"শিশুসাথী"র নিয়মাবলী

১। "শিশুসাথী"র চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২।০। প্রতি সংখ্যা ।৵০। **চাঁদার টাকা শ্রীহরিশরণ ধর, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। "শিশুসাথী"র বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। চাঁদার টাকা পাইলেই গ্রাহক করিয়া পত্রিকা পাঠান হয়। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে। পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই, সমস্ত গ্রাহকের পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা, কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে, পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায় তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ।৵০ হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা যখনই কোন চিঠি-পত্র লিখিবেন, চিঠিতে নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৮। **লেখক-লেখিকারা ও গ্রাহকেরা** ছেলেমেয়েদের উপযোগী "শিশুসাথী"র জন্য 'লেখা' পাঠাইতে পারিবেন। সম্পাদকের মনোনীত হইলে উহা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়; তবে তাহা কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তোলা ফটো অথবা তাহাদের আঁকা ছবিও "শিশুসাথী"তে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয়। মনোনীত হইলে ছাপা হয়। সঙ্গে পোষ্টকার্ড না পাঠাইলে অথবা উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সকল সময় সম্ভব হয় না। কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদা ভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৯। ধাঁধার উত্তর ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছান দরকার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'** : ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩৫শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

ধর্মধ্বজ ও ইন্দ্রাণী (জাতক হইতে)

৩৫শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৬৩ { ১ম সংখ্যা

নতুন বরষ জাগায় হরষ

শ্রীসুনির্মল বসু

বৈশাখেতে ঐ শাখেতে
হাস্‌ছে পাখী গান করে',
গাছের শাখায় ঐ যে তাকায়,
ফুল্‌রা হাসে প্রাণ ভরে।

ঝর্‌ণা-নদী বইছে যদি
কোন্ হাসিতে মাত্‌ছে রে ?
দখিন বাতাস সুনীল আকাশ
হাসিরই ফাঁদ পাত্‌ছে রে।
হাস্‌ছে চাঁদে মনের সাধে,
হাস্‌ছে তারা মিট্‌মিটে,
মুখ-গোম্‌রা হাস্‌ছে ওরা,
হাস্‌ছে যারা খিট্‌খিটে।

জলে-স্থলে আকাশ তলে
হাস্‌ছে সবাই বৈশাখে,
মন্‌-মরারা কাঁদ্‌ছে যারা
আজ্‌কে তারা কই থাকে ?
সবাই হাসে কী উল্লাসে,
খুশী সবার চিত্ত রে।
নতুন বরষ জাগায় হরষ
এ সুখ থাকুক নিত্য রে।

ঐতিহাসিক ঘোড়া

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যত্ন করে ফারসী ভাষা শিখেছিলাম মুসলমান আমলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবো বলে। গবেষণা করেও ছিলাম বেশ কিছু দিন তুর্কী মুসলমানদের সম্বন্ধে।

কিন্তু সেই কথা বলার জন্যেই এই কাহিনীর অবতারণা করছি না। ফারসী ভাষার জ্ঞানটা হঠাৎ একদিন কি ভাবে একটা রহস্যপুরীর বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল আমার চোখের সামে, তাই হল আমার গল্পের বিষয়। সে কথায় পরে আসছি।

তখন আমার বয়স বারো তেরোর বেশী নয়। বাড়ীর সংলগ্ন খিড়কির পুকুর পাড়ে বহুকালের পুরানো যে শিবমন্দির ছিল, সেটা ভূমিকম্পে ভেঙে পড়লো। বুড়ো শিব গ্রামের জাগ্রত দেবতা—সবাই বললো, মন্দিরটা আবার তৈরি করাতে। নইলে অমঙ্গল হবে।

বাবা মিস্ত্রী লাগালেন। খোঁড়াখুঁড়ি সুরু হল। কিন্তু কয়েক হাত খোঁড়ার পর বেরুলো কোন মৃত জানোয়ারের এক রাশ হাড়—তারপর বেরুলো আট দশটা ছোট ছোট সোনার ঘণ্টা এবং একটা রূপোর আসনের মতো জিনিষ।

সারা গ্রামে সোরগোল পড়ে গেল। চাটুয্যেরা গুপ্তধন পেয়েছে। কেউ বললো, তিন ঘড়া মোহর পেয়েছে, কেউ বললো আধমণ সোনা পেয়েছে।

প্রীতপাল

হাইস্কুলের হেডমাষ্টার অচ্যুতবাবু জিনিষগুলো দেখে ভেবেচিন্তে বললেন, কোন প্রাচীন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন—সেই ঘোড়ার হাড়, এগুলো তারই গলার ঘণ্টা, আর ওটা জিন। তখনকার জিন ঐ রকমই ছিল।

ব্যাখ্যাটা মুখে মুখে অনেক দূর ছড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে আজ গরীব হয়ে গেলেও চাটুয্যেরা, অর্থাৎ আমরা এক সাবেকী রাজবংশ।

কিন্তু ঘটনার চেয়ে রটনা বেশী হল। ফলে, থানার অফিসার এসে হাজির হলেন আমডাঙায় এবং কি এক আইন বলে ঘণ্টা, জিন, আর কয়েক টুকরো হাড় নিয়ে গেলেন।

বললেন, মাটির ওপরে যা আছে তা জমির মালিকের—ভেতরে যা পাওয়া যাবে, তা গবর্ণমেণ্টের।

ঐশ্বর্য্য ও রাজবংশের গরিমা একবার মাত্র ঝলক দিয়েই শূন্যে মিলালো, শুধু একটি কিশোর বালকের মনে রয়ে গেল একটা অস্বচ্ছ রহস্যের স্মৃতি।

* * * *

প্রায় আটাশ বৎসর পরে যখন আমি পুরাতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছি, সেই সময় আকস্মিক ভাবেই একদিন সেই হাড় হয়ে যাওয়া অশ্বমেধের ঘোড়া ও তার ঘণ্টার রহস্য আবিষ্কার করে ফেললাম আমি।

বাবার এক জ্ঞাতি সম্পর্কের ভগিনী ছিলেন—তাঁকে আমরা বলতাম রাঙা পিসিমা। নিঃসন্তান এই পিসিমা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে এসে থাকতেন আমার কাছে।

সেবার যখন তিনি এলেন, এক বাণ্ডিল কাগজ-পত্র সঙ্গে নিয়ে এলেন।

বললেন, তোর বাবা গয়ায় চাকরি নিয়ে যাবার সময় এই কাগজগুলো আমার কাছে রেখে গিয়েছিল—তারপর আর সে দেশে ফেরেনি ত। কাগজগুলো এতকাল পড়েই আছে আমার সিন্দুকে। বরাবর ভাবি তোকে এনে দোব—মনেই থাকে না।

জমি-জমা সংক্রান্ত একরাশ কাগজ, পাট্টা, কবুলত, খত ও দানপত্র। এ ছাড়া আছে অজস্র চিঠি, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, বিয়ের ফর্দ্দ আরো নানা জিনিষ—সাবেকী তুলোট কাগজে গোট গোট অক্ষরে লেখা। লেখার ছাঁদও যেমন পুরানো, কাগজ কালিও তেমনি পুরানো। আড়াই শো বছর ত বটেই, তিন শো বছরও হতে পারে কতকগুলোর বয়স।

সাগ্রহে ওল্টাতে লাগলাম দলিলগুলো। একে প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা আমার প্রতি দিনের পেশা, তার ওপর আপন পূর্ব্বপুরুষদের জিনিষ!

কয়েক দিন পর্য্যন্ত দিনেরাত্রে তন্নতন্ন করে পড়ে চললাম এই বৃহৎ বাণ্ডিলের প্রত্যেকটি কাগজ। অনেক জায়গা পোকায় ফুটো করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় বিবর্ণ হয়ে গেছে কালির রঙ, কোন কোন কাগজে হরফের পুরানো ঢং পড়াই যায় না। তবু ঘেঁটে চললাম, যদি কিছু দামী সমাচার বের করতে পারি।

হঠাৎ পিটানো পাতলা চামড়ার মচমচে একটা রোকা হাতে পড়লো। সরু সরু জরির সুতো দিয়ে সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। ঠিক এই ধরণের দলিল দস্তাবেজ কাশ্মীর, আগ্রা ও বিজাপুর থেকে পাওয়া গেছে—তাই বুঝলাম জিনিষটা মূল্যবান।

জরির বাঁধন খুলে ফেললাম। কয়েক ভাঁজ চামড়ার কাগজ আর তাতে ঝকঝকে হাতে ফারসী হরফে লেখা একটি কাহিনী। অদ্ভুত আশ্চর্য্য কাহিনী।

এতদিনে মনে হল ভাগ্যি ফারসী ভাষাটা শিখেছিলাম যত্ন করে।

* * * *

কাহিনীকার আলি হোসেন সিরাজী বলছেন, জাহাঙ্গীর বাদশার তৃতীয় ফৌজদার সুলেমান ইসার খাঁ পরগণা নিকারীগঞ্জ, কুমারডিহি, বারুণ্ডা, জোগ্রাম আর হাঁসখালি দখল করে এক নবাবশাহী গড়লেন। আমি হোসেন সিরাজী ছিলাম তাঁর প্রধান কাতেব—আমার কাজ ছিল আরবী ফারসী থেকে বিখ্যাত কিস্‌সা, কাহিনী আর কবিতা নকল করা।

নবাব তাঁর সাতজন পাট বেগম, তিনজন উজীর, ছ'জন ফৌজদার, বাইশজন হুকুমত নবীশ, ছুশোজন সিপাহী, অনেক ঘোড়া, হাতী, উট এবং বান্দা-বান্দী নিয়ে থাকতেন বিখ্যাত কাঁচ মহল নাসেম-ই-সাহেরীতে।

এরি ক্রোশ খানেক দূরে ছিল আমার বাগান বাড়ী—তার নাম খোসবাগ। চারিদিকে বোসরাই গোলাপের বন, মধ্যে ফিনকি দিয়ে জল ঠিক্‌রানো ফোয়ারা—ছোট্ট কুঞ্জগৃহ ছিল আমার।

-প্রীতপাল-

খাসা স্ফূর্ত্তিতে ছিলাম কবিতা চর্চ্চা নিয়ে। কোন ভাবনা ছিল না।

হঠাৎ বরাত ভাঙলো আমার। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে বই নিয়ে বুঁদ হয়ে আছি, এমন সময় এক তরুণী কালো বোরখা মুড়ি দিয়ে এসে উঠলেন আমার বাড়ী। পিছন পিছন কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে এক বর্ষীয়সী—সম্ভবতঃ তাঁর বাঁদী।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, কে আপনারা?

বাঁদী উত্তর দিল, নবাবের তিসরী বেগম হুজুরাণ জিন্নৎ নূর—আর তার বাঁদী বিবি কলিমন।

করজোড়ে বললাম, আমার ওপর হজরত কি আদেশ করছেন?

মুখের ঢাকা সরিয়ে ফেলে বেগম তাকালেন আমার দিকে। শিশির ধোয়া পদ্মের মতো মনোরম তাঁর মুখ—ছুটি চোখ ছল ছল করছে যেন কান্নায়।

বললেন, মুন্সীজী, নবাব গোঁসা হয়েছেন আমার ওপর—রাত পোহালেই আমাকে আর আমার এই খোকাকে কুয়োয় পুঁতে ফেলার হুকুম দিয়েছেন কোতোয়ালকে।

ফু পিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। কাঁদতে লাগলো বাঁদী কলিমনও।

বললাম, কি করলে আপনার হিত হতে পারে হজরত, হুকুম করুন তা বান্দাকে।

বেগম জিন্নৎ নূর বললেন, আমি হলাম মৌলানা আলহিসার মেয়ে—এই অপমানের মৃত্যু আমি স্বীকার করবো না। বাঁদী আর আমি এই রাত্রেই ঝাঁপ দিয়ে মরবো অজয় নদীতে। জানের চেয়ে ত মান বড় মুন্সীজী!

আমি সবিনয়ে বললাম, কিন্তু মানের চেয়ে সন্তান আরো বড় হজরত। আপনি যে জননী।

কলিমন বাঁদী বললো, সেই জন্যেই ত আপনার বরাবর এসেছি মুন্সীজী। আপনি আলেম লোক, অভাগিনী বেগমকে বাঁচাতেই হবে আপনার এই বে-ইজ্জতী থেকে। বেগমের বাচ্চাটা নিন, ওর খোরপোষের জন্যে নিন এই হাজার আসরফীর তোড়া—আর এই রাত্রেই পালিয়ে যান দূরে, যত দূরে পারেন···এইটুকু আমরা মেহেরবানি চাইছি।

ভয়ে ভয়ে বললাম, কেমন করে পায়ে হেঁটে পালাবো আমি নবাবের বাচ্ছা নিয়ে?

জিন লাগানো তুর্কী ঘোড়া মোতায়েন আছে দরজায়, বললো কলিমন।

ঘোড়া ছুটলো। দু'রাত দু'দিন একটানা দৌড়ানোর পর আমডাঙার এক পুকুর পাড়ে এসে ঘোড়া হঠাৎ আছাড় খেয়ে ঘায়েল হল—চার পা টান করে শুয়ে পড়লো সে, আর উঠলো না।

অগত্যা আস্তানা গাড়তে হল আমাকে সেখানেই।

সেই থেকে পরিচিত হলাম আমি চিনিবাস চাটুরঝিয়া নামে, আর আমার ছেলে কৃত্তিবাস চাটুরঝিয়া নামে মানুষ হতে লাগলো নবাবজাদা ইসমাইল।

মুসলমানী শিল্পের দীক্ষা ও আদব দস্তুর মুছে ফেলে হিন্দু হতে কম মেহনৎ করতে হল না আমাকে। কিন্তু খোদা হাফেজ, অকৃতকার্য্য হলাম না।

আঠারো বছর কেটে গেল এই করে। কৃত্তিবাস এখন দিব্যি স্বাস্থ্যবান যুবক লেখাপড়াও শিখেছে সে ভালোই। কিষণনগরের এক গোঁসাই বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছি তার। বৌমাটিও খাসা সুন্দরী।

বিষয়-আশয়, জমি-জিরেত, বাগান-পুকুর আমি মন্দ করিনি। সবই দিয়ে দিলাম আজ ওদের—কেননা আজই রওনা হচ্ছি আমি আবার শূন্য হাতে অজানার পথে।

যাত্রার আগে আমি আলি হোসেন সিরাজী জানিয়ে যাচ্ছি যে বেগম জিন্নৎ নূরের সেই হাজার আসরফীর এক দিনারও খরচ করিনি আমি। সব ফেলে দিয়েছি বেণে বৌয়ের দীঘিতে, আর নবাবের ঘোড়া, তার গলার সোনার ঘণ্টা ও রূপার জিন-রেকাব মাটি চাপা দিয়ে, তার ওপর তৈরি করিয়েছি এক শিব মন্দির।

পবিত্র ফারসী ভাষায় এই কাহিনী লিখে যাচ্ছি আমি ভবিষ্যৎ কালের মানুষের জন্যে। তোমরা যারা পড়বে এই কাহিনী, তারা জেনো, হিন্দু দেশে একটি মা-বাপ হারা নিষ্পাপ শিশুকে হিন্দুরূপে মানুষ করে তোলার জন্যেই আমাকে করতে হয়েছিল ছদ্মবেশ ধারণ—নইলে অন্তর থেকে মুসলমানত্ব বিসর্জ্জন দিই নি আমি এক দিনের জন্যেও!

* * *

পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। হতভাগিনী বেগম জিন্নৎ নূর আর বাঁদী কলিমনের কি হল, কি হল নবাবের হুকুম ফাঁসিয়ে দিয়ে তাঁর বাচ্ছাকে নিয়ে হোসেন সিরাজীর সেই রাত্রে পালানোর ফল, তা ভাবতে ভাবতেই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে পড়লো, বাবা প্রায়ই বলতেন, চিনিবাস চাটুরঝিয়া ছিলেন আমডাঙা চাটুয্যে পরিবারের আদি পুরুষ, আর তাঁর পুত্র কৃত্তিবাস ছিলেন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত—তিনি বিবাহ করেছিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বংশে। আশ্চর্য্য ব্যাপার ত!

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত যে অশ্বমেধের ঘোড়া আর সোনার ঘণ্টার হদিশ মিললো এবং তা মিললো ফারসী ভাষা শিখেছিলাম বলে, এতেই আমি খুসী। অবশ্য এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার সম্ভব হল রাঙা পিসিমার জন্যে, তাই তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই!

খেলনা তৈরি

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

সামান্য একটু ঠ্যালা দিলেই হাবলা-পুতুল দুলতে আরম্ভ করবে। পুতুলটির চেহারা দেখলেই হাসি পায়—মাথায় তার গাধার টুপী, পা একটা, গায়ে রঙীন জামা! তৈরি করতে চাও তোমরা?

পুরু টিনের পাত বা পাতলা প্লাইউড দিয়ে একটা ক্লাউন বা হাবলা পুতুল ছবি অনুযায়ী আধ ইঞ্চি বর্গ করে নিয়ে পুতুলটি তৈরি করা যাবে। পুতুলটিকে নানা রংয়ের
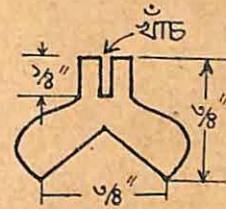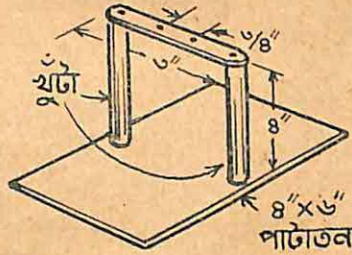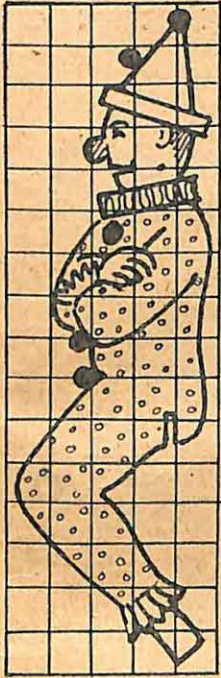
কাপড় পরিয়ে (বা রং করে) নিলে ভালো হয়। পুতুলের পায়ের নীচের পাটাতন (base)টি ধাতুর পাত বা প্লাইউড দিয়ে তৈরি কর। এর দু'পাশে থাকবে দুটি খুঁটা (dowel)। খুঁটা দুটি ঐ পাটাতনের উপর পুততে হবে। পাটাতনের পাশের দিক থেকে স্ক্রু লাগিয়ে ওটা শক্ত করা চলে।

এই দুই খুঁটার সংযোগ করবে আর একটা কাঠ (bar)। এই কাঠের দণ্ডটির মধ্যে করতে হবে দুটি ছিদ্র। ছিদ্র দুটির তলায় ছোট কার্পেটের টুকরো দিয়ে নিলে ঘষাটা কম লাগবে! ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে ঐভাবে হাবলা পুতুলের তলায় এবং ঐ পুতুলের দাঁড় বা যার উপর বসবে তার (pivot) উপর খাঁচ (slot) কেটে নাও। তারপর এই দাঁড় আর পুতুলকে এটে নাও। (ধাতুর হলে ঝালাই করবে)। ছবি অনুযায়ী একটা সীসের চৌকো তাল আটকে দাও ঐ পুতুলের পায়ের সঙ্গে। এই পা, বসবার দাঁড় এবং পুতুলটির মাথার শীর্ষভাগ যেন এক সরল রেখায় থাকে। একটু ঠ্যালা দিলেই পুতুলটি দুলবে।

রাজার দয়া

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

—এক—

অনেক আগের কথা। এক ছিল চাষা আর তার ছিল আদরের এক মুর্গী। গরীব বেচারা তার ছেলে-বউকে পেট ভরে খেতে দিতে পারত না। মনে তাই বড় দুঃখ।

একদিন হলো কি, চাষার বৌ জানাল, ঘরে চাল বাড়ন্ত। পুরো দিনটাই উপোস। ছোট ছেলেটার করুণ মুখের দিকে চেয়ে চাষা ব্যথায় মুষড়ে পড়ল। হঠাৎ সেই সময় মুর্গীটাকে দেখে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

খানিক বাদে মুর্গীটা জবাই করে সে তার বৌয়ের হাতে দিল, "এই নে, এ-বেলার মত এটা পুড়িয়ে খাওয়া চলবে?"—বৌ তাড়াতাড়ি মুর্গীটা ঝলসাতে বসল। কিন্তু খাবে কি দিয়ে? ঘরে যে নুনটুকুও নেই! চাষা গেল তার প্রতিবেশীর ঘরে, যদি কিছু ধার মেলে। বুদ্ধির জাহাজ সে। চাষার কানে কানে কি যেন বলল। চাষার মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

—দুই—

ওদিকে রাজসভায় মহা সোরগোল। এক চাষা এসেছে। রাজার দর্শন চাই। বহু ভেবে রাজামশাই তাকে আসতে আদেশ দিলেন। চাষা তার ঝলসানো মুর্গীটা ভক্তিভরে রাজার পায়ে রেখে প্রণাম করল। তারপর জোড়হাতে বলল, "হুজুর, ভাবলাম, জীবনে রাজ-দর্শন হবে না? শুধু হাতে না এসে যৎসামান্য এই প্রণামী এনেছি। গ্রহণ করতেই হবে।" রাজা বুঝলেন বেটার নিশ্চয় কিছু মতলব আছে। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "বেশ, মুর্গীটা আমি নিলাম। কিন্তু আমার

পরিবারের সবার ভেতরে ঠিকমত ওটা ভাগ করে দাও। তোমার ভাগের কৃতিত্ব অনুযায়ী তোমায় আমি পারিতোষিক দেব। এই দেখ, আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আর এই রাণী-মা।" চাষা খানিক ভেবে নিল। তারপর কোঁচার খুট থেকে ধারাল একটা ছুরি বার করে মুর্গীটা ভাগ করতে বসল। প্রথমে মুগার গলা অবধি কেটে নিয়ে মহারাজকে দিয়ে সে বলল; "প্রভু, এত বড় যে রাজ্য, তার আপনিই সর্বেসর্বা। শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ যে মাথা, তা' আপনি ছাড়া কে পাবার যোগ্য ?" তারপর লেজের দিকটা কেটে রাণীর হাতে দিয়ে সে বিনয়ের সাথে জানাল, "মা, মুণ্ডু যে-দিকে যায়, লেজও যায় সেইদিকে। তেমনি মহারাজার গতির সাথে আপনার জীবনের গতি যেন চলতে পারে।"—মুর্গীর ঠ্যাং দুটো কেটে সে দুই রাজপুত্রের হাতে দিয়ে হাসল, "বাবারা, তোমরাই ভবিষ্যৎ। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে মুর্গীরই মত সবল পায়ে চলতে সমর্থ হও, এই কামনা করি।" তারপর পাখাদুটো দুই রাজকন্যাকে দিয়ে সে সস্নেহে, বলল "মা-লক্ষীরা, বড় হয়ে এই মুর্গীর মত পাখার আশ্রয়ে প্রজাদের পালন কর, এই আমার প্রার্থনা।" সবশেষে মহারাজের দিকে ফিরে সে নিবেদন করল, "দীনের পিতা, দয়ার অবতার, যদি অন্যায় ক্ষমা করেন ত আপনাদের প্রসাদ-স্বরূপ মুর্গীর ধড়টা এই অধমকে নেবার অনুমতি দিন।"—সভাশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠল চাষার বুদ্ধি দেখে। রাজার হুকুমে চাষা একমণ চাল ও একশ মোহর পুরস্কার পেল। আহ্লাদে গদগদ হয়ে সে ফিরে গেল ঘরে।

—তিন—

শহরে এক ধনী ব্যবসায়ী ছিল। কিছুতেই তার লোভ মিটত না। চাষার কাণ্ড শুনে সে বাজারে গিয়ে পাঁচটা মোটা দেখে হাঁস কিনে আনল। তারপর সোজা রাজসভায় গিয়ে প্রণাম করল রাজাকে, আর ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁকে জানাল যে তার যথা-সম্বল এই হাঁসগুলো সে রাজার জন্য এনেছে। তিনি তা গ্রহণ করলে তার জীবন সার্থক হয়। রাজা ব্যাপার বুঝলেন। কিন্তু ভাল মানুষের মত তিনি তাঁর পরিবারের সকলের মধ্যে ঠিকভাবে হাঁসগুলো তাকে ভাগ করে দিতে বললেন। ছয়জনের মধ্যে পাঁচটা হাঁস কি করে ভাগ করবে ঠিক করতে না-পেরে সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। রাজা হুকুম দিলেন সেই চাষাকে ডেকে আনতে।

চাষা রাজসভায় এসেই রাজাকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর জেনে নিল কি জন্য মহারাজ তাকে স্মরণ করেছেন। সব শুনে সে বলল, "ওঃ, এত খুব সোজা হিসেব।" এই বলে রাজা ও রাণীর দিকে একটা হাঁস এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিয়ে আপনারা তিনজন। "তারপর দুই রাজপুত্রের দিকেও একটা হাঁস এগিয়ে দিল, আর একই কথা বলল। রাজকন্যাদের বেলাতেও একই ব্যাপার। তারপর দুই বগলে বাকী হাঁসদুটো পুরে সে বল্লে, "আর মহারাজ, এই নিয়ে আমরাও হলাম তিনজন!" আবার সভায় হাসির রোল উঠল। চাষার কপাল ভাল। রাজা তাকে অনেক দামী দামী পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

———

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর শ্রীপীযূষকান্তি চৌধুরী

(৮) শ্রমিক

শ্রমিক কথাটা কাণে আসতেই তোমাদের মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে সেটা অনেকটা এরকম ঃ একটা রোগা লোক, মাথার চুলে টেরি, গায়ে একটা রঙ্গিন হাফ সার্ট পরণে তালিদেওয়া খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে বাদামী রংয়ের কেডস্ অথবা চটি। মুখে সিগারেট অথবা বিড়ি। কারখানা থেকে যখন সে আট ঘন্টা ডিউটি দিয়ে বেরিয়ে এল তাকে দেখলে মনে হবে যে যন্ত্রদানব তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। ও যেন আর চলতে পারছে না। ওর মনে কোন আনন্দ নেই, কোনরকমে যেন জীবনটা ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নেবার আগে আমি আট বছর কারখানায় চাকরী করেছি। বজবজ থেকে ডালমিয়া নগর পর্য্যন্ত নিজ চোখে দেখেছি শ্রমিকদের অবস্থা। কাজেই এদেশে আসার পর থেকেই মনে মনে একটা ইচ্ছা ছিল এদেশের শ্রমিকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার। সুযোগ অবশ্য সহজে মেলেনা বিশেষ করে বিদেশীদের পক্ষে। প্রথমতঃ দু' এক দিন কেবল কারখানা দেখলেই তো অবস্থাটা ঠিক বোঝা যায় না, অন্ততঃ যদি মাসখানেক কোন কারখানায় কাজ করা যায় তবেই বাস্তবিক অবস্থাটা চোখে পড়ে। আমি অবশ্য এদেশে দু' একটা কারখানা দেখেছি অন্যান্য বিদেশী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। গত বড়দিনের ছুটীতে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন বিদেশী ছেলেমেয়ে স্কুইবএর কারখানা দেখতে যাই। স্কুইব খুব নাম করা আন্তর্জ্জাতিক ওষুধের কারখানা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর শাখা আছে। আমাদের দেশেও বোম্বেতে ওর একটা ছোট কারখানা আছে।

নিউইয়র্ক থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে নিউব্রান্‌সিকে এই নতুন কারখানাটি তৈরী হয়েছে। প্রায় তিন হাজার লোক এখানে কাজ করে। এর মধ্যে গবেষণাগারে আছে প্রায় পাঁচ শ' লোক। এদের লেবরেটরী খুব ভাল ও নাম করা। স্কুইবএর পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন পৃথিবী বিখ্যাত। কারখানার অধিকাংশ কাজই স্বয়ং চালিত যন্ত্রের সাহায্যে হচ্ছে তা-না হলে অন্ততঃ দশ হাজার লোকের দরকার হত।

বিরাট জায়গা নিয়ে কারখানাটি। প্রথমে ঢুকতেই যে জিনিষটা সবাইকে অবাক করবে তা হ'ল মোটর গাড়ীর সারি। দেখেই মনে হবে—একসঙ্গে এত গাড়ীই বোধহয় আমি কোনদিন দেখিনি। হাজার তিনেক তো হবেই। হয়ত বেশীও হতে পারে। আমার জীবনে বজবজ থেকে ডালমিয়ানগর পর্য্যন্ত গাড়ী আমি অনেক দেখেছি সত্যি কিন্তু সেগুলো হ'ল ম্যানেজার সাহেবের অথবা প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বা সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের। কোন কেমিষ্টের গাড়ী দেখেছি বলে মনে হয় না।

আর এখানে সব শ্রমিকেরই একটা করে গাড়ী আছে। কারও কারও বেশীও আছে, যেমন, স্বামীর একটা, স্ত্রীর আর একটা। প্রায় পাঁচ-ছ' ঘন্টা ধরে কারখানাটা ঘুরে দেখলাম। কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। প্রত্যেক করিডরে রেডিও থেকে মিষ্টি গান হচ্ছে। শ্রমিকেরা মিষ্টি সুরে তাল দিয়ে নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে। দেখলেই মনে হয় ওদের মনে কত আনন্দ। তুমি যদি কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস কর অমনি সে তোমায় বুঝিয়ে দেবে সে কি করছে। খাটুনি কিন্তু খুব। ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সব স্বয়ংচালিত যন্ত্রেই হচ্ছে কিনা। শ্রমিকদের কাজ হচ্ছে কেবল জোগান দেওয়া। যেমন ধর বোতল ভর্ত্তি করতে হবে। খালি বোতল, চেইন কনভেয়ার (Chain Conveyer) করে একটার পর একটা তোমার হাতের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। তোমার ডিউটি হল কল খুলে ওটাকে ভর্ত্তি করা। ওটা ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাবে আর একটা খালি বোতল তোমার হাতের কাছে এগিয়ে আসবে। গল্প করার বা বিড়ি খাবার উপায় নেই। সব সময় নজর রাখতে হ'বে তা-না হলে সব কারখানার কাজ অচল হয়ে পড়বে আর তোমার গাফিলতি সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবে এর নামই হল যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা।

বারটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকেরা লাঞ্চের জন্য কাজ থেকে উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে লাঞ্চঘরের দিকে যেতে লাগল। আমরাও গেলাম। কোম্পানী থেকে খুব সস্তায় এখানে ভাল খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা স্কুইব কোম্পানীই করেছিল। খুবই আদর যত্ন করে খাওয়াল। বিকেলে আমরা সমস্ত লেবরেটরিগুলি ঘুরে দেখলাম। এদের লেবরেটরীতে যে সমস্ত দামী দামী যন্ত্রপাতি আছে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েও সেরকম নেই। এরা গবেষণার উপর খুব জোর দেয়, না হলে নতুন নতুন ওষুধ কি করে বার হবে।

শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই মেয়ে। সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা খাটুনি। শনি রবি পুরো ছুটি। সত্তর-আশী ডলার নীচের দিকে সপ্তাহের মজুরি। এ ছাড়া অসুস্থ, বেকার এবং প্রসূতি বীমার ব্যবস্থা ত আছেই। সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের সুন্দর স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কারখানা থেকে দেওয়া সাদা পোষাক। সমস্ত কারখানাটা মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট লেবরেটরী। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আমরা কত পেছনে পড়ে আছি। আমাদের শ্রমিকেরা এদের আনন্দের শতকরা দশ ভাগও বোধহয় পায় না। কাজের কি আনন্দ তা ওরাই উপভোগ করছে।

স্কুইবের গবেষণাগার দেখে আমরা সবাই খুবই আনন্দ নিয়ে ফিরেছিলাম। আমার কিন্তু মনে পুরো সন্তোষ হয় নি কেননা একদিনে তো আর সব বোঝা যায় না। আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল যখন আমার স্কুল থেকে আমায় একটা বড় ওষুধের গবেষণাগারে প্রায় এক মাস কাজ করার জন্য পাঠাল। এক মাস ঐ কারখানায় কাজ করে নিজের চোখে ভাল করে সমস্ত দেখে আমার এখন দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে এদেশের শ্রমিকেরা বাস্তবিকই সুখী। এদের প্রত্যেকেরই

বাড়ীতে টেলিভিসান, রেডিও, টেলিফোন তো আছেই তা'ছাড়া গাড়ীও আছে। ওদের জীবন-যাত্রার মান এত উঁচু যে আমাদের দেশে মধ্যবিত্তদেরও ঐ অবস্থায় পৌঁছতে বহু বছর লেগে যাবে। এই পরিবর্ত্তন নাকি এসেছে মাত্র বারো-তেরো বছরের মধ্যে আর এর মূলে হচ্ছে ওদের ইউনিয়ন। এ দেশের দুটো বড় বড় শ্রমিক সংগঠন সম্প্রতি একত্র হয়েছে। এর নাম এ. এফ. এল., এবং সি. আই. ও (অ্যামেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এবং কংগ্রেস অব ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল অরগানিজেশন) এদের সভ্য সংখ্যা দেড় কোটি—সভাপতি জর্জ্জ মিনি। মিনির অসম্ভব ক্ষমতা। যে অনুপাতে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে সেই অনুপাতে কিন্তু মধ্যবিত্তদের মাইনে বাড়েনি। যেমন ধর না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এখনও মাসে ছ'-সাত শ' ডলার পাচ্ছেন কিন্তু ফোর্ড কোম্পানীর একজন সাধারণ শ্রমিক পাচ্ছে প্রায় পাঁচ শ' ডলার। এতে সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার মান খুব বেড়ে গেছে সত্যি কিন্তু জ্ঞানী-গুণী মধ্যবিত্তদের তেমন বাড়েনি। অনেককে বলতে শুনেছি আমাদেরও একটা ইউনিয়ন করতে হবে তা না হলে আমাদের অবস্থা বদলাবে না।

মোটকথা আমেরিকার শ্রমিক বাস্তবিকই সুখী। এমন কি কিছুদিন আগে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে যে ডেলিগেশান এসেছিল ওরাও এদের অবস্থা দেখে স্বীকার করে গেছে যে রাশিয়াতে শ্রমিকের মান এদেশের সমান করতে এখনও অনেক বছর লাগবে।

প্রার্থনা গীতি

বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আমরা সোনার দীপ্ত শিশু
মর্ত্য ধুলায় মানুষ হবো,
উদয়-ভানুর আশীষ কমল
মাথায় পাতি মোরা লবো।
দিগ্বিজয়ের আশা রেখে
ঘুমন্তদের আন্‌ব ডেকে,
দিগন্তে ঐ বিজয়-ধ্বজা
উড়িয়ে মোরা চল্‌ব নব॥

অন্যায়েরে করব শাসন
ন্যায়ের আসন পাতবো মোরা,
মোদের নতুন শক্তি দিয়ে
গড়্‌বো নতুন বসুন্ধরা
নবারুণের রক্ত রাগে
ভোরের কমল যেমন জাগে
হে ভগবান জাগাও তেমন
জাগার বাঁশী বাজিয়ে তব॥

যন্ত্রের তৈরী মানুষ

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

তোমরা ভাবছ আমি এক আজগুবি গল্প বলতে বসেছি। কিন্তু তা মোটেও নয়। বৈজ্ঞানিক যুগে যন্ত্রের সাহায্যে এমন বহু মানুষ তৈরী হয়েছে, যারা রক্ত মাংসের মানুষের মত কাজ করতে পারে।

প্রথমে একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলি। লণ্ডনে একটা মোমের পুতুলের মিউজিয়ম আছে। ঐ মিউজিয়মে মোম দিয়ে তৈরী গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, চার্লি চ্যাপলিন, হিটলার প্রভৃতি বিখ্যাত মানুষদের প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সাজানো আছে। আমি টিকেট কেটে যখন সিঁড়ি দিয়ে মিউজিয়মের দোতলায় উঠতে যাচ্ছি, দেখি সামনে একজন দ্বাররক্ষী আমার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। দেখে ভাবলুম বুঝি সে আমার টিকেটখানি দেখতে চায়। সুতরাং টিকেটখানি বের করে তার হাতে দিতে যাচ্ছি, দেখি হাতখানি যে ভাবে বাড়ানো ছিল সেই ভাবেই বাড়ানো রয়েছে। দেখে আশ্চর্য লাগল। ভাল করে চেয়ে দেখি, দ্বাররক্ষী আসলে মানুষই নয়, একটি মোমের তৈরী মানুষাকৃতি পুতুল। কিন্তু সত্যিকার মানুষের সংগে তার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! হঠাৎ দেখলে বোঝবার জো নেই যে ওটা পুতুল, মানুষ নয়। যা হোক, অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম।

যে পুতুলের কথা বললাম সে তো নিশ্চল, নড়াচড়া করতে পারে না। কিন্তু ম্যাগনাম নামে এক বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্রচালিত মানুষ তৈরী করেছিলেন। ঐ মানুষ কোন এক বৈজ্ঞানিকের ভৃত্যের কাজ করত। সত্যিকার মানুষ অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যন্ত্রের তৈরী মানুষ ক্লেশ কাকে বলে জানে না। কি করে জানবে? মানুষ অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে ক্রমশঃ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু যন্ত্রের তো আর অনুভব শক্তি নেই, তাই সে ক্লান্ত হয় না। শোনা যায় ঐ ভৃত্য ত্রিশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিককে সেবা করেছিল।

অনেক বছর আগে প্যারিসের একটি প্রদর্শনীতে একটি যন্ত্রচালিত পুতুল খুব সুন্দর বাঁশী বাজিয়েছিল। ঐ প্রদর্শনীতে কোন এক বৈজ্ঞানিক একটি যান্ত্রিক হাঁস এনেছিলেন। ঐ হাঁস সত্যি হাঁসের মত ডাকতেও পারত, হাঁটতেও পারত। শুধু তাই নয়, তার সামনে খাবার রেখে দিলে সে ঠিক হাঁসের মত খুঁটে খুঁটে শস্য ইত্যাদি খেতেও পারত ও খাওয়ার পরে প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে ডাকতে অন্যত্র চলে যেত। ভারী মজার ব্যাপার, নয় কি? তোমরা যদি যন্ত্রের তৈরী বাঘ, সিংহ বা হাতী পাও তাহলে কি মজা-ই না হয়! বাঘ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করবে অথচ

তেড়ে গিয়ে কামড়াতে পারবে না। হাতী তোমাদের পিঠে নিয়ে বেড়াতে পারবে, কিন্তু কখনও পিঠ থেকে ফেলে দিতে পারবে না।

ঘড়িতে যখন 'এ্যালার্ম্ বেল' বাজে সেও তো যন্ত্রচালিত মানুষের কাজ করে। কারণ নির্ধারিত সময়ে ঘড়ি ঘণ্টার আওয়াজ করে। শোনা যায় পঁচিশ বছর আগে ফরাসীদেশে এক ভদ্রলোক একজন ভৃত্য নিযুক্ত করেছিলেন, লোকটি নির্ধারিত সময়ে তাকে সজাগ করে দিতে। কিছুদিন পরে দেখা গেল লোকটি তার কাজ ঠিকমত করছে না, উপরন্তু মাইনেও বেশী চাচ্ছে। তখন ভদ্রলোক লোকটিকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে যাতে 'এ্যালার্ম্-বেল' বাজিয়ে তাকে সজাগ করে দিতে পারে এমনি একটি যান্ত্রিক মানুষ তৈরী করেছিলেন।

প্রায় দু'শো বছর আগে অষ্ট্রিয়াতে একটি পুতুল তৈরী করা হয়েছিল সেটা লিখতে পারত। পুতুলটি দেখতে কি রকম জান? একটি দেবী মূর্তি, হাতে কলম। পুতুলটি টেবিলের উপর হাত রেখে পনেরো মিনিটের ভিতর প্রায় ষাটটি শব্দ লিখে ফেলতে পারত।

শুনলে আশ্চর্য হবে একটি পুতুল দাবা খেলতে পারত। পুতুলটি একজন বয়স্ক মানুষ প্রমাণ লম্বা। তার মাথায় ছিল টুপি, গায়ে দামী পোষাক, পায়ে জুতো। আর তার বিশাল গোঁফ ছিল। পুতুলটি খুব ভাল দাবা খেলত। অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে গুটিগুলি এমন ভাবে চালান হত যে খুব ওস্তাদ দাবা খেলোয়াড়ও ঐ পুতুলকে সহজে হারাতে পারত না। শোনা যায় জার্মাণীর রাজা ফ্রিডরিখ্ ও ফরাসী নেতা নেপোলিয়ন ঐ পুতুলের সংগে দাবা খেলে হেরে গিয়েছিলেন। পুতুলটির সংগে দেশ বিদেশ থেকে বহু ওস্তাদ খেলোয়াড় দাবা খেলতে আসত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অমন একটি পুতুল এখন আর নেই। শোনা যায় আমেরিকায় আগুনে পড়ে পুতুলটি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

মোটর চালক কলের পুতুলের কথা কখনও শুনেছ? বিজ্ঞানের যুগে এও সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া যন্ত্রচালিত মানুষ যে গত মহাযুদ্ধের সময় বায়ুযান চালিয়েছে একথাও তোমরা শুনে থাকবে।

বৈজ্ঞানিকেরা স্বপ্ন দেখছেন কয়েক বছরের ভিতর তাঁরা এমন যান্ত্রিক মানুষ তৈরী করবেন যে টেক্স আদায় করতে পারবে। শুধু কি এই, তাঁরা আশা করেন ভবিষ্যতে এমন কলের মানুষ তৈরী করবেন যে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করতে পারবে। ঐ পুলিশ খুব দ্রুত চলমান মোটর গাড়ীকে রুখতে পারবে। ফলে রাস্তায় আকস্মিক দুর্ঘটনা কম ঘটবে। এ ছাড়া একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন এমন দিন অদূর ভবিষ্যতে আসছে যেদিন নাবিকবিহীন জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে। কথাটা শুনতে অবশ্য খুবই অদ্ভুত শোনায় কিন্তু বিজ্ঞান যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে এটাও যে একদিন সম্ভব হতে পারে সে কথা বিশ্বাস করা বোধ করি খুব অযৌক্তিক হবে না।
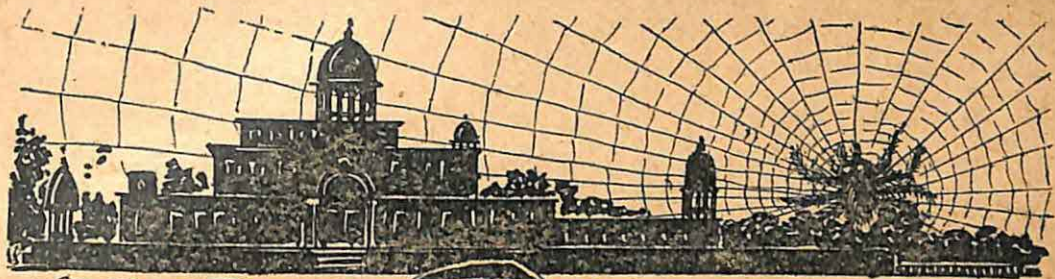
[**পূর্ব্বানুবৃত্তি**—নির্জ্জন মাঠের মাঝে প্রকাণ্ড বাড়ী। রহস্য পুরী। নানা জনে নানা কথা বলে এই বাড়ীর সম্পর্কে। কেউ বলে ভূত আছে, কেউ বলে দানা-দত্যি। এ নিয়ে কল্পনা-জল্পনার আর শেষ নেই। যুদ্ধের সময় মিলিটারী এসেও এখানে ব্যারাক করতে চেয়েছিলো। কিন্তু থাকতে পারেনি। সেই গ্রামে কলকাতা থেকে একদল ছেলে এসে হাজির হলো। এরা অভিযাত্রী হিসেবে বেরিয়েছিলো। অমিতাভ দলের অধিপতি আর দলে ছিলো পাবক, চঞ্চল ও হিমেল। তারা গিয়ে সেই গ্রামেরই এক বাড়ীতে অতিথি হলো। সেখানে বাড়ীর গিন্নীর সাথে মাসীমা পাতিয়ে বেশ সুখেই কাটালো দিনকয়েক। প্রেতপুরীর সন্ধান তারা পেলো। তাদের ইচ্ছা তারা ঐ বাড়ীতে রাত্রে যাবে। সবাই বাধা দিলো। কিন্তু বাধা মানবার ছেলে তারা নয়। তারা নিজেরা নানা রকম পরামর্শ করে একদিন রাত্রিবেলা লুকিয়ে ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো। পুরোণো বাড়ীর মধ্যে নানা রকম আসবাবপত্র ও দেয়ালে টানানো সব ছবি দেখে তারা বাড়ীটাকে কোন প্রাচীন আমলের বনেদী লোকের বাড়ী বলে মনে করলো। রাত্রিবেলা তারা পালা করে জেগে বাড়ীতে কি আছে তাই দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রইলো। তারা জেগে পাহারা দিতে দিতে নানা রকম সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলো। সেখানে হঠাৎ শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলো। অনেক লোকজন যেন বাড়ীতে এসে ঢুকেছে। কিসের যেন উৎসব চলেছে মনে হচ্ছে। নামকরণ উৎসব একটি শিশুর। শিশুটির আদরের সীমা নেই। একজনের কোল থেকে আর একজনের কোলে যাচ্ছে। একটি বলিষ্ঠ পুরুষ এসে বললে—"খোকাকে আমার কোলে দাও, বৌঠান।" ছেলের মা শিশুটিকে তার কোলে দিতে চাইছিলেন না। কারণ পুরুষটি মুখে ভালো কথা বললেও তার মুখে চোখে হিংসার আগুন জ্বলছিল। এর নাম বীর্য্য সিংহ, বাড়ীর ছোট জমিদার। তারই ভাইপো ছেলেটি। জমিদারীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এ জীবিত থাকলে বীর্য্য সিংহের জমিদারী পাওয়া হবে না। তাই সে একটি লোককে নিয়ে এলো ছেলেটিকে খুন করতে। লোকটি ভীষণ। সে না করতে পারে এমন কাজ নেই। সে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ এনে ছেলেটি যে ঘরে ঘুমিয়েছিলো রাত্রে সেখানে জানালা গলিয়ে ছেড়ে দিলো।]

[দশ]

হিমেল বসে বসে ভাবছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওকে ডেকে তুলে চঞ্চল সেই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে—আর তার কোনো সাড়া শব্দ নেই!

এই প্রেতপুরীতে নিশুতি রাতে এমন কি দেখলে চঞ্চল—যাতে ওর মুখের কথা অবধি বন্ধ হয়ে গেছে?

কোন্ অভিশাপ গুমরে কাঁদছে—এই নির্জ্জন অভিশপ্ত পুরীর আনাচে-কানাচে?

হিমেল কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে।

মাথার ওপরে মাকড়শা অনেকখানি জাল বুনেছে। নির্ব্বাক হয়ে তাই দেখতে থাকে হিমেল। ওই মাকড়শাটার জালে একটা চামচিকে কেমন করে জড়িয়ে পড়েছে। কিছুতেই সেই জাল ছিঁড়ে আর বেরিয়ে আসতে পারছে না!

চামচিকের চাইতে মাকড়শা নিশ্চয়ই বেশী কৌশলী।

একটা জানালা খুলে দিতে হিমেল-হাওয়া যেন হিমেলকে দাঁত বের করে আক্রমণ করলে! তাড়াতাড়ি আবার জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফার উপর বসলে সে।

ওর তিনটি বন্ধুই একেবারে অকাতরে ঘুমুচ্ছে!

যেন ওদের কেউ ঘুমের অষুধ খাইয়ে দিয়েছে। একি প্রেতপুরীর সম্মোহন না আর কিছু? পর পর তিন জন তিন প্রহরে রাত জেগেছে? ওরা কি কেউ ভূত-প্রেতের সন্ধান পেয়েছে—না, শীতের ভয়ে অমন গুড়ি স্থড়ি মেরে শুয়ে আছে?

ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না হিমেল। তবে একটি কথা সত্যি যে, প্রচুর ঘুমুবার অবকাশ পেয়েছে সে। এখন এই প্রহরটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

এই বিশাল পুরী একেবারে মরার মতো ঘুমিয়ে আছে। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কারো। মাঝে মাঝে ওপর দিকে চোখ পড়তে দেখা যাচ্ছে—মাকড়শাটা কেমন করে চামচিকেটাকে জালে জড়িয়ে নিচ্ছে। নাঃ, বেচারীর আর মুক্তি পাবার কোনো আশা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে পাইচারী করতে থাকে হিমেল। চারদিকের জানালা-দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে আছে—তবু যেন হাড়কাঁপানো শীত যায় না!

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হাতে-হাত ঘসতে থাকে হিমেল।

নাঃ, মিছিমিছি কতক্ষণই বা ঘোরাঘুরি করতে হয়? ও যখন আপন মনে পাইচারী করে তখন ওর লম্বা ছায়াটা ভারী অস্বাভাবিক মনে হয়। ভাবতে থাকে, তাইত, আমিও কি প্রেতপুরীতে প্রেতের মতো মানুষের গন্ধ পেয়ে লোভাতুর হয়ে উঠেছি নাকি?

তার চাইতে গুড়িস্ুড়ি মেরে একটা সোফার ওপর গ্যাঁট্ হয়ে বসি। যদি তেমন কিছু শব্দ শুনি, উঠে দাঁড়াতে কতক্ষণ ?

বেশ কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে হিমেল।

কতক্ষণ যে সে ওইভাবে বসেছিল—নিজেও জানে না। হঠাৎ একটা মৃদু ঝুম্-ঝুম্ শব্দ ওর কানে এলো। ছোট ছেলে নূপুর পরে হাঁটলে কিম্বা হামাগুড়ি দিলে যেমন শব্দ হয়—ঠিক তেমনি।

প্রথমে ভাবলে মনের ভুল। না, তা ত নয়—শব্দটা যে আরো কাছে। যেন সিঁড়ি বেয়ে ছেলেটি ওপরে উঠে এলো। তারপর ঝুম-ঝুম শব্দ করতে করতে ঢুকলো এসে ঘরে।

হিমেল তখন মুখ তুলে তাকালো।

কি আশ্চর্য্য! কেউ কোথায়ও নেই!

কি আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখলে হিমেল ? নিজের ওপরই ওর রাগ হল।

আবার কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে রইলো সে।

আরো খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ!

হঠাৎ একটা খিলখিল হাসি শুনে হিমেলের লোমকূপগুলি একেবারে খাড়া হয়ে উঠল।

নাঃ, এবার ত স্বপ্ন নয়। নিজের কানে শুনেছে সে হাসি! যেন একটা বেলোয়াড়ী ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

তবু মুখ তুললে না হিমেল। দেখা যাক, ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গড়ায়!

আবার সেই আধো-আধো কণ্ঠের খিলখিল হাসি! এইবার হিমেল মাথা তুলেই একেবারে থ' হয়ে গেল।

ছোট্ট ফুটফুটে একটি ছেলে—একগা' গয়না। পায়ে সোনার নূপুর। একটু একটু হেলছে, আর দুলছে···সোনার নূপুর ঝুম ঝুম করে বাজছে। হঠাৎ দেখা গেল,—সেই ছোট্ট ছেলেটি তাকে হাত তুলে ইসারা করে ডাকলে।

নিশির ডাকে—পাওয়া মানুষের মতো হিমেল উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটিও এক পা—এক পা করে দরজার দিকে এগুতে লাগলো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো হিমেল তাকে অনুসরণ করলে।

এ কি! ছোট্ট ছেলেটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে যে! প্রেতপুরী একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঢাকা—কিন্তু কি আশ্চর্য্য—ছোট্ট ছেলেটির গতিপথ অনুসরণ করতে হিমেলের এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না!

নূপুর বাজে—ঝুম—ঝুম—ঝুম!

হিমেল তার পেছন পেছন এগিয়ে চলে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাগাল পায় না। এ কি রহস্য—ও বুঝে উঠতে পারে না।

এইটুকু ছেলে—খিলখিল করে হাসছে আর পায়ে পায়ে কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। মাটিতে পা ঠেকছে—কি ঠেকছে না।

হিমেলও ছাড়বার পাত্র নয়—সেও যেন কিসের টানে চলেছে ওর পেছন পেছন।

নীচে নেমে লম্বা বারান্দা ধরে এগিয়ে চলে খোকা। বারান্দা ঘুরে অন্দর মহলের বাগানের কাছাকাছি যখন সে পৌঁছুল সেই সময় দেখা গেল—একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চেপে একটি ঘোড়সোয়ার তীর বেগে বাইরে চলে গেল। ঘোড়ার খুরের ঠকাঠক শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যেতে লাগল।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হিমেল থমকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেকে—খোকা আবার মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হিমেল আবার চলে এগিয়ে।

কিন্তু কে এ খোকা? তাকে নিরুদ্দেশের পথে কোন বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

এরই নামে কি নিশির ডাক?

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।)

নব বৈশাখে

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

এলো বৈশাখ
এলোরে নতুন বর্ষ,
নতুন আশার রঙিন স্বপন
এলোরে নতুন হর্ষ!
বিগত দিনের যত হাসি গান,
বিষাদ কালিমা হল আজি ম্লান,
আকাশ বাতাসে ভেসে আসে শুধু
নতুন সজীব স্পর্শ!

স্পর্শে তাহার
সজীব ধরণী বক্ষ;
নতুন জীবন যাত্রার পথে
পড়িছে সবার লক্ষ্য।
মঙ্গল-দীপ জ্বালে আজি সব,
ঘরে ঘরে উঠে শঙ্খের রব,
গাহিছে সকলে নিঃসঙ্কোচে
অমলিন প্রীতি সখ্য!

ইন্দ্রজালে

ঘড়ি অদৃশ্য করা

যাতুসম্রাট পি. সি. সরকার

আমার এই ঘড়ি অদৃশ্য করার খেলাটি খুবই সুন্দর। তুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন জার্মানীতে গিয়াছিলাম তখন আমার একজন বন্ধু আমাকে তাহার ঘড়ি অদৃশ্য করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে একবার তিনি একজন যাদুকরের খেলা দেখিতে গেলে ঐ যাদুকর তাহার ঘড়িটি অদৃশ্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে একটি পাউরুটির মধ্য হইতে উহা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মতে ঐরূপ ভাল খেলা নাকি তিনি জীবনে আর কোথায়ও দেখেন নাই। আমি মনে মনে হাসিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম আমাদের দেশে All India Magicians club (নিখিল ভারত যাদুকর সম্মিলনী) আছে উহার প্রায় পাঁচ শতাধিক সভ্যের প্রত্যেকেই এই ঘড়ির খেলা দেখাইতে পারে। তিনি বিশ্বাস করিলেন না। এমন কি চ্যালেঞ্জ করিলেন যে যদি কেহ তাহার এই ঘড়ি অদৃশ্য করিয়া দেখাইতে পারে তবে ঐ দামী ঘড়িটি তিনি তাহাকে দিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য তিনি আমাকে জব্দ করার জন্যই জোর গলায় ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন। আমি নিরুপায়, কারণ ষ্টেজের উপর ঐ ঘড়িটি কেন ঐ ঘড়ির মালিক ও তাহার মোটর গাড়ীটি পর্য্যন্ত মুহুর্ত্তে অদৃশ্য করিতে পারি কিন্তু বন্ধুর বাড়ীতে কোন প্রকার প্রস্তুতি নাই সেখানে ঘড়ি অদৃশ্য করিব কি করিয়া! আমি ঘড়িটি ভাল করিয়া দেখিলাম এবং বলিলাম আজ নহে আগামী কাল নৈশ ভোজনের সময় দেখা যাইবে। পরদিন যখন সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছি—তখন প্রসঙ্গত ঐ ঘড়ি অদৃশ্য করিবার কথাটি উঠিল। আমি বলিলাম—আমি ঐ দিন প্রস্তুত হইতে পারি নাই কাজেই আর একদিন সময় দিতে হইবে অর্থাৎ তারও পরদিন নৈশভোজনের সময় দেখাইতে রাজী আছি। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে বন্ধুটি কোন এক অফিসে কাজ করেন এবং সারাদিন বাহিরে থাকেন—আমি নিজের কাজকর্ম্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। রাত্রিতে খাওয়ার টেবিলে আমাদের সকলের একবার করিয়া দেখা হয় এবং কথাবার্ত্তা হয় কাজেই সময় চাহিলেই পরবর্ত্তী দিন নৈশভোজনের সময় স্থির হয়। ভদ্রলোক
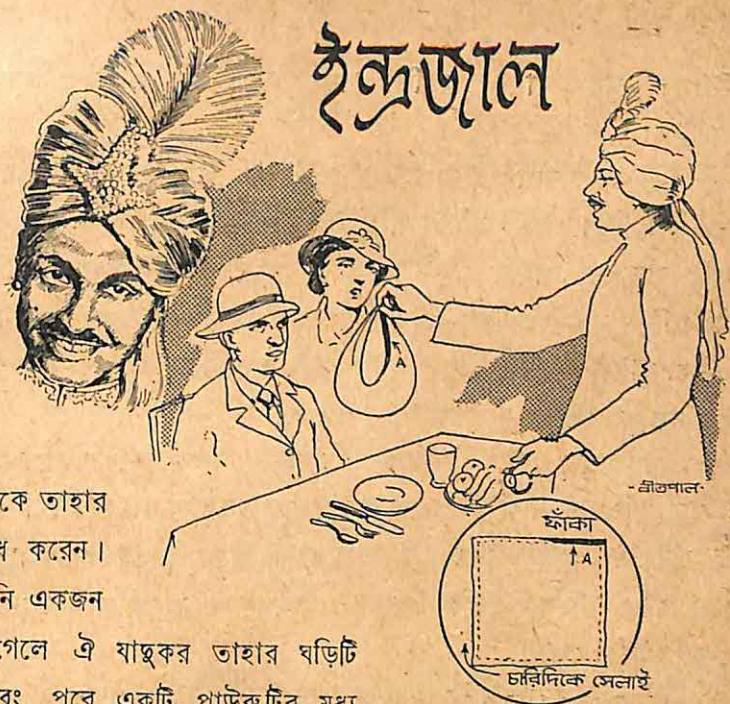
বলিলেন—তুমি আরও একদিন সময় লও এবং সেইদিন নৈশ ভোজনের সময় এই খেলা দেখাইও।

এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ দিন আমি নিজেই অদৃশ্য হইব কারণ ঐ দিন প্রাতে আমি জার্ম্মানী ছাড়িয়া প্যারিস চলিয়া যাইব ইহা স্থির ছিল। তখন যেন তাহার বিদ্রূপে উত্যক্ত হইয়া আমি তাহাকে তাহার ঘড়িটি আমাকে দেখাইতে বলিলাম এবং কিছুক্ষণ পরে উহা তাহার নিকট ফেরৎ দিতে যাইয়া বলিলাম এই ঘড়িটা অদৃশ্য করা কিছুই নহে। আমি আমার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চিত্রের ন্যায় উহার চারিটি কোণ ধরিয়া উহাকে থলিয়ার মত করিয়া ঝুলাইয়া ধরিলাম এবং বন্ধুর ঘরিটিকে সর্ব্বসমক্ষে উহার মধ্যে রাখিয়া দিলাম। সকলে দেখিলেন যে ঘড়িটি ঐ রুমালের মধ্যে রহিয়াছে। পরে ঐ ঘড়িসহ রুমালটি একজন দর্শকের হাতে ধরিতে দিলাম—তিনি হাত দিয়া টিপিয়া দেখিলেন যে ঘড়িটি তখনও আছে এবং খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিলেন। আমি তখন মুহূর্ত্তে ঐ রুমালের একটি কোণ ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া নিতেই দেখা গেল ঘড়িটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উহা শূন্যে হাওয়ায় মিলিয়া গেল। সকলেই অবাক কারণ তাহাদের সকলের মধ্যে চক্ষুর সম্মুখে এই খেলাটি হইয়া গেল!

তারপর পাউরুটি হইতে বাহির করার পালা। আমি বন্ধুটিকে একটি পাউরুটি আনিতে বলিব এইরূপ আশাই সকলে করিতেছেন। কিন্তু তখন দেখা গেল যে ঘড়িটি আমার হাতের রিষ্টে সুন্দরভাবে বাঁধা রহিয়াছে—ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক। আমি ঘড়িটি খুলিয়া সকলকে দেখাইলাম যে প্রকৃতই উহা তাহাদের ঘড়িটি। বন্ধুর মুখ রক্তবর্ণ—লজ্জায় ও বিস্ময়ে তিনি কথা বলিতে পারিতেছেন না। বন্ধু ঘড়িটি আমাকে দিয়া দিলেন—শত পীড়াপীড়িতেও ফেরৎ নিলেন না। আমি বাধ্য হইয়া উহা নিয়া আমার একজন সহকারীকে ঐটি দিয়া দিলাম।

এবারে খেলার কৌশল বলিয়া দিতেছি। দুইটি সুন্দর চেক ডিজাইনের একই রং ও আকৃতির সূতী রুমাল লইয়া উহার চারিদিক সেলাইকলে সেলাই করিয়া লইতে হইবে। চিত্রে উহা ভাল ভাবে দেখান হইয়াছে। চারিদিকেই সেলাইকরা হইয়াছে সত্য কিন্তু বালিসের মধ্যে তুলা ভর্ত্তি করিবার জন্য যেরূপ কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়- সেই ভাবে একদিকে A চিহ্নিত স্থানে কিছুটা ফাঁকা থাকিবে। রুমালটি তখন ডবল রুমাল হইল এবং A স্থানে ফাঁকা থাকিয়া একটা মুখ হইল। এইবার রুমালের চারিটি কোণ ধরিয়া ঝুলাইয়া ধরিলে উহার এক পাশে চিত্রের ন্যায় A ফাঁকা জায়গাটি থাকিবে। দর্শকদের ঘড়িটি এই ফাঁকা জায়গাটি দিয়া ডবল রুমালের থলিয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। দর্শকগণ এই ব্যাপারের কিছুই জানেন না এবং তাহারা একটি সাধারণ রুমালে সাধারণভাবে ঘড়িটি রাখা হইয়াছে বলিয়াই মনে করেন। এইবার ঐ ডবল রুমালের একটি কোণ ধরিয়া ঝাকানি দিলেই ঘড়িটি আর বাইরে নজরে পড়িবে না। যাদুকর রুমালটি ঝাড়িয়া গম্ভীরভাবে মুখ মুছিয়া পকেটে তুলিয়া রাখিলেন। বলাবাহুল্য ঘড়িটিও রুমালের সঙ্গে সযত্নে

পকেটেই রহিয়া গেল। কাজেই সর্ব্বসমক্ষে ঘড়ি অদৃশ্য হইল। আমি ঐ দিন ঠিক ঐ ভাবেই ঘড়িটিকে অদৃশ্য করিয়াছিলাম। প্রথম দিন আমি তাহার ঘড়িটি দেখি এবং পরদিন অনুরূপ একটি ঘড়ি সংগ্রহ করিয়া এই খেলা দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া যাই এবং দেখাইতে পারিব না এইরূপ ভান করিয়া থাকি। খেলা দেখাইবার সময় বন্ধুর ঘড়িটি হাতে বাঁধিয়া লইয়া তারপর ডুপ্লিকেট ঘড়িটিকে রুমালে ভরিয়া অদৃশ্য করি। দর্শকগণ এই দ্বিতীয় ঘড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না কাজেই কোনরূপ সন্দেহই হয় নাই। পরে যখন হাতে বাঁধা ঘড়িটি দেখান হইল তাহাদের এইটি সন্দেহ করা স্বাভাবিক কিন্তু এইটি প্রকৃতই তাহাদের ঘড়ি কাজেই আমার খেলা সুসম্পন্ন হইল।

খোকনের দুষ্টুমি

খোকন এখন সব কিছু বুঝতে শিখেছে। যদি কেউ তাকে গাল দেয় বা মন্দ বলে তবে এখন আর সে কাঁদে না। সাথে সাথেই জিব দেখিয়ে ভেংচি কেটে তার উত্তর দেয়।

ফটো ঃ শান্তিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বিনোদদা'র পরিবর্ত্তন

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

এই বিচিত্র জগৎ বিচিত্র লোকে ভর্তি। কেউ খেলার পাগল, কেউ পড়ার নেশায় মত্ত। কেউ পশু পালন করে কেউ আবার পাখী পোষে। বিনোদদা'র সখ ছিল মাছ ধরার।

মাছ ধরবার জন্যে তা'র ছিল অনেক রকম কৌশল। জাল ফেলে, ছিপ দিয়ে কখনও আবার শুধু হাতে পুকুরে ডুবে ডুবে। কেউ যেখানে কিছু পায় না বিনোদদা'র মুখে সেখানেও হাসি। লোকে তাই বলত, ওর গন্ধে মাছ আসে,—জেলের জামাই ও।

সেই বিনোদদা' আর মাছ ধরে না। হঠাৎ বৈষ্ণব হ'য়ে উঠল সে। কারণ জিজ্ঞেস করলে থাকত চুপ করে। একদিন পাড়ার সব ছেলেরা ঘিরে ধরল তাকে,—আজ আর ছাড়ছি না তোমাকে বিনোদদা'। বলতেই হবে কেন তুমি আর মাছ ধর না।

নাছোরবান্দাদের অতি উৎসাহে বিনোদদা'কে খুলতেই হ'ল তা'র মুখের দুয়ার। সুরু করল বলতে—জানিস্—আকাশের সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ আছে আর আকাশের মেঘের ডাকের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে পুকুরের মাছের—বিশেষ করে কৈ মাছের। কৈ মাছ খুব সঙ্গীতপ্রিয়, ছন্দ-যাদুকরও। গাছে ওঠে, শুক্‌নো জায়গাতেও চলতে পারে অনায়াসে। আকাশে যখন মেঘ ডাকে, জলের স্তর ভেদ করে সে-ডাক বাঁশী হ'য়ে কানে পৌঁছে কৈ মাছের। তখনই সে হয় পাগল। নিশ্চিন্ত আবাস জলাশয় ছেড়ে ঐ বাঁশীর সুরকে ধরতে পাড়ে উঠতে থাকে,—চলতে থাকে অচিন পথে।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। জলাশয়গুলো প্রায় শুক্‌নো হ'য়ে রয়েছে বর্ষার নবজলধারাকে সাদরে বুকে টেনে নিতে। মাঝে দু'একদিন বৃষ্টি হওয়ায় পুকুরের মাছেরা পেয়েছিল নূতন জলের আগমনী সংবাদ। মনে বসন্তের হাওয়া বইছিল তাদের।

সেদিন বিকেলে আকাশের আঙিনায় বেশ ঘনঘটা। মেঘবালারা তাদের কালো মিশমিশে অলকগুচ্ছ ছড়িয়ে দলবেধে ছুটোছুটি করছিল আকাশের একোণে ওকোণে। তারপর দেখা গেল তাদের গতি স্থির! সব তখন ভিড় জমাল এক জায়গায়। তাতেই সন্ধ্যার আগে হ'য়ে এলে সন্ধ্যা। একখানা কালো পর্দায় ঢেকে গেল সব।

তখন ঝড়ের পূর্ব মুহূর্ত। একটু পরেই বাতাস বাজনা বাজিয়ে চল্‌ল শো-শো। বাতাসকে অনুসরণ করল বৃষ্টি আর মেঘের ডাক। আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ঐ গর্জনে ঘরের শিশুরা উঠল চম্‌কে। আমিও চম্‌কে উঠলাম সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে। মনে করলাম, তখনও বসে রয়েছি ঘরে। মেঘের ডাকে তো কৈ মাছ উঠছে।

সরু মুখ একটা মাছের হাড়ি নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লাম আমি। দাসের পুকুর অতি

পরিচিত আমার। ও-পুকুরের মাছের স্বভাবও জানি আমি। প্রত্যেক বছরেই ওখানে মাছ ধরি বলে যে পাশ দিয়ে বেশী মাছ উজিয়ে ওঠে সে-পাশেই গিয়ে পৌঁছলাম। আমার মাথায় তখন বর্ষার বারিধারা, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মনে অসীম আনন্দ। অনেক মাছ পুকুর থেকে উঠছে। যে হাড়ি সঙ্গে নিয়েছি তা' তো ভর্তি হবেই উপরন্তু ও-হাড়ি বাড়ীতে রেখে আর একটা হাড়ি নিয়ে ফিরে আসব কিনা সে-হিসেবও করছিলাম মনে মনে।

গোলাপ ফুল তুলতে কাঁটার আঘাতের মতো কৈ মাছ ধরতে ধরতে আমার হাতদুখানা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেল। অন্য সময় হ'লে বেদনা বোধ করতাম। কিন্তু তখনকার ঐ পরিবেশে মাছ ধরার আনন্দে আমার সব বেদনা গোলাপ হ'য়েই ফুটে উঠল মনে। মনের আনন্দে বর্ষার রিমঝিম সঙ্গীতের সঙ্গে আমিও গাইলাম নীরব সঙ্গীত।

অনেক মাছ ধরলাম অনেক সময় ধরে। কিন্তু আমার মাছের হাড়িটা যেন আর ভর্তি হ'তে চায় না।—ব্যাপার কি! মনে খট্‌কাও জেগেছিল একবার। অবশ্য তা' নিয়ে বিশদভাবে ভাববার অবসর তখন ছিল না। তা' ছাড়া ভাবতে যাবোই বা কেন? যথেষ্ট মাছ উঠছে পুকুর থেকে। হাড়ি ভর্তি হয়নি—একটু পরেই ভর্তি হ'য়ে যাবে।

সন্ধ্যা তখন হ'য়ে গেছে। মাছ দেখা যাচ্ছে না চোখে। শুধু যখন এক ঝলক্ বিদ্যুৎ খেলে যায় তখনই চোখের নিমেষে দেখা যায় দু'একটা। সে-বিদ্যুতের খেলাও ক্রমে গেল কমে, বৃষ্টিও গেল থেমে।

এতোক্ষণ বৃষ্টির শব্দে যা' শুনতে পারিনি তখন শুনলাম তা'। বেশ শব্দ হচ্ছে চক্‌চক্—চক্‌চক্। মাছের হাড়িটা সামনে রেখে কান সজাগ করলাম কোন্ দিক থেকে শব্দ আস্‌ছে তা' ধরতে। পড়লাম আরো মুস্কিলে। আমার চারদিকেই ঐ শব্দ।

মাছের হাড়িটা হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়েছি তখন। বেশ ওজন হ'য়েছে হাড়িটার। কিন্তু চলেছি যেন ঐ শব্দকে পদদলিত করেই,—যেন ঐ শব্দই অনুসরণ করছে আমাকে। একটু ভয় হ'ল মনে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ঠাকুমার উপদেশ। বীরত্বের সঙ্গেই তখন সামনের ঘন অন্ধকারের আড়ালে ঐ চক্‌চক্ ধ্বনিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলাম ঃ

ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি,—
রাম লক্ষণ বুকে আছে করবি আমার কি?

বাড়ীতে এসে চীৎকার করে বললাম, শীগগির আলো নিয়ে এসো। দেখ এসে কতো মাছ। জীবনে কখনও এত মাছ পাইনি।

অনেক মাছের কথা শুনে সকলেই ছুটে এলো—কই দেখি, দেখি! তাদের সকলের মুখেই প্রজ্বলিত হ্যারিকেনের মতো উজ্জ্বল হাসি। তর্ সইছে না তাদের। একজন অতি উৎসাহী হ'য়ে মাছের হাড়িটাকে ঢেলে ফেলল মেঝেতে।

সকলের চোখের সঙ্গে আমার চোখও তখন চড়কগাছ। বিস্ময়ে ভরা সকলের চোখ। যা' ভাবিনি, ভাবতে পারিনি তাই। একটিও আস্ত কই মাছ নেই ওতে। শুধু রয়েছে মাছের মাথাগুলো।

অতি বিস্ময়ে সকলে তখন ভেঙ্গে পড়েছে একটা অট্টহাসিতে। আমি কিন্তু যোগ দিতে
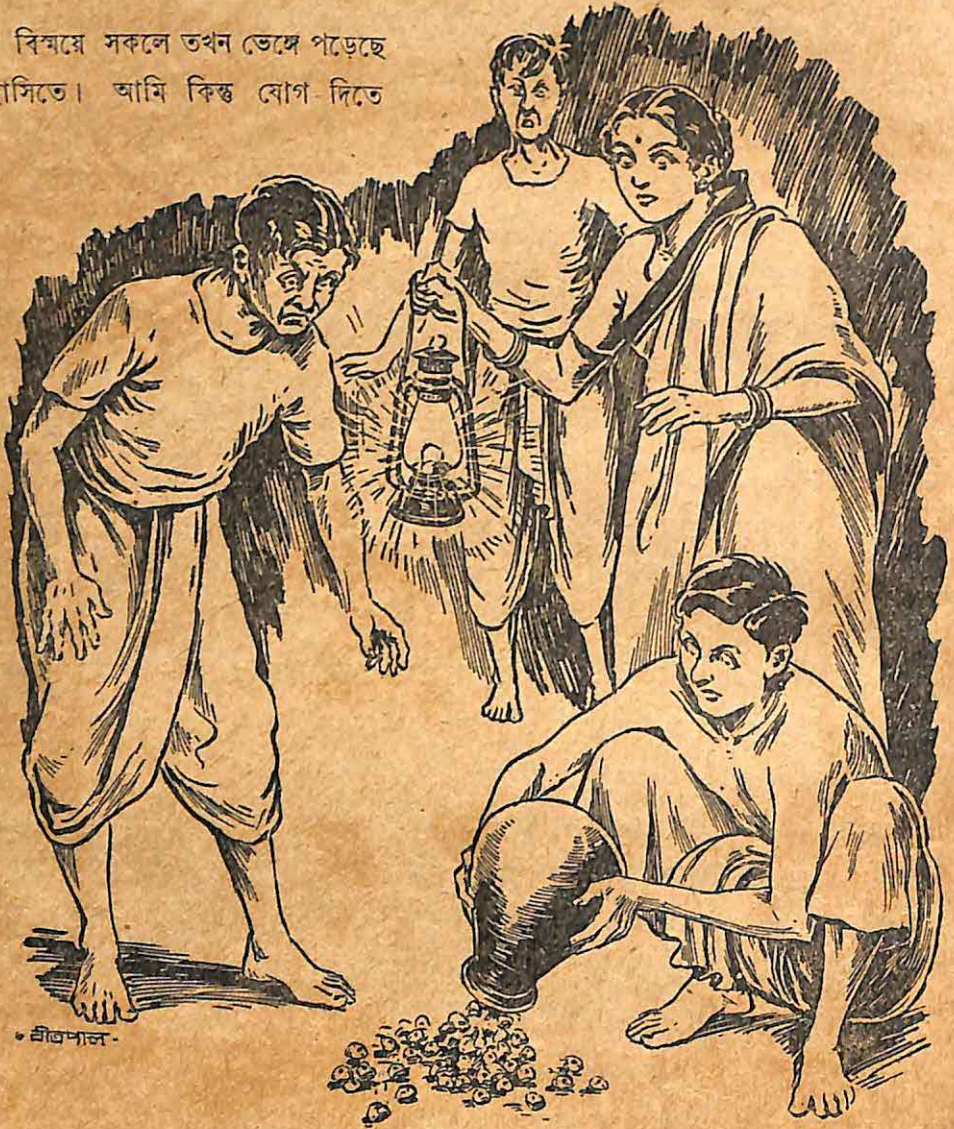
পারলাম না ওদের সঙ্গে। সেই চকচক শব্দের সাড়াশী আক্রমণ যেন তখন নূতন করে কানে বাজতে লাগল আমার। ভয়ে আমার সারা শরীর উঠল কাঁটা দিয়ে। কাঁপিয়ে এলো জ্বর। সেই জ্বরই আমার যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে ফিরে আসার বড় অসুখ।

কচি ও কাঁচা
গাংশালিক
—পম্পা ভট্টাচার্য (বয়স ৮)
জলের ধারে ঘাসের আড়ে
গাংশালিকের বাসা—
দেখ্‌তে বড়োই খাসা!
রাখ্‌ব তা'রে রূপোর দাঁড়ে—
ক'রনু আমি আশা!
রোজ সে ভোরে গান শোনাবে,
আয়েস ক'রে পায়েস খাবে,—
আর পাবে মোর চুমোর আদর,
অনেক ভালোবাসা ॥
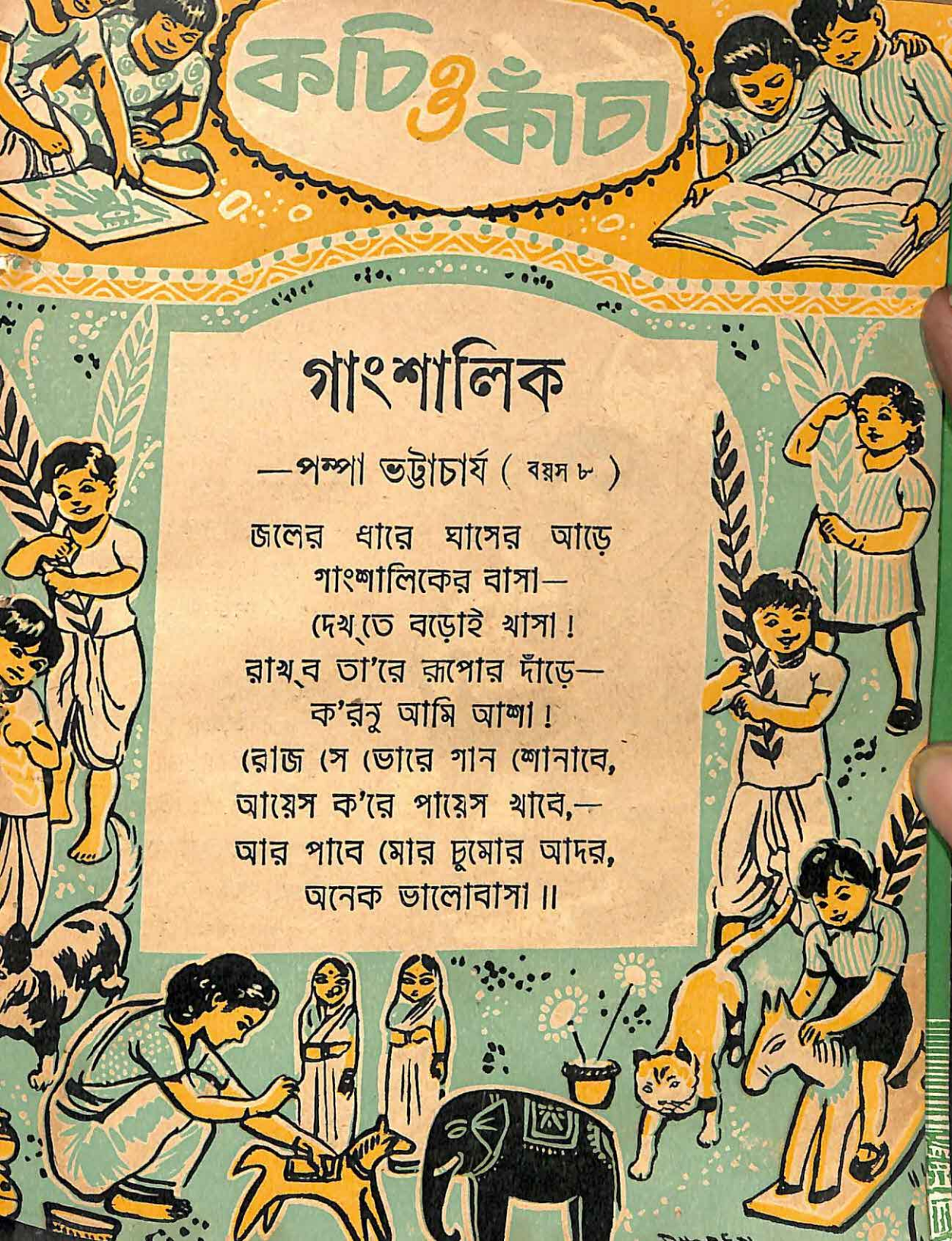
চড়ুইটি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
ফুরুৎ ফুরুৎ ওড়ে,
কড়ি কাঠের ফোকর থেকে
বেরিয়ে সে কোন্ ভোরে !
কিচির মিচির বলে কি ?
ইচ্ছে করে শিখে নি' ;
কেমন করে পারি ?
ইংরিজি কি বাংলা থেকেও
শক্ত আরো ভারী !

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
উঠোন খুঁটে খায় ।
ভুলো মেনীর দেখা পেলেই
কোথায় উড়ে যায় ।
কোথায় যে যায় জানি কি ?
ইচ্ছে করে সঙ্গ নি' ;
কেমন করে যাই ?
মার যে মানা, উঠোনখানার
বাইরে যেতে নাই !

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
আমায় চেনে কই ?
দিন রাত্তির দুজন তবু
এক বাড়িতেই রই।
বাসাতে তার করে কি ?
ইচ্ছে করে দেখে নি',
কেমন করে উঠি ?
বড্ড উঁচু, কাছে পিঠে
নেই মই কি খুঁটি !

চড়ুই, চড়ুই, চড়ুইটি,
ভাব করতে চাই।
দেব, বলি, আমার নতুন
হাওয়া বন্দুকটাই !
কি যে ভাবে জানি কি ?
ইচ্ছে করে বুঝে নি',
বুঝব কখন ছাই ?
বন্দুকটা দেখেই করে
পালাই, পালাই !

বার্ষিক শিশুসাথী হইতে।

গাছে দড়ি ত ঝুলচেই, বেশ দোল্না খাটানো যাক্।
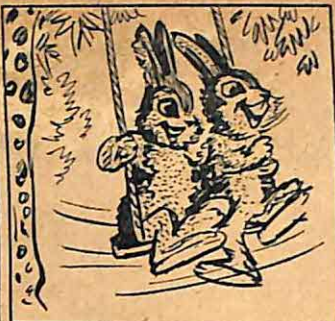
বাঃ, বেশ মজা !
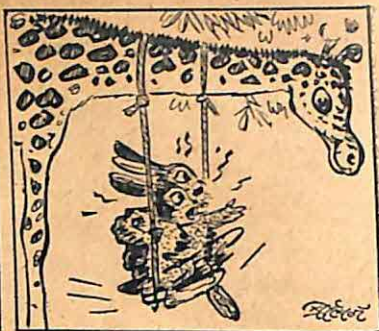
ওমা ! গাছটা নড়ে যে !

খোকার বিয়ে

বাঃ রে, তোমরা
হাসছো কেন ?
আমার যে আজ
বিয়ে।
দেখছো নাকো
বসে আছি—
টোপর মাথায়
দিয়ে।

ফটো ঃ বীথি দেব

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

৮। কৃষ্ণবট বা গোকর্ণবট

আমাদের দেশের বটগাছ তার বিশাল আকৃতি আর তার শাখা থেকে যে অসংখ্য ঝুড়ি নামে তার জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। বটেরই মত আরও একটি গাছ তার পাতার বিশেষত্বের জন্য লোকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এই গাছের নাম "কৃষ্ণবট" বা "গোকর্ণবট"। এই গাছের প্রত্যেকটি পাতা এক একটি ঠোঙ্গার মত। দেখলে মনে হয় একটি সাধারণ বটপাতার নিম্নাংশ দুই পাশ থেকে মুড়ে নিয়ে পানের খিলির মত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেক সময় দেখি নানা রকম কীট গাছের পাতাকে বাঁকিয়ে পাতার দুই পাশ জুড়ে তার মধ্যে বাসা তৈরী করে। কৃষ্ণবটের পাতা দেখলে মনে হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু এই গাছের প্রত্যেকটি পাতা স্বাভাবিক ভাবে কচি অবস্থা থেকেই এইরকম ঠোঙ্গার মত হয়ে থাকে।

কথিত আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের একটি সাধারণ বটগাছের পাতাকে ঐ ভাবে মুড়ে নিয়ে তাতে ননী রেখে খেয়েছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় ঐ গাছের সব পাতা আপনা থেকেই ঐ রকম ঠোঙ্গার মত হয়ে যায়। এখন যতগুলি কৃষ্ণবটের গাছ আছে সবগুলিকেই ঐ একটি গাছেরই বংশধর বলে মনে করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে এই যে নূতন রকম গাছের সৃষ্টি হল তার নাম হল কৃষ্ণবট। এই গাছের পাতার আকৃতির সঙ্গে গরুর কানের সাদৃশ্য আছে বলে এই গাছের আর একটি নাম হ'ল গোকর্ণ বট।

এই গাছ সাধারণ বটগাছের মত যত্রতত্র দেখা যায় না এবং যেখানেই এই গাছ আছে সেখানেই সেটি মানুষের দ্বারা রোপিত হয়েছে; বট অশ্বত্থের মত আপনা হতে কোথাও জন্মায় না। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে প্রায় ৬০ বছর আগে দুইটি কৃষ্ণবটের ডাল রোপন করে দুইটি গাছ করা হয়, তারপর সেই গাছ থেকে ডাল কেটে আরও অনেকগুলি গাছ করা হয়েছে। বটানিক গার্ডেনে

আনার পর উদ্ভিদবেত্তাদের নজর এর উপর পড়ে এবং গাছটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁরা এর নাম দেন ফাইকাস্ কৃষ্ণি। যে কিংবদন্তী অনুসারে এর নাম কৃষ্ণবট হয়েছে তা ছাড়া এই গাছের সম্বন্ধে আরও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাম যখন বনবাসে ছিলেন তখন তিনিই কোনও এক সময়ে এই গাছের পাতাকে ঐ ভাবে মুড়ে দিয়েছিলেন।

শিবপুর বটানিক গার্ডেনে যে কৃষ্ণবট আছে, প্রায় ২০ বছর আগে একবার দেখা গেল যে, একটি গাছের একটি ডালে কতকগুলি পাতা ঠোঙ্গার মত না হয়ে সাধারণ বট গাছের পাতার মত হয়েছে। এই ব্যাপারে এই গাছটির প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। পরে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে কৃষ্ণ বটের বীজ থেকে যে চারা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ বটের মত হয়; সেগুলি বড় হলে তাতে ঠোঙ্গার মত পাতা হয় না। যদি একশতটি কৃষ্ণ বটের বীজ থেকে চারা করা যায় তা হলে অন্ততঃ ৯০টি হবে সাধারণ বটগাছের চারার মত, যেগুলি বড় হ'লে সাধারণ বটগাছ হবে, আর দশটি চারা হবে কৃষ্ণ বটের মত যা বড় হয়ে কৃষ্ণবট হয়ে উঠবে। যদি ডাল কেটে বা গুটি কলম করে কৃষ্ণবটের চারা করা হয় তা হলে সেই চারাগুলি সবই কৃষ্ণবট হয়ে ওঠে, সাধারণ বট হয় না। এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করে উদ্ভিদবেত্তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কৃষ্ণবট আসলে সাধারণ বটেরই একটি রূপান্তর মাত্র। সাধারণ বটের মতই কৃষ্ণবটেরও শাখামূল বা ঝুরি হয়, তবে কৃষ্ণবট সাধারণ বটের মত বিশালাকার হয় না।

রাগ-রাগিণী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাগ আর রাগিণী।
মা বলেছে, 'ডাকিনী',
খুকু অভিমানিনী—
তাই কিছু খায়নি,
গায়ে তেল মাখেনি,
ঘুম থেকে জাগেনি॥

বাঘিনী আর বাঘ।
খোকা করেছে রাগ,
দিদি বলেছে, 'ছাগ',
তাই সে ভাত খায়নি,
ইস্কুলেতে যায়নি,
আর গান গায়নি॥

চাঁদনি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—ক—

পেয়েছিলুম মনের মত ঠাঁই। সহর পালিয়ে ঘিঞ্জি জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার মানে হয় না। আমি খুঁজেছিলুম নিরিবিলি ফর্সা জায়গা। তাই পেয়েছি।

দুই দিকে দেখা যায় সবুজে ঘাসে মোড়া তেপান্তর, বুক দিয়ে তার রূপোর লহর দুলিয়ে নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। কাছাকাছি একখানি ছাড়া আর কোন বাড়ী চোখে পড়ে না। লোকালয় থেকে মাইল খানেক তফাতে। এবং সকালে ও বিকালে জনকয় বায়ুসেবক ছাড়া লোক চলাচল নেই বললেই চলে। সাড়া পাওয়া যায় কেবল গীতকারী পাখীদের। বেশ আছি।

কলকাতায় বাতে পঙ্গু হয়ে শয্যাগত ছিলুম প্রায় তিন মাস। ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত এসেছি বায়ু পরিবর্ত্তনে। সঙ্গী কেবল স্ত্রী কমলা আর একমাত্র কন্যা মৃণু, বয়স তার আট বৎসর।

প্রথম কয়েক দিন বাড়ীতে বসেই কাটাতে হল। হাঁটুর বাত তখনও ভালো করে সারে নি। তবু জায়গাটি ভালো লাগছে। সহরে চোখের সামনে নানান বাধা। কিন্তু এখানে দেহ অচল হলেও চোখ বন্দী নয়। আমি বসে থাকি বটে বারান্দায়, কিন্তু আঁখিপাখী উড়ে যায় ধু-ধু প্রান্তরে আর কান্তারে, নদীর ধারে ধারে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে। আমার আকাশ-চাওয়া মনের সঙ্গে দুই নয়নের আর আনন্দের সীমা নেই।

কমলাকে বেড়াতে যেতে বললেও শোনে না। আমি বেরুতে পারি না বলে সেও থাকে আমার কাছে কাছে। কিন্তু মৃণুকে ধরে রাখবে কে? সে হচ্ছে মহাচঞ্চল মেয়ে, বেয়ারাদের চোখ এড়িয়ে রোজ চারদিকে একবার-না-একবার টহল দিয়ে আসবেই।

আমিও সেজন্য ব্যস্ত হই না, কারণ একে তো এখানে গাড়ী-ঘোড়ার উপদ্রব নেই, তার উপরে শুনেছি এখানকার নদীর জলে হাঁটু পর্য্যন্ত ডোবে না। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি নির্ভয়। খোলা আকাশ-বাতাসের আশীর্ব্বাদে তার দেহের উপকার বৈ অপকার হবে না।

—খ—

একদিন সন্ধ্যার আগে বেড়িয়ে এসে মৃণু বললে, "বাবা, চাঁদনির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। আমরা সই পাতিয়েছি।"

—"কে চাঁদনি ?"

—"আমার মত একটি মেয়ে। রোজ তার সঙ্গে আমি লুকোচুরি খেলি, বাগানে ফুল তুলি। আজ তোমর জন্যেও ফুল এনেছি, এই নাও।"

বুঝলুম, মৃণু সমবয়সী এক সাথী আবিষ্কার করেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "চাঁদনি কোথায় থাকে ?"

আমাদের বাসা থেকে একটু তফাতে এ অঞ্চলে যে একখানি মাত্র বাড়ী ছিল, সেই দিকে আঙুল তুলে মৃণু বললে, "ঐ যে চাঁদনিদের বাড়ী।"

একটু বিস্মিত হলুম। রোজই বাড়ীখানা আমার চোখে পড়ে। আমি জানতুম সেখানা খালি বাড়ী। সর্ব্বদাই তার জানালাগুলো বন্ধ থাকে। রাত্রেও সেখানে আলো জ্বলতে দেখি না।

দিন কয় পরে মৃণু বললে, "বাবা, তোমরা সবাই আমাকে সুন্দর বল। চাঁদনি কিন্তু আমার চেয়ে ঢের সুন্দর। আমি তার মত গান গাইতেও পারি না।"

আমি বললুম, "বেশ তো, চাঁদনিকে একদিন এখানে নিয়ে এস না! আমিও তার সঙ্গে ভাব করব।"

মৃণু মাথা নেড়ে বললে, "উঁহুঁ, সে আসবে না বাবা!"

—"কি করে জানলে ?"

—"আমিও তাকে অনেকদিন আসতে বলেছি। কিন্তু সে রাজী হয় নি।"

—"নিশ্চয় তার বাবা তাকে বাড়ীর বাইরে যেতে মানা করেছেন।"

—"তা হবে। বোধ হয় তার বাবা তোমার মত লক্ষীছেলে নয়।"

মৃণুর কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়ে আদর করে তার নরম গালে একটি চুমো দিলুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, "চাঁদনির বাবাকে তুমি দেখেছ ?"

—"না!"

—"তার মাকে ?"

—"উঁহুঁ। আমরা যে খিড়কির বাগানে লুকোচুরি খেলি, বাড়ীর লোক টেরও পায় না।

—গ—

ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠল।

মৃণু এসে বললে, "বাবা, চাঁদনি কি চমৎকার সাঁতার কাটে!"

—"কোথায়, নদীর হাঁটু জলে ?"

—"ধেৎ, তুমি ভারি বোকা! চাঁদনি সাঁতার কাটে তাদের খিড়কির পুকুরে।"

—"তাদের বাগানে পুকুর আছে নাকি ?"

—"হ্যাঁ, চমৎকার পুকুর। কেমন ঠাণ্ডা তার জল! সেই পুকুরে সে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটে আর আমাকেও জলে নামতে ডাকে। কিন্তু আমি কেমন করে জলে নামি বাবা, আমি কি সাঁতার জানি ? সে বলে, আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে। আমার ভয় করে। আজও ডেকেছিল, কিন্তু আমি তার কথা শুনিনি বলে আমার উপরে সে রাগ করেছে।"

সেইদিন থেকে মৃণুর চাঁদনির বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হল। তার উপর বসল কড়া পাহারা।

পুকুরকে আমাদের বড় ভয়। আমার ছোট ভাই জলে ডুবে মারা গিয়েছে।

—ঘ—

দুই হপ্তা কেটে গেল। এর মধ্যে মৃণুকে একলা ছেড়ে দেওয়া হয় নি। বেয়ারার সঙ্গে রোজ সে বেড়াতে যায় বটে, কিন্তু চাঁদনির বাড়ীতে তার যেতে মানা।

মৃণুর মুখে আর হাসিখুসি নেই। বেশীর ভাগ সময় সে কেমন গুম হয়ে থাকে। মনে মনে কি যেন ভাবে। আর মাঝে মাঝে চাঁদনির নাম করে। তার দেহ ও মন শুকিয়ে আসছে।

কমলা বললে, "ওগো, তোমার মেয়েকে চাঁদনি বোধহয় জাদু করেছে। তুমি তো এখন সেরে উঠেছ। একবার চাঁদনিদের খবরটা নাও না।"

হ্যাঁ, আজকাল বাতের ব্যথা আর আমার নেই বললেও চলে। রোজ সকালে-বিকালে বাড়ীর

হাতায় কিছুক্ষণ ধরে বেড়িয়ে বেড়াই। কমলার প্রস্তাবটা মনে লাগল। চাঁদনিদের বাড়ী তো বেশী দূরে নয়।

সেদিন রোদ পড়ে গেলে পর মৃণুকে ডেকে বললুম, "চল মৃণু আজ আমরা চাঁদনিদের বাড়ী বেড়াতে যাব।"

শুনেই মৃণুর সে কি আনন্দ! সে মহা উৎসাহে বেগে বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়ল, তারপর তাকে সামলে রাখাই দায়!

এই তো চাঁদনিদের বাড়ী!

কিন্তু বাড়ীর চেহারা দেখেই আমার চক্ষু স্থির!

রীতিমত পড়ো বাড়ী! ফ্লোরের উপরে বাহির-দালান, কিন্তু যতগুলো দরজা-জানালা দেখা যাচ্ছে সব বন্ধ। চুণ বালি খসে পড়েছে, রং জ্বলে গিয়েছে। বহুকাল সে বাড়ীতে কেউ বাস করেছে বলে মনে হল না। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

সামনের হাতায় এক সময়ে বাগানের বাহার ছিল বলে বোঝা যায়। এখনও রাশি রাশি আগাছার মাঝখান থেকে দুই-তিনটে অযত্নবর্দ্ধিত পুষ্পিত ফুলগাছ সেই বাগানের স্মৃতি বহন করছে।

ভাঙা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে এই সব দেখছি, হঠাৎ মৃণু সকৌতুকে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "ওহো, ঐ যে চাঁদনি!"

আমি কিন্তু চারদিকে নজর চালিয়েও কোথাও চাঁদনির অস্তিত্ব দেখতে পেলুম না।

ইতিমধ্যে মৃণু সেই জঙ্গুলে জমির ভিতর দিয়ে কোঁকড়ানো চুল উড়িয়ে ছুটতে সুরু করেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "দাঁড়াও মৃণু, আর ছুটো না!"

মৃণু একটা আধমরা রঙন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কাছে যেতেই সে বললে, "বাবা, চাঁদনি আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে! আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে দৌড়ে ঐ পুকুরের ঘাটে নেমে গেল! দেখ না, এমনি তাকে ধরে ফেলছি!"

মৃণু আবার ছুটল। আমিও দ্রুতপদে তার সঙ্গে এগিয়ে চললুম।

বাড়ীর পিছনে ছিল আধখানা পানায় ভরা একটা পুষ্করিণী। কিন্তু তার ঘাটে জঙ্গলে কারুরই দেখা পাওয়া গেল না।

মৃণু বললে, "চাঁদনিটা কি দুষ্টু বাবা! কোথায় লুকালো বল দেখি?"

কোথাও আর কেউ নেই, কিন্তু ও আবার কি ব্যাপার? অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, পুকুরের ঘাটে ধাপে ধাপে রয়েছে জলে আঁকা ছোট ছোট পদচিহ্ন! যেন এইমাত্র কোন শিশু জল থেকে ঘাটে এসে উঠেছিল!

তখন দিকে দিকে ঘনিয়ে উঠেছে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া। আমার বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল।

—৬—

একটি প্রাচীন ভদ্রলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মৃণুর হাত ধরে আমাকে সেই পোড়ো বাড়ীর জমির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে-চোখে ফুটল বিস্ময়ের রেখা।

বোধহয় তিনি এখানকারই স্থানীয় লোক, কারণ রোজই সকালে-বিকালে তাঁকে আমার বাসার সামনে দিয়ে আনাগোনা করতে দেখি।

পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "মশাই, এ বাড়ীখানা কার বলতে পারেন ?"

—"এ বাড়ীর মালিক হচ্ছেন ভুবনবাবু। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে তাঁর একমাত্র শিশুকন্যা খিড়কির পুকুরে জলে ডুবে মারা যাওয়াতে তিনি এই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই থেকে বাড়ীখানা খালি পড়ে আছে।"

—"তাঁর কন্যার নাম জানেন ?"

—"জানি। চাঁদনি।"

শ্রীখেলোয়াড়

শিকারী

কমপক্ষে ৯ জন এবং বেশী হলে ৪১ জন খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলাটি খেলা চলবে।

যে খেলোয়াড়টি সব চেয়ে ভালো দৌড়ুতে পারে তেমনি একজনকে 'শিকারী' বলে ঠিক করে নেবে। বাকী যে সব খেলোয়াড় থাকবে তারা দুজন করে এক একটা দলে ভাগ হয়ে যাবে। এইভাবে যে দলগুলি হবে তার প্রত্যেকটি দলের ভিন্ন ভিন্ন পশুর নাম দেওয়া হবে। যেমন মনে কর, কোন
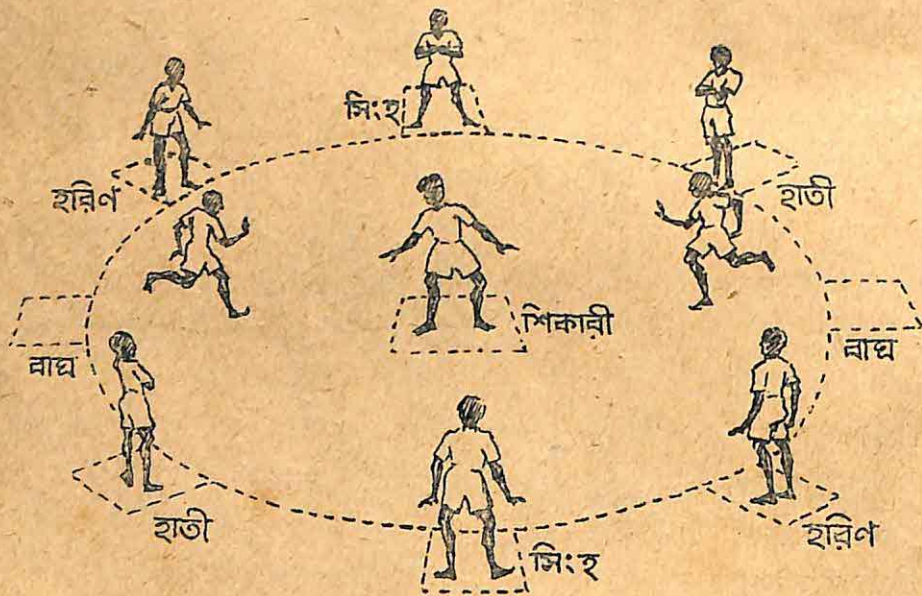
দলের নাম হলো 'বাঘ', কোন দলের নাম হলো 'সিংহ', কোন দলের নাম হলো 'হাতী', কোন দলের নাম হলো 'গণ্ডার', কোন দলের নাম হলো 'হরিণ', এই রকম। প্রত্যেক রকমের পশুর জন্য মাঠের বিপরীত দুইদিকে দুটো ঘর এঁকে নেবে। মাঠের দুইদিকে বাঘের জন্য দুটো ঘর হলো। সেই দুটো ঘরে দুজন বাঘ থাকবে। এইভাবে সিংহ, গণ্ডার, হাতী, হরিণ প্রভৃতি যারা হবে তারাও ঐ রকম মাঠের

দুদিকে নিজের নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকবে। মাঠের মাঝখানে শিকারীর জন্য একটা আলাদা ঘর থাকবে এবং শিকারী যে হবে সে তার ঘরটির মধ্যে দাঁড়াবে।

খেলা সুরু হলে শিকারী যে পশুর নাম বলবে সেই নামের পশুরা তখন পরস্পর ঘর বদলাবদলি করবে। এইভাবে ঘর বদলাবদলি করবার সময়ে শিকারী যদি যে কোন পশুকে তার ঘরে পৌঁছানোর আগে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে যাকে শিকারী ছুঁয়ে দেবে সেই পশু ও তার সঙ্গী দুজনেই 'মরা' হয়ে যাবে। যেমন মনে করো শিকারী যেই 'হরিণ' বলে চীৎকার করলো অমনি মাঠের দুদিকে যে দুজন হরিণ ছিল তারা পরস্পর ঘর বদলাবদলির চেষ্টা করবে। এইভাবে ঘর বদলাবদলি করার সময়ে শিকারী যদি যে কোন একটি হরিণকে তাদের ঘরে পৌঁছানোর আগে ছুঁয়ে দিতে পারে তাহলে দুজন হরিণই 'মরা' হয়ে যাবে। শিকারী যখন এইভাবে একে একে সব পশুদের 'মরা' করে দিতে পারবে তখন একবারের মত খেলা শেষ হবে। একবার খেলা শেষ হলে একজন নতুন শিকারী ঠিক করে আবার একই ভাবে খেলা সুরু করবে।

আমেরিকার ছেলেদের কাছে এ খেলাটি বিশেষ প্রিয়।

খোকনের রাগ

পলাশ মিত্র

রাগ করেছে খোকনমণি
ভাত খাবে না আর
বেলুন কিনে দেয়নি কেন
বোঝে না সে কিছুই যেন
তার বেলাতেই যত ফাঁকি
নয় বোকা সে আর
ছেলে সে যে খেলনা নাকি
রাগও আছে তার।

কিনছে দিদি শাড়ির গাদা
নতুন বাইক কেনে দাদা
হাত দিলে তায় চেঁচিয়ে সবে
বলবে, খবরদার ;
কাজের বেলা তাকেই ডাকে
করলে তা না বলবে মাকে
এমন ধারা চলবে নাকো
জুলুম বারেবার।

তাইতো খোকন রাগ করেছে
ভাত খাবে না আর॥

শীতের দিনে নাক-মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোয় কেন?

শীতের দিনে তোমাদের নাক-মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোয় এ তোমরা সবাই লক্ষ্য করেছো। তখন বার বার করে নাক-মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে তোমরা অনেকে ফুর্তিও করে থাকো। কিন্তু সত্যি সত্যি যে জিনিষটি তোমাদের নাক বা মুখ থেকে শীতের দিনে বেরোয় তা কি ধোঁয়া। না—সে জিনিষটি ধোঁয়া নয়। তবে কি?—তাই বলছি।

আমাদের শরীরের ভেতর থেকে নাক বা মুখ দিয়ে যে নিশ্বাস সব সময়ে বেরিয়ে আসে তার তাপ-মাত্রা সব সময়েই এক রকম। কিন্তু বাইরের আবহাওয়ার তাপ-মাত্রা সকল সময়ে একরকম থাকে না। কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা আবার কখনও বা এর মাঝামাঝি থাকে। তোমরা হয়ত

জানো যে আমাদের নিঃশ্বাসে জলীয় গ্যাসের আকারে একটা স্যাঁতস্যাতে জাতীয় জিনিষ থাকে। শীতের দিনে এই জলীয় গ্যাস যখন আমাদের শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে তখন বাইরে আসার সাথে সাথেই ঠাণ্ডা পেয়ে জমাট বেঁধে যায়। হঠাৎ ঠাণ্ডার সংস্পর্শে যখন আসে এই জলীয় গ্যাস তখনই জমাট বাঁধে আর অনেকটা মেঘের মত ধোঁয়াটে হয়ে যায়। সাধারণ মেঘ যেমন জলবিন্দু বা বাষ্পে পূর্ণ থাকে তেমনি।

এই ধোঁয়াটে জিনিষটাকেই তখন আমরা আমাদের নিঃশ্বাস বলে মনে করি। কিন্তু সত্যি সত্যি এ জিনিষটি আমাদের নিঃশ্বাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তাই। গরমের দিনেও আমাদের নিঃশ্বাসে ঐ জলীয় গ্যাসটি থাকে তবে বাইরে গরম থাকে বলে তার চেহারার আর কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু একটা টুকরো কাঁচ বা পাথরের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে পরীক্ষা করে দেখো, দেখবে তার ওপর জলীয় বাষ্প জমে আছে কারণ এগুলো বেশ ঠাণ্ডা।

সাগরদ্বীপের কেল্লা

নির্ম্মল চৌধুরী

পূর্ব্বানুবৃত্তি—

[সাজাহান তখন ভারতের সম্রাট। এই সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে রত্নপুর বলে একটি বন্দর ছিলো। এই রত্নপুরের জমিদার ছিলেন সত্যকিঙ্কর ও কালীকিঙ্কর রায়। কালীকিঙ্কর দেশে থাকতেন না। জাহাজে করে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। সত্যকিঙ্কর দেশে থাকতেন। তিনি খুব সাহসী ও ভালো যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর ছেলে সুবর্ণকেও তিনি যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ করে তুলেছিলেন। এই সময়ে বাংলা দেশের সমুদ্রোপকূলের গ্রামগুলোতে জলদস্যুদের অত্যাচার খুব হতো। তারা আক্রমণ করে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে দিতো। একদিন এই জলদস্যুরা আক্রমণ করলো রত্নপুর। তারা গ্রাম লুঠ করে সুবর্ণকে ধরে নিয়ে গেলো। এই জলদস্যুদলের নেতা ছিলো বার্থেলোমিউ। এদিকে কালীকিঙ্কর জাহাজে করে দেশে ফিরছিলেন। তখন সমুদ্রে তার সাথে এক চীনা বোম্বেটের জাহাজের দেখা হয় ও সংঘর্ষ ঘটে। চীনা দস্যুর জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেই জাহাজ থেকে তারা একটি লোককে উদ্ধার করে। সেই লোকটির কাছ থেকে তারা মালয়ের পূর্ব্ব উপকূলের জংগলে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ মঠ ও সেখানে লুকোনো গুপ্তধনের খোঁজ পায়!]

ভিক্ষু বললেন, "কারণ মঠের ধন-রত্ন মঠে নেই। দস্যু-তস্করের ভয়েও বটে, ধন-রত্ন সর্ব্বদা কাছে থাকলে ভিক্ষুকের মনশ্চাঞ্চল্য ঘটবার আশঙ্কায়ও বটে তা মঠ থেকে দূরে একটি গোপনীয় জায়গায় রাখার ব্যবস্থা কর। জায়গাটি কেবল অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষই চেনেন। তার সঠিক অবস্থান

জানা না থাকলে কারো পক্ষে সেই শত যোজনব্যাপী গভীর অরণ্যে তা খুঁজে বার করা অসাধ্য। যাক সে কথা।

"তারপর শুনুন। মঠ ছাড়িয়ে নদীপথে আরও কিছুদূর গেলে দেখবেন একটি জায়গায় একটি ছোট স্রোতস্বতী এসে নদীতে মিশেছে। এইখানে নৌকো থেকে ঐ স্রোতস্বতী ধরে উজানে এগিয়ে যাবেন। কোথাও থামবেন না। যেতে যেতে দেখবেন, ভূমি ক্রমেই উঁচু হচ্ছে। তারপর এক জায়গায় গিয়েই দেখবেন, সামনে একটি ছোট পাহাড়। তার ডান ধার দিয়ে স্রোতস্বতীটি ঝর্ণার আকারে নেমে আসছে। কিন্তু সেদিকে আর অগ্রসর হবেন না। বাঁ দিক ধরে উঠতে থাকবেন। পাহাড়টি জঙ্গলময়।

"কিছুটা উঠলেই ডান ধারের শিউলি ও চারাবেলের ঝোপ ঠেলে ডান ধারে যাবেন। তারপর সামনেই পাহাড়ের গায়ে দেখবেন একটি সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটি গভীর অন্ধকারে ভরা। অনেক সময়ে বন্য জন্তু সুড়ঙ্গটির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে। কাজেই খুব সাবধানে মশাল হাতে তার মধ্যে ঢুকতে হয়। সুড়ঙ্গটির শেষে বাঁ দিকের পাথরের গায়ে খাঁজকাটা আছে। খাঁজটি বেশ বড়। তার মধ্যে বসানো দশটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। দেখলে মনে হয়, মূর্তিগুলি দেয়ালের পাথর কুঁদে তৈরী। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রত্যেকটি মূর্তিকে সামনের দিকে সাবধানে টানলেই উঠে আসে। মূর্তিগুলি এক একটি করে টেনে আনলেই তাদের পিছনে একখানি খোপ দেখতে পাওয়া যাবে। তার মধ্যে ঢুকে একটু ভিতর দিকে গেলেই দেখা যাবে পাঁচটি লোহার পেটিকা। ঐ পেটিকাগুলোর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে মঠের ধন-রত্ন।

"এই ধনাগারটি তৈরী করা হয় এক শতাব্দী পূর্ব্বে। তখন মঠের অধ্যক্ষ যিনি ছিলেন তিনিই মঠের কয়েকজন ভিক্ষুর সাহায্যে এই কক্ষটি পাথর কেটে তৈরি করেন। এতে যে তাঁদের কি পরিমাণ শ্রম করতে হয়েছিল তা অনুমান করলেও তাঁদের কর্মশক্তিতে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।" এই পর্য্যন্ত বলে ভিক্ষু নীরব হলেন।

তাঁর ও কালীকিঙ্করের ধারণা ছিল তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হচ্ছিল তার শ্রোতা কেবল তাঁরা দুজনেই। কিন্তু তখন তাদের কামরার বাইরে দরজায় কান পেতে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল আর একটি লোক। সে এক মগ নাবিক, নাম বা-সিন।

বা-সিন এক সময়ে ছিল বোম্বেটে সর্দার। তাকে শঙ্খচূড়ের নাবিকেরা কেউ পছন্দ ও বিশ্বাস করতো না, এমন কি, কালীকিঙ্করও না। একবার এক বন্দরে গিয়ে জাহাজে একজন নাবিকের দরকার হওয়ায় তিনি তাকে নিযুক্ত করেন। অন্য নাবিকেরা ছিল কালীকিঙ্করেরই প্রজা।

বা-সিন লোকটিও ছিল নিতান্ত দুর্বৃত্ত। সে কালীকিঙ্করের ভৃত্য হলেও তাঁর ক্ষতি করতে তার বিবেকে একটুও বাধতো না। যেমন কুৎসিৎ ও রুক্ষ ছিল তার চেহারা তেমনি বিশ্রী ছিল তার মন। কালীকিঙ্কর ভিক্ষুর সঙ্গে কি বিষয়ে আলাপ করছেন, তা জানতে তার কৌতূহল হয়।

সে গোপনে এসে কামরার দরজায় কান পেতে থাকে এবং মঠের ধন-রত্ন কথাটি তার কানে যেতেই সে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। সন্ন্যাসী প্রথমে একটু উচ্চৈস্বরে কথা বলছিলেন। তাই তার প্রথম দিককার কথাগুলি তার কানে যায়। কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অবস্থানের কথা সন্ন্যাসী এত নিম্নস্বরে বলেন যে, শত চেষ্টাতেও সে তা শুনতে পায় না। তবুও সেই গুপ্তধনের লোভে সে অন্তরে অন্তরে হিংস্র হয়ে ওঠে এবং কি উপায়ে তার অবস্থান সম্বন্ধে সকল কথা জেনে সমস্ত নিজেই আত্মসাৎ করতে পারে তখন থেকে তার জন্য সচেষ্ট হয়।

ওদিকে কালীকিঙ্কর ও সন্ন্যাসী বুঝতেও পারলেন না যে, তাঁদের কথোপকথনের শ্রোতা ছিল আর একজন। সন্ন্যাসী কালীকিঙ্করকে কথাগুলি বলে কতকটা নিশ্চিন্ত হন ও মনে শান্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হলো। কালীকিঙ্কর তাঁর দেহ সমুদ্রগর্ভে সমাধিস্থ করলেন।

এদিকে জাহাজ চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ও টানের ইচ্ছামতো একদিকে। কালীকিঙ্কর গভীর চিন্তায় মগ্ন। কোথায় কি ভাবে যে কূল পাবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। হয়তো ঐ সন্ন্যাসীর মতো তাঁদেরও সমুদ্রে সমাধি হবে।

সন্ন্যাসীর কথা শোনবার পর থেকে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। সংকল্প করেছিলেন, তা উদ্ধার করতে পারলে, তাঁর অংশ মৃত নাবিকদের পরিবারবর্গ, জীবিত নাবিকগণ ও নিজের মধ্যে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

পরদিন ভোরে আহত নাবিকেরা সকলেই প্রায় একই সঙ্গে মারা গেল। কালীকিঙ্কর তাদের দেহও সমুদ্রে সমাধিস্থ করলেন।

এখন তাঁকে নিয়ে শঙ্খচূড়ে জীবিত রইলেন মাত্র চারজন। এই চারজন অকূল সমুদ্রে পালহীন, দাঁড়হীন জাহাজে দিনরাত ভেসে চল্‌লেন।

—পাঁচ—

কালীকিঙ্কর ও তাঁর সহকারী নাবিক তিনজনের মনে একটু আশার সঞ্চার হলো। মনে হতে লাগলো, তাঁরা শীঘ্রই একটি আশ্রয় পাবেন। একদিন তো তাঁরা আশায় একটু উৎফুল্লই হয়ে উঠলেন। আর সেই দিন রাত্রেই উঠলো বিষম ঝড়।

কালীকিঙ্কর ও নাবিকেরা দেখলেন, সে ঝড়ে তাঁদের কারো রক্ষা নেই, মৃত্যু নিশ্চিত। আকাশ মেঘে মেঘে কালিময়, সমুদ্র পাগল, বাতাস উদ্দাম, বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। বজ্রের কড়্‌কড়্‌ গর্জন, বাতাসের হুঙ্কার, বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ সব একসঙ্গে মিশে প্রলয় নাচের বাজনা বাজতে লাগলো! ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজ মড় মড় করে ওঠে, যেন তার হাড়-পাঁজরা ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা ঢেউ এসে তাকে কাৎ করে দিলে। কালীকিঙ্কররা অগত্যা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর আর এক ঢেউয়ে জাহাজ ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল।

কালীকিঙ্করের সৌভাগ্য যে তিনি সেই গাঢ় অন্ধকারেও হাতের কাছে পেলেন তাঁর সাধের "শঙ্খচূড়ের" একখানি তক্তা। সে যেন তার চরম মুহূর্তেও তাঁর সেবা ক'রে, তাঁর উপকার ক'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কালীকিঙ্কর তক্তাখানি ধরে তার ওপর চড়ে বসতেই তাঁর পাশে উঠলো আর একজন। কালীকিঙ্কর দেখলেন বা-সিন। বাকী দুজন নাবিক যে কোথায় গেল তা তিনি জানতে পারলেন না।

তাঁরা দুজনে সেই তক্তা আশ্রয় করে ভেসে চললেন এবং ভোরের দিকে একটি বিশাল ঢেউ তক্তাশুদ্ধ তাঁদের দুজনকে একটি দ্বীপের কূলে আছড়ে ফেল্‌লে। কালীকিঙ্কর বুঝতেই পারলেন না যে তাঁরা কোথায় এসেছেন। আর, তখন তা জানবার কৌতূহলও তাঁর ছিল না। কারণ দেহ মন ক্লান্ত, অবসন্ন। এখন যে কোন আশ্রয়ই পরম লাভ।

দুজনে কূল থেকে কোন মতে হাত কয়েক তফাতে সরে গেলেন। তারপর আর এগোতে পারলেন না, নিজে বালির ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

ক্রমে বেলা হয়ে উঠলো, আকাশ পরিষ্কার হলো, সমুদ্রের রুদ্র মূর্তি শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। তাঁদেরও দুজনেরই জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কারো উঠে বসবার সামর্থ্য নেই। অথচ মনে হচ্ছে, দ্বীপটি জনহীন, সেখানে কারো কাছে সাহায্য আশা করা বৃথা। বাঁচতে হলে, নিজেদেরই চেষ্টায় তার উপায় করতে হবে। কালীকিঙ্কর যে অসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী

ছিলেন তা না বললেও চলে। তিনি মনে জোর এনে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন। বা-সিনকে পছন্দ না করলেও তাঁর বিপদ ও দুঃখভাগী সেও। তাকে তখন তাঁর সঙ্গী ও বন্ধুর মতো মনে হলো। বললেন, "এস বা-সিন। দেখা যাক কোথাও খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যায় কিনা!

বা-সিন নীরবে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলো।

কিছুদূরে একটি ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। কালীকিঙ্কর বা-সিনকে নিয়ে তার কাছে গেলেন এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তার চূড়ায় গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দ্বীপটির সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। দেখলেন, কাছাকাছি প্রাসাদের মতো এক প্রকাণ্ড ইমারৎ। তার চারধারে উঁচু দেয়াল। ইমারৎটি যেন একটা দুর্গের মতো। প্রাসাদের সামনাসামনি স্থির সমুদ্রে কয়েকখানি জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার বেশি আর কিছু দেখবার মতো মানসিক ধৈর্য্য তাঁর হলো না, আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই দূর দ্বীপে মানুষ! বিপদে মানুষের সাহায্য পাবেন। তাদের সাহায্যেই দেশে ফিরে যেতে পারবেন। তাঁর মনে আশা, শরীরে বল ফিরে এল। তিনি বা-সিনকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে চললেন সেই ইমারৎটির দিকে।

[চলবে]

বাংলাদেশে

দুর্গাদাস সরকার

পাঁচজনাদের মতন আমরা বদ্ধ কেহ নই ঘরে,
শিক্ষা শুধু চাই না কোনো পাঠশালাতে বই পড়ে।

হাতছানি দেয় আমাদেরে উড়ন্ত মৌ-মক্ষীরা,
নীল আকাশের তলে সঙ্গী সবুজ বনের পক্ষীরা।
আঁধার রাতে আমরা মাতি তারার সাথে গল্পেতে,
বক্‌বকানি সইতে নারি, তুষ্টও নই স্বল্পেতে।
বকের সারি নীল আকাশে উড়লে কেমন হয় ছবি,
সেই ছবি সে আঁকেই মনে কখ্‌খনো যে নয় কবি।

স্বচ্ছ নদীর সূক্ষ্ম গানে আমরা থাকি বন্দী তো,
মাঠের ধানের ঝঙ্কারে হই আমরা অভিনন্দিত।
দূরদিগন্তে নীলিম আকাশ দেখে যে পাই সান্ত্বনা,
আমরা হবো এমনতরো হয়তো কেহ জান্‌তো না।
এইভাবে ভাই আমরা সবাই পাচ্ছি সদাই শিক্ষা ত
বাংলা মাকে ভালোবেসেই আমরা হবো বিখ্যাত।

শরীর গঠনের কথা

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

তোমাদের আজকে শরীর গঠন সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিছু বলবো। তোমরা অনেকেই চুপটি করে বসে শিশুসাথীর বৈঠকের কথা সব শুনছো। কিন্তু এই বসার মধ্যে তোমাদের কেউ কেউ এমন একটা ভুল করে যাচ্ছো যে বদ অভ্যাসের জন্য শরীরটাকে গড়ে তুলবার ইচ্ছা থাকলেও, সে ইচ্ছা তোমাদের পূরণ হবে না।

লক্ষ্য করো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কেমন সামনের দিকে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে বসে আছো। কেন অমন করে বসেছো বলতো? এতে শরীরটাকে গড়ে তোলার কাজে—শরীরের ভেতরের কলকব্জায় রক্ত এবং রস চলাচল ভালভাবে হতে পারে না—যার ফলে শরীরের কাঠামোতে বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এই ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি বজায় রেখে—শত ব্যায়াম বা খুব করে ঘি, দুধ, ছানা, মাংস খেলেও নীরোগ শরীরে বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই শরীরটাকে গড়তে যাবার আগে এ বিষয়ে তোমাদের মোটামুটিভাবে কিছু জানা দরকার।
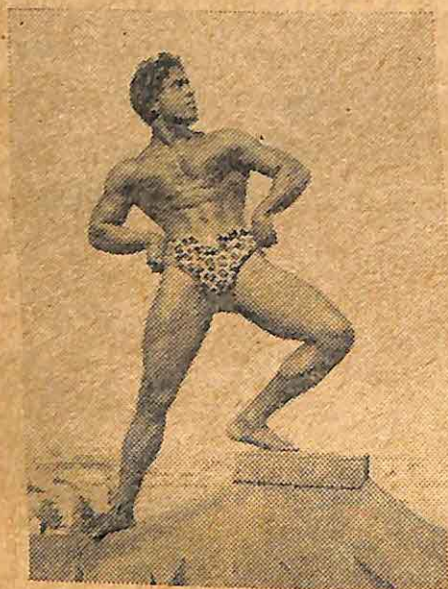
আজকে আমি তোমাদের সেই কথাই বলবো। শোনো মন দিয়ে—আমাদের এই শরীর-কারখানার ভেতরে কতশত কলকব্জা রয়েছে। ওদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজ; আবার জানো, কেউ কাউকে ছাড়া নিজের কাজ করতে পারে না। সুতরাং একটি যন্ত্র খারাপ হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি যন্ত্রও খারাপ হতে সুরু করে। তোমাদের এই কুঁজো হয়ে বসা বা চলার মধ্যে ঐ ধরণের যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি।

এইভাবে চলা-বসার দোষে শরীরের কোঁন্ কোন্ অংশের খুব বেশি ক্ষতি হয় জানো? বুকের খাঁচা যায় ছোট হয়ে,—তারপর হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র আর শিড়দাঁড়ার আশেপাশের স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ করার ক্ষমতা আসে ক্রমশঃ কমে। যার ফলে বয়স বাড়বার সাথে তাল রেখে শরীর আর মনের পরিমাণ মত উন্নতি বা পুষ্টি হতে পারে না। এই না পারারও একটা কারণ আছে; সেটি হ'ল—কুঁজো হয়ে চলা বা বসার অভ্যাসে বুকের খাঁচাটি যায় ক্রমশঃ কুঁচকে, সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসদ্বারা ঐ কুঁচকে যাওয়া খাঁচাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না—বড় করা তো দূরের কথা।

আর তারই ফলে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ এবং হৃদ্‌যন্ত্র ঐ কুঁচকে যাওয়া ছোট্ট খাঁচার চাপে ছোট্টটি হয়েই থাকে। এই ফুস্‌ফুস্‌ আর হৃদ্‌যন্ত্রই কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে।

এতো নিশ্চয়ই জান—হাওয়ায় অক্সিজেন গ্যাস ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না। আর আগুন ছাড়া কোনরকম (energy) এনার্জি বা শক্তির সৃষ্টিও হ'তে পারে না। সেই শক্তি সৃষ্টির জন্যই প্রকৃতি আমাদের বুকের মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌ এবং হৃদ্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। হৃদ্‌যন্ত্র থাকে আমাদের বুকের বাঁ দিক ঘেঁসে। সে হল রক্তধারক। ভালমন্দ সব রক্তই সেখানে স্থান পায়। বদ্‌-রক্তকে পাম্প করে ফুস্‌ফুসে পাঠায়। সেখানে অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে রক্ত পরিষ্কার হয়ে ধমনী দিয়ে সমস্ত শরীরে যায়। কিন্তু কুঁজো হয়ে থাকলে তাদের স্বাভাবিক পথে চলার গতি আসে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে।

আবার দেখ, এই কুঁজো হয়ে বসার দোষে পেটের যন্ত্রগুলি, যারা খাবার বয়ে নিয়ে যায়, ঐ খাবারগুলিকে সুন্দরভাবে হজম করিয়ে সারটুকু ছেঁকে নিয়ে শরীর গঠনের কাজে যদি না লাগিয়ে দেয়, তারা আস্তে আস্তে হয়ে পড়ে অকেজো। তখনই দেখা দিতে থাকে পেটের নানারকম গোলমাল। ফলে, মেজাজটা হয়ে পড়ে খিট্‌খিটে। খেলাধূলা বা লেখাপড়ায় মন বসতে চায়না। এ দোষ ডাক্তারী ওষুধে ঘোচে না। কারণ, গোড়ায় গলদ থাকলে ওষুধে কাজ করবে কেমন করে ?

তারপর ধর শিরদাঁড়ার কথা। অমন করে কুঁজো হয়ে বসার জন্য, তার যা নিজস্ব ধর্ম্ম, সেটাতো বজায় রাখতে বেশ বাধা পায়। যে জন্য আমাদের স্মৃতিশক্তি, ধীশক্তির পরিমাণ মত বিকাশ হতে পারে না। কারণ শিরদাঁড়ার আশেপাশের স্নায়ুমণ্ডলীর সাথে মাথার কলকব্জার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ওটা হল আমাদের দেহ-কারখানার 'হেড্‌ অফিস্‌'। বুঝলে ? এই কারখানার যারা প্রধান কর্ত্তা তাদের কেউ কেউ থাকে মস্তিষ্কে আর কেউ কেউ থাকে 'মেরুমজ্জার মধ্যে' এরা দেহের অভাব অভিযোগ পূরণ করে দেহের মঙ্গলের প্রতি নজর রেখে চলে।

জানো, এই দেহকারখানার অন্তরালে রয়েছে এক অনন্ত সম্ভাবনা। ওকে ভালভাবে ধোয়াপোঁছা করে যত্নে রাখতে পারলে অনেক অ-নে-ক বাপুজী, স্বামিজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, শ্যামাকান্ত, ভীমভবানীর সৃষ্টি হবে তোমাদের মধ্য থেকে।

এবার,—এবার নিশ্চয়ই তোমরা সোজা সরল হয়ে বসেছো ? আর যেন কখনও স্কুল, কলেজ, ক্লাব, বাড়ি—কোথাও কুঁজো হয়ে বোসনা। সোজা সরল হয়ে চলবে ফিরবে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে, উঠে এক গ্লাস গরম জলে একটু পাতি লেবুর রস আর নুন মিশিয়ে খেয়ে নেবে। সকালে অথবা সন্ধ্যায় হাল্কা ধরণের ব্যায়াম করবে, খাওয়া, শোওয়া, বিশ্রাম আনন্দের সময় ঠিক রেখে চলবে। লোভে পড়ে না খেয়ে হজমশক্তির অবস্থা বুঝে খাবে ; রাতে শোবার সময় প্রথমে কয়েক মিনিট বাঁ কাত হয়ে, পড়ে চিৎ হয়ে, তারপর ডান কাতে শোবে, সুনিদ্রা হবে। যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, সেই অনুপাতে শরীর মনকে বিশ্রাম দেবে ; শিক্ষামূলক আনন্দের খোরাক নিজেরাই রুচিমত বাছাই করে নিও। নিয়মিত পড়াশুনা যেন বাদ না যায়।

শ্রীসমর দে

শিশুর হাসি আর ফুলের হাসি দুটিতে এত মিল, যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি। তাই, এদের ভালবাসে না এমন মানুষ হয়তো কোথাও নেই। তবুও, আদরযত্নে দেখেশুনে শিশুদের মানুষ করার মত, ফুলের বেলায় কিন্তু আমরা অনেক কিছুই জানিনে। অথচ ফুল দেখলে সবাই ভাবি—গাছ থেকে তা তুলে এনে নিজের হাতে রাখি। না হয়তো বাড়ী নিয়ে ফুলদানিতে সাজাই। কিন্তু দেখো, ফুলের প্রতি এই যে এত স্নেহ, খানিক বাদেই সে ভাবটি কোথায় গেল চলে!

আবার আজও দেখো, গাছে গাছে কৃষ্ণচূড়া ফুল কেমন মিষ্টি হাসি হাসে।

তা' হলেও দেখি, ঐ হাসিটি কেড়ে নিয়ে—অর্থাৎ সে গাছের সব ফুল উজার করে, পথে পথে

তা ছিটিয়ে ফেলে, বেরসিকেরা চললো নিয়ে বাড়ী। যেন তাদের সব জিনিষটিই গোছানো আছে, অভাব ছিল ফুলের! এদিকে ফুলের মরশুম ফুরোতে না ফুরোতেই—সব ডালপালা ভাঙ্গা গাছের এমন হ'ল শ্রী, যে দেখে তোমাদেরও মনে হবে সে কৃষ্ণচূড়া ফুল, হয়েছে তখন খোকার মাথায় মাঝে মাঝে আরসোলাতে খেয়ে ফেলা চুল।

এ না করে এসো, আমরা যদি ফুল সত্যি ভালবাসি, তবে বাড়ীর এখানে সেখানে পড়ে থাকা যায়গাগুলোকে—ফুল গাছেতে ঢাকি। দেখবে তখন, সৌন্দর্য্য নষ্ট হবার ভয়ে দেশের একটি ছেলেও আর দিচ্ছে না হাত গাছে অথবা গাছের একটি কোন ফুলে।

অদ্ভুত যত জন্তু-জানোয়ার

প্যাঙ্গোলিন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

এক সময় আমাদের পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। ছিল হরেক রকম পশু আর পাখী। তখন তারাই ছিল পৃথিবীর মালিক। তাদের সব এখন বেঁচে নেই। অনেকে লোপ পেয়ে গেছে, অনেকের বংশধরেরা বেঁচে আছে। তাদেরও চেহারা আর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এদের কিছু কিছু দেখতে পাবে চিড়িয়াখানায় গেলে। আর দেখতে পাবে যাদুঘরে। চিড়িয়াখানায় যারা আছে তারা সবাই জ্যান্ত, কিন্তু যাদুঘরে জীবন্ত কোন পশুপাখী নেই। যারা এক সময় পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াত কিন্তু আজ তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না তাদেরই কয়েকটি প্রাণীর হাড়গোড় জোড় লাগিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। দেখলেই ভয় লাগে। ভাগ্যিস্, তারা আজ বেঁচে নেই!

যাক্, ওদিকে যে সব প্রাণী প্রকৃতি আর মানুষের সঙ্গে লড়াই করে এখনও টিকে আছে তাদেরই কিছু কিছু নমুনা দেখতে পাবে চিড়িয়াখানায়। সব রকমের জীবন্ত প্রাণীর নমুনা সেখানে নেই, এবং রাখাও সম্ভবপর নয়। তাছাড়া এমন অনেক পশু আর পাখী আছে যাদের খুব কম দেখা যায়। এদের বংশ প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমনি কতকগুলি জীবজন্তুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব, অবশ্য প্রবন্ধের মারফৎ। পড়লে দেখবে কি মজার মজার এই সব জীব-জন্তু। ওদের কথা শুনলেই পালতে ইচ্ছে যাবে। কিন্তু পাবে কোথায়? ওরা যে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ওদের রক্ষা করবার জন্য কেউ তেমন চেষ্টা করছে না। সুতরাং···যাক্গে। আজ তোমাদের বলব তেমনি প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্যাঙ্গোলিনের কথা।

ভারী লাজুক আর ভারী নিরীহ প্যাঙ্গোলিনরা। কেউ দেখে ফেলবে এই জন্যে দিনের বেলায় প্রায় বেরই হয় না। নিজের গর্ত্তের মধ্যে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে। বেশ রাত হলে বেরিয়ে

আসে খাবার খুঁজতে। কিন্তু তাও খুব ভয়ে ভয়ে আর সন্তর্পণে। একটু শব্দ হলেই দৌড়ে গিয়ে গর্ত্তে লুকায়। কোনক্রমে যদি কারু পা বা হাত ওর গায় লেগে যায় তবে ও গোলপাকিয়ে একদম ফুটবল বনে যায়। তখন ওকে দেখতে খুব মজার।

এত যখন নিরীহ তখন বুঝতেই পারছ খাওয়া দাওয়ার সম্বন্ধে ওর নিশ্চয়ই বেশ বাছ-বিচার আছে এবং সত্যি আছে। পিঁপড়ে বা উইয়ের ডিম ছাড়া ও কিছুই খায় না। ডিম নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এমন কোন ধাড়ি পিঁপড়ে বা উই পেলে অবশ্য ও তাকে রেহাই দেয় না—খপ্ করে ধরে গপ্ করে গিলে ফেলে। তবে সে খুব কম। শক্ত জিনিস ও খায় না, খেতে পারে না। কারণ ওর দাঁত নেই। প্যাঙ্গোলিন হচ্ছে দাঁতশূন্য জানোয়ারদের গোষ্ঠীর একটি প্রাণী! দাঁত নেই বলে ওর খাওয়ার জিনিস হজম করতে কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। সে আগে থাকতে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা পাথর কুচি বা কিছু বালু খেয়ে রাখে। এগুলোই তার খাওয়ার জিনিষ পেটের মধ্যে পিষে দেয়।

তার খাবার জোগার করার কায়দা-টাও মন্দ মজার নয়। সে ভাল দেখতে বা শুনতে পায় না কিন্তু ঘ্রাণশক্তি তার খুব প্রখর। মাটির নীচে কোথায় পিপড়ের বাসা আছে মাটি শুঁকেই সে তা বের করতে পারে। পিঁপড়ের বাসা খুঁজে বের করবার পর সে মাটি খুঁড়তে থাকে। গর্ত্তটা বেশ বড় হলে সে তার নাকমুখ ঢুকিয়ে দেয় গর্ত্তে। তারপর তার লম্বা জিব্‌টা যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দেয় পিঁপড়ের পেঁচানো বাসার মধ্যে। তার জিহ্বায় মাখানো থাকে চট্‌চটে আঁটালো একরকম জিনিস। পিঁপড়ে আর পিঁপড়ের ডিম সহজেই সেঁটে যায় তাতে। তারপর আর কি, জিহ্বা টেনে টপাটপ গিলে ফেললেই হোল। প্যাঙ্গোলিনের সেই জিহ্বা দেখলেই পিঁপড়ের বাসায় যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাতো তোমরা বুঝতেই পারছ।

জাতীয় নয়। প্যাঙ্গোলিন হচ্ছে 'শ্লথ' বা পিপিলিকাভুক আর্মাডিলোর জ্ঞাতি-ভাই। তাদেরই মত দাঁতহীন আর স্তন্যপায়ী। কিন্তু দেহের সাজপোষাক তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর গায়ে লোম নেই, আছে মাছের আঁশের চেয়ে শক্ত আঁশ। সেই আঁশের নীচে কখনও কখনও শক্ত লোম দেখা যায়। আঁশগুলো বেশ বড়, একটার উপর আরেকটা সুন্দর ভাবে সাজান, দেখতে গোলাকৃতি। রঙ্ হচ্ছে হল্‌দে-ধুসরাভ, অনেকটা সাপের গায়ের আঁশের রঙ্। প্যাঙ্গোলিনের পিঠের দিকে আর সারা লেজেই এই আঁশ দেখা যায়। এটাই তার বর্মের কাজ করে। স্তন্যপায়ী আর কোন জীবের কিন্তু এমন আঁশ নেই শরীরে।

প্যাঙ্গোলিন লেজ ছাড়া লম্বা হয় এক থেকে তিন ফিট। লেজটা কখনও ছোট হয় আবার কখনও কখনও তিন ফিটের দ্বিগুণ হয়। এর পাগুলি খুব ছোট। পিঠটা বাঁকিয়ে ল্যাজটা মাটি থেকে সামান্য তুলে সে খুব আস্তে আস্তে চলে।

এশিয়া এবং আফ্রিকায় এই আজব জন্তুটি এখনও পাওয়া যায়। এশিয়ার ভারত, সিংহল, ইন্দোচীন হতে জাভা ও বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে প্যাঙ্গোলিন দেখা যায়। আর দেখা যায় পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। এইসব বিভিন্ন জায়গায় যে সব প্যাঙ্গোলিন দেখা যায় তার সবগুলো একই রকমের নয়। যেমন ধর, এশিয়ায় যে তিন রকমের প্যাঙ্গোলিন দেখা যায় তাদের ছোট ছোট কান আছে, আর আছে আঁশের নীচে লোম। কিন্তু আফ্রিকায় যে চার রকমের প্যাঙ্গোলিন দেখা যায় তাদের তা নেই। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের প্যাঙ্গোলিনের বুকেও আঁশ দেখা যায়। তাছাড়া সব জায়গার প্যাঙ্গোলিন গাছে চড়তে পারে না, মাটিতেই ঘুরেফিরে বেড়ায়। দক্ষিণ ভারতেও কিছু কিছু প্যাঙ্গোলিন দেখা যায়।

প্যাঙ্গোলিন ভয় পেলে সাপের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে থাকে এবং একরকম দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে। কেউ আক্রমণ করলে সে তাকে লেজ দিয়ে বাড়ি মারে, তাতে অনেক সময় ঘা হয়ে যায়।

অনেকে বলেন প্যাঙ্গোলিনের মাংস খুব সুস্বাদু। আবার অনেকের বিশ্বাস প্যাঙ্গোলিনের মাংস খেলে কাজ করবার ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া পাহাড়ীদের ধারণা যে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ গলায় ঝুলালে কোন রোগ হয় না। এইসব নানা কারণে এক সময় লোকে বহু প্যাঙ্গোলিন মেরে ফেলায় আজ এ জীবটি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

বাঙ্গলায় শাড়ীপরা

কাফী খাঁ

[কাফী খাঁকে তোমরা অনেকেই শুধু শিল্পী বলেই জানো। তিনি শুধু শিল্পীই ন'ন ইতিহাসেও তাঁর গভীর জ্ঞান আছে। তিনি বাঙ্গালার সমাজে, আচার-ব্যবহারে, রীতিনীতিতে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে পরিবর্ত্তন এসেছে সে সম্পর্কে তোমাদের বলবেন কয়েকটি প্রবন্ধে। সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিও থাকবে।—সম্পাদক]

আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যুগযুগান্ত ধরে কী ভাবে শাড়ী পরে আসছেন জানো ? তবে শোনো। প্রাচীন কাল থেকে বৃটিশ যুগ পর্য্যন্ত শাড়ী পরার নিয়ম তেমন কিছু বদলায়নি। একটা দশ হাত লম্বা শাড়ীকে মেয়েদের শরীর জড়িয়ে রেখেই পরা চলতো। বাঙ্গালা দেশটা ভাপ্‌সা স্যাঁত্‌সেঁতে গরমের দেশ কিনা, তাই মেয়েরা সাধারণতঃ গায়ে কোনো জামাও বড়ো দিতেন না। আর কোমরের নীচ থেকে পা পর্য্যন্ত কোনো সায়া বা পেটিকোটও ব্যবহার করতেন না। কোনো কোনো জায়গায়, যেমন পূর্ব্ববঙ্গে, মেয়েরা শরীরের আবরু রাখার জন্য শাড়ীটাকে দুই ফের জড়িয়ে তবে গায়ে তুলে আঁচল করে নিতেন। কিন্তু তাতে মেয়েদের সৌন্দর্য্য কিছুটা নষ্ট হতো বই কি।

প্রথমকার যুগে বাঙ্গলায় শাড়ী পরা

এখনো এক ফের্তা শাড়ী পরা বাড়ীতে থাকা সময়ে চলে। তবে তার নিচে সেমিজ সায়া ব্যবহার হয়.

শাড়ীর সৌন্দর্য্য ও মেয়েদের লালিত্য বেড়ে গেল বলতে গেলে বৃটিশ আমল থেকে। কলকাতার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টিও বৃদ্ধি পেল। তখন থেকেই নবাবী আমলের ঢাকাই গোলাবতুন, জামদানী, ডেমরাই, পাবনাই, মুর্শিদাবাদী, বিষ্ণুপুরী, হুগলী, ধনেখালী, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি দেশী তাঁতের শাড়ীর শিল্পের উন্নতি হল। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ থেকে জাহাজ বয়ে ল্যাংকেশেয়ারী মিহি সূতার সস্তা মাল সমাজের সাধারণ স্তর পর্য্যন্ত এসে পড়লো। কিন্তু মেয়েদের শাড়ী পরার মূল কায়দার তেমন কোনো তফাৎ হলো না, শুধুমাত্র শাড়ীকে কুচিয়ে নিয়ে পরা ছাড়া।

এই কোচানো কায়দাটা কিন্তু তখনকার দিনের সাহেব ও মেমদের কোচানো ফ্রিল করা জামার হাতা গলার নেকটাই ও কলার কোচানো রুমাল থেকেই জন্ম নিয়েচে !

মেয়েদের গায়ে প্রথম জামা উঠলো বলতে গেলে মেমদের অনুকরণে। তার আগে যে মেয়েদের গায়ে জামা একেবারেই ছিলো না, তা নয়। সেটা অনেকটা আংরাখা ধরণের, আর তার উচ্চাঙ্গের রূপ হতো মুসলমানী বা হিন্দুস্থানী কুর্তা জাতীয় জিনিষ। আমাদের মেয়েদের সেমিজ বা কামিজ (ওটা ফরাসী নাম Chemise, এর ইংরাজী নাম হচ্ছে Shirt) আসলে হচ্ছে একটা Underwear, যার ওপরে শাড়ীটা পরা হয়। এতে মেয়েরা তাদের শরীরের আবরুর ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তার সঙ্গে এলো

কোচানো কাপড়ের যুগ

অঢেল ঐশ্বর্য্যের যুগ

মেমদের দেখাদেখি আমাদের জ্যাকেট বা ব্লাউজ ! জ্যাকেটটা ছিল তখনকার দিনে সমুখে বোতাম-ওলা। আর ব্লাউজটা ছিল পেছনে বোতামওলা। আজকাল জ্যাকেট নামটা বড়ো ব্যবহার হয় না। সম্মুখে বোতামওয়ালা জ্যাকেট জাতীয় জামাকেই এখন ব্লাউজ বলে। এই জ্যাকেট ব্লাউজের সঙ্গে নীচের দিকে এলো কোঁচানো ফ্রিল দেওয়া পেটি-কোটের ব্যবহার, যেটাকে আমরা চলতি কথায় বলি সায়া।

কিন্তু সবই ত' হলো, এখন শাড়ীর উপায় ? আমাদের মেয়েরা মেমদের মত দশসেরী

পাঁচসেরী জামা গায়ে দেবার পর তো আর শাড়ীটাকে তার ওপর শুধু এক ফেরতা করে জড়িয়ে বয়ে বেড়াতে পারেন না! তাই তখন থেকেই শাড়ী পরার একটা নতুন পদ্ধতির জন্ম হলো। এই পদ্ধতির জন্মদাতা হলো পিরালীর ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরা। তাঁদের শাড়ী পরার ঢংয়ের নামই হলো তাই "পিরালী ড্রেস"। কিন্তু এই ভাবে 'ড্রেস' করে শাড়ী পরা তখনকার দিনের অবস্থাপন্ন বাড়ীর মেয়েদের পক্ষেও একটু কঠিন হতো বলেই কলকাতার বাজারে নতুন শাড়ীগুলিকে এই ড্রেসের মতো করে কুঁচিয়ে ফিতা দিয়ে বেঁধে তখনকার দিনে বিক্রী পর্য্যন্ত করা হতো।

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।]

জবাব

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

অপরিসীম খুসী হলেম
মিত্রা! তোমার চিঠি পেয়ে
হারিয়ে যাওয়া মধুর স্মৃতির
সৌরভে মন গেল ছেয়ে।

দেশের বাড়ীর পুকুর পাড়ে
গাছের ছায়ায় সেই জটলা,
কানা মাছি গোল্লাছুট আর
সিঁড়ির ঘরে 'ক্যারম্' খেলা।

ঠাকুর বাড়ীর তাল পুকুরে
সারা দুপুর সাঁতার কাটা,
বাঁধন হারা পাগল পারা
খুসীর ঢেউ-এ উছলে ওঠা।

তার পরেতে পড়ছে মনে
ছেলে বেলার কত কথা,
মন ভরা সব আনন্দ, আর
স্বপ্ন-মধুর রঙীণ ব্যথা।

অতীত দিনের কত কথা
মনের কোণে উঠছে ভেসে,
হঠাৎ যেন হেসে তুমি
দাঁড়ালে মোর কাছে এসে।

কালের হাওয়ায় কে যে কোথায়
ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেলেম,
হিসেব করা আজকে বৃথা
পাইনি কি আর, কী-ই-বা পেলেম।

কুশল দিও! আজকে তবে
এই খানেতেই করছি ইতি
গ্রহণ কর আমার মনের
শুভেচ্ছা আর অনেক প্রীতি।

রাখে কেষ্টা—মারে কে ?

আশা দেবী

দুপুরবেলা যখন মেজমামা ঘোড়াকে গরু করবার সেই যে কি অঙ্ক—ঐকিক নিয়ম না যেন কি, দিয়ে ফর্‌র্‌—ফোঁ—ফর্‌র্‌ ফোঁ করে নাক ডাকায় তখন কেষ্টর মন যেন কেমন উদাস উদাস উড়ু উড়ু লাগে। অবশ্য অঙ্ক দেখলেই তার মন উদাস হয়ে যায়। অঙ্কখাতায় মামার ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে কেষ্টর মনে হয় মামা কানে কালা হলে ভাল হতো—তা হলে সে নিশ্চয়ই তার কানে একজোড়া দুল গড়িয়ে দিতো। কারণ মামার যত নজর কেষ্টর কানের দিকে। শুধু শুধু সেটাকে টেনে টেনে লম্বা করে দিচ্ছে—শেষে সবাই যদি তাকে লম্বকর্ণ বলে ? তখন ?

ঘোঁর্‌রৎ—মামার একটা দীর্ঘশ্বাস টানার শব্দ হলো! মামার নাকে বোধহয় পথ ভুলে মাছি ঢুকে গেছে।

কেষ্ট আবার অঙ্কখাতা পেতে বসলো। যত সব অসম্ভব কথা। ঘোড়াকে গরু আর ছেলেকে মেয়ে করা—। মামার আর কোনো বুদ্ধি কখনও হবে না। এই সব মূল্যবান চিন্তা করতে করতে কেষ্টর চোখ পড়লো সামনের ঝাঁকড়া দেবদারু গাছটার উপরে। ওর কোটরে একটা প্যাঁচা বাসা বেঁধেছে। সারাদিন বসে বসে দুলে দুলে প্যাঁচা গিন্নী কি যে ভাবে তার ঠিক নেই। কত কথা, কত হিসেব তারও ইয়ত্তা নেই। দুপুরে ওরা ভারি কাবু। কেন ? চোখে একটা সান্‌গ্লাস দিয়ে বেরুলেই পারে। ওদের দেখে মনে হয় ওরা বেশ জ্ঞানী আর ভারি ভারি ঐকিক পৌনঃপুনিক অঙ্ক কষতে পারে!—হঠাৎ মামার দিকে চোখ পড়তেই কেষ্টর মনে হলো মামা যেন পরজন্মে প্যাঁচা হয়—

ঃ কেষ্ট ? বলি কাব্য করা হচ্ছে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ? নিয়ে আয় খাতা—

ঃ অঙ্কটা কিছুতেই মিলছে না, মেজমামা। মাথা চুলকে কেষ্ট বললে।

বাদুরের মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে মেজমামা বললে ঃ মিলছে না ? মিলছে না কেন ? হা করে বাইরে তাকিয়ে থাকলে কারুর অঙ্ক মেলে ? আজ যদি অঙ্ক না হয় এই বেত রইলো, পিঠে ভাঙবো।

কেষ্ট কেঁদে কেঁদে বললো ঃ হয় না যে, বড় শক্ত !

ঃ বড় শক্ত ! খেতে পার ?

কেষ্ট বলে ঃ হাঁ।

ঃ তা তো পারবেই—। আর গুণ নেই ছার গুণ আছে। যা—যা অঙ্ক কষ গে—যা। আজ তোর বিকেলে খেলা বন্ধ।

ঃ ঘোরর্‌—ফু—ঘোরর্‌ ফু। আবার মেজমামার নাক ডাকতে লাগলো।

এবার মেজমামার মুখের দিকে বেশ ভালো করে তাকালো কেষ্ট। টক দইয়ের হাঁড়ির মতো মুখখানা মেজমামার। আর গোঁফগুলো যেন স্থঁচ এক একটি। শুয়ে শুয়ে না ঘুমিয়ে স্থঁচের ব্যবসা করলেও তো বেশ দুপয়সা হতো বিধিদত্ত সম্পত্তিতে। দাঁতগুলো যেন গাবের বিচি। আরো

অনেক কিছু বিশ্রী বিশ্রী চিন্তা মাথায় আসতেই হঠাৎ নজরে পড়লো মাথার কাছে কঞ্চিটার দিকে। রঙ্গিন ফানুসের মত সব চিন্তাগুলো যেন হাওয়ায় উড়ে গেল।

বিন্দেপিসির কালো হুলোটা কখন যে এসে মেজমামার পায়ের কাছে বসে নীরবে ফ্যার্—র্ ফ্যার্—র্ শব্দ করছে তা কেষ্টর লক্ষ্য পড়ে নি। এবার পড়তেই একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। বেড়াল-টাকে সহজে ধরা যায় না। কেষ্টা একটা বাটি করে একটু দুধ এনে বললেঃ চুক-চুক। বেড়ালটা বার কতক দ্বিধা করলো, তারপর টিকটিকির মত কেৎরে কেৎরে এসে দুধে যেই গোঁফ ডুবিয়েছে অমনি—খঁা করে ছোড়দির চুল বাঁধা ফিতে দিয়ে ওর গলা বেঁধে মেজমামার পায়ের সঙ্গে শক্ত করে গেরো দিয়ে বললেঃ তোদের রাখীবন্ধন হলো। খা—এবার দুধ—।

কেষ্ট অঙ্কের খাতা শুদ্ধ আম বাগানের রাস্তা ধরে একেবারে হাওয়া।

মেজমামা বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল। কাজেই ঘোঁররৎ করে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—

ঃ এই কেষ্ট অঙ্কের খাতা পায়ের ওপর রাখিস না।

ঃ ম্যাও—ওঁ—ও।

ঃ এখন ওঁ হবেই। পায়ে ধরলে কি হবে। মেজমামা চোখ বুঁজেই বললেন।

ঃ ঘর্—র্—ম্যাও। এবার একটা প্রচণ্ড টান।

ঃ ওরে—ও কেষ্ট, পা ধরে টানছিস কেন। ওঠ যা, খেল গিয়ে।

ঃ ঘরাৎ—কট্! হুলোর ধৈর্য্যের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলো মেজমামার বুড়ো আঙুলে কট্ করে এক কামড় বসিয়ে দিয়ে।

: ওরে বাবারে মারে—চিৎকারে সবাই ছুটে এলো। ছোড়দি বললে: ওমা এ যে আমার ফিতে—।

বিন্দেপিসি আর্ত্তনাদ করে উঠলো: নিয়ে আয় আমার ঠাকুর ঘরের ফলকাটা বটি আমি দড়ি কেটে দিই।

মা বললেন: আসুক কেষ্টা, ওর কান কেটে দেব কাঁচি দিয়ে।

কেষ্টা কিন্তু বাড়ীর অবস্থা নখদর্পণে দেখছিল জেলা স্কুলের বোর্ডিংয়ের পাশের ফুলতলায় বসে। এখন ফেরা যায় কি করে? আজ রাত নটার গাড়ীতে মেজমামার বিলাইচণ্ডীতে যাবার কথা। একবার চলে গেলে তারপর সবাই হয় তো তার কথা ভুলে যাবে। কিন্তু নটার আগে কিছুতেই বাড়ী ফেরা নয়। ফিরলেই হিপোপোটেমাসের মতো মুখখানা হা করে মেজমামা একটা বড়ির মত তাকে গিলে ফেলবে।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এলো। ফুলতলায় একটা ফুটো দিয়ে অসংখ্য পাখাওয়ালা পিঁপড়ে তাকে একা পেয়ে ছেঁকে ধরলো। একটা শেয়াল পথ ভুল করে ছুটে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে: ক্যা হুয়া। বোর্ডিং-এর নেড়া ঠাকুরটা রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ছেলেদের টিফিনের গোটা দশেক রসগোল্লা সাবড়ে দিলে। কেষ্টার নজর কিছুই এড়াল না। কিন্তু সে করে কি। সেই পথ দিয়ে বাড়ীর ঝি বেণীর মা যাবে, কেষ্ট তার কাছেই বাড়ীর আবহাওয়ার সংবাদ নেবে।

কিন্তু কৈ—আজ আর কেউ তো যায় না। এদিকে পোকার উৎপাত বেড়েই চলেছে। পায়ের নীচে গুবরে পোকা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কেষ্টা উঠে দাঁড়ালো।

: কে? বেণীর মা না? বেণীর মা, শোন?

: দাদাবাবু—তুমি এত রাতে এখানে?

: কত রাত রে? নটা বাজতে কত দেরী? মেজমামা ষ্টেশনে গেছে?—কেষ্ট এক নিঃশ্বাসে সব কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো।

: না। যায় নি, যাবে না। তাঁর তো খুব জ্বর এসেছে। বেড়ালে কামড়ে দিয়েছে তাই।

: বাবা বাড়ী নেই? কেষ্টর গলার স্বর কান্নায় ভরে এলো।

: না। তিনিও ফেরেন নি আজ। বেণীর মা বললে।

: আর মা—? মা কি করছেন—? কেষ্ট ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

: দাদাবাবু মার নাম আর করো না। তুমি বাড়ী ফিরলে তিনি তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেবেন। তুমি নাকি মেজমামার পায়ের সঙ্গে হুলো বেড়াল বেঁধে দিয়েছিলে।

: কি করবো বেণীর মা। তুই আমাকে বাঁচা। যত দোষ ওই হুলোটার।

: দাদাবাবু, আমার বাড়ী চল। যা আছে ভাত তরকারী খেয়ো। তোমাদের বাড়ীর

ভাঁড়ারের বড় চালের খালি ড্রামটার মধ্যে শুয়ে থাকো। কাল সকালে আমি বাসন মাজতে এসে তোমায় খুলে দেব, দেখ কি হয়।

অগত্যা কেষ্টাকে রাজী হতেই হলে। না হয়ে উপায় কি ? এতদিন বেণীর মাকে বগ দেখানো ভ্যাংচানোর শোধ সে বোধ হয় তুলছে। কেষ্ট মনে মনে ভাবলে যদি একবার সুযোগ পাই, তা হলে তোমাকে দেখাব মজা।

ভোরে বাড়ীতে কি কোলাহল! ষ্টেশন থেকে খবর এসেছে ; কাল রাতের গাড়ী কলিসন হয়েছে। ষ্টেশনমাষ্টারবাবু বাবাকে চিঠি দিয়েছেন—

ঃ আপনার ভাগ্যি ভালো যে মেজবাবুকে পাঠাননি তা হলে আর ফিরে পেতে হতো না তাঁকে।

ঃ ওরে বাবা! ভাগ্যিস্ কাল যাইনি—মেজমামা বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসলো।

বেণীর মা বাড়ীতে ঢুকেই সব ব্যাপারটা বুঝে বললে ঃ মামাবাবু, ভাগ্যিস্ ছোটবাবু তোমার পায়ে বেড়াল বেঁধে দিয়েছিল তাই না যাওয়া হলো না। তাকে ডাকো। সেই তো তোমার জীবন-দান করলে গো।

ঃ ওরে কেষ্টই তো বাড়ীর লক্ষ্মী তাকে তোরা সারা রাত বাড়ীতে আসতে দিলি না—বিন্দেপিসি ভাঙ্গা কাঁসির মত খ্যানখ্যানে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।

ঃ তাই তো! ছেলেটা রাতে ফেরেনি, কী যে হলো—

ঃ ও কেষ্টা—কেষ্টা—ছোড়দি চেঁচিয়ে ডাকলো—

ঃ ডাকলেই হলো! ছেলেটা বাড়ী আসুক, আর তোমরা ধরে ওকে মারো। বেণীর মা লাইন ক্লিয়ারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বললে।

ঃ তুই কি পাগল বেণীর মা। ওকে কি মারতে পারি। ও—ওর মেজমামার প্রাণ দিয়েছে। ওতো ছদ্মবেশী ভগবান।—বিন্দে পিসি খুব গদ গদ ভাবে বললে।

ঃ কেষ্ট, ও কেষ্ট—মেজমামা ডাকলে ঃ আয় তোকে আর দুপুরে আটকে অঙ্ক করাব না। হঠাৎ বাবা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীতে এসে বললেন ঃ ভাগ্যি ভূতো কাল রাতে যায়নি। ও বাড়ীর বেঁকোর ঠ্যাং কাটা গেছে। সে হাসপাতালে পড়ে রয়েছে—

ঃ বাবাঠাকুর এ সবই ছোটবাবুর গুণে। কাল নাকি এক সাধু ওকে বলেছিল ঃ খোকা তোমার মামার আজ রাতে ফাঁড়া আছে। দাদাবাবু আমার বুদ্ধি করে মেজমামার যাওয়া আটকেছেন।

ঃ অ্যাঁ—তাই নাকি ?—ও কেষ্টা—কেষ্টা আয়। পঞ্চু একসের রসগোল্লা আন কেষ্টার জন্যে।

ঃ সে ছোঁড়া গেলো কোথায় ?

মাথা ভর্ত্তি ঝুল আর মাকড়সার জাল নিয়ে ড্রাম থেকে বেরিয়ে কেষ্ট বললে ঃ এই যে আমি!

হে কবি, লহ প্রণাম

[পঁচিশে বৈশাখের শ্রদ্ধাঞ্জলি]

ভারতীয় সভ্যতার মূর্ত্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাধনা-লব্ধ জ্ঞান ভারতকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্ণ মর্য্যাদায়। কবি পঁচিশে বৈশাখ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন এবং জীবিতকালে ভারতের তথা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাই এই পঁচিশে বৈশাখ আমাদের কাছে এক অতি পবিত্র স্মরণীয় দিন। এই দিনের মর্য্যাদা দিতে শুধু ঘরে ঘরে উৎসবের দরকার হয় না—প্রয়োজন হয় যাঁর উদ্দেশ্যে এই উৎসব তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি আমরা করতে পারি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি আমরা তাঁর সাহিত্যকে বুঝতে চেষ্টা করি। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন তাঁকে উপলব্ধির—উৎসবের নয়।

"চাহিয়া প্রভাতে রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
রাখিব তোমায় চিরকাল মনে
বলিয়া পড়িল টুটে।"

"প্রভাত রবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্য্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়
আবার ফুটায়ে তুলে।"

ময়নার গয়না

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

ময়না কথা কয়না কেন,—
গয়না বুঝি চাই ?
যাচ্ছে হাটে পায়রা যেন,—
সঙ্গে আমি যাই।
বায়না করি টায়রা চুড়ো,—
পয়সা কোথা পাই ?
স্যায়না বড়ো স্যাক্‌রা বুড়ো,—
তুল্‌ছে খালি হাই !

বুড়ো টিয়ের মুখে ব্যথা,—
ঠোঁটটি বোজা তাই ;
ঝোঁটন্‌ দিয়ে নোটন্‌ সেথা
আস্তে বুলোয়, ভাই !
সার্‌লো ব্যামো, ব'ল্‌লে টিয়ে—
"ময়নাকে বউ চাই !"
কইনু চ'টে—"কিসের বিয়ে ?
কিপ্টের অনেক খাঁই !"

কট্‌মটিয়ে চোখ পাকিয়ে
ব'ল্‌লে সে—"দূর ছাই !
গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে
যাচ্ছি ক'নের ঠাঁই।"
গয়না খুলে' বাক্স থেকে
ছুট্‌লো-যে সাঁই সাঁই ;
স্যাক্‌রা তো থ, ফ্যাক্‌ড়া দেখে,'—
আমরা খাই মিঠাই !

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[**গোড়ার কথা** ঃ সাঁওতাল পরগণার ঝন্টি-পাহাড়ীতে ক্যাবলার মেশোমশাইয়ের বাংলো। লোকে বলে সেখানে ভূত আছে।

সেই ভৌতিক রহস্য ভেদ করতে বেরুল পটলডাঙার চারমূর্তি ঃ টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল সেন আর প্যালারাম।

ট্রেনে সঙ্গী হলেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ। স্বামীজী যখন নাক ডাকাচ্ছেন, তখন চার বন্ধুতে সাবাড় করল তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি। রসগোল্লা আর লেডিকেনিতে সে হাঁড়ি বোঝাই ছিল। মুরি স্টেশনে স্বামীজী নেমে গেলেন। তাঁর শিষ্য গজেশ্বর তেড়ে এসেছিল চারজনকে—কিন্তু ট্রেন ছেড়ে যাওয়াতে এবং গজেশ্বর প্ল্যাটফর্মে আছাড় খাওয়ায় সে-যাত্রা বেঁচে গেল ওরা।

চারমূর্তি এসে পৌঁছুল ঝন্টি-পাহাড়ের ডাক-বাংলোতে। সত্যিই ভূতুড়ে বাংলো! রাত্রে হা-হা—অট্টহাসি—অশরীরী কণ্ঠস্বর—জানলা দিয়ে মড়ার মাথা! তার মধ্যে আবার হাবুল সেন ভ্যানিশ্! হাবুলের একপাটি জুতোর ভেতরে একটুকরো চিঠি ঃ হাবুলকে আমরা লোপাট করিলাম—তোমাদেরও করিব। ইতি ঃ দস্যু ঘচাং ফুঃ।

অমন পালোয়ান টেনিদা পর্যন্ত ঘাবড়ে টাবড়ে একাকার! কিন্তু ক্যাবলা ভাঙে তবু মচকায় না! ক্যাবলা বললে, আমরা নস্যু কচাং কুঃ! ঘচাং ফুঃকে কচাং করে তবে পটলডাঙার ছেলে পটলডাঙায় ফিরে যাব।

সেই অভিযানে বেরিয়ে প্যালারাম পড়ল কামরাঙার লোভে। কামরাঙা গাছের কাছে যেতেই গোবরে পা পিছলে একেবারে পাতালে এসে কার ঘাড়ে পড়ল! আর তক্ষুণি অজ্ঞান! এবার পড়ে যাও—]

—গজেশ্বরের পাল্লায়—

অজ্ঞান হয়ে থাকা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে এক ঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে—তখন? অজ্ঞান তো দূরে থাক, মরা মানুষ পর্য্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।

আমিও লাফ মেরে' উঠে বসলুম।

কেমন আবছা আবছা অন্ধকার—গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেলনা। চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছিল। হঠাৎ বাঁ-কানের ওপর কটাৎ করে আর একটা কাঠপিঁপড়ের কামড়।

—বাপ্‌রে—বলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালুম।

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ কট্‌কটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল। তারপর ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয়, তেমনি ক'রে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপ্‌রে-বাপ্‌রে বলছ, এর পরে যখন ভামরুলে কামড়াবে, তখন মেশোমশাই-মেশোমশাই বলে' ডাক ছাড়তে হবে।

তাকিয়ে দেখি—

ঠিক হাত দুয়েক দূরেই একটা মুশকো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। কথাটা বলেই সে আবার কট্‌কটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখনো সব কি রকম গোলমাল ঠেকছিল! বললুম, আমি কোথায়?

—আমি কোথায়?—লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড় বড় দাঁত বের ক'রে আমায় ভেংচে দিলে। তারপর ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না! হঠাৎ ওপর থেকে দুড়ুম ক'রে পাকা তালের মতো আমার পিঠের ওপরে এসে নামলে, আর এখন সোনা মুখ ক'রে বলছ আমি—কোথায়? ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

আমার সব মনে পড়ে গেল। সেই পাকা কামরাঙা—গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে' পড়া—তারপরে—

আমি হাঁউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুর আড্ডায় এসে পড়েছি?

—ঘচাং ফু ? সে আবার কী ?—বলেই লোকটা সামলে নিলে : হাঁ—হাঁ—ঠিক বটে ! বাবাজী অম্‌নি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে।

—বাবাজী ? কে বাবাজী ?

—একটু পরেই টের পাবে !—লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ ? এত ক'রে চলে যেতে বললুম—ভূতের ভয় দেখানো হ'ল—সারারাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে বসে মড়ার মাথা-ফাথা ছুড়লুম—অট্টহাসি হেসে হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল—তবু তোমাদের গেরাহ্যি হয় না। দাঁড়াও এবার। একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি—তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ, এবার তোমাদের শিক-কাবাব বানিয়ে খাব।

—অ্যাঁ—শিক-কাবাব !

—ইচ্ছে হলে আলু-কাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল-কাটলেট। চপও করা যায় বোধ হয়। কিন্তু—লোকটা চিন্তিতভাবে একবার মাথা চুলকোলো : কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনো দেখিনি।

শুনে, আমার কেমন ভরসা হল ! মরতে তো বসেইছি—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখি।

বললুম, সে কথা ভালো। আমাদের খেয়োনা—অন্তত আমাকে তো নয়ই। খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, ডিপ্‌থিরিয়া হতে পারে—এমন কি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয় !

লোকটা বললে, থামো ছোকরা—বেশি বক্‌বক্‌ কোরোনা। আপাতত তোমায় নিয়ে যাব ঠাণ্ডীগারদে—তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে। সেইখানেই থাকো। ইতিমধ্যে বাবাজী ফিরে আসুন - তোমার বাকী দুটো সাঁকরেদকে পাকড়াও করি—তারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবে—না ডিমের হালুয়া !

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমায় খেয়োনা। খেয়ে কিচ্ছু সুখ পাবে না—তা বলে' দিচ্ছি। আমি পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল খাই—কিচ্ছু রসকষ নেই। আমাদের অঙ্কের মাষ্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি ! আমাকে খেয়ে বেঘোরে মারা যাবে বাবা ঘচাং ফু—

লোকটা রেগে বললে, আরে রেখে দাও তোমার ঘচাং ফু। ঘচাং ফুর নিকুচি করেছে ! কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মি[illegible] খাওয়ার সময় মনে ছিল না ? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি এ-কথা খেয়াল ছিলনা যে আমাদেরও দিন আসতে পারে ? নেহাৎ মুরি ষ্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—নইলে—

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো ছানা বড়া নয়—একেবারে ছানার ডালনা।

—অ্যাঁ, তা হলে তুমি—

—চিনেছ এতক্ষণে। আমিই গুরুদেবের সেই অধম শিষ্য গজেশ্বর গাড়ুই।

—অ্যাঁ!

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে, মুরি ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে! আমরা যে তার পরের গাড়ীতেই চলে এসেছি, সেটা আর টের পাওনি! এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল। বেশ বুঝতে পেরেছি, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজেশ্বর ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাৎ 'সামী কাবাব' বানিয়ে খাবে। নেহাৎ যখন মরবই, তখন আর ভয় করে কী হবে? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন? ক্যাবলার মেশোমশাইয়ের এই বাংলোতে তোমাদের কী দরকার? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছোই বা কি জন্যে? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মুখে একতাল গোবর রেখে দিয়েছো কেন?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে—গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি? রেখেছে গোরুতে। তোমার মতো গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুরুৎ করে পিছলে পড়বে—সেই জন্যেই বোধ হয়।

—সে তো হল—কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন? এ বাড়ীতে তোমাদের কী দরকার?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কি হে চিংড়ি মাছ? এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয়—ওসব খবরে তোমার কী হবে?—ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল।

আমাকে চিংড়ি মাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল। ডান কানের ওপর আর একটা কাঠপিঁপড়ে পুটুস্ করে' ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছিল, 'উঃ' করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাটলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবর্দার বলছি, চিংড়ি মাছ বোলো না।

—কেন বলব না? চিংড়ির কাটলেট বলব।—গজেশ্বর মিটি মিটি হাসল।

—না, কখনো বলবে না।—আমি আরো রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে আর দুধ বেরোয় না—আমি দু-দুবার স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি।

—ইঃ—স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে!—গজেশ্বর ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো ঃ আচ্ছা বলো তো—'ক্যাটাক্লিজম্' মানে কী?

—ক্যাটাক্লিজম? ক্যাটাক্লিজম?—আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধ হয়?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু! আচ্ছা বলোতো—সেনিগেম্বিয়ার রাজধানী কী?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু? নাকি ম্যাডাগাস্কার?

—ইস্—ভূগোলকে একেবারে গোলগপ্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি!—গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, জাড্যাপহ মানে কী? অনিকেত কা'কে বলে?

—কী বললে—অনিমেষ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই।

—হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই।—গজেশ্বর ঝগড়াটে পঁ্যাচার মতো খ্যাঁচখেচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইন্যাল কেন—তুমি ছাত্রবৃত্তিতেও ফেল করবে। নাঃ—সত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য।

বোধ হয় শুক্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়ো।

—কোথায় যেতে হবে?

—বললুম তো, ঠাণ্ডীগারদে। সেখানে তোমার ফ্রেণ্ড হাবুল সেন রয়েছে—তার সঙ্গেও মোলাকাৎ হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটুখানি বিষয়কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক—

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নিচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাং করে না পড়তুম, তা হলে হাত-পা নির্ঘাৎ গুঁড়ো হয়ে যেত। যেখানে বসে আছি—সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে—কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই ভেতরে কোথাও ঠাণ্ডীগারদ আছে—সেইখানেই আপাতত বন্দী রয়েছে হাবুল সেন।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে—কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না? কোনোমতেই না?

মাথার ওপরে গোলকুয়োর মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ্য করে আরো দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে। একটু চেষ্টা করলেই টকাৎ করে ওপরে—

এসব ভাবতে বোধ হয় মিনিট দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে গজেশ্বর—মিট্‌মিট্ করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

—বলি, মতলবটা কিহে? পালাবে? সে গুঁড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি! বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারো, কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ুইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই। তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছ—তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়ালো।

অ্যাঁ! তা হলে সেই তামাকখেগো ভুতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের! স্বামীজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসে আড়ি পাতছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালীর ল্যাজ মনে ক'রে সেই স্বর্গীয় দাড়ি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, সত্যি বলছি, আমি ইচ্ছে করে দাড়ি ছিঁড়িনি। আমি ভেবেছিলুম—

—থাক—থাক! তুমি কী ভেবেছ টেবেছ তা আমার জেনে দরকার নেই! গালের ব্যথায় গুরুদেব ঘু'ঘণ্টা ছট্‌ফট্ করেছেন। তিনি ফিরে এলে—যাক সে কথা, ওঠো এখন—

গজেশ্বর হাতীর শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায় পাকড়াও করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: বাপ্‌রে গেলুম—ওরে বাপরে—গেছি—

ততক্ষণে আমিও দেখেছি। কালো কট্‌কটে একটা কাঁকড়া-বিছে! গজেশ্বরের পায়ের কাছে তখনো দাঁড়া উঁচু করে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে।

—গেলুম—গেলুম—ওরে বাবা—জ্বলে গেলুম—

বলতে বলতে সেই ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা মেজের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল: গেছি—গেছি—একদম মেরে ফেলেছে—

আর আমি? এমন সুযোগ আর কি পাব? তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম—এইবারে এস্‌পার-কি ওস্‌পার!

(ক্রমশঃ)
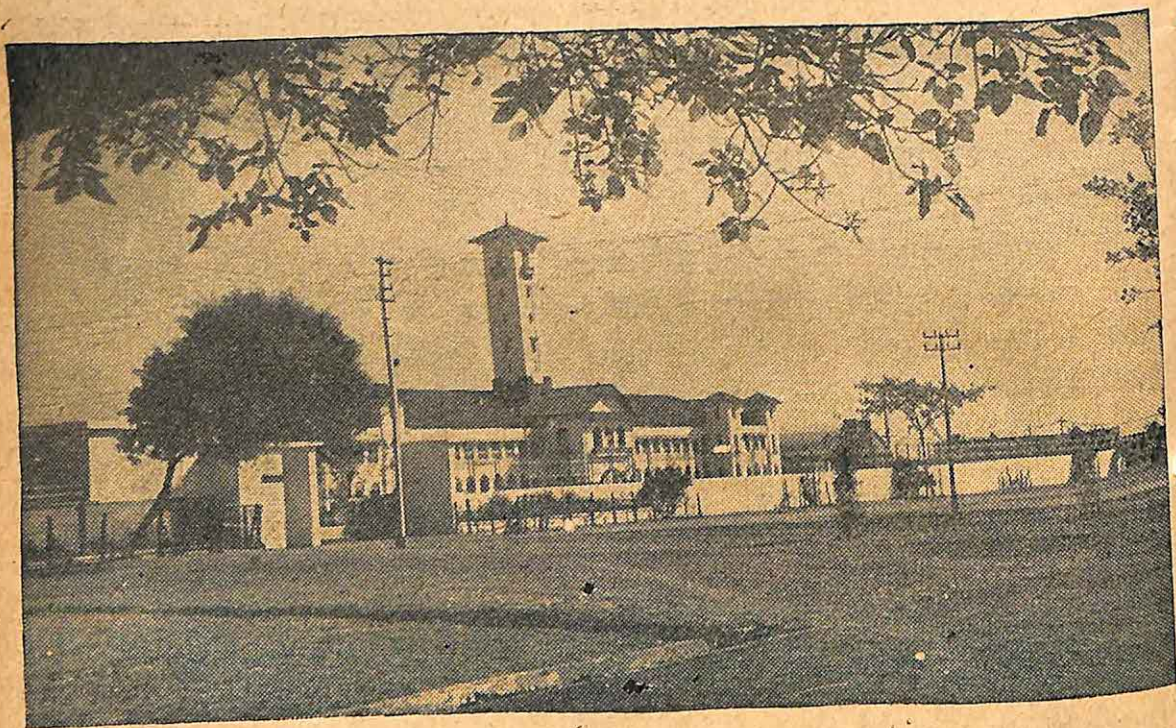
দি ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্‌টিটিউট অব টেক্‌নোলজি, খড়গপুর

[ভারতীয় কারিগরী শিক্ষার মহা বিদ্যালয়]
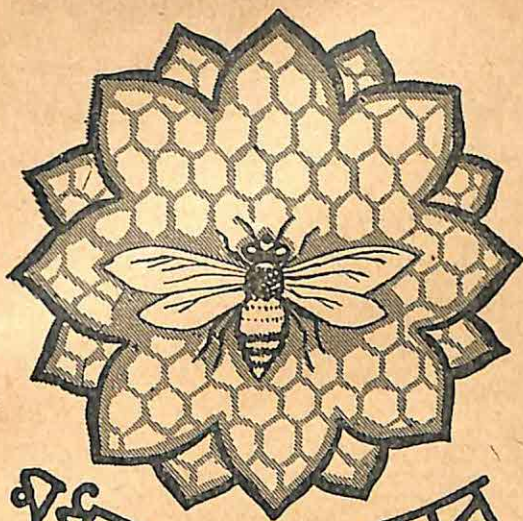
আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা,

একটি বছর শেষ হয়ে আবার এলো নতুন বছর। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। এক বছর পুরোণো জীর্ণ হয়ে চলে যায় আবার আর এক বছর আসে নতুন আশার আলোক-বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে—তোমাদের আহ্বান জানায় নতুন পথের সন্ধান দিতে। এই মহাকালের আহ্বানকেই তোমাদের অনুসরণ করে ছুটে চলতে হবে সাফল্যের সন্ধানে। তোমার একার সাফল্য নয়—তোমার দেশের ও দশের। মনে রেখো, তুমি এ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। দেশকে বড় করবার, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে, খেলা-ধূলায়, কলাবিদ্যার চর্চ্চায় জগৎ-সভায় এর শ্রেষ্ঠ আসন লাভের পথ তৈরী করার দায়িত্ব তোমার। তাই তুমি নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে প্রতিজ্ঞা নাও, তোমার দায়িত্ব পূর্ণ মর্য্যাদায় পালন করবার। আমার অনেক আদর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নাও। ইতি

আসর পরিচালক

সুনীলকুমার দত্ত (গ্রাঃ নঃ ১০৬৯৮)—তোমার পোস্টকার্ডে লেখা 'নিমগাছ' কবিতাটি মন্দ হয়নি। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাসায় বসে বসে ভালো লাগছে না। সে অবস্থায় তোমার মনে কবি-ভাব জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তোমার ছন্দে, মিলে হাত ভালো। আমার মনে হয় তুমি লিখে গেলে তোমার হাত কবিতায় মোটামুটি খারাপ হবে না। **দেবেন্দ্রনাথ পরামাণিক (সারঙ্গাবাদ)**—তোমার ছবিটি শিক্ষার্থীর দিক থেকে বিচার করলে খারাপ মনে হয় না। ড্রইং এখনও কাঁচা। ড্রইং ঠিক না হলে ছবি ভালো হয় না। ছবি চাইনিজ কালী দিয়ে আঁকবে। **দিলীপকুমার গাঙ্গুলী (গ্রাঃ নঃ ১৬০৭৪)**—তোমার 'বৃষ্টির দিনে' ও 'ভিখারী' এই দুটি কবিতার মধ্যে 'ভিখারী' কবিতাটির ভাব ভাল আর বৃষ্টির দিনে কবিতাটির বর্ণনা মন্দ নয়। তবে দুটি কবিতাতেই মিল ও ছন্দে ত্রুটী আছে। কবিতার এ দুটি বস্তুই আসল। সুতরাং এ ত্রুটী সংশোধনের দিকে লক্ষ্য রেখে চর্চ্চা করলে কালে হয়ত তুমি সাফল্যলাভ করবে। **রমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১৪৭৫২)**—তোমার লেখা এর আগেও পেয়েছি। সকল সময়ে সব লেখা ছাপা বা আলোচনা করা সম্ভব নয়, ভাই, কারণ বহু লেখা প্রতি মাসে আমাদের হাতে আসে। তাই পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই আমরা সুযোগ দেই। এজন্য মনে কোন ক্ষোভ রেখো না। তোমার গল্প "ঠাকুরমার বৈঠক" মন্দ নয়। ভাষাও ভালো। তবে দোষ হচ্ছে এই যে বড় বেশী ফেনানো।

গল্পটিকে ইচ্ছা করলেই আরো ছোট তুমি করতে পারতে। মোটামুটি ভাবে, বেশী না বলে, প্লটটিকে রূপ দিতে পারলে ছোট গল্প সার্থক হয়। **কৃষ্ণদাস মণ্ডল (গ্রাঃ নঃ ১৫১১৪)**—তোমার গল্প ও কবিতা পেয়েছি। গল্প লেখায় তোমার কবিতা লেখার চেয়ে হাত ভালো। তোমার কবিতায় ছন্দ এবং শব্দ চয়নে যথেষ্ট ক্রটী আছে। মিলগুলিও ভালো নয়। এগুলো যদি সংশোধন না করতে পারো তবে তোমার কবিতা লেখায় হাত ভালো হবে না। তোমার 'একতার বল' গল্পটির প্লট মামুলি হলেও, তোমার বলবার গুণে অনেকটা উত্‌রে গেছে। একতার দ্বারা কিভাবে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে সে ভাবটা তোমার গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। **সমরেন্দ্রনাথ সিংহ (গ্রাঃ নঃ ১৬২০১)**—তোমার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা 'অদ্ভুত হত্যা' গল্পটি ভালো হয়েছে। এ ধরণের ভৌতিক গল্প লিখতে হলে একটি কথা মনে রাখলে তোমার রচনা আরো ভালো হবে। কথাটি হচ্ছে এই যে, এ ধরণের গল্প লিখতে হলে প্রথম থেকেই যাতে কৌতুহল সৃষ্টি হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। **কুমারী ছায়া চাটার্জি (গ্রাঃ নঃ ১৩৯৫৮)**—তোমার 'হে রুদ্র বৈশাখ' কবিতাটির মধ্যে ছন্দে ও মিলে দোষ থাকলেও ওর ভাবের জন্য কবিতাটি মন্দ লাগেনি আমার। তোমার ক্রটীগুলো সেরে নিয়ে তুমি যদি কবিতা লেখার চর্চ্চা করতে পারো তবে আমার মনে হয় কালে তোমার কবিতা-গুলো আরও ভালো হয়ে উঠবে।

—অষ্টাবক্র—

দেখতে দেখতে আর একটা বছর আমরা পার হয়ে এলাম। ১৩৬৩ সালের শুভারম্ভে আমার ছোট্ট প্রিয় বন্ধুদের নববর্ষের প্রীতি জানাই। খেলাধূলার ক্ষেত্রের নতুন বছরের সুরু বলতে পারি। কারণ আর কিছুদিন পরে সুরু হবে সর্ব্বজনপ্রিয় খেলা ফুটবল। কলকাতায় এখন হকির মরসুম। হকি লীগের প্রতিযোগিতা জোর চলেছে। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান আর ভবানীপুর দুই দলই অপরাজিত রয়েছে, তবে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট খুইয়েছে। এগারটা করে খেলা খেলে মাত্র একটি করে পয়েন্ট হারালেও খেলার দিক থেকে এ দুই দলের নৈপুণ্য অসাধারণ বলতে হবে। গত বছরের লীগ জয়ী মোহনবাগান এবারেও লীগ জয়ের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ভবানীপুরও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলেই মনে হয়। গত বছরের রাণার্স আপ কাষ্টমস এর মধ্যে পাঁচটি পয়েন্ট নষ্ট করে ফেলেছে। মহমেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল দলের অবস্থাও কাষ্টমস-এরই মত। চ্যাম্পিয়ানশিপের পাল্লা মোহনবাগান আর ভবানীপুরের মধ্যেই শেষ পর্য্যন্ত চলবে মনে হচ্ছে।

এ তো গেল প্রথম ডিভিসনের কথা। দ্বিতীয় ডিভিসনে এবার রাজস্থান দল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আসছে বছর রাজস্থান আবার প্রথম ডিভিসনে খেলবে।

বিশ্ব অলিম্পিকে ফুটবলে ভারত—এ বৎসরের নভেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সহরে বিশ্ব অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে। ভারত এবার অলিম্পিক ফুটবলে যোগ দেবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কারণ লণ্ডন ও হেলসিংকি অলিম্পিকে ভারত ফুটবলে সুবিধে করতে পারেনি বলে আমাদের খেলাধূলার কর্ত্তারা ভারত ফুটবলে যোগ দেবে না বলে স্থির করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা স্থির করেছেন যে, ভারত তাতে যোগদান করবে। অলিম্পিকে এবং বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশে প্রতিটি খেলা নব্বুই মিনিট ব্যাপী হয়ে থাকে। ভারতে খেলা হয় একঘণ্টা বা ষাট মিনিট ধরে। এখন স্থির হয়েছে ভারতেও ১৯৬০ সালের মধ্যে সকল খেলা নব্বুই মিনিট করেই খেলান হবে। ভারতের খেলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হলে এই ব্যবস্থাই সমীচীন। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়েরা দম রাখতে না পারলে সুফল আশা করা বৃথা। দম রাখতে হলে অনুশীলন মস্ত বড় সহায় এবং সেই অনুশীলন পূরো সময় নিয়ে করতে হবে। আমাদের ফুটবল কর্ত্তারা এদিকে নজর দিয়েছেন দেখে আমরা সকলেই খুসী হয়েছি।

বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের এথলেট—বিশ্ব অলিম্পিকে এথলেটিকস্ বিভাগে বিশ্বের সকল দেশেই তোড়জোড় চলেছে। ভারতীয় অপেশাদার এথলেটিক ফেডারেশান মেলবোর্ণ অলিম্পিকএ এথলেট নির্ব্বাচনের প্রথম পর্য্যায়ে ১৯ জন এথলেটের নাম ঘোষণা করেছেন। বিশ্ব অলিম্পিকের উপযোগী করবার জন্যে এই মনোনীত এথলেটদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। অনুশীলন শেষ হলে আগামী অক্টোবর মাসে ট্রায়াল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলাফল দেখে চূড়ান্ত ভারতীয় দল নির্ব্বাচন করা হবে।

এই মনোনীত এথলেটদের দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) যে সকল এথলেটের মান ফেডারেশানের নির্দ্দিষ্ট মানের মধ্য আছে এবং যাদের মান নিম্নে আছে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত অনুশীলনের পর নির্দ্দিষ্ট মানে পৌঁছতে পারে।

প্রথম শ্রেণীতে আছেন—লেভিপিণ্টো ও দর্শন সিং (২০০ মিটার), শ্রীচাঁদ (১১০ মিটার হার্ডল) জগদেব সিং (৪০০ মিটার হার্ডল), অজিত সিং (উচ্চ লম্ফন), রামমেহার ও শাদিলাল (রাণিং ব্রড জাম্প), মিস মেরি ডি-সুজা (১০০ মিটার)।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন—সুখদর্শন সিং ও মহীন্দর সিং (হপ ষ্টেপ এণ্ড জাম্প), সোহন সিং (৮০০ মিটার), গুরুচরণ সিং (মারাথন), ভি. কে. রাই (১০০ মিটার), মিস লীলা রাও (১০০ মিটার) এবং এসিলভেরা, হরজিৎ, যোগীন্দর সিং, মিলকা সিং ও জে-বি-জোসেফ (৪ × ৪০০ মিটার রিলে)।

প্রাচ্য সফরে মোহনবাগান :—সম্প্রতি মোহনবাগান দল ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর পরিভ্রমণ করে ভারতে ফিরেছে। কলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগ বিজয়ী মোহনবাগান প্রাচ্যের

এই তিন স্থানে প্রায় একমাস ব্যাপী সফর করে সর্ব্বসমেত বারটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে সাতটি খেলায় তারা বিজয়ী ও দুটিতে পরাজিত হয় আর তিনটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। মোহনবাগান দল যেখানেই গেছে সেখানেই পেয়েছে বিপুল অভিনন্দন এবং প্রচুর সমাদর। তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যও সকলের প্রশংসা পেয়েছে। এই সফরে মোহনবাগান সর্ব্বত্রই বুটপায়ে খেলেছে। সবুট খেলাতেও তাদের চিত্তাকর্ষক ফুটবল সকলকে বিমুগ্ধ করেছে।

১২টি ম্যাচে মোহনবাগান ৩৬টি গোল করে এবং তাদের বিপক্ষে গোল হয় ২১টি। খেলোয়াড়দের মধ্যে কে. পাল ১৩টি (দুটি হ্যাটট্রিক), পি. ব্যানার্জ্জি ১১টি, এস. ব্যানার্জ্জি ৬টি, সি. গোস্বামী ২টি, রমন ২টি এবং রতন সেন একটি গোল করেন।

এই দলের ম্যানেজার হয়ে গেছলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন খ্যাতিমান খেলোয়াড় করুণা ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন যে, এর আগে যে-সকল সর্ব্বভারতীয়, প্রাদেশিক বা স্বতন্ত্র ফুটবল দল প্রাচ্য সফরে গেছলেন তাঁদের ব্যর্থতার জন্য ফুটবল খেলায় ভারতের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই সফরে মোহনবাগান দলের সাফল্যে ভারতের সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ক্রিকেটে জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বাংলার পরাজয় :—ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রণজী-ট্রফির ফাইন্যালে বোম্বাই দল বাংলাকে আট উইকেটে হারিয়ে দিয়ে আটবার রণজী ট্রফি লাভের গৌরব অর্জ্জন করেছে। বাংলা দল এবার নিয়ে পাঁচবার ফাইন্যাল খেলে একবার মাত্র (১৯৩৮-৩৯) এই ট্রফিতে বিজয়ী হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে।

কলকাতায় ইডেন উদ্যানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিনের খেলার চতুর্থ দিনেই সমাপ্তি ঘটে। কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে বাংলার ব্যাটসম্যানরা বোম্বাইয়ের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেন নি এবং তার ফলস্বরূপ বাংলাকে পরাভূত হতে হয়। বাংলা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে এবং পি. সেনের ৫৫, বি. চন্দের ৫৫, ও শিবাজী বসুর ৪০ রাণের সহায়তায় প্রথম ইনিংসে ২৫৫ রাণ করে। এর উত্তরে বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসে করে ৩০৮। পলি উমরিগড় ১১২, মন্ত্রী ৬৭ ও পি. কে. কামাথ ৬৯ রাণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বাংলার কৃতী বোলার পি. চ্যাটার্জ্জি ১০১ রাণে ৭ উইকেট প্রাপ্ত হন।

এর পরে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ব্যাটিং বিপর্য্যয় ঘটে ও ১৭৯ রাণে সকলে আউট হয়ে যায়। একমাত্র শিবাজী বসু ৬৮ রাণ করা ছাড়া এ ইনিংসে আর কোন ব্যাটসম্যান সুবিধে করতে পারেন নি। ভিজে মাঠে বোম্বাইয়ের বোলাররা দ্রুত উইকেট দখল করেন।

জয়লাভের জন্যে ১২৭ রাণ প্রয়োজন থাকায় বোম্বাই দল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দুই উইকেটে ১২৯ রাণ করে আট উইকেটে বিজয়ী হয়।

—বিশ্বদূত—

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান—অস্বাভাবিক রকম গ্রীষ্ম-প্রধান বলে আফ্রিকার কোন কোন স্থান বিদেশীর কাছে রীতিমত আতঙ্কের কারণ। ন্যাটালের বার্গভিলে শহরে গ্রীষ্মকালে তাপ একশ' ত্রিশ ডিগ্রীতে গিয়ে পর্য্যন্ত কখনও কখনও পৌঁছায়। ফলে, সেখানকার তাপমান যন্ত্রগুলো ফেটে চুরমার হয়ে যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে সেখানকার ভেড়ার বাচ্চাগুলোর পাকস্থলীতে পানকরা দুধ পর্য্যন্ত টক হয়ে যায়। ফলে, তারা মরে যায়। সেখানকার গাছের পাতা শুকিয়ে অসময়ে ঝরে পড়ে।

ভগবান বুদ্ধদেবের সার্দ্ধ দ্বিসহস্রতম জন্মতিথি—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমাতে তথাগত বুদ্ধদেবের সার্দ্ধ দ্বিসহস্রতম জন্মতিথি পূর্ণ হবে। হিন্দুরাও বুদ্ধদেবকে ভগবানের অন্যতম অবতার বলে মেনে থাকে। বুদ্ধদেব ছিলেন প্রেম ও শান্তির পূর্ণ প্রতীক। জন্মতিথির উৎসব সমস্ত
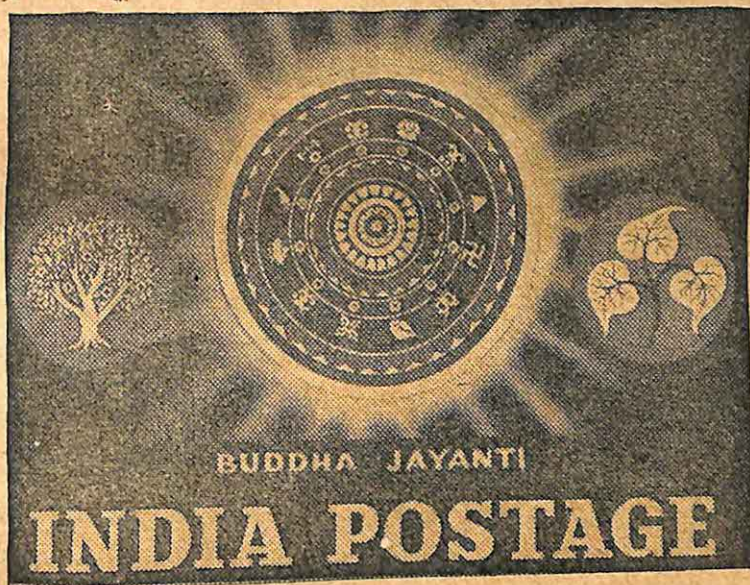
বৌদ্ধ জগতে সাড়ম্বরে পালিত হবে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-স্থল ভারতেও মহা আড়ম্বরের সাথে এই উৎসব পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। এ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সম্মানিত বৌদ্ধ প্রতিনিধি ভারতবর্ষে পদার্পণ করবেন। ভারত সরকার এ উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকেট বার করা স্থির করেছেন।

ইয়াকোহামা বন্দরের কথা—১৯২৩ সালের ভূমিকম্পের ফলে জাপানের ইয়াকোহামা বন্দর খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে বন্দরটিকে আবার গড়ে তোলা হয়েছিলো। ভূমিকম্পের ফলে সেখানে যে ভূমিক্ষয় সুরু হয়েছিলো তা কিন্তু আজও বন্ধ হয় নি। ফলে, সেখানকার বাড়ীগুলো মাটীর নীচে বসে যাচ্ছে। এ ব্যাপার সেখানকার লোকের পক্ষে বিশেষ আতঙ্কের কারণ হয়েছে।

পরলোকে বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী—মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানীর সংখ্যা কম। এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী হিসেবে যাঁরা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন মাদাম জোলিও কুরী তাঁদের নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। উনষাট বছর বয়সে কিছুদিন আগে এঁর মৃত্যু হয়েছে। মাদাম কুরী যিনি রেডিয়ম আবিষ্কার করে বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন ইনি তাঁরই কন্যা। তেজস্ক্রিয় তত্ত্ব সম্পর্কে এঁর আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। নানা ক্ষেত্রে আণবিক শক্তির প্রয়োগ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার পথের যে সন্ধান দিয়েছে এর গবেষণাই সে পথের সন্ধান প্রথম বিজ্ঞানী সমাজকে দিয়েছিলো।

ফুলের গন্ধ নয় রংই আকর্ষণ করে—মধুমক্ষিকা ও অন্যান্য কীটেরা আহার্য্যের সন্ধানে ফুলের ওপর গিয়ে বসে এ তোমরা অনেকেই জানো। কিন্তু একটা কথা তোমরা হয়ত জানো না যে এরা ফুলের মধু বা ফুলের গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এরা আকৃষ্ট হয় তাদের রংএর দ্বারা। যে ফুলের রং যত চড়া তাদেরই এ কীটদের আকৃষ্ট করবার শক্তি তত বেশী। রাত্রিবেলা যে সব ফুল ফোটে তাদের রং বেশীর ভাগই সাদা। প্রাকৃতিক নিয়মেই এ সব ফুলের রং সাদা হয়ে থাকে। কারণ রাত্রি বেলা সাদা ছাড়া অন্য রং কারো চোখে পড়ে না।

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

"এ যুগে গ্রাম কি রকম হওয়া উচিত।" এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে। ১ম পুরস্কারে ৫৲ টাকা ও ২য় পুরস্কারে ৩৲ টাকা মূল্যের বই দেওয়া হবে। বইগুলি আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত বইয়ের ভেতর থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের ইচ্ছানুসারে দেওয়া হবে। প্রবন্ধের আকার ছাপালে 'শিশুসাথী'র দুই থেক তিন পৃষ্ঠার বেশী যেন না হয়। প্রবন্ধ ২৫শে বৈশাখের মধ্যে শিশুসাথী কার্য্যালয়ে পৌঁছা চাই। প্রবন্ধের সঙ্গে নাম, গ্রাহক নম্বর ও পুরো ঠিকানা দিতে হবে। ফলাফল আষাঢ় মাসে বেরোবে।

নতুন বই

অশ্বিনীকুমার দত্ত—ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন আর প্রকাশ করেছেন ২৭ ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা থেকে যতীন্দ্রকুমার ঘোষ। দাম এক টাকা।

বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের কোন নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন বোধহয় তোমাদের দরকার হবে না। তিনি স্বদেশপ্রেমিক, সমাজকর্ম্মী ও শিক্ষাগুরু রূপে সে যুগে বাংলা দেশের মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরাধীন জাতির স্বদেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ শাসক জাতির হাতে বহু ভাবে তিনি লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হয়েছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর সেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য লাভ করেছিলেন। স্থতরাং তিনি অশ্বিনীকুমারের সম্পর্কে কিছু লিখবার যোগ্য অধিকারী। তোমরা বইখানা পড়ে দেখো এবং অশ্বিনীকুমারের আদর্শ অনুসরণ করে মানুষের মত মানুষ হবার চেষ্টা করো। বইখানা লেখার গুণে অত্যন্ত স্থপাঠ্য হয়েছে।

হিন্দুস্থান ইয়ার বুক (১৯৫৬)—এস. সি. সরকার সম্পাদনা করেছেন আর প্রকাশ করেছেন ১৪ বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ থেকে এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ। দাম ৪।০ আনা মাত্র। হিন্দুস্থান ইয়ার বুকের কোন নতুন পরিচয় দরকার হয় না। চব্বিশ বছর ধরে বইখানা বাংলার শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক প্রভৃতির নানা বিষয় ও তথ্য জানবার আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষ-ভাবে মিটিয়ে আস্‌ছে। বর্ত্তমান চলতি দুনিয়া সম্পর্কে যে কোন তথ্য এই বইখানা থেকে পাওয়া যায়। এ ধরণের বর্ষপঞ্জী প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে বার করা শুধু শ্রম এবং ব্যয়সাধ্যই নয় এজন্য অসীম ধৈর্য্যেরও প্রয়োজন হয়। এ বছর বইখানাতে কয়েকটি নতুন বিষয় যোগ করায় বইখানার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই বইখানা যত্নের সঙ্গে কাছে রাখতে অনুরোধ করি।

পাথরের ফুল—খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন আর প্রকাশ করেছেন ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে সাহিত্যায়ন। দাম এক টাকা চার আনা।

বিশ্ববিখ্যাত রুশ কথা-চিত্র 'ষ্টোন ফ্লাওয়ার' অবলম্বনে বইখানা লেখা। বইখানা ছোটদের পক্ষে খুবই শিক্ষাপ্রদ। খগেনবাবুর গল্প বলবার নতুন পরিচয় দিতে হবে না হয়ত তোমাদের কাছে। তাঁর বলার গুণে বইখানা সত্য সত্যই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। বইখানা যে জনপ্রিয় হয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াই তার প্রমাণ।

মজার ধাঁধা

নীতিকথার একটি কথা

আছে, বর্ণগুলির মাঝে,

একটি ছেড়ে একটি পড়

নইলে—সবই হবে বাজে !

গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদিগের নাম

মুকুল সেনগুপ্ত, উমা সেনগুপ্তা ও গণেশ সেনগুপ্ত (১৫৭৪৮) খড়্গপুর ; মায়া ও দীপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬৬৬০) শিবপুর, হাওড়া ; রতনকুমার দে (১৬৪৩২) ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ; পদ্মা দেব (১২০৩৮) লাবান, শিলং ; অপূর্ব্বশঙ্কর ঘোষ (১৫৮২১) বোলপুর ; সমীরণ ঘোষ, সামন্তখণ্ড, হুগলী ; নরেশ, অনিমেষ, পরিমল, মুনু, সাধনা, বাসনা, জ্যোৎস্না ও ইণ্ডিয়া বণিক (৪৬০ পি) তাঁতিবাজার, ঢাকা ; শক্তি, বাবু, তাতু, পল্টু, খোকা, জাপু, বীণা, চায়না, স্বাতী, কলিকাতা ; টুলটুল দে, টালিগঞ্জ, কলিকাতা ; মিহির দত্ত (১৫৭৮৬) জলপাইগুড়ি ; অসিত চৌধুরী (১৪০০১) বালী, হাওড়া ; রামকিশোর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, মুক্তাগাছা, পূর্ব্ব-পাকিস্থান ; মনোজিৎ-নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী (১৯৬ পি) মুক্তাগাছা, পূর্ব্ব-পাকিস্থান ; ঐশ্বর্য্যময় মিত্র ও প্রশান্তভাস্কর সিংহ (১৪৯২৩) কাটিহার, পূর্ণিয়া ; বিমলেন্দু গিরি (১৩৫৭২) কালিন্দী, মেদিনীপুর ; হীরু, টাকু

ও হীরেন্দ্রনাথ সান্যাল (৭৯১৭) আদ্রা, মানভূম ; অপূর্ব্বনাথ ভট্টাচার্য্য, খিদিরপুর, কলিকাতা ; জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ (১৬৬০০) পাটনা ; উদয়ন, ঝুমু, তপন (১৬০৬৪) দেওঘর ; অশোক কর্ম্মকার (১৬১৩৬) কুচবিহার ; সুশান্ত ও সুমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, নাজিরবাগান, হালতু ; অরুণকুমার রায় (৭৬৯২) তমলুক, মেদিনীপুর ; অমিতাভ ও মীনাক্ষী হোড় (১৬১৫৭) নয়াটোলা, মুজঃফ্ফরপুর ; অতুল চৌধুরী ও শঙ্কর নাহা, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি ; বন্দনা বাগচী (১৬৫৩৪) ডালমোর ; দিলীপকুমার চক্রবর্ত্তী (৮৭৫৩) আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি ; স্বপ্না ও দীপ্তিশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৯৩১) কলিকাতা ; বাসুদেব পাল (১৬৬১৫) গাজিপুর, হাওড়া ; শুক্লা ও কৃষ্ণা বসু (১৪৩৫৭) কাঁকে, রাঁচি ; বিজয়কুমার সিংহরায় (১৬০৮৪) খন্যাল, হুগলী ; জনা, লক্ষ্মী ও তাপস (১৬০২৩) মাহাঙ্গা ; গোষ্টবিহারী মাইতি (১৬৩৪৭) হাওড়া ; সুভাষ লাহিড়ী ও নন্দ, দীনু, বোলা, শঙ্কু, বলু, বুকু, টুটুল, অসীম, বুবুল, নিতু, তরুণ ইত্যাদি (১৬০৫৪) বরাহনগর, কলিকাতা ; আশীষ গুপ্ত, দিলীপ মুখার্জ্জী ও কমল বর্ম্মণ (১২৩৯২) হ্যাভলক স্কোয়ার, নিউ দিল্লী ; সত্যেন্দ্র বসু (১৪৮২৬) বাঁকুড়া ; সোমনাথ ও দেবনাথ দত্ত (১১৫১৭) কলিকাতা ; হৃদয়রঞ্জন ও যূথিকারাণী দাস (১৬২৯২) অরারবাজার, বালেশ্বর ; হাসি চক্রবর্ত্তী, প্রভাস রায় ও অশোকা চক্রবর্ত্তী, বার্ণিশঘাট, জলপাইগুড়ি ; দেবনাথ বিশ্বাস, আতপুর, ২৪ পরগণা ; ভারতী, পূরবী, দেবব্রত, সুপ্রকাশ ও সুনন্দা জামশেদপুর ; পিনাকীপ্রসাদ সরকার (১২৮৬১) তমলুক ; তারাশঙ্কর দেবরায় (১৬৫২৫) বরাহনগর, কলিকাতা , বিদ্যুৎকুমার চন্দ্র (১৪৪৩৯) পটুয়াটোলা, কলিকাতা ; সুব্রত চাটার্জ্জী (১৩১৩৭) শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং ; আলপনা চাটার্জ্জী (১৫৪৩৯) আম্বালা, পূর্ব্বপাঞ্জাব ; প্রবীরকুমার (১৬২২৮) পাটনা ; অর্চ্চনা আইচ্, শান্তিনিকেতন, বোলপুর ; পার্থ, দীপালি, কল্যাণী মিত্র (১২৪৫৯) চিত্তরঞ্জন, বর্দ্ধমান ; টেনিদা, প্যালারাম, হাবুল ও ক্যাবলা (১৬১০৬) ধানবাদ ; শিকুল ও সুমিত চক্রবর্ত্তী (১৬১০৬) ধানবাদ ; নূপুর মৈত্র (১৫৫৬৯) কলিকাতা ; সুব্রত, শান্তা, শীলা দেব, বোকারো, হাজারীবাগ ; পিয়া মজুমদার (১৫০০১) কুচবিহার।

ভবেশ, ইলা, শীলা, ভাবলু, টুকু, খুকু ও বাবলুসোনা, অরুণোদয় পাঠাগার—শিবপুর ২৪ পরগণা, তিলাদেবী দাশ, শিবপুর শিশু পাঠশালা, ডায়মণ্ডহারবার ; সুখেন, পূরবী, সন্ধ্যা, প্রীতিন্দু বাগচী (১২৩৩৬) ঢাকুরিয়া ; প্রণব রায় (১৬০৫৩) মেদিনীপুর ; সন্তোষ চক্রবর্ত্তী—খড়দহ, ২৪ পরগণা ; মুক্তি, ভক্তি, হরিসাধন, সনাতন ও নিখিল, মানভূম ; বিপ্লব ও শ্রীলেখা মিত্র (১৪৫০২); দুর্গাদাস, মানস, সজনী, কাঞ্চন ও নীলমোহন, গৌরাঙ্গ চক (১৬৪৯৫) ; মৃণাল, মৃন্ময়, ছায়া, ছবি ও ছন্দা, গোরক্ষপুর ([illegible]) ; অমল দেব গোস্বামী, গোঁসাই চক (১৬৭৭৪) ; অশোক রায় চৌধুরী, বাণারস ; অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৪৬৫৫) শ্রীরামপুর ; সুনির্ম্মল গুহ (১৫০২১) ; হৈমন্তী ও শঙ্করানন্দ ভট্টাচার্য্য, বালিগঞ্জ ; কুমারী ছায়া, মিনতি, দীনবন্ধু, মমতা, শ্যামল চাটার্জি (১৩৯৫৮) মেদিনীপুর ; বাণী, অশোক, অজয়, বহ্নি, শান্ত, সীমা ও বিপ্লবদাস (১২৭৫১) ; অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (১০৯৬০)

বানারস, কানাই, স্মৃতি পাঠাগারের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ—ইরা, মৌটুসী, পারুল, শিশির, উষা, বাসন্তী, সবিতা, জয়ন্তী (৪২২৩) ; অহীন্দ্র, প্রদীপ, মৃণাল ও সাধন, জলপাইগুড়ি ; দীপক ও তপন ব্যানার্জি কলিকাতা ; হারাধন, প্রসাধন, ভানু চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ; দীবা, মীরা, রেখা ও শঙ্কর, কাঁকিনাডা ; স্বপন সেনগুপ্ত, (১৫৮৫৭) মেদিনীপুর।

বিঃ দ্রঃ (ছবি দেখে চিনতে পারার জন্যেই যখন ধাঁধা, তখন যারা ছবি এঁকে ধাঁধার উত্তর পাঠিয়েছ তাদের ধন্যবাদ।)

চিত্র-পরিচয়

[প্রথম রঙীন চিত্র ধর্ম্মধ্বজ ও ইন্দ্রাণী]

ছবিখানা এঁকেছেন শিল্পী বীতপাল। 'বীতপাল' শিল্পীর ছদ্মনাম। এই শ্রেণীর রঙীন ছবি ও রেখাচিত্র রচনায় বীতপাল সিদ্ধহস্ত। ছবির বিষয়বস্তু 'জাতক' থেকে নেওয়া।

বহুকাল আগে বারানসীতে যশপাণি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর সেনাপতির নাম কালক। লোকটি ভালো নয়। ধর্ম্মধ্বজ ছিলেন রাজ-পুরোহিত। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। ছত্রপাণি ছিলো রাজার অলঙ্কার-শিল্পী। খুবই সজ্জন ব্যক্তি। ধর্ম্মধ্বজের সঙ্গে কালকের নানা ব্যাপার নিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। কালকের পরামর্শে রাজা ধর্ম্মধ্বজকে কতকগুলো কঠিন কাজের ভার দেন। সকল পরীক্ষায়ই ধর্ম্মধ্বজ উত্তীর্ণ হন। অবশেষে যশপাণি কালকের পরামর্শে ধর্ম্মধ্বজকে একখানা সুন্দর বাগান তৈরী করে দিতে বলেন। ধর্ম্মধ্বজ এ নিয়ে ভাবনায় পড়লেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এ ভাবনা থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন একখানা বাগান তৈরী করে দিয়ে। বাগানে দীঘি, প্রমোদ-ভবন ইত্যাদিও এইভাবে তৈরী হলো। এরপর আদেশ হলো চারটি সৎগুণ আছে এমনি একজন উদ্যান রক্ষক দেবার। না দিতে পারলে প্রাণদণ্ড। ধর্ম্মধ্বজ মহাভাবনায় পড়লেন। তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেলেন। এখন তাঁর একই ভাবনা—উদ্যান রক্ষকের।

এমনি সময় সেখানে উপস্থিত হলেন একটি নারী। দেখে মনে হয় কাঠুরিয়ার মেয়ে। তার সঙ্গে ধর্ম্মধ্বজের অনেক কথা হলো। তখন মেয়েটি বললেন—আমি ইন্দ্রাণী, আমার স্বামী ইন্দ্র তোমার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তোমার এই সমস্যাটির সমাধান আমি করে দিচ্ছি। রাজার অলঙ্কার-শিল্পী ছত্রপাণির চারটি সৎগুণ আছে। সে-ই রাজার উদ্যান-রক্ষক হবার উপযুক্ত লোক। তুমি রাজাকে গিয়ে এই কথা জানাও। ধর্ম্মধ্বজ রাজবাড়ীতে চলে গিয়ে রাজাকে সব কথা জানালেন।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরন ধর**
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"শিশুসাথী"র নিয়মাবলী

১। "শিশুসাথী"র চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২৷০। প্রতি সংখ্যা ।৶০। **চাঁদার টাকা শ্রীহরিশরণ ধর, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। "শিশুসাথী"র বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। যে কোন্ সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। চাঁদার টাকা পাইলেই গ্রাহক করিয়া পত্রিকা পাঠান হয়। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে। পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই, সমস্ত গ্রাহকের পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা, কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে, পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায় তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ।৶০ হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা যখনই কোন চিঠি-পত্র লিখিবেন, চিঠিতে নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৮। **লেখক-লেখিকারা ও গ্রাহকেরা** ছেলেমেয়েদের উপযোগী "শিশুসাথী"র জন্য 'লেখা' পাঠাইতে পারিবেন। সম্পাদকের মনোনীত হইলে উহা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়; তবে তাহা কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তোলা ফটো অথবা তাহাদের আঁকা ছবিও "শিশুসাথী"তে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয়। মনোনীত হইলে ছাপা হয়। সঙ্গে পোষ্টকার্ড না পাঠাইলে অথবা উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সকল সময় সম্ভব হয় না। কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদা ভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৯। ধাঁধার উত্তর ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছান দরকার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'**; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা: ১২

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৩৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য

৩৫শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ { ২য় সংখ্যা

বুদ্ধ জয়ন্তী

শ্রীকালিদাস রায়

আড়াই হাজার বছর ধরি
শুচি-সাধনায় বোধি বোধনায়
রেখেছ ভারতে তীর্থ করি
নতশিরে আজ তোমারে স্মরি।

ভারতের বোধি তরুর তলে,
লভিলে সহসা যে দিব্যালোক
ধ্যানযোগে মহাতপের ফলে,
তিমির মগ্ন অর্দ্ধ ভুবন
লভি সেই জ্ঞানালোকের ভাতি,
মেলিল নয়ন, প্রভাত হইল
মানব মনের অমার রাতি।

সভ্য জীবন তা হতে সুরু,
গত কত যুগ, তবু তুমি প্রভু
আজো আছ সেই জগদ্‌গুরু।

দিয়ে গেছ তুমি চরম বাণী।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে কত না দ্বন্দ্ব
দ্রোহ-বিগ্রহে কত না গ্লানি।
সবার উর্দ্ধে তব বাণী রাজে
অম্লান চির সত্য ধ্রুব,
সঞ্চার করে সাম্য মৈত্রী
যা কিছু শান্ত যা কিছু শুভ।

আড়াই হাজার বছর আগে,
যে সত্য তুমি করেছ প্রচার
নানা মতবাদে তাহাই জাগে।
চিরপুরাতনে নূতন লাগে।

সারা ধরা আজ আর্ত্ত কাতর
হিংসার বিষে চেতনাহারা।
ঘুচায়ে ভ্রান্তি চাহে সে শান্তি
কোথা পাবে তব বাণীটি ছাড়া ?
ভোগের পঙ্কে শূকরের মত
যাহারা রয়েছে মজ্জমান।
তাহারাও চায় পুনরুদ্ধার
কে করে তাদেরে পরিত্রাণ ?
আড়াই হাজার বছর পরে
আর্ত্ত বিশ্ব তোমারে স্মরে।
দেখাও সুপথ, অন্তরে তার
সুমতি জাগাও করুণা ভরে।
ধ্বনিত হউক তোমার বাণী।
প্রভু তথাগত রাখো ব্যথাহত
ধরণীর শিরে অভয় পাণি।

"ওই নামে একদিন ধন্য হলো দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুম তলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক মোহ আবরণ।
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
নব প্রাতে উঠুক কুসুমি।" —রবীন্দ্রনাথ

আড়াই হাজার বছর আগে আর আজকে

অজিত রায়

আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে, এখন যেখানে নেপাল রাজ্য, সেখানে বাস করতেন এক রাজকুমার। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম।

রাজকুমার গৌতমের খেলার সাথী ছিল তাঁর এক বন্ধু, দেবদত্ত। একদিন গৌতম আর দেবদত্ত রাজপ্রাসাদের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখতে পেলেন আকাশে উড়ে যাচ্ছে একটি অপরূপ সুন্দর রাজহাঁস। গৌতম অবাক হ'য়ে সেই রাজহাঁসটিকে দেখছেন এমন সময় দেবদত্ত তা'র হাতের ধনুক দিয়ে রাজহাঁসকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়লেন। তীর গিয়ে বিঁধল রাজহাঁসের ডানাতে সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রতে ক'রতে এসে প'ড়ল গৌতমের পায়ের কাছে। গৌতম বুকে তুলে নিলেন রাজহাঁসকে, তা'র গা' থেকে তীর খুলে ফেলে দিলেন তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে রাজহাঁসটির গা ধুইয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। তখন দেবদত্ত এসে ব'ললো আমি রাজহাঁসটিকে মেরেছি ওটি আমার হাঁস আমাকে দিয়ে দাও। গৌতম বললেন, তুমি হাঁসটিকে মেরেছো, যদি হাঁসটি মরে যেতো তা'হলে ওটি তোমার হ'তো, কিন্তু এখন আমি একে বাঁচিয়েছি কাজেই এটি আমার হাঁস। এই ব'লে গৌতম হাঁসটিকে আবার মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিলেন। তারপর দেবদত্তর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, দেখ মেরে ফেলতে সবাই পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে তুলতে পারে ক'জন! প্রাণ নিতে পার, কিন্তু একটি প্রাণও কি দিতে পারো? গৌতমের কথা শুনে দেবদত্ত অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। সে ভেবেই পেল না এ প্রশ্নের উত্তর কি!

এই ঘটনার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত দুহাজার পাঁচশ সত্তর বছর কেটে গেছে,কিন্তু আজও গৌতমের সেই কথার জবাব, তোমরা আমরা ও আরো অনেকে ঠিক মত দিতে পারে নি। তবে উত্তর দিতে না পারলেও সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছে যে সেই সিদ্ধার্থ গৌতম আমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি শুধু মানুষকেই ভালোবাসতেন না, সমস্ত জীবজন্তু প্রাণীকে সমান ভাবে ভালোবাসতেন।

সেই জন্যেই বোধহয় আজকে সারা ভারতবর্ষে, সমস্ত এশিয়ায় ও পৃথিবীর দিকে দিকে সেই গৌতমকে ভালোবাসে সবাই।

এখন আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমকে জানি বুদ্ধদেব ব'লে। তার কারণ গৌতম যখন বড় হ'লেন তখন তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এসে গয়ার কাছে একটি অশ্বথ গাছের তলায় ব'সে ধ্যান করতে লাগলেন এবং যখন তাঁর সেই ধ্যান ভাঙ্গল তখন তিনি পুরাকালের মুনিদের মতন পৃথিবীর

সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে ফেলেছেন। তখন থেকে তাঁর নাম হ'ল বুদ্ধ, মানে যিনি জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হ'য়ে আছেন।

"নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।"

তোমরা যখন বড় হ'য়ে বুদ্ধদেবের বাণী বইয়েতে পড়বে তখন দেখবে যে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী বোধ-হয় কখনো কোথাও জন্মাননি।

বুদ্ধদেবের জন্ম, জ্ঞানলাভ ও তিরো-ধান সমস্তই ঘটেছিলো বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন ছিলো বৈশাখী পূর্ণিমা, যেদিন তিনি বুদ্ধ হলেন সেদিনও ছিলো বৈশাখী পূর্ণিমা, আবার যেদিন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান সেদিনও পূর্ণিমার চাঁদ বৈশাখ মাসের আকাশকে আলোকিত ক'রে রেখেছিলো।

এ'বছরের ইংরাজি মে মাসের ২৪শে তারিখে সেই বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। ঐ দিন থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশ হ'তে লোক আসবে আমাদের এই ভারতবর্ষে। যেখানে বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন, জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন ও শেষ শয্যা গ্রহণ করে-

ছিলেন—সেই দেশে তীর্থযাত্রায়। সারা পৃথিবীর মানুষ বুদ্ধদেবের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে ও তাঁর ধ্যান করার জন্যে আসছেন আমাদের দেশে।

বুদ্ধদেব যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নে'ন সংস্কৃত ভাষায় তাঁর সেই বিদায় নেওয়াকে ব'লে মহাপরিনির্বাণ। ইংরাজি ২৪শে মে ১৯৫৬ সালের পূর্ণিমার দিন সেই মহাপরিনির্বাণের দিন থেকে হিসাব ক'রলে ঠিক দু'হাজার পাঁচশ বছর হয়। এই সার্দ্ধদ্বিসহস্রতম বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। ঐ দিন থেকে এক বছর পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত জায়গায় বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব চ'লবে। সকলের চেয়ে বেশি লোকের সমাগম হবে সেই সব জায়গায় যেখানে বুদ্ধদেব কোনো না কোনো সময় একবারও ছিলেন। এই জায়গাগুলির নাম হচ্ছে লুম্বিনি, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, বুদ্ধগয়া, যেখানে তিনি বুদ্ধ হ'য়েছিলেন, সারনাথ, যেখানে তিনি প্রথম বাণী দান করেন, কুশীনারা যেখানে তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়। এ ছাড়াও আরো অনেক জায়গা আছে যেমন জেসাস্থি, সাঁচি, নালান্দা, রাজগির, অজন্তা, ইলোরা। এই সমস্ত জায়গাতেও অনেকে যাবেন কারণ এ গুলিও কোনো না কোনো ভাবে বুদ্ধদেবের নাম ও মহিমার সঙ্গে জড়িত।

আমাদের ভারত সরকার বুদ্ধজয়ন্তীর সুরুর দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন ব'লে ঘোষণা করেছেন। তোমাদেরও ঐদিন ছুটি। তোমরা ভারতের জাতীয় পতাকা নিশ্চয়ই দেখেছো, সেই পতাকার মাঝখানে যে ধর্ম্মচক্রটি আছে সেটি বুদ্ধদেবের এক পরমভক্ত মহারাজ অশোকের পতাকার ধর্ম্মচক্রের অবিকল প্রতিচ্ছবি। তোমরা যখন বড় হ'য়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বে তখন দেখতে পাবে এই মহারাজ অশোক বুদ্ধদেবের কত বড় ভক্ত ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করার জন্যে কি ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

এই অশোক বুদ্ধদেবের বাণীকে পঞ্চশিলা নাম দিয়ে দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার করেন। পঞ্চশিলা মানে পাঁচটি পাথর নয়। পঞ্চশিলা মানে পাঁচটি শুভ আদর্শ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালও এই পঞ্চশিলা এখন দেশে দেশে প্রচার করছেন।

সারা ভারত আজ বুদ্ধভক্তদের সঙ্গে উচ্চারণ করছেন্—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

—

পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'—**রবীন্দ্রনাথ**

ভগবান বুদ্ধ

সুমন্ত্র

অনেক অনেক কাল আগের কথা।

আমাদেরি ভারতবর্ষে তখন ছিল একটি অতি সুন্দর স্বাধীন রাজ্য। নাম তার শাক্য-রাজ্য। রাজ্যের রাজধানীর নাম হচ্ছে কপিলবস্তু। সূর্যবংশের রাজা ইক্ষাকুর বংশধরেরা রাজত্ব করতেন এই রাজ্যে। শাক্য নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা। কুলের উপাধি তাঁদের গৌতম।

মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন (বাঢ়হুত)
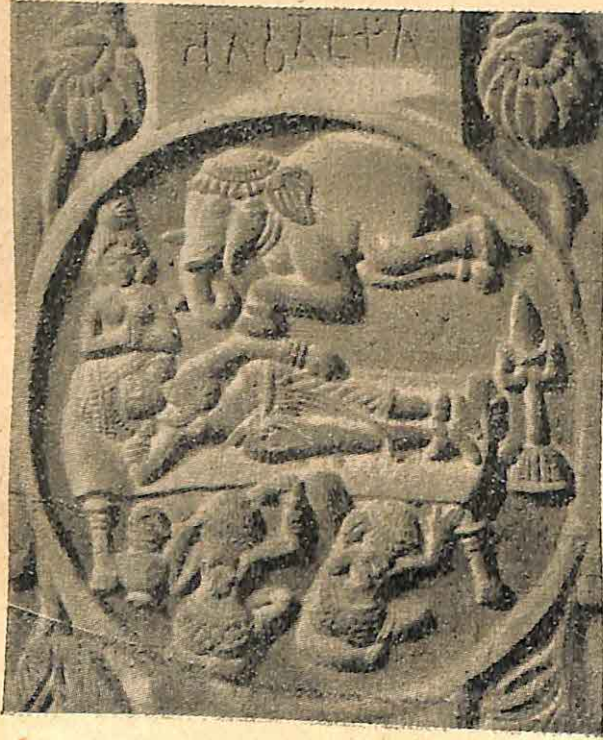
শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতির নাম শুদ্ধোদন। বাস করতেন তিনি গিরি-নদী-ঘেরা প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা কপিলবস্তুতে। সেখানে থেকেই তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য শাসন করতেন। কিন্তু তাঁর শাসনে প্রজারা পীড়িত হয় নি কোনদিন। প্রজার মঙ্গল সাধন, তাদের উন্নতি করা এবং তাদের সুখ-সুবিধা দেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। প্রজারা তাই সুখে ও শান্তিতেই বাস করত তাঁর রাজত্বে।

অশেষ গুণ ছিল রাজা শুদ্ধোদনের। রাজকোষে ছিল তাঁর অফুরন্ত ঐশ্বর্য। অযুত তাঁর সৈন্যদল। নিজেও অমিতবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। রাজ্যে ছিল শান্তি, গৃহে ছিল শান্তি। তবু মনে ছিল না সুখ। দুঃখের কারণ হচ্ছে তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তিনি ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন।

কিছুদিন চলল এমনি ভাবে।

হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলেন রাণী মায়াদেবী। অদ্ভুত স্বপ্ন। তিনি শুয়ে আছেন খাটে। কোথা থেকে নেমে এল ছোট্ট একটি হাতী। দুধের মত শাদা তার রঙ। সে এসে রাণীর ডান

ধারে বসল। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রাজমহিষীর দেহে। কারা যেন হর্ষধ্বনি করে উঠল। রাজ্ঞীর দেহ ও মন স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠল।

জ্যোতিষীরা স্বপ্নের কথা শুনে পুলকিত হলেন। বুঝলেন ঃ এ অতি শুভ স্বপ্ন। ঘোষণা করলেন ঃ এক মহামানব আসছেন রাণীর কোল আলো করে। সেই আলোতেই দূর করবেন ধরার সব দুঃখের কারণ। শুনে রোমাঞ্চিত হল রাজ্ঞী মায়াদেবীর দেহ। শুদ্ধোদন হলেন আনন্দে উৎফুল্লিত।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল পৃথিবীত্রাতার জন্মক্ষণ। রাণী যাবেন দেবদহে তাঁর পিত্রালয়ে। কিন্তু পিত্রালয়ে উপনীত হবার পূর্বেই জন্ম নিলেন মহামানব! যেখানে তাঁর জন্ম হল নগরীরই উপকণ্ঠ, নাম লুম্বিনী উদ্যান। বৈশাখী পূর্ণিমার রজত-শুভ্র রাত্র আরও সুন্দর হল ফুটফুটে একটি শিশুর স্পর্শ পেয়ে।

এই শিশুই ভগবান বুদ্ধ!

বুদ্ধের জন্ম

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ। পুত্রের জন্মের পর তাঁর সর্বার্থসিদ্ধ হয়েছিল বলেই তিনি ওর নাম রেখেছিলেন সিদ্ধার্থ।

মহাসমাদরে, আনন্দে ও খেলার মধ্য দিয়ে শিশু সিদ্ধার্থ বড় হতে লাগল। তারপর একদিন তাঁর উপনয়ন হল। এরপর আরম্ভ হল বিদ্যাভ্যাস। সঙ্গে চলল রাজকুমারোচিত শস্ত্র, শাস্ত্র ও রাজনীতিচর্চা। অল্প সময়েই তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন সর্বশাস্ত্রে। মৃগয়া, অশ্বারোহণ ও রথচালনায়ও দক্ষতা অর্জন করলেন তিনি।

কৈশোর বয়স কেটে গেল সিদ্ধার্থের। এলো যৌবন। তাঁর পৌরুষোচিত চেহারায় রূঢ়তার পরিবর্তে ফুটে উঠল একটা আশ্চর্য প্রশান্ত ভাব। চরিত্রেও দেখা দিল পরিবর্তন। ভোগবিলাস!

তাঁকে আকর্ষণ করে না। জীবহত্যায় আনন্দ পান না। মাঝে মাঝে নিশ্চল ভাবে একাগ্র হয়ে কি যেন ভাবেন তিনি। দূর গহন অরণ্যে পালিয়ে গিয়ে ধ্যান-নিমগ্ন হন। ভাবেন বোধহয়, মানুষের দুঃখদুর্দশা, জরামরণ, আদিব্যাধি আর তার নিষ্ঠুরতা, হিংসার কথা। কি করে মানুষকে এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার করা যায় তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

সব শুনে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হলেন। পুত্রকে সংসারে বেঁধে রাখার জন্যে বিয়ে দিলেন অপূর্ব সুন্দরী যশোধরার সঙ্গে। কুমারকে আকণ্ঠ ভোগবিলাসে ভুলিয়ে রাখার জন্য আয়োজনের অন্ত থাকে না। তারপর সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের যখন জন্ম হল রাজা তখন কিছু নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু পৃথিবীকে কিছু দেবার মহান ব্রত নিয়ে জন্মেছেন যিনি তিনি কেন বাধা পড়বেন এই বন্ধনে। তাই নগরী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে একবার জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, আবার ব্যাধিগ্রস্ত একটি লোক এবং তৃতীয়বার একটি শবদেহ দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে বিপ্লব জাগল। একদিন তিনি সব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। মানুষের পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ নিবারণের দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তিনি।

তারপর বিভিন্ন স্থানে তিনি সাধনা করলেন, বহু সাধুজনের সংস্পর্শে এসে আত্ম-জিজ্ঞাসার সদুত্তর লাভের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মনের ক্ষোভ মিটল না। তিনি এলেন গয়াধামে নৈরঞ্জনা নদীতীরে। ধ্যাননিমগ্ন হলেন এক অশ্বত্থতরুর মূলে। এখানেই লাভ করেন তিনি পরম জ্ঞান। তাই এই বৃক্ষ বোধিদ্রুম আর ঐ স্থানে বুদ্ধগয়া নামে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। পরমজ্ঞান লাভের পর সিদ্ধার্থ হলেন 'বুদ্ধ', হলেন সম্বুদ্ধ।

পরমজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধদেব ৪৫ বছর ধরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এবং নির্বাণলাভের পর ভারতের বহু অংশে তো বটেই, তাছাড়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, নেপাল, কাবুল, কান্দাহার, জাপান, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, সাইবেরিয়া, খোটান, পূর্ব তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে বুদ্ধদেব ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বহুলোককে দীক্ষা দেন। কুশীনগরে তিনি নির্বাণলাভ করেন। সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। এই তিথিটি বুদ্ধের জীবনের একটি বিশেষ তিথি। কারণ এই তিথিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এই তিথিতেই তিনি সম্বোধি লাভ করেন, আবার এই তিথিতেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

বুদ্ধের গল্প

ভিক্ষু জ্ঞানানন্দ

শ্রাবস্তীতে সুদত্ত নামে বুদ্ধের একজন বণিক শিষ্য ছিল। তিনি বছরের বেশির ভাগ সময় বাণিজ্য করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। এক সময় রাজগৃহ নগরে বুদ্ধের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নিজের দেশে নিয়ে যাবার সংকল্প করেন।

বুদ্ধ সুদত্ত বণিকের আমন্ত্রণ প্রসন্ন হৃদয়ে গ্রহণ করে শ্রাবস্তীতে যাবার একটা নির্দিষ্ট দিন তাঁকে জানিয়ে দিলেন। সুদত্ত বণিক পণ্য বিক্রয় শেষ করে দেশে ফিরে এলেন, আর দেশময় ঘুরে বুদ্ধের আগমন সংবাদ প্রচার করে দিলেন।

জেতবন মহাবিহারে বুদ্ধ

বুদ্ধ আসবেন তার জন্য একটা ভাল থাকবার ব্যবস্থা করা চাই। তিনি আবার সাধারণ লোকের মত গৃহস্থের গৃহে বাস করেন না। সঙ্গে বহু শিষ্য সংঘও থাকে। সুতরাং একখানি সংঘারাম না হলেই নয়। সংঘারামটি আবার যেমন তেমন হলেও কেমন যেন বেমানান হয়। সুতরাং বৃহৎ একটি বিহার (মঠ) নির্মাণ করা ছাড়া উপায় নেই।

সুদত্ত বণিকের অর্থের অভাব ছিল না। সংঘারাম তৈরীর সকল ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দিলেন। কিন্তু মুশ্‌কিল হল স্থান-নির্বাচন নিয়ে। গ্রামের মধ্যে এমন কোন স্থান তিনি খুঁজে পেলেন না, সব দিক দিয়ে যা উপযুক্ত হবে। এই নিয়ে তাঁর মনে ভাবনার অন্ত নেই। গ্রামের আশেপাশে বহু জায়গা ঘুরে দেখলেন কিন্তু কোনটাই তাঁর মনঃপূত হল না।

সেই গ্রামে জেতকুমার নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর নিজের জিম্মায় সুবৃহৎ একখানি উদ্যান ছিল—গ্রামের মধ্যস্থলে। সংঘারাম নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত স্থানই বটে।

কিন্তু জেতকুমারের অর্থের অভাব ছিল না কোন দিক থেকেই সুতরাং উদ্যান বিক্রির কথা উঠতেই পারে না। এই উদ্যানে কালেভদ্রে তিনি বিলাস-ভ্রমণে বার হন।

সুদত্ত বণিক কিন্তু এই উদ্যান ক্রয় করে তাতে বিহার নির্মাণের কথা মনে মনে সংকল্প করে বসে আছেন। একদিন তিনি একথা নিয়ে জেতকুমারের কাছে এলেন এবং একথা সেকথার পর আসল কথা পাড়লেন।

সুদত্ত বণিকের একথা শুনে জেতকুমারের চক্ষু স্থির। এমন কথাও আবার লোকে বলে নাকি ?

জেতকুমার উদ্যান বিক্রির কথাতে কিছুতেই সম্মত হবেন না আর সুদত্ত বণিকও নাছোড়বান্দা। এক কথা বার বার শুনে শুনে শেষ পর্য্যন্ত তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। সুদত্ত বণিককে জব্দ করার জন্য তিনি বললেন, বেশ উদ্যান বিক্রিতে আমি সম্মত আছি, কত দাম দেবেন বলুন। কত মূল্য আপনি এর বিনিময়ে আশা করেন।

জেতকুমার বললেন, যত স্বর্ণ মুদ্রায় উদ্যান মুণ্ডন করা যায় তত মুদ্রাই এর মুল্য।

কথা যখন দিয়েছেন আর ফেরাবার উপায় নেই। সুদত্ত বণিক তাতেই রাজি হলেন। জেতকুমার কিন্তু এ কথাটা খুব যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সুদত্ত বণিক পরের দিন ভোরে সত্যি সত্যি স্বর্ণ মুদ্রায় উদ্যান মুণ্ডনের জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা সহ লোক প্রেরণ করলেন বাগানে। উদ্যান মুণ্ডনের কাজ সুরু হল।

খবরটা কানে কানে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল অতি অল্পকালের মধ্যে। সুদত্ত বণিকের মনে আনন্দের সীমা নেই। তিনি গাড়ি করে করে মুদ্রা প্রেরণের কাজে লেগে আছেন।

সংবাদটা এক সময় জেতকুমারের কানে গিয়ে উঠল। ব্যাপারটা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে তিনি নিজেকে খুবই অপরাধী মনে করলেন। খানিকটা অনুতপ্তও হলেন। উদ্যান মুণ্ডন তখনো কিছুটা অবশিষ্ট আছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বাগানে ছুটে এলেন। সুদত্ত বণিক তখন সেখানে দাঁড়িয়ে।

উদ্যানে প্রবেশ করেই জেতকুমার বললেন, আপনারা মুদ্রা ছড়াবেন না আর আমি এ উদ্যান বেচবো না। অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। জেতকুমারের একথা শুনে সুদত্ত বণিকের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

জেতকুমারকে পুনরায় তিনি বললেন, সামান্য তো আর বাকী মাত্র। আরো কিছু না হয় আপনাকে উপরি দেওয়া হবে, আপনি না করবেন না যেন।

জেতকুমার বললেন, উদ্যান আপনি ঠিকই পাবেন। সেজন্য আপনাকে কিছুই মূল্য দিতে হবে না। উদ্যানটি বুদ্ধের নামে আমি দান করলাম আপনি এই অর্থ দিয়ে বিহার নির্মাণ করুন।

সুদত্ত বণিক উদ্যানের মধ্যে মনোরম একখানি সংঘারাম তৈরী করলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে এলে তিনি তা দান করে দিলেন। জেতকুমারের উদ্যানে বিহার নির্মাণ করা হয়েছে বলে এর নামকরণ হল 'জেতবন মহাবিহার'।

অমৃতবাণী অমিতাভ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা পাদনখ কণা তাঁর"

বুদ্ধত্বলাভের পর মহাবাণী প্রচার করতে করতে চলেছেন প্রভু অমিতাভ। দলে দলে নরনারী তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হচ্ছে। এসে পোঁছালেন তিনি বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে। রাজা স্বয়ং তাঁর শরণ নিলেন—দিকে দিকে ধ্বনিত হতে লাগল : "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" রাজধানীর উপকণ্ঠে বিরাট উদ্যান বেণুবন রাজা দান করলেন মহামানবের উদ্দেশে। বুদ্ধদেব কয়েক বছর এই বেণুবনে বাস করে তাঁর অমৃত মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন জগতবাসীকে।

সেদিন উষার আলো সবে ধরণীর বক্ষে নেমে এসেছে। প্রভুবুদ্ধ মহাভিক্ষার পাত্র হাতে রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে দেখলেন এক যুবক দিক-বন্দনা করছেন। ঘুরে ঘুরে যুবকটি পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণমুখো হয়ে, তারপর উর্দ্ধ ও অধঃবদন হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। করুণাঘন মূর্ত্তি অমিতাভ এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হলেন। যুবকের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন আর তিনি করুণায় বিগলিত হলেন তার অজ্ঞতায়।

প্রশান্ত বদনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে যুবকের নিকটে গেলেন তিনি। ধরিত্রীর প্রতি প্রণাম সেরে যুবক চোখ মেলেই দেখতে পেলে সেই সৌম্য, শান্ত অমিত সুন্দর মূর্ত্তি। মানুষের দেহে এত সৌন্দর্য্য! নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না তার।

তাঁর বিস্ময়ের সীমা বহুগুণ বেড়ে গেল সেই দীপ্যমান পুরুষের করুণাপূর্ণ প্রশ্নে। যুবককে তিনি শুধালেন—"শীতের প্রভাতের এই নিষ্করুণ সময়ে সিক্তবস্ত্রে এতক্ষণ ধরে তুমি যে এই বন্দনা করছ তার কি কোন অর্থ জানো?"

উত্তর এল—"তা-তো জানিনা প্রভু। শুধু এইটুকু জানি মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে এই ধর্ম্মাচরণের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।"

মানুষের এই অজ্ঞতায় প্রভুর অন্তর করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয়, ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে সেই নিষ্ঠায় মানুষের জীবন শান্তির আধার হতে পারে। তাই তিনি যুবককে, আহ্বান করে বললেন—"যুবক, এই ছয় দিক বন্দনা অতি অর্থপূর্ণ। মানুষের জীবনে ছয় দিক হচ্ছে এইরূপ : (১) মাতাপিতা—পূব দিক,

(২) শিক্ষক—দক্ষিণ দিক (৩) পত্নীপুত্রাদি—পশ্চিম দিক, (৪) পাত্রমিত্রাদি—উত্তর দিক (৫) ভৃত্য ও সেবকাদি—অধঃ দিক, (৬) ধর্ম্মগুরু ও ব্রাহ্মণ—উর্দ্ধ দিক।

বুদ্ধের করুণাপূর্ণ বচনে যুবক আশ্বস্ত হল। এতদিন সে মনে মনে যে প্রশ্ন করেছে তার উত্তর দিতে এলেন কোন্ দেবতা। তার অন্তরের কথা টের পেয়ে অন্তর্য্যামী কি তাকে ছলনা করতে এলেন। সাহসে ভর করে সে বললে—"প্রভু, আমরা সংসারী লোক। ধর্ম্ম আচরণ করতে হয় বলে করে যাই, অর্থ তার কিছু বুঝিনা। কিন্তু মন আমার বহুদিন ধরে ব্যাকুল হয়ে আছে এর অর্থ জানবার জন্য। আজ আপনার করুণাপূর্ণ বচনে পিপাসিত চিত্ত আমার তৃপ্ত হয়েছে। ছয় দিকের যে অর্থ বললেন তা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। এঁদের পূজা কি ভাবে হবে?"

মধুর হাস্যে প্রভুবুদ্ধ বললেন—

(১) "পিতামাতার প্রতি সন্তান এইসব উপায়ে তার কর্ত্তব্য পালন করবে—তাদের অবলম্বন হবার চেষ্টা করে, তাদের করণীয় কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করে, বংশগত ঐতিহ্য রক্ষা করে।"

(২) শিক্ষকদের প্রতি ছাত্র পাঁচ উপায়ে তার কর্ত্তব্য পালন করবে—স্বীয় আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে, তাঁদের আজ্ঞা পালন করে শেখবার

গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে, ব্যক্তিগত ভাবে সেবা করে, শিক্ষাগ্রহণে গভীর অভিনিবেশ প্রয়োগ করে।

(৩) স্বামী পাঁচটি উপায়ে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবে—শ্রদ্ধা, সৌজন্য, বিশ্বস্ততা, কর্ত্তৃত্ব প্রদান ও আভরণ দিয়ে।

(৪) পাত্রমিত্রাদির প্রতি এই পাঁচ উপায়ে কর্ত্তব্য পালন করতে হবে—উদারতা, সৌজন্য, দাক্ষিণ্য, আত্মবৎ আচরণ ও কথামত কাজ করে।

(৫) ভৃত্য ও সেবকদের প্রতি এই পাঁচ উপায়ে কর্ত্তব্য পালন করতে হবে—সাধ্যায়ত্ত কাজ দিয়ে, পরিমিত খাদ্য ও পারিশ্রমিক দিয়ে, অসুস্থ অবস্থায় পরিচর্য্যা করে, সুখাদ্যে সম-অংশ দিয়ে ও প্রয়োজন মত ছুটি দিয়ে।

(৬) গুরু, দ্বিজ ও সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি এইভাবে কর্ত্তব্য পালন করতে হবে—কায়মনোবাক্যে ভক্তিমান হয়ে, তাঁদের জন্য গৃহদ্বার সদা উন্মুক্ত রেখে, তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে প্রভু বুদ্ধ সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়েছেন তা আজও অম্লান হয়ে আছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আয়োজন করছে। আমরা সাধারণ মানুষ, আয়োজনও আমাদের সামান্য। সদা বিনীতভাবে তাঁর নির্দ্দেশগুলি পালন করে যেন আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি।
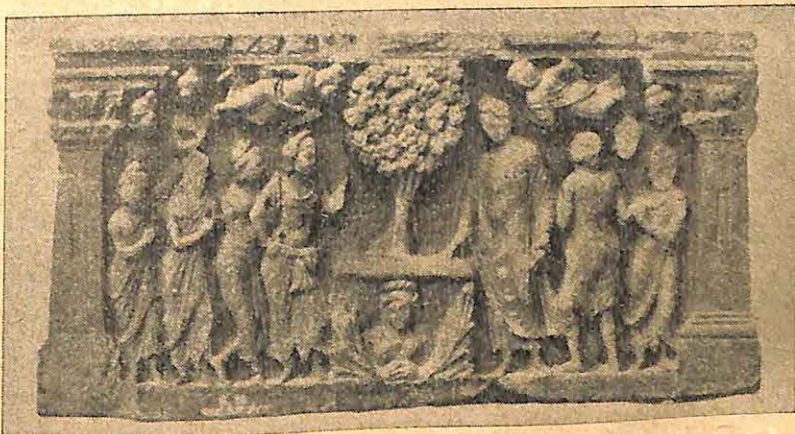
মহাজ্ঞানলাভের প্রতিজ্ঞা নিয়ে গৌতম বোধিবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

দুর্গাদাস সরকার

'সাধনা'য় তুমি শোক ব্যাধি জরা
মৃত্যু করেছো জয়,
জেনেছো চরম লক্ষ্যই 'অদ্বয়'।
অপরূপ তুমি জানালে তবুতো
কাজ নেই 'নির্বাণে'
একক তোমার 'বিজ্ঞান'বিদ্ প্রাণে।

জীবনে কেবল লাভ করা নয়
স্ব-কারণে 'শূন্যতা,'
করুণাও দেবে 'আনন্দ'-সফলতা।

আমরাও চাই সাম্য ও সুখ
আমরা শান্তিকামী,
তাই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

নেপালের বৌদ্ধতীর্থ

নেপালের বুদ্ধমূর্ত্তি

নেপালের বৌদ্ধস্তূপ

ফটো : শ্রীঅজিতকুমার শ্রীমানি

পঞ্চশীল

১। আমি জীবহিংসা থেকে বিরত থাকবো।

২। যা আমাকে কেউ দেয় নি এমন জিনিষ গ্রহণ আমি করব না অর্থাৎ আমি কখনও চুরি করবো না।

৩। অন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা থেকে আমি বিরত থাকবো।

৪। অসত্য ভাষণে আমি বিরত থাকবো।

৫। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার আমি করবো না।

প্রত্যেক সৎবৌদ্ধ এই পঞ্চশীলের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে থাকেন।

সুভাষিতাবলী

(ধম্মপদ হইতে)

যিনি অস্থিরমতি, সৎ ধর্ম্ম যিনি জানেন না, হৃদয় যাঁহার প্রসাদহীন—তাহার প্রজ্ঞা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না।

* * * * *

ধীর ব্যক্তি যাঁহারা কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত তাঁহারাই যথার্থ সুসংযত।

* * * * *

দূষিত মনে যদি কেহ কিছু বলে বা করে তাহা হইলে চক্র যেমন বাহক জন্তুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে—দুঃখও সেইরূপ তাহাকে অনুবর্ত্তন করে।

* * * * *

দূরগামী, একাচারী অশরীরী এবং গুহাশায়ী এ হেন চিত্তকে যাহারা সংযত করেন তাঁহারা পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হ'ন।

* * * * *

আসক্তির মত অগ্নি নাই, দ্বেষের মত হিংস্র গ্রহ বা ত্রাসকারী জন্তু নাই, মোহের মত জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই।

* * * * *

তৃষ্ণা হইতে শোক জন্মে, তৃষ্ণা হইতে ভয় আসে। যিনি তৃষ্ণা হইতে মুক্ত তাঁহার শোক থাকে না। ভয় কোথা হইতে আসিবে।

* * * * *

শরীরের নশ্বর মলিনতা—এই অশুভ যিনি অনুভব করেন, যাঁর ইন্দ্রিয় সুসংযত—যিনি মিতাহারী, শ্রদ্ধাবান এবং উদ্যোগশীল পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

চিত্র-পরিচয়

১। মলাটের চিত্রখানা জাপানের বিখ্যাত সঙ্গেৎস্বুদো বৌদ্ধ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিলিপি। মূর্ত্তিটি বিরাট এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত। ইনি সেখানে বোধিসত্ত্ব বা বোন্‌তেন নামে পরিচিত।

২। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পঞ্চশিষ্যসহ বুদ্ধদেবের চিত্রটি বিখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তীর আঁকা। গয়ার নিকটস্থ বোধিবৃক্ষের নীচে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করবার পর গৌতম চললেন মৃগদাবের দিকে। এই মৃগদাবই বর্ত্তমান সারনাথ। পথে চলতে চলতে তিনি পাঁচজন শিষ্যলাভ করেন। এদের নাম কোণ্ডাঞ্য, ভাদদীয়, তপ্প, মহানাম এবং অস্‌সাজি। এঁরাই বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য। এঁদের কাছেই তিনি প্রথম তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করেন।

৩। আমরা যে সব ছবি লেখার সঙ্গে ব্যবহার করেছি সেগুলো প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ এবং মন্দিরগাত্রে অবস্থিত প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তি থেকে নেওয়া। বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ লাভের পর এদেশের শিল্পী ও ভাস্করেরা অপূর্ব্ব দক্ষতায় বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী রূপায়িত করে তুলেছিলেন। এসব প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তির অধিকাংশই তোমরা কলকাতা যাদুঘরে দেখতে পাবে। এগুলো থেকে বুঝতে পারবে যে বৌদ্ধ যুগে ভাস্কর্য্য কত উন্নতিলাভ করেছিলো। ৮৮ পৃষ্ঠার ছবিটি একটি প্রাচীন পটে আঁকা ছবি থেকে নেওয়া।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ লাভ

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।
সমগ্র বিশ্বচরাচর সুখী হউক।

ধৈর্যের পরীক্ষা

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

—এক—

পশ্চিম ইটালিতে সালুজ্জো নামে একটি দেশ আছে।

এক সময়ে সেখানকার জমিদার ছিলেন মার্কুইস্ ওয়াল্টার।

ওয়াল্টার তরুণ যুবক। যেমন সুন্দর তাঁর চেহারা, তেমনি গায়ে জোর। তাঁর স্বভাব-চরিত্রও এতো ভাল যে প্রজারা সবাই তাঁকে ভালবাসে—ভক্তি করে।

শুধু একটা ব্যাপারে প্রজাদের মন দিনরাত খুঁত খুঁত করে। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে তারা আতংকিত হয়।

ওয়াল্টারের বিয়ের বয়স হয়েছে অথচ তিনি এখনো বিয়ে করেন নি। এতেই প্রজাদের যত অস্বস্তি। তারা ভাবে, নিঃসন্তান অবস্থায় যদি মার্কুইসের মৃত্যু হয়, তাহলে জমিদারী চলে যাবে অন্য লোকের হাতে। কে জানে কেমন লোক হবেন তিনি? ওয়াল্টারের আমলের মতো এমন সুখে কি তখন তারা থাকতে পারবে?

অনেক ভেবে-চিন্তে প্রজারা স্থির করল, সদলবলে তারা মার্কুইসের সংগে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব তুলবে। যেমন করেই হোক, তাঁকে বিয়েতে রাজী করাতেই হবে।

প্রজাদের একান্ত অনুরোধ ওয়াল্টার ঠেলতে পারলেন না। বিয়েতে তিনি সম্মতি দিলেন! বললেন, বিয়ে করে ঝামেলা বাড়াবার ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে তোমাদের যখন একান্ত ইচ্ছে আমি বিয়ে করি, তবে তাই হোক। কিন্তু একটি কথা। আমি যাকে পছন্দ করে বিয়ে করে আনব—তা সে যেই হোক আর যেমনি হোক—তাকেই কিন্তু তোমাদের রাণীর সম্মান দিয়ে গ্রহণ করতে হবে।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! বলে প্রজারা একবাক্যে মাথা নাড়ল।

ওয়াল্টার তখন পাত্র-মিত্র-সভাসদ, দাসদাসী সবাইকে বলে দিলেন, শীঘ্রই আমি বিয়ে করছি। তোমরা তার আয়োজন কর।

ধুম পড়ে গেল বিয়ের আয়োজনের। ঘর-বাড়ি সাজানো হল। পোষাক-পরিচ্ছদ গয়না-গাটি তৈরি হল। বাদ্যি-বাজনা বায়না করা হল।

কিন্তু কোথায় কি? বিয়ের কনে দেখার নামটি পর্যন্ত নেই। এ আবার কেমন খেয়াল মার্কুইসের?

মার্কুইসের রাজপ্রাসাদ থেকে খানিকটা দূরে এক গাঁয়ে বাস করত এক গরীব বৃদ্ধ। তার নাম জানিকোলা। সেই জানিকোলার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। তার নাম গ্রিসেল্ডা। যেমন রূপে, তেমনি গুণে, সে-তল্লাটে গ্রিসেল্ডার চেয়ে ভাল মেয়ে আর কেউ ছিল না। সংসারের সব কাজ সে একা করত। তার উপর বুড়ো বাপের দেখাশুনা, চরকায় সুতো কাটা, মাঠে মাঠে মেষ চড়ানো—সব কাজ করেও সব সময়েই তার মুখে লাগত হাসির আলো। যেন মুক্তো ঝরে পড়ছে।

শিকারে যাওয়া-আসার পথে মার্কুইস অনেকদিন দেখেছেন গ্রিসেল্ডাকে। বড় ভাল লেগেছে তাঁর মেয়েটিকে। তাই তিনি স্থির করলেন, বিয়ে যদি করতেই হয় তো গ্রিসেল্ডাকে।

ক্রমে বিয়ের দিন এসে পড়ল। কিন্তু কনের দেখা নেই। বাড়ি-ভরা বিয়ের হৈ-চৈ। কিন্তু কনে কোথায় কেউ জানে না। সবাই হতভম্ব!

এমন সময় ওয়াল্টার আদেশ দিলেন, জোলুস সাজাও, কনে আনতে যাব।

বিয়ের পোষাক পরে, বাদ্যি বাজিয়ে, লোক-লস্কর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে ওয়াল্টার স্বয়ং চললেন জোলুসের আগে আগে।

তল্লাট জুড়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। কি চাও? মার্কুইস্ চলেছেন পাত্রী পছন্দ করে আনতে। রাস্তার দুপাশে ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই ধর্ণা দিয়ে দাঁড়াল, নতুন রাণীকে দেখবে বলে।

সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে গ্রিসেল্ডাও দাঁড়াল তাদের কুড়ে ঘরের এক পাশে।

কিন্তু—এ কী ব্যাপার! ওয়াল্টার যে তাঁদেরি ভাঙা ঘরের আঙিনায় এসে উঠলেন! তাকেই তিনি নাম ধরে ডেকে বললেন, গ্রিসেল্ডা, তোমার বাবা কোথায়?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গ্রিসেল্ডা বলল, হুজুর, বাবা ভিতরে আছেন। আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

এক দৌড়ে সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। ফিরে এল বুড়ো বাবার হাত ধরে।

তাকে দেখেই ওয়াল্টার সসম্মানে বলল, জানিকোলা, আমার মনের বাসনা আর আমি লুকিয়ে রাখব না। আমি আপনার মেয়েকেই বিয়ে করতে চাই। আশা করি, আমাকে জামাতা হিসাবে পেতে আপনার কোন আপত্তি হবে না?

আপত্তি? এ যে হাতে চাঁদ পাওয়া।

বিস্ময়ে জানিকোলার মুখ দিয়ে কথাই ফুটল না প্রথমে। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, হুজুরের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা!

মার্কুইস তখন গ্রিসেল্ডার দিকে তাকিয়ে বললেন, গ্রিসেল্ডা, আমার মনের কথা শুনলে? এখন বল, তোমার এ বিয়েতে মত আছে তো? আমাকে ভালবাসতে, সব ব্যাপারে আমার কথা মত চলতে

পারবে তো? কখনো কোন অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ করবে না? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না। বরং আমি যখন যা বলব হাসিমুখে তা পালন করবে?

গ্রিসেল্ডার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। কাঁপা গলায় সে বলল, হুজুর, গরীবের মেয়ে আমি, সব দিক থেকেই আপনার অনুপযুক্ত। তবু যদি আপনি দয়া করে আমাকে বিয়ে করেন, তাহলে আমি সব সময়েই আপনার কথা মত চলব। প্রাণ গেলেও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করব না।

মার্কুইস্ তখন তার লোকজনদের ডেকে বললেন, শোন তোমরা, এই আমার স্ত্রী। আজ থেকে তোমরা আমাকে যে সম্মান কর সেই সম্মান একেও করবে।

তারপর গ্রিসেল্ডাকে রাণীর বেশে সাজিয়ে রথ-চৌদলে বসিয়ে বাদ্যি-বাজনা বাজিয়ে মার্কুইস্ তাকে নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন।

প্রাসাদে হাসি-খুসি আমোদ-আহ্লাদের ধুম পড়ে গেল।

—দুই—

কেটে গেল একটি বছর।

গ্রিসেল্ডার একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে হল।

রাজ্যের সবাই আবার নতুন করে আনন্দে মেতে উঠল।

এই আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ একদিন মার্কুইসের মনে হল, তাই তো, গ্রিসেল্ডা আমার

কতখানি অনুগত তার কোন প্রমাণ তো আজো নেওয়া হয় নি। এবার তাকে আমি একটু পরখ করে দেখব।

মনে মনে মতলব ঠিক করে একদিন তিনি মনমরা ভাবে গ্রিসেল্ডাকে বললেন, দেখো, তুমি আমার প্রিয় হতেও প্রিয়। কিন্তু তুমি গরীবের ঘরের মেয়ে বলে আমার প্রজারা তোমাকে কিছুতেই ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। বিশেষ করে তোমার ছেলে না হয়ে একটি মেয়ে হওয়ায় তারা বড়ই গোলমাল সুরু করেছে। কাজেই তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তোমার এই মেয়েকে এ বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে।

বেচারি গ্রিসেল্ডা! কি কঠিন পরীক্ষা তার সামনে!

অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সে বলল, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

মার্কুইসের নির্দেশ মত তার একজন অনুচর গ্রিসেল্ডার কাছে তার মেয়েটিকে চাইল।

গ্রিসেল্ডা মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, বিদায় বাছা, বিদায়! এ জীবনে তোর চাঁদ মুখখানি আর আমি দেখতে পাব না! এই নাও আমার মেয়ে। কিন্তু দোহাই তোমার, মৃত্যুর পরে একে এমন ভাবে কবর দিও যাতে পশু-পাখি এর দেহের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

মেয়েকে নিয়ে অনুচর মার্কুইসের কাছে এল।

মার্কুইস বললেন, একে নিয়ে এখুনি বোলোনায় আমার বোনের কাছে চলে যাও। সেখানে তাকে বলবে, যথাযোগ্য স্নেহ-যত্নে সে যেন এই মেয়েকে মানুষ করে। আর এ যে আমার মেয়ে সে কথা যেন গোপন রাখে।

অনুচর মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গ্রিসেল্ডার মনে এ নিয়ে মার্কুইসের বিরুদ্ধে এতটুকু ক্ষোভ দেখা গেল না। স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা পূর্বের মতই অটুট রইল।

—তিন—

আরো চার বছর কেটে গেল।

গ্রিসেল্ডার কোল আলো করে এবার এল একটি চাঁদের মত ছেলে।

রাজ্যজুড়ে আনন্দের বান বয়ে গেল।

ছেলেটির বয়স যখন দু'বছর হল, তখন মার্কুইস আবার স্ত্রীর ধৈর্য ও আনুগত্য পরীক্ষা করতে চাইলেন।

আবার তার অনুচর এসে গ্রিসেল্ডার কাছ থেকে ছেলেটিকে নিয়ে বোলোনায় মার্কুইসের বোনের কাছে রেখে এল।

বেচারি গ্রিসেল্ডার বুক ফেটে গেল। তবু মুখে সে কোন প্রতিবাদ জানাল না। যত দিন যেতে লাগল তত সে স্বামীর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ও অনুগত হয়ে উঠল।

ক্রমে মার্কুইসের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রজারাও বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, গরীবের মেয়ের ছেলে-মেয়ে বলেই মার্কুইস গোপনে তাদের হত্যা করিয়েছেন।

মার্কুইস কিন্তু মনে মনে নতুন ফন্দী আঁটলেন।

গ্রিসেল্ডার মেয়ের বয়স তখন বারো বছর পূর্ণ হয়েছে।

সেই সময়ে তিনি গোপনে একজনকে রোমে পাঠালেন। পূর্ব নির্দেশমত সেখান থেকে সে চিঠি লিখে জানাল, গ্রিসেল্ডাকে পরিত্যাগ করে একটি ধনী-কন্যাকে বিয়ে করবার যে অনুমতি মার্কুইস চেয়েছেন, মহামান্য পোপ তা মঞ্জুর করেছেন।

যথাসময়ে সে চিঠি তিনি গ্রিসেল্ডাকে দেখালেন। গ্রিসেল্ডা মর্মাহত হল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

ওয়াল্টার তখন বোলোনায় ভগ্নিপতিকে চিঠি লিখলেন, ছেলেমেয়ে দুটিকে খুব জাঁকজমক করে সালুজ্জোতে নিয়ে আসতে। আরো লিখলেন, তাদের পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়।

ভগ্নিপতি যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে রওনা হলেন।

এদিকে মার্কুইস গ্রিসেল্ডার কাছে যেয়ে বললেন, তোমাকে নিয়ে পরম সুখেই আমার দিন কাটছিল। কিন্তু কি করব বল, প্রজারা কিছুতেই ছাড়ছে না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে আবার বিয়ে করতে হচ্ছে। মহামান্য পোপও অনুমতি দিয়েছেন, সে তুমি জান। এ অবস্থায় তোমার তো আর এ-বাড়িতে থাকা চলে না। তুমি তোমার বাবার কাছেই ফিরে যাও।

চোখের জলে গ্রিসেল্ডার বুক ভেসে গেল। তবু সে বলল, তাই হবে প্রভু!

গ্রিসেল্ডা তখন রাণীর পোষাক ছেড়ে ফেলে ময়লা কাপড় পরে খালি পায়ে খালি মাথায় হাঁটতে হাঁটতে বাপের বাড়ি চলল।

প্রজারা কাঁদতে কাঁদতে চলল তার সংগে।

—চার—

যথাসময়ে ভগ্নিপতি ছেলেমেয়ে দুটি ও দলবলসহ সালুজ্জার নিকটে এসে উপনীত হল।

খবর পেয়ে ওয়াল্টার গ্রিসেল্ডাকে তার বাপের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন নিজের প্রাসাদে। বললেন, বিয়ের কনে আসছে বাড়িতে। তাকে বরণ করতে হবে তো তোমাকেই। তা

ছাড়া, বিয়ের আয়োজন, ঘরদোর সাজানো, সব তো তোমাকেই করতে হবে। তাই তোমাকে এনেছি।

গ্রিসেল্ডা মুখ নিচু করে বলল, আপনার ইচ্ছামত কাজই হবে।

পরদিন দুপুর নাগাদ সবাই প্রাসাদে এসে পৌঁছল। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। গ্রিসেল্ডা নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর অতিথি-অভ্যাগত সবাই যখন ভোজের টেবিলে জড় হল, তখন ওয়াল্টার গ্রিসেল্ডাকে একান্তে ডেকে নিয়ে শুধালেন, মেয়ে কেমন দেখলে ?

গ্রিসেল্ডা বলল, পরমা সুন্দরী কন্যা। এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নি। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, এর প্রতি আপনি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করবেন না। গরীবের মেয়ে আমি যা সইতে পেরেছি, এ তা সইতে পারবে না।

গ্রিসেল্ডার মুখে এই কথা শুনে, তার অসীম ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে, ওয়াল্টার আর কোন কথা গোপন রাখতে পারলেন না। গ্রিসেল্ডাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, গ্রিসেল্ডা, গ্রিসেল্ডা, তোমার ধৈর্য ও মহত্ত্বের তুলনা হয় না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এতদিন আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। এই সুন্দরী কন্যা তোমারই মেয়ে। আর এই তোমার ছেলে। এতদিন বোলোনায় আমার বোনের কাছে এরা পরম যত্নে মানুষ হয়েছে। এবার তোমার ছেলেমেয়েকে তুমি কোলে তুলে নাও।

এই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দে গ্রিসেল্ডা অচৈতন্য হয়ে পড়ল। সবাই মিলে তাকে নিয়ে গেল তার সুসজ্জিত কক্ষে।

সেখানে তার জ্ঞান ফিরে এলে ছেলে ও মেয়েকে সে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ওয়াল্টারের দিকে চেয়ে বলল, আর আমি কোন কিছুকেই ভয় করি না। মৃত্যুকেও না। এবার যে তোমার ভালবাসা আমি জয় করেছি।

তারপর থেকে লর্ড ওয়াল্টার ও গ্রিসেল্ডা পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। বুড়ো জানিকোলা রাজপ্রাসাদে মেয়ের কাছেই বাস করতে লাগল।

কালক্রমে ইতালীর এক সম্ভ্রান্ত ঘরে তাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেও বড় হয়ে রাজ্যের শাসনভার হাতে নিল। বাপ-মা তার বিয়ে দিলেন পরমা সুন্দরী এক মেয়ের সংগে।

ছেলে কিন্তু বাবার মত তার স্ত্রীকে কখনো কোন কঠোর পরীক্ষায় ফেলে নি। *

---

* ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্ থেকে।

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর শ্রীপীযূষকান্তি চৌধুরী

(৯) কৃষক

আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা তোমরা সবাই দেখেছ। ওদের মত গরীব, নিঃসহায়, নির্য্যাতিত জাত আমাদের সমাজে আর নেই। অথচ ওরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের শতকরা আশী ভাগ। বাকী কুড়ি ভাগের মধ্যে আছে, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও বড়লোকের দল।

আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত গরীব, অশিক্ষিত, মূর্খ। এককথায় মানুষ হয়েও প্রায় পশুর মত। কাজেই আমরা কথায় কথায় বলি, ও লোকটা একেবারে "চাষা"। তার মানে হচ্ছে ভদ্রলোক হয়েও ও ভদ্রতা জানে না যেমন চাষারা জানে না।

এদেশে আসার পর থেকেই তাই একটা বিশেষ ইচ্ছা ছিল এদেশের কৃষকদের অবস্থা দেখার। এমনিতে দেখছি সবাই বেশ আরামে ও আনন্দে দিন কাটাচ্ছে কিন্তু যারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য ফলাচ্ছে তাদের অবস্থাটা কি? যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে চাষবাস যদি দেখতে চাও দক্ষিণে যেতে হবে, যেমন, ভার্জ্জিনিয়া অথবা আলবামা বা লুসিয়ানিয়া। যাই হোক, যদিও আমার দক্ষিণে যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি তবুও আমার নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সি ষ্টেটেই সহর থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে বড় বড় ক্ষেত খামারে সত্যিসত্যিই চাষবাস দেখার সুযোগ ঘটেছিল।

প্রথমেই দেখলাম বিরাট মাঠ তার এমাথা থেকে ও মাথা দেখা যায় না। আলের কোন বালাই নেই। আমাদের দেশের মত ছোট ছোট টুকরো মাঠ তার মধ্যে অসংখ্য আল বা সীমানা এদেশে তা নেই। তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ এই যে আল বা সীমানা আমাদের দেশের ক্ষেতকে টুকরো টুকরো করে কতটা চাষবাসের যোগ্য জমিকে বৃথাই নষ্ট করছে। আমার সঠিক সংখ্যা মনে নেই তবে কিছুদিন আগে কলকাতায় থাকতে কাগজে দেখেছিলাম যে হিসাব করে দেখা গেছে যে এত আল যদি না থাকত তবে আমরা আরও কমপক্ষে ১০ লক্ষ টন বেশী ফসল তৈরী করতে পারতাম। কাজেই ভেবে দেখ ছোট জমি দেশের কত সর্ব্বনাশ করছে।

এদেশের চাষবাস প্রায় সবই যন্ত্রের সাহায্যে। ট্রাক্টার, কলের লাঙ্গল, কলের নিড়ানো যন্ত্র সবই আছে দেখলাম। মুষ্টিমেয় লোক কি বিরাট বিরাট জমি চাষ করছে দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এদিকে পশুটানা লাঙ্গল একেবারেই দেখা গেল না তবে শুনলাম দক্ষিণে এখনও কোন কোন জায়গায় ঘোড়াটানা লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে যেখানে "ভাগীদার"

(Share Cropper) আছে। সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই ভাগীদাররা আবার সবাই নিগ্রো অর্থাৎ কিনা গরীব। বিরাট জমিদার তিনি এত জমি নিজে তদারক করতে পারেন না কাজেই সেগুলো নিগ্রোদের দিয়েছেন চাষের জন্য। ওরা ও থেকে বেশীর অংশটাই কর্ত্তাকে ফেরৎ দেয়। খুব কম সংখ্যক 'সাদা' লোকেরাই কিন্তু ভাগীদার। ওরা নিজে জমি না পেলে বড় বড় সহরে চলে আসে শ্রমিক হয়ে। জীবন যাত্রার মান কিছুতেই কমাতে রাজী নয়। তাই যখন কৃষকের বাড়ী দেখলাম মনে হ'ল কলকাতায় বড় সাহেবের বাড়ী। প্রত্যেকের সুন্দর বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ী, সামনে ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গন, কলিংবেল, ড্রয়িং রুম, সুন্দর বেডরুম, বর্ত্তমান যুগের রান্নাঘর, ইলেক্‌ট্রিকের উনুন, রেফ্রিজেরেটর, টেলিফোন, মোটরগাড়ী সবই আছে। দেখে ভাবলাম সার্থক দেশ। এই যদি চাষাদের অবস্থা হয় তবে দেশের উন্নতি হবে না কেন? কেউই গরীব নয়। সামান্য মাত্র জিনিষের দাম কমে গেলে Senateএর Congressএর ঘন ঘন বৈঠক হয়। প্রেসিডেণ্ট আইজেনওয়ার থেকে সেক্রেটারীকে পর্য্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়। আলুর বা তুলোর দাম কমল কেন? কমা চলবে না, তা হ'লে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'বে। সরকার রাজী হয়েছেন। Soil Bank সৃষ্টি হয়েছে। ওরা দেখবে যে কৃষকের পূরো ন্যায্য মজুরি যেন মারা না যায়। এ রকম কত বলব। এক কথায় সমাজের এক অংশকে অনাহারে রেখে, অশিক্ষিত রেখে অন্য অংশকে বিরাট সুবিধা দেওয়া চলবে না। সবাই সুখে থাকবে, সবাই আরাম করবে, দেশের প্রাচুর্য্যের অংশ পূরোমাত্রায় নেবে এই হ'ল মূলমন্ত্র। অবশ্য অবিচার যে নেই সেকথা আমি বলছি না। যেমন নিগ্রোরাই তো অনেক সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু নিগ্রোরা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আমেরিকান। দেশটা যে সাদাদের। কাজেই সব সাদা আমেরিকানের সমান সুখভোগ করা চাই। এদিকটাকে বাস্তবিকই ভাল বলতে হ'বে। প্রত্যেক চাষীর বাড়ীতে একটা বা দুইটা মোটরগাড়ী দেখে কি যে অবাক হয়েছিলাম, কি বলব। মনে হ'ল ওরা যেন নিউইয়র্কের লোকদের চেয়েও বেশী সুখে থাক্‌তে চায়, কেননা ওরা যে খাদ্য ফলাচ্ছে। ওদের কত জোর। কত Senator ও Congressman ওরা পাঠাচ্ছে ওদের স্বার্থ দেখার জন্য। ওদের মনের কিন্তু তেমন পরিবর্ত্তন হয় নি। অধিকাংশই খুব প্রাচীনপন্থী। সাদাদের প্রাধান্য এখনও তেমন জোরের সঙ্গে আগের মতই বজায় রাখতে চায়।

যন্ত্রের সাহায্যে এবং নতুন নতুন সারের অদ্ভুত উৎপাদন ক্ষমতার ফলে এদেশে এত খাদ্য হচ্ছে যে লোকে খেয়েও শেষ করতে পারে না। আমাদের দেশে তোমরা জান আমরা ভাত বা রুটি খাই। ভাতের সঙ্গে ডাল, ঝোল বা তরকারী মেখে খাই। মাছের একটা টুকরো থাকে, কদাচিৎ এক আধদিন মাংস। যেদিন বাড়ীতে মাংস রান্না হল সেদিন তো উৎসব। ছেলেমেয়েরা কি খুসী, আজ মা মাংস রাঁধছেন। এ দেশের মায়েরা দু বেলা ছেলেমেয়েদের মাংস, দুধ, ফল, চকলেট, আইস্‌ক্রীম এত খাওয়াচ্ছেন যে বাচ্চারা বড়ই মোটা হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের অধিকাংশ লোকই মোটা, কি ছেলে কি মেয়ে। যে কোন জায়গাতেই খেতে গেলে খাবারের মধ্যে ৫০ ভাগ প্রোটিন

৫০ ভাগ ষ্টার্চ্চ। কাজেই স্বাস্থ্য ভাল না হ'য়ে উপায় কি? তাছাড়া বুড়ো, জোয়ান সবাই কত দুধ খাচ্ছে। এত খেয়েও ১৬½ কোটি লোকের দেশে যা খাদ্য হচ্ছে তা থেকে আমেরিকার সরকার পৃথিবীর সর্ব্বত্র গম, দুধ, চাল, মাংস, পনির, সব পাঠাচ্ছেন কিছুটা দান খয়রাত বাকীটা ব্যবসা। তামাক তো ভার্জ্জিনিয়ার একচেটে। এত ভাল তামাক পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। তারপর তুলো। এ দেশে এত তুলো জমা হয়েছে যে বাজারে ছাড়লেই পৃথিবীর অন্যান্য তুলোর দেশ, যেমন মিশর, সেখানে বিপর্য্যয় আসবে। এই সব অভাবনীয় উন্নতির মূলেই হল বিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন। আগে যেখানে এক টন ফসল হ'ত এখন হচ্ছে পাঁচ ছ' টন। আগে যে খামারে লোক লাগত পাঁচশ এখন লাগে পঞ্চাশ। রাশিয়ানরা পর্য্যন্ত এ দেশের ক্ষেতখামারে চাষবাসের প্রণালী দেখে তারিফ করে গেছে আর কিছু কিছু অভিজ্ঞতা নিজের দেশে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে।

দেশকে উন্নত করতে গেলে চাই বিজ্ঞানের চর্চ্চা—ফলিত রসায়নের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। তার উপরে চাই দেশের জন্য দরদ। দেশের এক অংশের লোককে বঞ্চিত করে অন্য অংশকে প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। এই শিক্ষা যদি আমরা আমেরিকা থেকে নিতে পারি আমাদের দেশের উন্নতি হ'তে বাধ্য।

গ্রীষ্মে

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

কা-কা-খা-খা কাকগুলো ডাক্‌ছে,
আল্‌তা-হলুদ-রঙে কাঁচা আম পাক্‌ছে।
কাঠ ফাটা রোদ্দুরে মাঠ ঘাট ফাট্‌ছে,
পথিকেরা গরমিতে পথে নাহি হাঁট্‌ছে।
থম্ থম্ চারিদিক্ খাঁ খাঁ কর্‌ছে,
ঘুঘু আর ঝিঁ-ঝি পোকা গান গেয়ে মর্‌ছে!

জল চায় ছেলেগুলো—খালি ঘটি ঠুক্‌ছে,
জিভ বের করে সব, কুকুরেরা ধুঁক্‌ছে!
ঘূর্ণির পাকে পাকে শুধু বায়ু ঘুর্‌ছে,
বন্ বন্ করে যত ধূলি পাতা উড়ছে।
কুচকুচে মেঘ জমে ঈশানের আকাশে,
কড় কড় চপলার ধ্বনি ভাসে বাতাসে!

মোটা মোটা ফোঁটা হয়ে, নেমে পড়ে বৃষ্টি,
শিলা পড়ে ঠক্ ঠক্ তছনছ সৃষ্টি!

* * *

থেমে গেল তাণ্ডব নেমে এলো শান্তি,
ধুয়ে মুছে গেল সব আবিলতা ভ্রান্তি!

কায়াহীন ছায়া

শ্রীমণিলাল অধিকারী

—এক—

নিঃশব্দ নিরালা দুপুর। সহর থেকে দূরে,—গ্রামের শেষ প্রান্তে জমিদার বন্ধুর কাছারী বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।

বিশাল কাছারি বাড়িটা এককালে জনসমাগমে কোলাহলমুখর হয়ে উঠত। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। জমিদার আর জমিদারের কাছারি ধ্বংসের মুখে। গ্রামের শেষে নির্জন প্রান্তরে অতীতের স্মৃতি হয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বাড়িটা।

এমনি একটা নিরিবিলি পরিবেশই খুঁজছিলাম আমি। জমিদার বন্ধুর কৃপায় পেয়ে গেলাম। এই নির্জন প্রান্তরে কেউ আর আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। স্বচ্ছন্দে বসে বসে একটার পর একটা গল্প লিখতে পারব।

অতবড় বাড়িটার বাসিন্দা বলতে মাত্র দু'জন—গোমস্তা নিশিকান্তবাবু আর পাইক মথুরা। অনেকদিন পরে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আমি বাস করতে এসেছি কাছারি বাড়িতে।

ঘুঘু ডাকা শান্ত দুপুর। বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে সূর্যদেব আগুন জ্বেলেছেন যেন। আর ঘরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বসে আমি গল্প লেখা সুরু করেছি।

বন্ধদ্বারে মৃদু শব্দ হল।

জিজ্ঞাসা করলাম. 'কে?'

'আমি নিশিকান্ত।'

'আসুন নিশিকান্তবাবু—ভিতরে আসুন।'

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন নিশিকান্তবাবু।

গোমস্তা নিশিকান্ত আমার সমবয়সী। শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম যুবক। পেশীবহুল লম্বা চওড়া শক্তিমান দেহ। চোখের দৃষ্টি দুর্দম···দুঃসাহসিক।

ঘরে ঢুকে নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখছেন—গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'ভূতের গল্প নিশ্চয়ই? আপনার লেখা অনেকগুলো ভূতের গল্প আমি পড়েছি। বেশ লেখেন কিন্তু—চমৎকার।' প্রশংসামুখর হয়ে উঠল নিশিকান্ত।

'খুসী হলুম শুনে।' মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থেকে নিশিকান্ত বলল, 'আপনার লেখার সময় বিরক্ত করতে আসা হয়ত আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ভাল একটা ভূতের গল্প লেখার উপকরণ আমার হাতে আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়—শোনাতে পারি সে কাহিনী। সত্যিকার ভূতের কাহিনী।'

'সত্যিকারের ভূত?' সোজা তাকাই নিশিকান্তের দিকে।

'হ্যাঁ তাই। সাজান ভূত নয়···ঠিক যেমনটি আপনি আপনার গল্পে লেখেন।'

'ওঃ···তাই নাকি?' ব্যঙ্গোক্তি করি।

দৃঢ়কণ্ঠে নিশিকান্ত বলল, 'হ্যাঁ। সত্যিকারের ভূত। জীবন্ত ভূত।'

লেখা কাগজগুলো একপাশে গুছিয়ে রেখে বললাম, 'বলুন শুনি!'

—দুই—

'ঘটনাটা আকস্মিক ভাবে ঘটে আমার জীবনে।' নিশিকান্ত তার কাহিনী সুরু করল, 'সেকালের জমিদারদের কীর্তি কাহিনী হয়ত আপনার কিছু কিছু জানা আছে। প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন স্বয়ং জমিদাররা। শাসন আর শোষণ দুই চালাতেন তারা। প্রায় প্রত্যেক জমিদারের কাছারি বাড়ির মাটির তলায় একটা করে কয়েদঘর থাকত, ভূগর্ভের কয়েদখানাগুলোকে বলা হত ঠাণ্ডা ঘর। দুর্দান্ত প্রজাদের দুরস্ত করা হত এইসব ঠাণ্ডাঘরে সারাজীবন আটকে রেখে। কত দুরন্ত প্রজা যে এই ভাবে এই সব ঠাণ্ডাঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে প্রাণ দিত, তার ঠিক নেই।

এমনি একটা ঠাণ্ডাঘর আছে আমাদের এই কাছারি বাড়ির মাটির তলায়।

মথুর এ বাড়ির পুরান পাইক। সে-ই একদিন আমাকে মাটির তলার ঠাণ্ডাঘর দেখিয়ে আনে। গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কিছু দূর গেলে একটা চওড়া বারান্দা পাওয়া যায় আর সেই বারান্দার শেষে ঠাণ্ডাঘরের লোহার দরজা।

মথুর বলে,—রাতে কখনও এ পথে পা বাড়াবেন না বাবু—রাতে তেনারা ঘোরাফেরা করেন এখানে।

প্রশ্ন করেছিলাম মথুরকে,—তোমার তেনারা কে মথুর?

ভয় আর শ্রদ্ধায় মথুরের মুখের ভাব এমন হয়ে উঠেছিল সেদিন—যা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। আস্তে আস্তে মথুর উত্তর দিয়েছিল,—তেনারা কে বুঝতে পারলেন না বাবু? ঐ অন্ধকার ঠাণ্ডাঘরে যারা তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছে—তাদের প্রেতাত্মারা।

মথুরের কথার সেদিন কোন মূল্য দিইনি। হেসেছিলাম শুধু একটু।'

—তিন—

'ছোট বয়েস থেকেই আমি দুর্দান্ত আর দুঃসাহসী।' একটু থেমে নিশিকান্ত আবার তার কাহিনী সুরু করল, 'মথুরের কথা কতদূর সত্য সেটা পরখ করে দেখার প্রবল ইচ্ছা হল আমার। প্রায় প্রতি রাতে গুপ্ত ঠাণ্ডাঘর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত আমাকে। কে যেন আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলত—এস, দেখ, বিশ্বাস কর। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে।

অবশেষে প্রস্তুত হয়ে একদিন রাতে ঠাণ্ডাঘরের সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলাম।

অতীতের কোন এক ফেলে আসা নিশীথে সুড়ঙ্গের দেয়ালে একটার পর একটা মশাল জ্বলত, আলোকিত করত গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ। আজ সেখানে জ্বালিয়ে দিলাম একটার পর একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। অবশেষে আলো আঁধারের আবছা অন্ধকারে ঠাণ্ডাঘরের সামনে প্রহরীদের বেঞ্চে বসে পড়লাম।

কতক্ষণ কাটল, কত রাত হল কে জানে? কিসের প্রতীক্ষা করছি—কি দেখব? সবই অনিশ্চিত, অলীক কল্পনা।' নিশিকান্ত চুপ করল হঠাৎ।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর কি হল? চুপ করলেন কেন—বলুন?'

নিশিকান্ত শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, 'তারপর যা ঘটেছিল, তা বললে হয়ত আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে এটুকু বলতে পারি আপনাকে—মথুর মিথ্যে কথা বলেনি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'অর্থাৎ—আপনি ভূত দেখেছেন?'

অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে নিশিকান্ত বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। একটা কিছু দেখেছি! কিন্তু সেটাকে ভূত বলা চলে কিনা জানিনে। আমি দেখেছি শুধু ছায়া। ঠিক জীবন্ত মানুষের ছায়ার মত। আপনি যদি যেতে চান তো আজ রাতেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। কিন্তু আপনার ভূতের ভয় নেই তো?'

মনে ভয় থাকলেও মুখে জোর করে হাসি টেনে আনি। বলি, 'কায়াহীন ছায়াকে ভয় পাবার মত কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

বুক ফুলিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়াল নিশিকান্ত। বলল, 'শক্তি আর সাহস থাকলে দুনিয়ার সব কিছুকে জয় করা সম্ভব। তুচ্ছ ছায়াকে ভয় করলে চলবে কেন?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ রাতেই তাহলে?'

'নিশ্চয়।' নিশিকান্ত উঠে দাঁড়াল, 'আজ রাতেই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। রাতে আহারের পর যাওয়া যাবে। আমি আলোর বন্দোবস্ত করিগে।' নিশিকান্ত বিদায় নিলে।

—চার—

সন্ধ্যার পর ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। লেখায় মন বসল না। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলো ভূতের গল্প লিখেছি। কিন্তু কোনটাই সত্যিকারের ভূতের কাহিনী নয়। সব কটা সাজান ভূতের গল্প। সত্যিকারের ভূত কোন দিন দেখিনি।

রাত দশটায় রাতের আহার শেষ হল।

নিজের ঘরে এসে জানালার ধারে ইজিচেয়ারটায় দেহ এলিয়ে দিলাম। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের মৃদু আলো ভৌতিক ছায়া বিস্তার করেছে যেন। আশপাশে কোথায় যেন একটা উড়ন্ত প্যাঁচা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। একদল শেয়াল ডেকে উঠল পরমুহূর্তে। মধ্য রাত্রির ঘোষণা।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—রাত বারটা। পরমুহূর্তে যে লোকটি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে ভীষণ চমকে উঠলাম। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি ?'

লোকটি হাসিতে ফেটে পড়ল একেবারে। বলল, 'ভয় পাবেন না—আমি নিশিকান্ত।'

আচমকা অমন করে ভয় দেখিয়েছে বলে নিশিকান্তের উপর রাগ হল।

কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ আপনার কি ধরণের রসিকতা নিশিকান্তবাবু ?'

'রসিকতা নয় ছদ্মবেশ', হাসতে লাগল নিশিকান্ত।

এবার অবাক হবার পালা আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছদ্মবেশ ?'

রহস্যময় হয়ে উঠল নিশিকান্তের চোখের মণিদুটো। বলল, 'ঠাণ্ডাঘরের প্রহরীর বেশ ধারণ করেছি। শুনেছি ঠাণ্ডাঘরের প্রহরীদের ভূতেরাও ভয় করে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম নিশিকান্তকে। সত্যি তাই। নিশিকান্ত পাইকের বেশ পরেছে। মাথায় পাগড়ী, গায়ে বেনিয়ান আর হাঁটুর ওপর আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। হাতে লাঠি আর পায়ে মোটা চামড়ার নাগরা।

নিশিকান্ত বলল, 'চলুন এবার সময় হয়েছে।'

নীরবে নিশিকান্তকে অনুসরণ করলাম।

লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল নিশিকান্ত। কয়েকখানা ঘর আর দালান পেরিয়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলাম। সুড়ঙ্গপথের দেয়ালে বেশ খানিকটা তফাতে তফাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলছিল। নিশিকান্ত পূর্বেই জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুড়ঙ্গপথের আলোগুলো। পথের শেষে বারান্দা আর বারান্দার শেষ প্রান্তে ঠাণ্ডাঘরের লোহার দরজা।

লোহার দরজার অপর প্রান্তে বেঞ্চের উপর বসে পড়লাম দু'জনে। হাতের লণ্ঠনটা নিবিয়ে

দিলে নিশিকান্ত। বলল, 'ভূতেরা আলো পছন্দ করে না। সুড়ঙ্গ পথের আলোগুলো ভূত দেখার পক্ষে যথেষ্ট আলো দিচ্ছে এখানে। চুপ করে বসে থাকুন—কথা বলবেন না।'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—রাত দু'টো। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। অল্প আলোয় তাকিয়ে রইলুম লোহার গরাদ দেওয়া ঠাণ্ডাঘরের দিকে। ঐ বন্ধদ্বারের অপর প্রান্তে কত অজানা রহস্যই না জমে আছে। কত প্রাণ না জানি জীবন্ত সমাধি লাভ করেছে ওখানে। আমার মনের গভীরে কেমন যেন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, হতভাগ্য বন্দীদের কেউ কেউ এখনও যেন ঠাণ্ডাঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে লুকিয়ে রয়েছে। কয়েকজোড়া জলন্ত চোখ যেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বেশ একটু জোরেই ঠেলা দিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল নিশিকান্ত। ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'তাকিয়ে দেখুন ভাল করে—সে এসে দাঁড়িয়েছে।'

অল্প আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, গরাদওয়ালা বন্ধ লোহার দরজার ওধারে খানিকটা তরল অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে উঠেছে, ক্রমশঃ রূপান্তরিত হচ্ছে নীলাভ ছায়ায়। কায়াহীন ছায়া যেন। উলঙ্গ মানুষের আকৃতির মত স্বচ্ছ নীলাভ ছায়ামূর্তি। স্পষ্ট দেখলাম···ছায়ামূর্তি নড়ছে।

ভয়ে আতঙ্কে সারা শরীর হিম হয়ে গেল আমার। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম বেঞ্চ থেকে। কিন্তু দুঃসাহসী নিশিকান্ত স্থির হয়ে বসে রইল। সহজ কণ্ঠে বলল, 'ভয় পাবেন না—বসুন। ছায়ামূর্তি এখুনি অদৃশ্য হয়ে যাবে আবার।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলাম সুড়ঙ্গ পথে। নিশিকান্তের কথায় ফিরে তাকালাম।

ছায়ামূর্তি তখনও অদৃশ্য হয়নি। পরমুহূর্তে ভয়ার্ত-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম···ছায়ামূর্তির আকৃতি আরও স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছে। ছায়াময় দেহের হাত পা, মুখ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। জলন্ত একজোড়া চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে।

কয়েক মুহূর্তে পরে লক্ষ্য করলাম, ঠাণ্ডাঘরের বন্ধ দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ামূর্তি, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নিশিকান্তের দিকে।

প্রাণ ভয়ে চীৎকার করতে গেলাম—কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। শুধু ছুটে চললাম সুড়ঙ্গপথ দিয়ে।

পরমুহূর্তে ভীষণ আতঙ্কপূর্ণ ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল নিশিকান্ত।

'ভূত!···ভূত! আমাকে স্পর্শ করেছে···বাঁচাও, বাঁচাও, উঃ···কি ঠাণ্ডা হাত···হাতের আঙুলগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা···আলো···আলো···'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম সুড়ঙ্গ পথের গুপ্তদ্বারের কাছে এসে। পিছু ফিরে দেখলুম···এক জোড়া নীলাভ স্বচ্ছ হাতের আঙুলগুলো নিশিকান্তের গলা টিপে ধরেছে। নিশিকান্তের চাপা কণ্ঠ থেকে তখন একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে···আলো···আলো···।

সঙ্গে ছিল শক্তিশালী টর্চ। চট্ করে টর্চটা জেলে ফেললাম। তীব্র আলোয় ভরে গেল সুড়ঙ্গ পথ। উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, আমার পেছনে মাত্র কয়েক হাত দূরে মুখ খুবড়ে পড়ে আছে নিশিকান্ত। অদৃশ্য হয়েছে ছায়ামূর্তি।

পরমুহূর্তে নিশিকান্তের জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিলাম কাঁধে, তারপর বেরিয়ে এলাম সুড়ঙ্গ পথ থেকে।

—পাঁচ—

'আপনাদের বাপমায়ের পুণ্যের ফলে এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।' আমার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে পাইক মথুরা বলল, 'তিরিশ বছর হল, রাতের বেলা সুড়ঙ্গ পথে কেউ প্রবেশ করেনি। গত তিরিশ বছর ধরে রাতে ওখানে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সুন্দরলালের অভিশপ্ত প্রেতাত্মা আজও ওখানে ঘুরে বেড়ায়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুন্দরলাল কে?'

মথুরা বলল, 'সুন্দরলাল ঠাণ্ডাঘরের শেষ কয়েদী। একটা চরের দখল নিয়ে সুন্দরলালের সঙ্গে আমাদের বুড়োকর্তার বিবাদ বাঁধে। সুন্দরলাল ছিল দুর্দান্ত ডাকাত। বুড়োকর্তা ওর দলের লোকেদের হাত করে ওকে গোপনে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে নিয়ে এসে ঠাণ্ডাঘরে আটকে রাখেন। ঘটনাটা ঘটে তিরিশ বছর

হ্যাচ্চো

[এক মিনিটের সিনেমা]

ফটো ঃ সতীশ কর

মন্টু আর অণু। ভাই আর বোন। যেমনি দু'জনের ভাব তেমনি আবার দু'জনের আঁড়ি। এই দেখলে, দু'জনে গলায় গলায় ভাব—কত হাসি, কত খেলা। আবার একটু পরেই ঝগড়াঝাটি-কান্নাকাটি, শুধু বাড়ীই নয়, একেবারে পাড়াশুদ্ধ মাত্। বাবা ছুটে আসেন, পড়শীরাও কখনও কখনও। তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিট্মাট করে দেন দু'জনকে। বাস্—আর কি! সাথে সাথেই দু'জনে হয়ে যায় ভাব। আবার চলে সেই হাসি আর খেলা।

মন্টু একটু শান্ত আর অণু একটু চঞ্চল। অণুই মন্টুর পেছনে লাগে বেশী। তবে তা বলে ভেবোনা যে মাঝে মাঝে মন্টু অণুর চুলের বিনুনীটা টেনে দিয়ে ছুটে পালায় না।

যাক ওসব কথা। যা বলবো, তাই শোন। একদিন মন্টু খেলাধূলো সেরে, সন্ধ্যেবেলা পড়ার ঘরে টেবিলে পড়তে বসেছে। টেবিলের ওপর হারিকেনটা জ্বল্ছে। সেদিন মন্টু বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই একটু পড়বার পরেই তার পেয়ে গেলো ঘুম। প্রথমে বার কয়েক হাই তুললে, তারপর সুরু হলো ঝিমুনী। মন্টু অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুমের

ভাবটা দূর করতে পারলে না। ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর মাথা রেখে মন্টু ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘরে আলো জ্বলছে। অথচ মন্টুর পড়ার আওয়াজ পাওয়া যায় না। অণু ধীরে ধীরে গিয়ে সেই ঘরে ঢুক্‌লো। ঘরে ঢুকে মন্টুর কাণ্ড দেখে তার মাথায় ভারী একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো। সাথে সাথেই সে ছুটে বাইরে চলে গেলো। এক টুক্‌রো কাগজ জোগাড় করে সেটাকে বেশ করে পাকিয়ে নিলো। তারপর চুপিচুপি গিয়ে সেই পাকানো কাগজটা ওর নাকের ভেতর ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে সুরু করলো।

আর যায় কোথায়! সাথে সাথেই সুরু হয়ে গেলো—

হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!

তারপর আবার, আবার, এমনি বহু-বার! সেখানে যেন সুরু হয়ে গেলো দারুণ ঝড়! আর এদিকে অণুত হেসেই কুটিপাটি!

তারপর আবার সেই ঝগড়াঝাটি, মারামারি, কান্নাকাটি আর বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড়!

মামার ফাঁকি
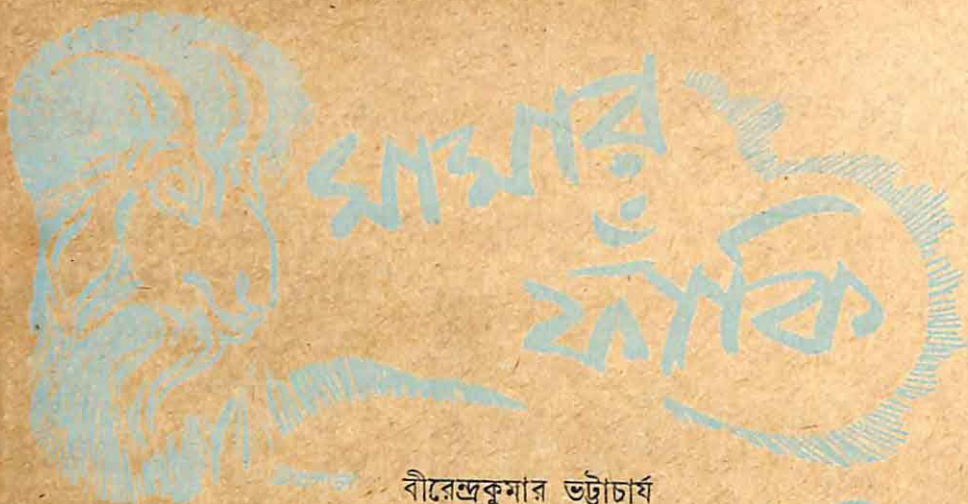
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সিংগির মামা ভোম্বলদাস—
বাঘ মেরে খায় দূর্বাঘাস।
ভাগ্নে দেখে' ব'ল্‌লে—"মামা,
দেখ্‌ছি একি কাণ্ডখানা!
সাম্‌নে রেখে গণ্ডা লাশ,
কাট্‌ছো দাঁতে চাট্টি ঘাস।"

মাতুল কহে—"হায় আনাড়ি!
বুঝ্‌বি কিসে—নেই যে দাড়ি।
মাংস খেয়ে পেটের দফা,—
তাইত চাখি দূর্বা তোফা।
দেখিস্‌নি কি—বাঘের মাসী
ভোজের পরে চিবোয় ঘাস-ই!"

১৩৬২ সনের বার্ষিক শিশুসাথী হইতে

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

৯। ম্যান্‌ড্রেক

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

নুরেমবুর্গ সহরের মিউজিয়ামে একটি ছবি আছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি লোক শিঙা বাজাচ্ছে, তার পায়ের কাছে আছে একটি কুকুর আর মাটি ভেদ করে উঠছেন জটাজুটধারী মুনি ঋষির মত একটি লোক, তার মাথার উপর ফুলপাতাসমেত একটি গাছ। আসলে জটাধারী মানুষের মত যে জিনিষটি দেখছ তা একটি গাছের শিকড়। এই গাছের নাম ম্যান্‌ড্রেক, বৈজ্ঞানিক নাম ম্যান্‌ড্রাগোরা। এই উদ্ভিদটিকে প্রাচীনকালের লোকেরা রক্তমাংসের তৈরী মানুষ বলে মনে করত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এর অনেক উল্লেখ আছে।

এই উদ্ভিদটি একটি ছোট ওষধি বিশেষ। এর আকার অনেকটা মুলার মত। এর মোটা শিকড় মাটির ভিতর থাকে আর মাটির উপর কতকগুলি পাতা ছত্রাকারে থাকে। গাছের ডালপালা থাকে না। এই যে মুলার মত শিকড় তা নীচের দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, আর মনে হয় যেন একটি মানুষের শরীর থেকে দুটি পা বেরিয়েছে। কখনও কখনও শিকড়ের উপর দিকে দুই পাশে দুইটি শাখা বের হয় এবং সে দুটিকে মানুষের হাতের মত দেখায়। ঐ যে মানুষের আকৃতির সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য এ হতেই সে যুগের লোকের ধারণা হয়েছিল যে এটা সাধারণ গাছ নয়, কোনও নৈসর্গিক প্রাণী এবং এই গাছ বা গাছের রূপধারী প্রাণী, বিশেষ যাদুশক্তি সম্পন্ন। বশীকরণের উদ্দেশ্যে

লোকে এই গাছ তাদের কাছে রাখত। এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য বা কাছে রাখার জন্য অনেক লোকের শাস্তি হওয়ার কথাও শুনা যায়।

এই রকম রক্তে মাংসে গড়া মানুষের মত যে গাছ, তাকে মাটি থেকে উপড়ে তুলতে হ'লে সে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করবে সেটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তখনকার লোক মনে করত যে মাটি থেকে তোলার সময় ম্যান্‌ড্রেক যন্ত্রণায় চীৎকার করে, আর যে লোক এই কাজ করত এই গাছ রাগে তার প্রাণ হরণ করত। মধ্য যুগের ইউরোপীয়দের মধ্যে ম্যান্‌ড্রেক সম্বন্ধে এই রকম কুসংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল। অনেক গ্রন্থে ম্যান্‌ড্রেক সংগ্রহকালে তার চীৎকার ও সংগ্রহকারীর বিপদ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং এই গাছ সংগ্রহ করতে হলে খুব সাবধান হতে হত। প্রথমতঃ যে লোক গাছ তুলবে তার একটি পোষা কুকুর থাকা চাই, সেই কুকুর নিয়ে সে গাছ তুলতে যাবে। গাছের চারপাশে এমন ভাবে মাটি খুঁড়তে হবে যাতে শিকড়গুলি কেটে বা ছিঁড়ে না যায়। শেষে সে একটি সরু দড়ি দিয়ে পোষা কুকুরটিকে গাছটির সঙ্গে বাঁধবে। তারপর কিছুদূরে গিয়ে কুকুরটিকে ডাকবে, তখন কুকুরটি যেই তার মনিবের কাছে যাবে তখন সেই দড়ির টানে গাছটি উৎপাটিত হয়ে আসবে। গাছটি মনে করবে কুকুরটাই তাকে স্থানভ্রষ্ট করেছে এবং তার কোপে পড়ে তখনই কুকুরটার জীবনান্ত হবে। এইভাবে একটি কুকুরের বিনিময়ে একটি ম্যান্‌ড্রেক গাছ সংগ্রহ করা হত, এই ছিল সাধারণ লোকের ধারণা।

এখন এই গাছের এই শক্তি সম্বন্ধে সে যুগের লোকের এই যে কুসংস্কার, তার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা দেখা যাক। ঔষধরূপে এই গাছের কিছু ব্যবহার আছে; এই গাছের রস জোলাপের কাজ করে, এর বমনকারক আর উত্তেজক গুণ আছে। এ ছাড়া এর আর একটি গুণ আছে। এই রস বেশী পরিমাণে সেবন করলে লোক অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং রোগীকে ক্লোরোফর্ম করলে যেমন অবস্থা হয়, সে রকম হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে চীনের একজন চিকিৎসক এইভাবে ম্যান্‌ড্রেকের ব্যবহার করতেন। সম্ভবতঃ অতীতে কোনও এক সময় কোনও লোক এই ম্যান্‌ড্রেকের মূল খাদ্যরূপে ব্যবহার করে মারা যায় বা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার ও গাছের শিকড়ের আকৃতি, দুই মিলিয়ে কল্পনার সাহায্যে মানুষ এই গাছকে রক্তমাংসে গড়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুত জীব বলে ধরে নিয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরাও কতকগুলি গাছকে তাদের উপকারিতার জন্য দেবতার আসনে বসিয়েছে, যেমন তুলসি, মনসা ইত্যাদি। কিন্তু কোনও গাছের প্রতিই এ দেশের লোকের এ প্রকার ভীতির কথা শোনা যায় নি।

সাগরদ্বীপের কেল্লা
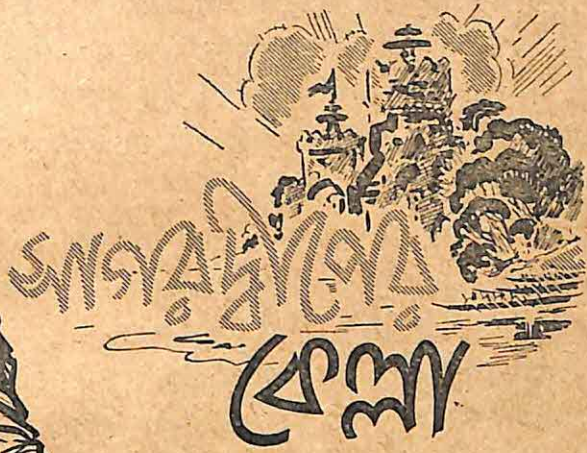
নির্ম্মল চৌধুরী

কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হতেই কয়েকজন সশস্ত্র লোক এসে তাঁদের ঘিরে ফেললে। তাদের পোষাক ও ভাষা থেকে কালীকিঙ্করের বুঝতে বাকি রইলো না যে তারা পর্তুগীজ।

তাদের মধ্যে একজন কালীকিঙ্করকে জিগ্যেস করলে, "তোমরা কে? কি উদ্দেশ্যে, কি উপায়ে এখানে এসেছো?"

কালীকিঙ্কর সংক্ষেপে তাঁদের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করলেন।

তখন লোকগুলি তাঁদের তেমনি ঘিরে ইমারতের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

কালীকিঙ্কর চলতে চলতে দেখলেন, ইমারতটির চারধারের দেয়াল বা প্রাচীরের মাথায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে মাঝে মাঝে কামান বসানো। ইমারতের ছাদ টাওয়ারের মতো। মাঝে মাঝে উঠেছে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় চারধারে সোজা একটি ছোট ঘর। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি সশস্ত্র লোক। সে মাঝে মাঝে চারধারে দূরে কি যেন লক্ষ্য করছে।

কালীকিঙ্করের বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তিনি তো এ দ্বীপটিকে কখন দেখেন নি এবং এর কথা কোন দিন শুনেছেন বলে মনেও পড়ে না।

এরা কে? কি উদ্দেশ্যে ঐ নির্জন সাগর দ্বীপে কেল্লা তৈরি করেছে? এরা সকলেই কি পর্তুগীজ? এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি লোকগুলির সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলেন।

মনে করেছিলেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করা হবে ভাল ভাবেই। কিন্তু তার বদলে তাঁদের সামান্য

খাদ্য দেওয়া হলো। তাঁরা তাই পেটপুরে জল খেয়ে ক্ষুধা দূর করলেন। খাবার পরে তাঁদের দুজনকে একটি ছোট ঘরে পূরে বাইরে থেকে ঘরের কপাট বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু কালীকিঙ্কর ও বা-সিনের অবস্থা এমন যে, চিন্তারও শক্তি নেই। ঘরে কোন শয্যা বা শয্যার জায়গা ছিল না। তাঁরা পাথরের খালি মেঝেতেই পরম ক্লান্তিভরে শুয়ে পড়লেন এবং অবিলম্বেই গভীর ঘুমে আছন্ন হলেন।

কালীকিঙ্কর কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জানেন না, তবে মনে হতে লাগলো তাঁর আরও খানিক ঘুমানো দরকার ছিল। তাঁর ঘুম ভাঙালো এক পর্তুগীজ। সে ধাক্কা দিয়ে বললে, "এই ওঠ।"

তিনি উঠে বসতেই সে বললে, "আমার সঙ্গে এস।"

সে কালীকিঙ্করকে নিয়ে এল সাজানো-গোছানো একখানি বড় হলঘরে। কালীকিঙ্কর দেখলেন, ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে ঢাকা, মাঝখানে খুব পালিশ করা একখানি টেবিল। টেবিলের তিন দিকে তিনখানি সুদৃশ্য চেয়ারে বসে আছেন তিনজন পর্তুগীজ। মেঝের চেয়ারে যিনি বসে তাঁর চেহারা যেমন বিশাল, পোষাকও তেমনি জমকালো। তাঁর দু'পাশের দুজনেরও পোষাকও বেশ জমকালো। তবে অতটা নয়।

মাঝের লোকটি পর্তুগীজ ভাষায় কালীকিঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

কালীকিঙ্কর পরিচয় জানালে লোকটি বললেন, "এখানে কি ভাবে এলেন?"

কালীকিঙ্কর উত্তর দিলেন, "যবদ্বীপে যাচ্ছিলাম। পথে চীনে বোম্বেটে হ্যাং লির সঙ্গে আমার লড়াই হয়। সে লড়াইয়ে সদলবলে ধ্বংস হয়েছে। আমার নাবিকেরাও প্রায় সকলেই মারা গেছে। জাহাজও ঝড়ে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে। আমি আর আমার একজন নাবিক বা-সিন তার একখানি তক্তায় ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের ধাক্কায় এখানে এসে পড়েছি। এখন আপনারা সাহায্য করলে দেশে ফিরে যেতে পারি।"

"তুমি শৃগালের মুখ থেকে এসে পড়েছো বাঘের মুখে। আমার নাম শুনলেই বুঝবে। আমার নাম বার্থেলোমিউ। আমি কাউকে বাঁচতে সাহায্য করি না।" বার্থেলোমিউ হাসতে লাগলো।

কালীকিঙ্কর বার্থেলোমিউয়ের নাম শুনেছিলেন। কিন্তু ঐ নির্জন সাগরদ্বীপে যে তার এমন একটা ঘাটি আছে তা জানতেন না, বললেন, "আপনার নাম কে না জানে?"

বার্থেলোমিউ বললে, "দেখ, ঐ হ্যাং লিটা তোমার হাতে নিপাত গেছে। এতে আমি তোমার ওপর ভারী খুশি হয়েছি। তাই তোমাকে আর তোমার চাকরকে প্রাণে মারবো না, তোমাদের আমার চাকর করে রাখবো। তোমরা কাল থেকে আমার জাহাজ তৈরির কারখানায় কাজ করবে। হ্যাং লি আমার শত্রু ছিল। একদিন আমিই তাকে শেষ করতাম। তুমি আমার পরিশ্রম বাঁচিয়েছ। তাই তোমাদের মেরে না ফেলে কাজ দিলাম। কারণ এখন লোকের খুব দরকার। তুমি যদি কাজ দেখিয়ে খুশি করতে পার তবে তোমাকে আমার দলে নিতে পারি। আর যদি তোমার বেচাল

দেখি তবে চাবুকে পিঠের চামড়া উঠবে। তাতেও শায়েস্তা না হলে একটা গুলি খরচ। ব্যস্।" বলে বোম্বেটে সম্রাট হা-হা করে হাসতে লাগলো।

কালীকিঙ্কর জানতেন বোম্বেটেরা, বিশেষ করে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা নিষ্ঠুরতায় জগতে অদ্বিতীয়। সত্যিই তিনি বাঘের মুখে এসে পড়েছেন। কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই তিনিও করেছেন। এরা এখন তাঁকে প্রাণে মারবে না, এ এক আশার কথা। তিনিও বাঘের মুখ থেকে সরে পড়বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তারপর ভাগ্যে যা থাকে। এখন শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বার্থেলোমিউকে বললেন, "যা আপনার হুকুম।"

বার্থেলোমিউ বললে, "এদের নিয়ে যাও। কিন্তু এক জায়গায় রেখো না। আমি বিদেশীকে বিশ্বাস করি না। দুজনে এক-সঙ্গে থাকলে পালাবার মতলব আঁটবে। এখান থেকে পালাতে তো পারবেই না, খালি আমার কতকগুলো লোককে ছুটোছুটি করাবে, গুলি খরচ হবে। যাও।"

শাস্ত্রীরা সর্দারের হুকুম মতো কালীকিঙ্করদের দুজনকে সেখান থেকে এনে দুটি আলাদা ঘরে বন্দী করে রাখলো।

কালীকিঙ্কর কিন্তু তেমন বিচলিত হলেন না। এবার একখানি তক্তা পেয়েছিলেন। তার ওপর ক্লান্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু বা-সিনের অবস্থা হলো কিছু অন্য রকম।

সেদিন জাহাজের কামরার দরজায় কান পেতে ভিক্ষুর কথা শোনবার পর থেকেই তার প্রধান চিন্তা হয়, কি উপায়ে কালীকিঙ্করের কাছ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান জেনে নিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে তা আত্মসাৎ করা যায়।

প্রথমে সে মনে করেছিল, শঙ্খচূড় হয়তো শেষে কোন বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে নেমে সে গুণ্ডাদল সংগ্রহ করে কালীকিঙ্করকে আক্রমণ করে, তাঁকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান জেনে নেবে। কিন্তু ঘটনা দাঁড়ালো অন্য রকমের। শঙ্খচূড় তো কোথাও ভিড়লোই না, উপরন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং সে নিজেই ডুবে মরতে বসলে। তবে এখন যখন বেঁচেছে তখন আবার গুপ্তধন সংগ্রহের ইচ্ছা তার মনে প্রবল হয়ে উঠলো।

সে বসে বসে ভাবতে লাগলো; দেহের ক্লান্তির ফলে চিন্তায় কিছু বাধা ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তার একটি মতলব স্থির করতে বাধলো না। কিন্তু সে তখন আর কিছু করলে না, শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে। তারপর বিকেলের দিকে পাহারাদার তার খবর নিতে এসে তাকে বললে, "তুমি যদি এখনই আমার কথা কাপ্তেনকে না জানাও তাহলে পরে খুব বিপদে পড়বে।"

পাহারাদার তার কথায় বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেল এবং খানিক পরেই তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললে, "কাপ্তেনসাহেব তোমায় ডাকছেন।"

বা-সিন তার সঙ্গে পূর্বেকার সেই হলঘরের পাশে আর একটি ঘরে যেতেই একজন সশস্ত্র লোক তাকে নিয়ে আর একখানি ঘরে ঢুক্‌লো। এ ঘরখানার দেওয়ালে চাবুক, লাঠি থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের অস্ত্র টাঙানো। ঘরের মাঝখানে একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বিশালাকায় বার্থেলোমিউ বসে।

বা-সিন তার সামনে সেলাম করে দাঁড়াতেই বার্থেলোমিউ জিগ্যেস করলে, "আমার মতো লোকের সঙ্গে তোর মতো একটা কুকুরের কি দরকার?"

বা-সিন বললে, "হুজুর! আমার কথা কেবল আপনাকে জানাতে চাই।"

"বটে!" বলে বার্থেলোমিউ ইঙ্গিত করতেই পাহারাদার ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। তখন বার্থেলোমিউ বললে, "এবার বল্‌ শুনি কি বলতে চাস্‌।"

বা-সিন বললে, "হুজুর! আমাকে যদি উপযুক্ত পুরস্কার দেবার অঙ্গীকার করেন তবে আপনাকে অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারি।"

"কি বলছিস্‌? ভাল করে ভেবে দেখ্‌।"

"ভাল করে ভেবেই বল্‌ছি।"

"কোথায় সে ঐশ্বর্য?"

"হুজুর! আমাকে পুরস্কার দেবেন বলুন।"

"বাচ্চা রইলো ডিমের মধ্যে আর তুই তার হিসেব আরম্ভ করলি! চট্‌পট্ বলে ফেল্।"

"হুজুর! আমি গরিব, আপনার আশ্বাস না পেলে তা বল্‌তে সাহস হয় না।"

"তুই অনেক কথা জানিস্ দেখ্‌ছি। সরকারী চাকরি করছিস্ বুঝি?"

"না হুজুর! আমিও ডাকাতি করতাম। আমার নিজেরই একটা দল ছিল।"

"কোথায় ছিল?"

"যবদ্বীপে।"

"ব—টে! তবে তুই পুরোনো ঘুঘু!"

"হুজুর যা বলে খুশি হন।"

"তা কি চাস্?"

"সামান্য। আমি যে সন্ধান দেবো তার বিনিময়ে আমায় ছেড়ে দিয়ে আপনারই দলে একটা ছোটখাটো কাপ্তেনের পদ দেবেন। তারপর গুপ্তধন উদ্ধার হলে আমাকে তার একটা মোটা বখরা দিতে হবে।"

বার্থেলোমিউ একটু চুপ্ করে থেকে বললে, "আচ্ছা। আর যদি না পাওয়া যায়?"

"পাওয়া যাবেই", বলে বা-সিন্ সন্ন্যাসীর মুখ থেকে যা শুনেছিল সব বলে গেল। তারপর বললে, "আমি তার সঠিক অবস্থানটা জানি না, জানে ঐ কালীকিঙ্কর। তাকে মোচড় দিলেই কথাটা বেরিয়ে আসবে। ওর জাহাজ ডুবি না হলে ও সেখানেই যেত।"

[চল্‌বে]

বাণ ও গান

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

ছুঁড়েছিনু বাণ মুক্ত গগনে
হারায়েছে কোন্ দূরে,
গেয়েছিনু গান ভাসিয়া গিয়াছে
অনন্ত অম্বরে।
দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আজ
বিস্ময়ে চেয়ে দেখি,—

হারান সে বাণ, খোয়ান সে সুর
আজো অবিকল, এ কি!
হেরিনু আজিও বিঁধিছে যে শর
মর্ম মাঝারে, আর,—
সংগীত মোর মন্থন করে
অমৃত পারাবার।

সাহেবের দেশে

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

যেখানে যাও না কেন লোকের মুখে খালি শীতের কথা—উঃ কী শীত, কী শীত! আমাদের মত স্থযিমামার রোদে পোড়া লোক দেখলে বেশী করে মনে পড়ে। তাই বলে যায়—খুব ঠাণ্ডা লাগছে! কী জঘন্য ঠাণ্ডা! কবে যে বসন্তের মুখ দেখব! তোমাদের ত গরম খাওয়া অভ্যেস, এখানকার আবহাওয়া না জানি কত খারাপ লাগে!

শীতে কাবু হয়ে পড়েছি, মুখ ফুটে এ কথা স্বীকার করি কোন লজ্জায়। উত্তর দেই—শীত বেশ পড়েছে বটে, তবে একেবারে অসহনীয় নয়। লোকে এর যতখানি বদনাম দেয় তত খারাপ নয়।

সোজা উত্তর আসে—আমরা বদনাম দেই না, কেবল বলি, এ ক'টা দিন জীবনের অভিশাপ।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, আমাদের দেশে কি শীত নেই? শীত যাকে বলে তা কি আমরা জানি না? পোষ মাঘ মাসে যখন হিমের দমক আসে সবাইকে থরহরি কম্পমান করিয়ে ছাড়ে। সে কথা মানি, তবে আমাদের শীতের চরম শাস্তি কম্প ধরিয়ে দেওয়া, আর এখানকার শীত…… বলছি ধীরে।

কলকাতার কথা ধর। মাঝরাতে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের মাথায় পঞ্চাশ ডিগ্রী তাপ সামান্য সময়ের জন্যে ছুঁয়ে গেল। অমনি দেশময় হৈ-চৈ। কাগজে কাগজে বড় বড় হরফে লোকের দুর্ভোগের কথা ছেপে বেরোল। হবে না কেন, এ যে ঠাণ্ডার রেকর্ড। তখন সময় সময় এ ও মনে হয়, বুঝি বা হিমালয় ভেদ করে মহাচীন থেকে আসছে হিমপ্রবাহ।

বিলেতে পঞ্চাশ ডিগ্রীকে গ্রীষ্মকাল বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন জানলা খুলে হাওয়া খেতে ইচ্ছে করে, একটা আইসক্রিম খাবার সাধ হয়। অবসর হলে টাইটা আলগা করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

ভাবছ, তবে ঠাণ্ডা কখন?

ধর, থার্মোমিটারে তাপ নামছে ত নামছেই, চল্লিশ ডিগ্রী হল। ক্রমে আরও নামছে পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ—এবার একটা দাঁড়ি টানতে পার। এই হল ফ্রিজিং পয়েন্ট অর্থাৎ এই তাপে জল আর জল থাকে না বরফ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা এখানেই শেষ হয় না, আরও নামছে। যদি সে কুড়ি, আঠারো কি পনেরো ডিগ্রীতে নামে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ভাবছ পনের ডিগ্রীটা মাঝরাতে একবার বুড়ি ছুয়ে গেল, তারপরই তাপ বাড়তে থাকে। আর যতই হোক না কেন সূর্যের আলো পেলে থার্মোমিটারের পারা লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠবে।

দুঃখের বিষয় সূর্যকিরণের কথা কি বলব, স্বয়ং মহাপ্রভু তখন ডুম্বরপুষ্পে পরিণত হন—

সত্যিকারের ডুমুরের ফুল। কালেভদ্রে কয়েক মিনিটের জন্যে তার মুখ দেখা যায় তাও তখনকার রোদ নয়ত যেন টিমটিমে কেরোসিনের আলো। সে সময় দিনও ছোট হয়ে যায়। সকাল হতে বেলা নটা, বিকেল তিনটে না বাজতে ঘোর অন্ধকার।

এবার আমাদের দেশের সংগে তুলনা করতে পার, সেখানে চরম শীত হাড়কাঁপানো, এ দেশের ঠাণ্ডার নাম ফ্রিজিং কোল্ড। এ ঠাণ্ডা মানুষের হাত পা জমিয়ে দেয়, মনে হয় শরীরে বুঝি রক্তচলাচল হচ্ছে না—হবে কোথা থেকে, রক্ত যে জমে বরফ হয়ে গেছে।

আমরা জানি শীত বলতে পোষ মাঘ মাস। ফাল্গুন মাসে বেশ গরম পড়ে যায়। কিন্তু বিলেতে সব চেয়ে ঠাণ্ডা মাস ফেব্রুয়ারী। আবার এ বছরের ফেব্রুয়ারী বেশী ভুগিয়েছে লোককে। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যা শীত পড়ল, ১৮৯৫ সালের পর নাকি এমন ঠাণ্ডা পড়েনি। দু'এক দিনের তাপমাত্রা জেনে রাখতে পার। ভোর ছটায় ছিল একুশ ডিগ্রী। বাড়তে বাড়তে বেলা বারোটায় দাঁড়াল তেইশ ডিগ্রী। একটায় চব্বিশ ডিগ্রী। আবার দুটোর পর নামতে সুরু করল, মাঝরাতে হল পনের ডিগ্রী। পরদিন সকালে যখন বাড়ী থেকে বেরোই তাপ ছিল আঠারো। রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় আবহাওয়ার অনেক উন্নতি হয়েছে, লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সুরু করেছে তখন যে তাপ উঠেছে সাতাশ—তবু ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে পাঁচ ডিগ্রী নীচে।

এখানে ফেব্রুয়ারী মাসে এক এক সময় তিন চার দিন ধরে তাপ থাকে ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে। হঠাৎ দু-চার ঘণ্টার জন্যে তার ওপরে ওঠে। আবার যে কে সেই, চার পাঁচ দিন ধরে চলে রক্তজমানো ঠাণ্ডা।

যে অবস্থায় বসে লিখছি বিবরণটা শুনে নিতে পার। নিশ্চয় জান, দেশে বাড়ী খুঁজলে ঘরগুলো দক্ষিণ খোলা কিনা লক্ষ্য করি—সন্ধ্যেবেলার ফুরফুরে হাওয়া কী চমৎকার! খুব শীত পড়লেও খড়খড়িটা খুলে রাখি। এ দেশে জানলা করার সময় ভাবে কোথায় বসালে হাওয়া ঢুকবে কম। তাছাড়া জানালাটা পুরোপুরি কাঁচের, নামিয়ে দিলে ঠাণ্ডা ঢোকার ছোট্ট ফুটো থাকে না। দেশে চকচকে সানের মেঝে দেখলে তারিফ করি, মোজেক বা শ্বেত পাথরের মেঝে হলে বলি অপূর্ব। এখানকার ঘরের মেঝে কাঠের, তার ওপর কার্পেট পাতা, উদ্দেশ্য ঘরটা গরম থাকবে।

এমন ঘরে বসেও স্বস্তি নেই। পায়ের কাছে জ্বেলে রেখেছি হিটারটা। তার তাপ বাড়িয়েছি পুরো মাত্রায়। যতখানি পারি কাছে টেনে এনেছি। অর্থাৎ আর একটুখানি এগিয়ে দিলে পাজামাতে আগুন ধরে যাবে।

পায়ে বেশ আরাম পাই কিন্তু হাতটাকে নিয়ে কি করি। একবার ভাবি গ্লাভসটা পরে নেই। তাহলে কলম চালাব কি করে? বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে লেখায় ইস্তফা দিতে হয়, হাতটা গরম করে নেই। তারপরও লেখার যা শ্রী হচ্ছে। ও, এইবার বুঝেছি, সেই জন্যেই এদেশের লোক সইটুকু ছাড়া হাতের লেখা কাউকে দেখায় না, তাদের সব কিছু টাইপ করা।

এবার রাস্তায় নেমে এস। সেখানে লোকজন চলছে বটে। তবে জেনো সবাই কোন না কোন কাজে পথে বেরিয়েছে। কেউ সখ করে বেড়াচ্ছে না। এবং মনে মনে ভাবছে ; কতক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকব, এ শাস্তিভোগ আর সয় না ! আর ছেলে বুড়ো সবাই চলেছে নয়ত ছুটছে। এরা কাজের মানুষ বা সময় নষ্ট করতে চায় না, ছোটার মূলে এ কথা যেমন সত্যি, তার চেয়ে বড় কথা ছুটে শরীর গরম করে নিচ্ছে।

এবার চল টিউব ষ্টেশনের মধ্যে, লোকজন অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্যে। প্ল্যাটফর্মের মধ্যেতে তাড়াতাড়ির প্রশ্ন নেই তবু ছুটছে, ছুটছে বলে এগোচ্ছে না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দড়ি লাফানর মত করে পা তুলছে ফেলছে,—গরম করে নিচ্ছে শরীর। আমাদের দেশে দেখলে হাসি পেত, মনে হত বুড়ো লোকগুলো ছেলেমানুষের মত লাফালাফি করছে। প্ল্যাটফর্মের আর একপাশে দেখতে পেলে কেউ গ্লাভস খুলে হাতজোড় করার ভংগিতে হাত মিলিয়ে জোরসে ঘসে নিচ্ছে। হঠাৎ সেখানে মনে হবে এমন হাত কচলাচ্ছে কেন ? অপরাধ করে ফেলেছে নাকি ? ভগবানের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে ? বুঝতেই পারছ ঠাণ্ডায় হাত জমে যাবার দাখিল, তাই রক্তচলাচল করিয়ে নিচ্ছে।

হাতের আবরণ হিসেবে গ্লাভস আছে সে কথাত জানই। তার ওপরটা চামড়ার, ভেতরে পশমী আস্তরণ কব্জির কাছে ভেড়ার লোম দেওয়া। তা পরেও শান্তি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় হাতজোড়া অবশ হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জ্বালা করতে থাকে; আগুনে পুড়ে গেলে যেমন জ্বলে। অনেক মেয়ে বিশেষ করে বুড়িরা শুধু গ্লাভস পরে সন্তুষ্ট হয় না। অধিকন্তু ফারের 'মাফ" পরে। মাফের গড়নটা দুমুখ খোলা পিপের মত, তার চেয়ে ভাল তুলনা দেওয়া যায় কীর্তন গাইয়ের খোলের সংগে। তবে আকারে খুব ছোট, কেবল দুটো হাত ঢুকতে পারে। গ্লাভস পরার পর কব্জি পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেয় তার মধ্যে। জানি না তাতেও বিশেষ ফল হয় কিনা !

অনেক সময় বুড়িরা হাত দুটো নিজের গায়ে জোরসে মারতে মারতে পথ চলে। আমাদের দেশে দেখলে লোকে নির্ঘাৎ ধারণা করত বুড়িটার মাথা খারাপ। এ ঘটনা এখানকার লোকের চোখে লাগে না। তারা নিজেরাও মাঝে মাঝে করে শরীর গরম করার জন্যে।

এখানেই দুর্ভোগের শেষ নয়। এদেশে অধিকাংশ গ্যাসের আগুন। হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা পড়লে লোকে ঘর গরম করার জন্যে বেশী করে আগুন জ্বালতে থাকে। গ্যাস কোম্পানী গ্যাস জুগিয়ে উঠতে পারে না। গ্যাসের চাপ যায় কমে। তখন যত পয়সা খরচ করতে রাজি থাক না কেন, মনের মত আগুন পাওয়া যাবে না। প্রয়োজন মত জল গরম করতে পারবে না। যে দশ মিনিটে ব্রেকফাস্ট রেঁধে ফেলে সে আধঘন্টায়ও খাবার হাজির করতে পারে না।

অনেক পাড়ায় গ্যাসের বদলে ইলেক্‌ট্রিকে রান্নার ব্যবস্থা, হিটারও ইলেক্‌ট্রিকের। ওই চরম শীতে তাদের কি দুর্ভোগ হয় জান ? ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ পড়ে পাওয়ার হাউসে, ব্যাস

পাড়াকে পাড়া ফিউস। কতঘণ্টা যে অন্ধকারে থাকতে হবে, কখন যে ইলেকট্রিক কোম্পানী সারিয়ে তাদের উদ্ধার করতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভাবত তখন বিলেতে কি সুখ। পাড়াকে পাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার, এদিকে জমে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়, চা জলখাবার ত সামান্য কথা ডিনারও বোধ হয় বরাতে জুটবে না, শুকনো রুটি চিবিয়ে রাত কাটাতে হবে।

সবার বড় অসুবিধে জল নিয়ে। তোমরা নিশ্চয় ভাবছ কেন জল বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাত দিতে হলে মনে হয় হাত কেটে যাচ্ছে। না সে অনেক উঁচু দরের। অনেক বাড়ীতে দুটো জলের ট্যাংক থাকে, একটায় ঠাণ্ডা জল আর একটায় গরম। সেখান থেকে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। অনেক বাড়ীতে গরম জলের আলাদা ট্যাংক থাকে না, কলের মুখে গ্যাসের অ্যাস্‌কট লাগান। পেনি ফেললেই আগুন জালান যায়, অমনি গরম জল বেরোতে থাকে।

দুর্ভোগের কথা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের কথায় আসতে হয়। গরমে জিনিসের আকার বেড়ে যায়, ঠাণ্ডায় যায় ছোট হয়ে। কিন্তু জলের বেলা সব সময় তা খাটে না, জল বরফ হয়ে গেলেই আকারে যায় বেড়ে।

এখন সকালে উঠে হাতমুখ ধুতে যাবে, কল খুলে দেখলে সাড়াশব্দ নেই। একটু ঠোকাঠুকি করলে তাও যে কে সেই। জলের মুখ দেখা গেল না। পাইপের জল যে জমে বরফ হয়ে গেছে আসবে কোথা থেকে। নাওয়া-খাওয়াত দূরের কথা হাতমুখ ধোয়ারও কোন উপায় নেই। অনেক বাড়ীতে আরও গুরুতর বিপদ। জানইত জল বরফ হলে আকারে বেড়ে যায়, ফলে পাইপ যায় ফেটে। তারপরই যদি বরফ গলে যায়। হুশ হুশ করে বাড়ি ভাসিয়ে দেয়। তাই বেশী ঠাণ্ডা পড়লেই বাড়ীর মাপকরা জলের পাইপের সেপয় তৎপর হয়। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, গরম কাপড় মুড়ে দেয়। ট্যাংকের জল দিনরাত গরম করে রাখে। তবু বিপদ এড়ান যায় না। পাড়ায় পাড়ায় জলের কল বিকল হয়। খাস লণ্ডনে পঞ্চাশ হাজার কলের মিস্ত্রী সে সময় হিমসিম খেয়ে যায়। দিনরাত কাজ করেও ভাঙা কল সারিয়ে উঠতে পারে না।

অনেক বাড়ীতে জল গরম করার বয়লার ফেটে যায় ঠাণ্ডায়। কাছাকাছি লোক থাকলে তাকেও জখম করে। এক পরিবার সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল। ছুটির দিন ধীরে সুস্থে খাচ্ছে গল্প করছে। খাবার ঘরের পাশেই ছিল বয়লার, বোমা ফাটার মত শব্দ করে ফেটে যায়। কাঁচের জানলা ভেঙে চৌচির করে দেয়। তছনছ করে দেয় ব্রেকফাস্টের টেবল। ঘরের ছাদ খসে পড়ে, বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। শেষ পর্বে দমকল ছোটে আগুন নেভাতে, অ্যাম্বুলেন্স আসে, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এখনকার শীতের সংগে যার গলায় গলায় ভাব, তার কথা এখনও বলা হয়নি, তিনি হলেন পবনদেব। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে তাঁর আগমন। যেই শীত পড়ে তিনি জোর কদমে ছুটতে থাকেন, লোকের হাত পা অবশ হয়ে যায়, নাকে মুখে ছুঁচ ফুটতে থাকে। একজন ইংরেজ আমাদের

বলে, খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, তোমাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে আমাদের সম্পূর্ণ দায়ী করো না। এ দেশটা অত খারাপ নয়, এর মূলে রাশিয়া। ওখান থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া পাঠিয়ে আমাদের দেশটাকে শেষ করে দিল। কি অন্যায় বলত, নিজেরা ভুগবে বলে আমাদেরও ভোগাবে!

ঠাণ্ডা কোথায় লাগলে লোককে বেশী কাবু করে দেয়? একথা জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলবে—কেন হাতে-পায়ে।

হাতে-পায়ে ঠাণ্ডা লাগে সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাদের রক্ষা করার ঢালতলোয়ার আছে। সারা শরীরের মত বেশ ঢাকাঢুকি থাকে দুজনেই, কিন্তু বেচারী কান আর নাক! ওরা নিতান্ত অসহায়, ভাবলেও মায়া হয়, যত ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন ওদের রক্ষা করার মত কোন ভদ্রসংগত আবরণ নেই। ভাবছ, মাফলারটা কানে জড়িয়ে নিলেই হল। কিন্তু এদেশে একমাত্র মেয়েরাই কান জড়ানর অধিকারী, ছেলেরা কান জড়ালে লোকে হাসবে। এদেশের মানুষ কি ধাতু দিয়ে গড়া জানি না। হয়ত এদের কান ঠাণ্ডাপ্রুফ, অথচ আমার সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা লাগে ওই কান দুটোয়। কিন্তু কি করতে পারি? মাথায় মাফলার জড়িয়ে দেশের বদনাম কিনতে পারিনা ত?

একদিনের ঘটনা বলি! তখন রাত দশটা হবে, বাড়ী ফিরছি, ঠাণ্ডা কুড়ি-বাইশ ডিগ্রী হবে। তুষার ঝঞ্ঝা বইছে, তার সংগে ঝাপ্টা মেরে চলেছে রাশিয়া থেকে পাঠান উত্তর-পূর্ব বায়ু। প্রায় চোখ কান বুঁজে চলেছিলাম। টুঁ শব্দ করার উপায় ছিল না, সংগে আছে স্ত্রী। মেয়ে হয়ে সে যদি জমে গেলাম বা উঃ কী শীত না বলে, আমি কষ্টের কথা মুখফুটে বলি কি করে? হঠাৎ নজর পড়ল, তা বলবে কেন। সুযোগ বুঝে বাংলা দেশের বউ সেজেছে, ঘোমটা টেনেছে এক হাত! আর কিছু না হোক কান দুটোত মজায় আছে।

এদেশের লোকের মতেও ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় সব চেয়ে বেশী পায়ে। যত ঠাণ্ডা বাড়তে থাকবে মোজার সংখ্যা দেবে বাড়িয়ে—এক-দুই-তিন-চার হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের কথা মেনেও যে আমার অবস্থা সংগীন হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কানদুটো বুঝিবা নেই, জমে বরফ হয়ে গেছে, চেপে ধরলে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে শেষ পর্যন্ত কি করে বসতাম জানি না। হয়ত পায়ের মোজা খুলে কানের কাছে হাত বাড়াতাম।

তারপর মনে হল নাক নামে আরও একটা অংগ আছে। তার দশাও ত শোচনীয়। তাকে কি দিয়ে রক্ষা করব। তাকে রক্ষা করার মত উপাদান আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। ঘোমটা তুলে কান ঢাকলেও নাকত তার আমার মতই খোলা। কই উচ্চবাচ্য করছে না ত? তাহলে শীতটা হয়ত খুব কষ্টদায়ক নয়, খবরের কাগজওয়ালারা বড় বড় হরফে রঙচঙ লাগিয়ে ঠাণ্ডার কথা প্রচার করে, তাই আমাদের এই দুর্বলতা।

বাংলার ডাকাত!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অতিথির হাতে প্রাণ রক্ষা

—এক—

কয়েক বৎসর আগে গিয়াছিলাম বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে। গঙ্গার তীরে বৃহৎ পল্লী। গঙ্গা বর্ষার শেষে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণসলিলা হইয়া পড়ে এবং গ্রীষ্মের দিনে অনেক যায়গায় শুকাইয়া যায়, লোকে তখন হাঁটিয়া পারাপার হয়। আমি যখন পূর্ব্বস্থলী গিয়াছিলাম, তখন বাহির হইতে কোন লোক সমাগম নাই, বাঙ্গালা দেশও বিভক্ত হয় নাই। ষ্টেসন হইতে গ্রাম দূরে। বড় গ্রাম। আমার সঙ্গীর বাড়ী নদীয়া—নবদ্বীপ সহর। তিনি বলিলেন, চলুন গ্রামের ভিতর। স্থানীয় একজন বৃদ্ধ মুসলমান হইলেন সঙ্গী। যে গ্রামের দিকে চলিলাম, সে গ্রাম পূর্ব্বস্থলীর অনেক দূরে। সে গ্রামের নাম আজ আমার মনে নাই।

মাঠ ছাড়াইয়া আসিলাম পল্লীপথে। অপ্রশস্ত পল্লীপথ, পথ উঁচুনীচু, দুই দিকে গভীর বাঁশবন, আমবাগান। বট ও অশ্বথ এবং পাঁকুড় গাছ। দক্ষিণে ও বামে দুই দিকেই বন ক্রমশ গভীর হইয়া আসিতেছিল। ঘর বাড়ী বড় একটা চোখে পড়িতেছিল না। ভগ্নজীর্ণ দালানকোঠা। কোথাও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাত নাই, গায়ে গায়ে বুনোগাছের চারা গজাইয়া অন্ধকার করিয়াছে। সাপ, গোসাপ ও শৃগালের নিরাপদ বাসস্থান। বড় বড় দীঘি-সরোবর নানা জলজ উদ্ভিদে ঢাকা, শৈবাল দলে পরিপূর্ণ।

আমরা দুইদিকে ভগ্নজীর্ণ বাড়ীঘর, কুঁড়ে, সঙ্কীর্ণ পথ, কাঁটা গুল্ম ঝোপঝাড় পার হইয়া চলিতে চলিতে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম রাস্তার বাঁ দিকে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর। প্রাচীর কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কোথাও খাড়া আছে। গাছগাছড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটি ভাঙ্গা সিংহ-দরজা, তার একদিকে ইট পড়িয়া আছে। প্রকাণ্ড একটা দীঘি। তার পারে শিবমন্দির, শিবমন্দিরে শুধু গৌরী পট পড়িয়া আছে। মুসলমান ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর আগে আগে চলিলেন, বাহিরে পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথশালা, পড়িয়া আছে এইসব দেখাইয়া বলিলেন, আসুন বাড়ীর ভিতর, বিরাট চকমিলান বাড়ী। এক বৃহৎ

অট্টালিকা। জানালা দরজা ভাঙ্গা। বাহিরের বৃহৎ একটি ঘরে, কোন্ যুগের একটা জীর্ণ শীর্ণ সতরঞ্চের অতি সামান্য অংশ পড়িয়া আছে। বাড়ীর নীচের তলে বড় বড় ঘর! সিঁড়ি ভাঙ্গা, কোনরূপে আমরা দ্বিতলে উঠিলাম। ধূলি বালিতে ভরা, আমরা এক পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—নীচে প্রকাণ্ড বড় রন্ধনশালা আর যতদূর চোখে পড়ে একটা বড় আম বাগান। হঠাৎ একটা সাপ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া হিস্ হিস্ করিয়া চলিয়া গেল। শেয়াল গুটিকয়েক মানুষের পদশব্দ শুনিয়া দৌড়াইয়া পালাইল। নির্জ্জন নিঃঝুম এ পুরী, যেন ভূতের বাড়ী। কয়েকটা নারকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি ও আমার সঙ্গী, ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখানে, এই পরিত্যক্ত জনহীন নির্জ্জন পুরীতে, চারিদিকের একটা ভয়ানক পরিবেশের মধ্যে দিনের বেলাও ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—চলুন।

আমি বলিলাম, বেলা হয়েছে এবার যাওয়াই ভাল।

স্থানীয় সেই বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক বলিলেন—আর একটু কষ্ট করতে হবে, চলুন বাড়ীর অন্দরের দিকে।

কোন রকমে সেই ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। সম্মুখে বিরাট বাঁধান চত্বর। ইটসুড়কি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভীর গর্ত্ত। ভাঙ্গা দরজার ভিতর দিয়া চলিলাম ভদ্রলোকের পেছনে। দুই দিকে রান্নার দালান। শিল নোড়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কড়াই পড়িয়া আছে, মরচে ধরা। একটা ঘর—সে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত লম্বা, সেটা ছিল খাবার যায়গা। সে ঘরের ছাদ নাই। কুলুঙ্গিতে কালো ধোঁয়ার দাগ। তুলসী মঞ্চ। শুষ্ক ইঁদারা, তার দূরে ঢালু যায়গা,—তার একটু পরে খিড়কীর পুকুর। বেশ বড, কিন্তু, আগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ। পুকুরে বুনো সব লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। একটা ঘরের ভিতর পড়িয়া আছে মরচে পড়া, প্রকাণ্ড খড়্গ, সামনে হাঁড়িকাট। সেই প্রকাণ্ড হাঁড়িকাঠের একদিকে জরাজীর্ণ। আর একদিক ঠিক্ আছে—তার পাশেই বিরাট খাড়া। মরচে পড়া সেই খাড়া।

দেখলেন ত বাবুমশাই!

কি বলতে চাও তুমি?

বাবু এখানেই হয়েছিল সর্ব্বনাশ! এখনও রাতের বেলা, সন্ধ্যে রাতে মানুষ দেখে ভূত! এসেছেন ত এই দিনদুপুরে তাও লোকজনের চলা চলতি নাই। একথাটা সত্য। লোকজনেরা এ বাড়ীর পাশ এড়াইয়া মাঠের পথে চলে। একে একে সব দেখাইয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বাবু দুনিয়ায় ত মানুষের এমনি হয় পরিণাম। এত বড় জমিদারের বাড়ী, তার দেখুন কি দুর্দ্দশা, কি পরিণতি! একটি কথাও মিথ্যা নয়। গাছপালা, দীঘি-পুকুর, দেয়াল সব যেন হা-হা করিতেছে! বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিলাম বন্ধুর বাড়ী।

সন্ধ্যার সময় আসিলেন মুসলমান ভদ্রলোক। এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেকালের এক ভয়ানক সত্য কাহিনী। সে কথাই বলিতেছি।

—দুই—

সে একশো দেড়শো বছর আগে ঐ গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় বাস করিতেন শম্ভুনাথ চৌধুরী। বিরাট ছিল তাঁর জমিদারী, ধনে-মানে সম্পত্তিতে ছিলেন তিনি মস্ত বড় লোক। অতিথি অভ্যাগত, দিন রাত্রি আসা যাওয়া করিত, বাড়ী নিত্য করিত গমগম্। বাবু শম্ভুনাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। নিত্য পূজাপার্ব্বণ লাগিয়াছিল তাঁর বাড়ীতে। গানবাজনা, কীর্ত্তন যেমন হইত, তেমনি গ্রামের দুঃখী দরিদ্রেরা পেট ভরিয়া দু' বেলা খাইতে পাইত। যেমন ছিলেন কর্ত্তা, তেমনি ছিলেন মা ঠাকুরুণ। অতিথি সেবা না হইলে কর্ত্তা ও গৃহিণী কেহ খাইতেন না। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ী আসিলেন এক বৃদ্ধ ও সঙ্গী তার যুবক পুত্র। দুই অতিথি।

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর কাছে যখন তাঁহারা আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে।

যুবক পুত্র বলিলেন—বাবা, এ ত বেশ বড়লোকের বাড়ী, আজ রাত্রের মত এ বাড়ীতে অতিথি হলে হয় না? কি বলেন?

ক্লান্ত বৃদ্ধ অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন, বলিলেন, তা ত হয় বাবা। কিন্তু এ অঞ্চলের সম্বন্ধে নানা দুর্নামও ত আছে, অনেক সময় জমিদারও ডাকাত হন—যদি এ ডাকাতের বাড়ী হয়?—কি করে বুঝবো!

—পুত্র বলিল, কাছে ত আর গ্রাম নাই, রাত্রি ত বেড়েই চলছে, বাঘের মুখে পড়ার চেয়ে এ বাড়ীতে অতিথি হলে মন্দ কি? তারপর এমনও ত হতে পারে যে পথে ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়তে পারি।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, কথাটা ঠিক্। সম্বল ত মাত্র ভিক্ষার এই হাজার টাকা। তা অবশ্য কোমরে শক্ত করেই থলেতে বেঁধেছি। এ টাকাটা গেলে মেয়ের বিয়ে দেব কি করে! কি জানি জগদম্বার মনে কি আছে?

ওঃ—দিদির বিয়ের কথা বলছো? সে হবে। কেউ নেবেনা এ টাকা। দু'জনে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে একেবারে ফটকের কাছে আসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের কাঁধে একটি সেতার ঝুলানো, বাঁ হাতে তার লাঠি। যুবকের হাতে পোটলা-পুটুলি। বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। যুবকের বয়স কুড়ি পঁচিশ হবে—বেশ বলিষ্ঠ।

একজন প্রৌঢ় গৌরবর্ণ সুপুরুষ ভদ্রলোক ইঁহাদের লক্ষ্য করিতেছিলেন, এবং ফটকের কাছে আসিয়াও তাঁহাদিগকে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: মশাইদের কোথায় যাওয়া হবে?

আজ্ঞে—মেড়পাড়া। আমরা ব্রাহ্মণ—এইটি আমার পুত্র।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের দর্শন পেলুম। আমার আজ অতিথি সেবা হয় নি। আসুন।

মহাশয় কি এই বাড়ীর কর্ত্তা ? জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মণ !

আজ্ঞে হাঁ। আসুন !—ভদ্রলোক পরম সমাদর সহকারে অতিথি দুইজনকে লইয়া আসিলেন এবং অতিথিশালার একটি বৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন কক্ষে তাঁহাদের রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভৃত্য আসিয়া হাত মুখ ধোয়ার জল দিল এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম বাণীনাথ তর্কালঙ্কার। পরম পণ্ডিত মানুষ। কন্যাদায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম ও যশ ছিল, কাজেই শিষ্য ও অন্যান্য ধনী মহাজন ও ভক্তদের কাছ হইতে যে হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই চিন্তিত ছিলেন পিতাপুত্র। পাছে ডাকাতে কেড়ে নেয় ! তাঁহারা ভাবিলেন এ বাড়ী কখনও ডাকাতের বাড়ী নয় !

চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ে মোহিত হইয়াছিলেন পিতা পুত্র। প্রচুর আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন—ভাণ্ডারী। রান্নাবান্না শেষে পরম পরিতোষের সহিত আহার করিয়া পিতা পুত্র ঘরে আসিলেন। পুত্র শুইয়া পড়িল। তর্কালঙ্কার টাকার তোড়াটা আরও শক্ত করিয়া থলেতে বাঁধিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া বসিলেন তক্তপোষের উপর সেতার লইয়া। ওস্তাদ সেতার-শিল্পী ছিলেন—বাণীনাথ, তিনি সেতারের সুরে সুরে গান ধরিলেন—প্রসাদী সুরে—

রইলি না মন আমার বলে।
ত্যাজে কমল দলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে।

গানের সে সুরলহরী গভীর নিশীথে দিকে দিকে সুরের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া দিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে যেখানে শম্ভুনাথ চৌধুরী শুইয়াছিলেন সেই সুর তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে সেই অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিলেন তর্কালঙ্কারের পাশে। করযোড়ে কহিলেন, ধন্য আপনি। আমাদের মানসম্ভ্রম, অর্থলোভ ও বিষয় বাসনা আর গেল না ! গান চলিতেছে, এমন সময় আবার দুইজন অতিথি আসিল। এইবারও একজন বৃদ্ধ এবং একজন যুবক। বৃদ্ধের হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি আর যুবকের কাঁধে ঝুলানো প্রকাণ্ড তীর ধনুক।

চৌধুরী মহাশয় একটু ভীত হইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কারা ? তাঁহার মনে হইয়াছিল বুঝি এরা ডাকাত ! বৃদ্ধ কহিল 'বাবুসাব, হামলোক শিকারী হায়, বহুৎদূর যানে হোগা, আপ্ বড়া আদমি, আজ রাতমে আপকা কুঠিমে রাহনে মাঙ্গতা। যুবককে দেখাইয়া বলিল, ও হামারা লেড়কা, ইস্‌কো নাম মহাবীর। ভারি জব্বর শিকার খেলনেওয়ালা। জয় হনুমানজী ! জয় রামজী।

দুইজন এই নবাগত অতিথিও আশ্রয় পাইল। তাহারা ডাল, রুটি বানাইয়া, রাত্রিতে অতিথিশালার একটি ছোটঘরে আশ্রয় লইল।—তর্কালঙ্কারের সঙ্গে নানা কথা হইল। তারপর ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শম্ভু চৌধুরীও অন্দরে চলিয়া গেলেন।

—তিন—

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চারিদিকে স্তব্ধভাব। বাতাসে গাছের পাতা সর্ সর্ শব্দে দুলিতেছে! দেউড়ীতে বরকন্দাজেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় অনেকগুলি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। একদল দস্যু অন্দরমহলের দিক হইতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের বিকট হা—হা—হা অট্টহাসিতে হইল বিভীষিকার সৃষ্টি! প্রত্যেকের হাতে বর্শা ও তরোয়াল, বরকন্দাজ ও পাহারাওয়ালারা ছুটিয়া আসিল কিন্তু এত বড় দস্যুদলের আক্রমণে কি করিতে পারে বিশ পঁচিশ জন বরকন্দাজ!

দস্যু সর্দ্দারের হুকুমে একদল দস্যু শম্ভু চৌধুরী মহাশয়ের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে: দোতলার সিঁড়ি দিয়া চাপা দরজা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে সুরু করিতেছিল। ঝন্ ঝন্ শব্দে কপাট ভাঙ্গিতেছিল আর বরকন্দাজদের বর্শা ছুঁড়িয়া মারিতেছিল।

বৃদ্ধ শিকারী যে তার যুবক পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—

বাচ্চা, ক্যায়া দেখতা, ছোড় তীর!

বীর বিক্রমে লাফাইয়া উঠিল মহাবীর। অদ্ভুত শিক্ষা বৃদ্ধ শিকারীর ও যুবকের। তারা

গোপনে একটা দরজার আড়ালে থাকিয়া মুষলধারায় বৃষ্টির মত তীর ছুড়িতে লাগিল। অব্যর্থ তাদের তীরের সন্ধান। তীরের আঘাতে দস্যুরা একে একে মাটিতে পড়িতে লাগিল। একটা প্রবল উত্তেজনা ও ভয়ে ডাকাতেরা পলাইতে আরম্ভ করিল, যে ডাকাতেরা চৌধুরী মহাশয়ের ঘরে ঢুকিতে দ্বিতলের দিকে ছুটিতেছিল, তাদের একজনও প্রাণে বাঁচিল না।

অতিথিশালার দিকে কয়েকজন ডাকাত যেমন পলাইবার মুখে ছুটিয়া আসিতেছিল বৃদ্ধ শিকারী এমন কৌশলে তাহাদিগের দিকে তীর ছুঁড়িতেছিল, যে সকলেই আহত হইয়া পড়িতেছিল, কেহবা মরিতেছিল।

পরদিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের পুত্র চৌধুরী মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোগা পুলিশ আসিল। আহত ব্যক্তিদের তাহারা সহরে চালান দিল। অনেক দস্যু, ডাকাত ধরা পড়িল। শিকারী বৃদ্ধ ও তরুণ, পিতা ও পুত্র, কোম্পানীর কাছ হইতে পুরস্কার পাইলেন।

শম্ভু চৌধুরী মহাশয় পিতা ও পুত্রকে তাহার বাড়ীর রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল। কোন দস্যু ডাকাত আর এ অঞ্চলে এর মধ্যে ডাকাতি করিতে আসে নাই।

কিন্তু সেই যে খড়্গ পড়িয়া আছে দেখিলেন, সেখানে একদিন হইয়াছিল ভীষণ এক ঘটনা! সে বড় করুণ! একজন তান্ত্রিক সাধু ঐ যে ভগ্নজীর্ণ কালীমন্দির দেখিলেন, সেখানে পূজা অর্চ্চনা করিতেন! শ্মশানে বসিয়া করিতেন সাধনা! একদিন সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিক গভীর নিশীথে এক চণ্ডাল বালককে চুরি করিয়া আনিয়া বলি দিয়া শবের উপর বসিয়া উপাসনা করেন! পরদিন ভোরে চৌধুরী মহাশয় জানিতে পারিলেন এবং নিজের চক্ষে দেখিলেন সেই ভীষণ দৃশ্য! দেখিলেন তান্ত্রিক কালান্তক! বালকের শব শ্মশানে ভূলুণ্ঠিত! শিহরিয়া উঠিলেন—চৌধুরী!

আর নয়! আর ত থাকা চলে না!

সংসার ছাড়িয়া হইলেন দেশত্যাগী। পুত্র থাকিতেন পশ্চিমে বেরিলি সহরে, একমাত্র পুত্র কমিশরিয়টের অফিসে, তাঁহাকে লিখিলেন সব জানাইয়া! বাবা! তোমার সংসার, তোমার সম্পত্তি বুঝে নাও, আমাকে বিদায় দাও, সংসার হইতে—বৃন্দাবনে যাব।

মাস যায়, বছর যায়, কোন উত্তর নাই।

যে পুত্র প্রতি মাসে পত্র দিতেন, সে পুত্র এমন একটি ঘটনা জানিয়াও বাবা মায়ের চিঠির উত্তর দিল না! ফিরিয়া আসিল না!

বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে পতি পত্নী দুইজনে চিরদিনের মত

সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া চলিলেন বৃন্দাবনে। সেই বৃদ্ধ শিকারী ও তাহার পুত্র মহাবীর হইল তাহাদের সাথী।

তারপর বুঝলেন বাবুমশাই—এই বাড়ীর হইয়াছে এই হাল। পাশ দিয়া কেহ যায় না। দেখে ভীষণ মূর্ত্তি তান্ত্রিক খাড়া কাঁধে করিয়া নরবলি দিতে ছুটিয়াছে। আর দেখে হারে রে রে শব্দ করিয়া মশাল জালিয়া ডাকাতেরা বাড়ী লুটিতেছে।

আপনারা কি বিশ্বাস করেন এসব? আমরা কিন্তু করি।

সেই পতিত বাড়ী—সেই ভীষণ দৃশ্য আমাদের মনে জাগাইয়া দিয়াছিল ভীষণ আতঙ্ক।

উভয়ে নীরব রহিলাম।

প্রশ্ন

বীরু চট্টোপাধ্যায়

নণ্টুদাদা, গোটা কতক প্রশ্ন তোমায় করি।
কি হতো বলতো দাদা,
যদি রক্ত হতো সাদা,
ছেলেরা সব উঠতো ক্লাশে বই পত্র না পড়ি'?

হতো যদি জাম গাছে ধামা ধামা টাট্‌কা খই?
বলতো দাদামণি
যদি পাওয়া যেত মণি
পথে পথে। ট্রামে চড়তে লাগতো যদি মই?

কই মাছ থাকতো ঝুলে সিম্ গাছ ভরে,
চাঁদ মামা এসে কাছে
ওরিয়েণ্টালি ধাঁচে
নেচে নেচে ফিরে যেত মোটরেতে চড়ে?

আষাঢ়ের মেঘ থেকে দুধ বৃষ্টি হতো,
আকাশ কুসুমগুলি
আকাশের মায়া ভুলি
যদি ঝরে পড়ে দাদা হেথা অবিরত?

এ সব তত্ত্বগুলি (দাদা) সদা ভেবে মরি,
মগজের ফাঁকে ফাঁকে
এগুলো সদাই থাকে
তুমি বল এসব ফেলে কখন পাঠ্য পড়ি?
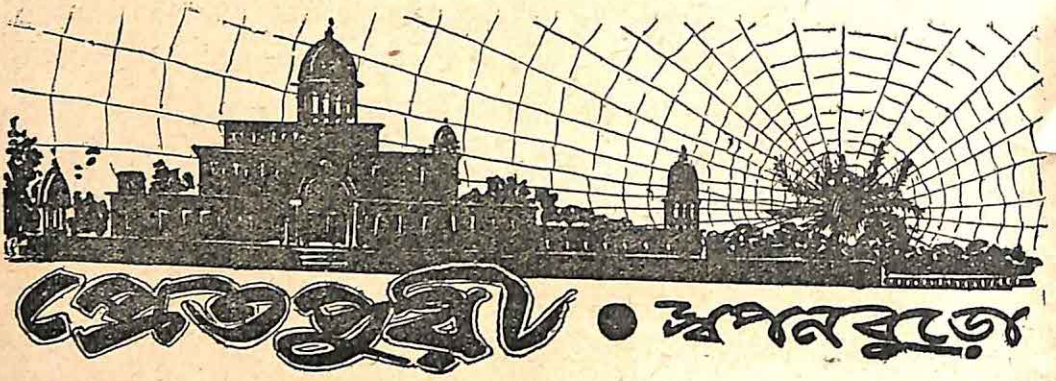
খোকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে—বাগানের মধ্যে ঢুকলো। হিমেলকেও কে যেন টেনে নিয়ে এলো সেইখানে।

কি বিপদ! ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অবলীলাক্রমে যেন উড়ে চল্লো খোকা। হিমেলের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, হাত-পা গেল ছড়ে, ক'বার হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিলে।

বনের অনেকটা মধ্যে ঢুকে পড়ল খোকা।

সেখানে একটি জীর্ণ কালীমন্দির। কালীমন্দিরের পাশে একটি উঁচু ঢিপি—ইট দিয়ে বাঁধানো। হঠাৎ দেখে মনে হয় প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে। খোকা সেই ঢিপির ওপরে গিয়ে দাঁড়ালো।

এত অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও হিমেলের খোকাকে দেখতে কোন অসুবিধে হল না।

ঠিক এই সময় মাথার ওপর একটা কাল প্যাঁচা বিশ্রী সুরে ডেকে উঠল।

খোকা সেই বাঁধানো ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে আর একবার হিমেলের দিকে করুণ নয়নে তাকালো।

কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। একটি লম্বা সাপ খোকাকে জড়িয়ে ধরে কপালের ওপর ক্রমাগত ছোবল মারছে।

খোকা বিষের জ্বালায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে একেবারে ঢলে পড়ল সেই ঢিপির ওপর।

এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য চোখের ওপর ঘট্‌তে দেখে হিমেল সেইখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

আশে-পাশে চারদিকে কার যেন বুক ফাটা আর্ত্তনাদ শোনা গেলো!

* * *

ওপরের নিস্তব্ধকক্ষে তিন বন্ধু তখনো ঘুমে অচেতন।

সেই অন্ধকার প্রেতপুরীতে কে এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সর্ব্বহারার কান্না কাঁদে ?

সেই কান্নার রেশে পাষাণ-পুরীর ইট-কাঠ-পাথরগুলিও বুঝি গলে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেবে !

হঠাৎ একটা অসহ্য বেদনায় অমিতাভের ঘুম ভেঙে গেল ! গলার কাছে কি কথা ঠেলে ঠেলে উঠছে···কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না ! সে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে।

প্রথমটা বুঝতে পারলে না সে কোথায় আছে !

তারপর আচম্‌কা প্রেতপুরীর কথা মনে পড়ে গেল ওর !

একি ! পাবক আর চঞ্চল সোফায় পড়ে ঘুমুচ্ছে—কিন্তু হিমেল কোথায় ?

এখন ত' হিমেলেরই পাহারা দেবার সময় !

প্রাণপণ চীৎকারে অমিতাভ ডাক্‌লে, হি—মে—ল !

একটা বিকট অট্টহাস্য হা-হা করে জানালা-দরজাগুলি খুলে ফেলে শেষ রাত্তিরের শীতের হাওয়া বইয়ে দিয়ে গেল।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে পাবক ও চঞ্চলকে ঠেলা দিয়ে ডাক্‌তে লাগলো, ওরে—পাবক, চঞ্চল, শীগ্‌গীর ওঠ— !

অমিতাভের আচম্‌কা আক্রমণে ওরাও দুজনে বিভ্রান্ত চোখে উঠে বসল।

—কি—কি—ব্যাপার কি ?

—হিমেলকে পাওয়া যাচ্ছে না !

—অ্যাঁ ! সে কি !

—ভূতের দল ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি ?

—তবে বোধহয় নিশির ডাক !

—উঁহুঁ ! মাকড়শার কাণ্ড !

এইভাবে যার মনে যা এলো মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো।

কিন্তু শুধু মন্তব্যে ত' হিমেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অমিতাভ বল্লে, চলো সবাই নীচে, সারা বাড়ীটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে।

ওপরের আশে-পাশের ঘরগুলো একবার দেখে নিয়ে ওরা পা টিপে টিপে নীচে চলে এলো।

সারা বাড়ী চুপচাপ···শুধু একটা কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এমন করে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে কে ?

সেই টানা বারান্দা ঘুরে ওরা অন্দর মহলের বাগানের দিকে চলে এলো।

এদিক্‌-ওদিক তাকায় সবাই !

কিন্তু হিমেলের দেখা নেই!

মানুষটা কি একেবারে কর্পূরের মতো উপে গেল নাকি?

ওই ঝোপের ভেতর একটা কান্না শোনা যাচ্ছে না?

অমিতাভের ইসারায় সবাই এগিয়ে যায় ওদিকে।

একটা থুত্থুড়ে বুড়ী—বল্‌ছে ওগো বাছারা, কে তোমরা, এইদিকে একবারটি এসো না—

এ ওর মুখের দিকে তাকায়!

শাকচুন্নির কোনো নতুন ষড়যন্ত্র নয় ত?

অমিতাভ বল্লে, চল না সবাই, দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা কি?

ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢোকে সবাই।

সেই যে কাঠকুড়ুনী বুড়ী—শনের মতো পাকা চুল—সেই ওখানে দাঁড়িয়ে। বল্লে, এক দুধের বাছা, এখানে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এসো ত' তোমরা—দেখ ত!

সবাই ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তাইত! ওদের হিমেলই ত!

সবাই মিলে নাম ধরে ডাক্‌তে থাকে।

বুড়ী কোত্থেকে এক আজলা জল এনে হিমেলের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দেয়।

হিমেল এইবার চোখ মেলে তাকায়—

তারপর হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে,—সাপ-সাপ! খোকাটাকে জড়িয়ে ধরেছে! ছোবল মারছে! বাঁচাও-বাঁচাও।

চঞ্চলের সব কথা মনে পড়ে যায়।

এইবার থুত্থুড়ে বুড়ীটার দিকে তাকায়। তারপর চীৎকার করে ওঠে—পার্ব্বতি! তুমি।

পার্ব্বতী পাগলের মতো হো-হো করে হেসে ওঠে।

হিমেল ততক্ষণে উঠে বসেছে।

কার যেন ডাক সে শুনতে পেয়েছে।

এগিয়ে যায় সেই ঢিপির দিকে। বলে, এইখানে খোকাকে পুঁতে রেখেছে। এসো সবাই মিলে জমি খুড়ি—ওকে টেনে তুলি।

বাঘিনীর মতো ছুটে আসে পার্ব্বতী।

আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে, না—না, তোমরা জমি খুঁড়ো না। আমি জানি, আমার সেই পুতুলী খোকা এইখানে ঘুমুচ্ছে।

কতকাল পরে ওর দুচোখ জলে ভেসে যায় কে জানে! আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করে বলে, ওর ঘুম তোমরা ভাঙিও না।

এইবার এগিয়ে আসে অমিতাভ।

সান্ত্বনার সুরে বলে, সব আমি বুঝতে পেরেছি পার্ব্বতী! এই প্রেতপুরীতে আজও তুমি কাকে আগলে বেড়াচ্ছ। ওই জমি আমরা খুঁড়বো। সেখানে যদি কোনো শিশুর কঙ্কাল মেলে তবে তাকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেবো।
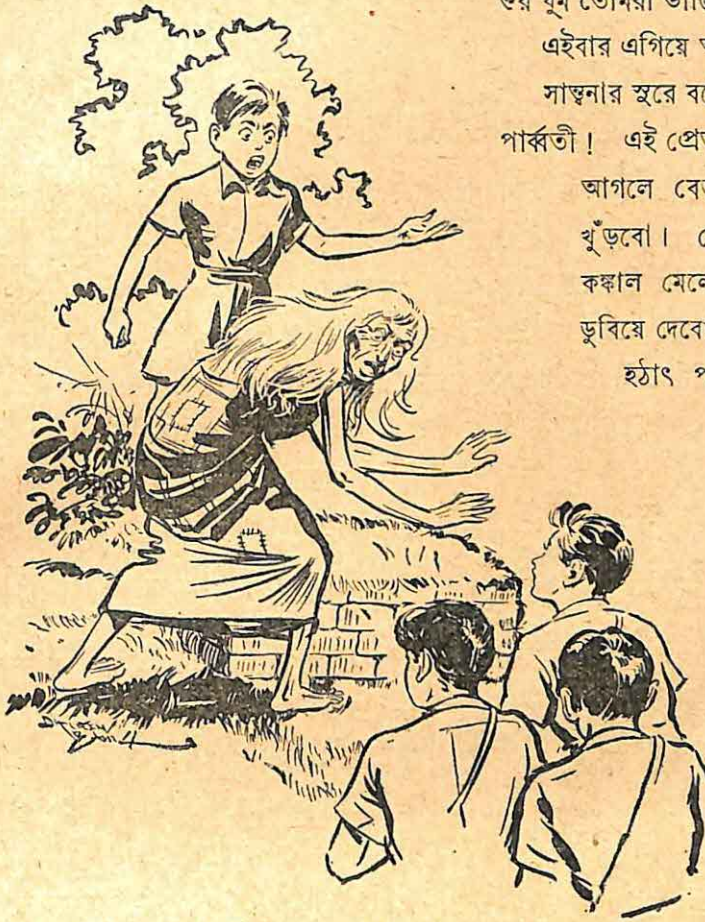
হঠাৎ পার্ব্বতীর মুখে-চোখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেবে? দাও, দাও, তাই দাও। সাপের বিষের জ্বালায় বড্ড জ্বলেছে। গঙ্গার শীতল জলে অন্ততঃ ওর হাড় ক'খানা ঠাণ্ডা হোক —ঠাণ্ডা হোক—!

উন্মাদের মতো হাস্‌তে হাস্‌তে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যায় সেই কাঠকুড়ুনী বুড়ী।

ততক্ষণে পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। সেই ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর পাখ-পাখালী ডেকে উঠেছে।

কি আশ্চর্য্য! প্রেত-পুরীতেও পাখী ডাকে?

— শেষ —

বাঙ্গলায় শাড়ীপরা

কাফী খাঁ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কিন্তু একটা অসুবিধা হলো এই যে তখনকার দিনের মেমেদের গাউনের দেখাদেখি এই 'ড্রেস' করে শাড়ী পরার পর দেখা গেলো—মাথায় ঘোমটার জন্য শাড়ীর আর কিছু অবশিষ্ট নেই! তখন মাথায় veil বলে একটা জিনিষ ব্যবহার করা আরম্ভ হলো মেয়েদের মধ্যে। এটা অনেকটা তখনকার দিনের মেমদের টুপী থেকে মুখ ঢাকা নেটেরই অনুকরণ। তোমরা যদি কেউ দেশবন্ধু দাশের মায়ের এই ড্রেস করা ফটো বা স্বর্ণকুমারী দেবীর ফটো দেখে থাকো তবে এর সবই বুঝতে পারবে। কিন্তু veil-টা ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো একটা ঝঞ্ঝাটের জিনিষ। তাই শাড়ীর মাপ আরো লম্বা করে সেটা দিয়েই মাথার ঘোমটার কাজ হতে লাগলো তার পরের যুগ থেকে। এর ড্রেসের জন্যে দরকার হতো বাঁদিকে শাড়ী কুচিয়ে safetypin আটকাবার জন্য একটা brooch, আর মাথার কাপড় যাতে খসে পড়ে না যায়, সেজন্যে একজোড়া লেসপিন।

এ সবই চলছিল বেশ। কিন্তু তারপরেই এসে গেলো প্রথম মহাযুদ্ধ। বিলেতে ও ভারতে সাড়া উঠলো 'খরচ কমাও', 'বাড়তি কাপড়ের ব্যবহার কমাও', ইত্যাদি। মেমদের পেছনকার ঐ মুরগীর লেজের মতো ঝোলানো ও মাটিতে লোটানো গাউনগুলো কমতে কমতে এসে তাদের হাঁটুতে গিয়ে উঠলো। বিলেতের মেমদের দেখে তখন মনে হতো যেন তারা একখানা বাঁন্দিপোতার গামছা জড়িয়ে রাস্তায় দাপাদাপি করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।—যেমন পরশুরাম তাঁর কেদার চাটুজ্যের 'স্বয়ম্বরা'র বিবরণে লিখেছেন। এতে একটা খুব সুবিধা হলো এই। মেমদের চলাফেরায় আগেকার গাউন ব্যবহারের সেই মন্থর গতির বাধা আর রইলো না। মেয়েরা চটপট করে হালকা ভাবে চলতে শিখলো। কিন্তু যুদ্ধের জন্য কাপড়ের টানাটানির ফলে হাঁটুতে বেশী কাপড় দেওয়া হতো না বলে মেমদের একটু পা আটকানো ভাবে নেংচে নেংচে চলতে হতো। সেই জন্যই মেমদের এই পোষাকের নাম হলো hobble skirt, অর্থাৎ খুঁড়িয়ে হাঁটা স্কার্ট। এই স্কার্টের হাঁটুর দুপাশে

একটু করে কেটে দেওয়া হতো মেমদের হাঁটার সুবিধার জন্য। এই ফ্যাশানটা আজও চীনা মেয়েদের স্কার্টের দু'পাশে দেখা যায়।

এই হব্‌ল্‌স্কার্ট ধরণের শাড়ী পরার কায়দা প্রথম ভারতে আমদানী করে বাঙ্গালী মেয়েরা। আমার ঠিক মনে নেই, বোধ হয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। এই হব্‌ল্‌স্কার্ট শাড়ী পড়ার ফ্যাশনটাই হচ্চে সাধারণভাবে আজকাল আমরা যা বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে দেখি। এবং এখন থেকেই এটা সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছে। শুধু সারা ভারতেই বা বলি কেন, বিদেশের মেমরা পর্য্যন্ত শাড়ীর সৌন্দর্য্য ভুলতে পারে না বলে তাদেরও অনেকে সখ করে এই ধরণে শাড়ী পরে। তোমরা বোধ হয় জানোনা যে, বিশ্ববিজয়িনী রুশ নর্ত্তকী Anna Pavlova ১৯২৮ এর শীতে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তিনি একজন বাঙ্গালী শিল্পীকে বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে তাদের মেয়েদের পোষাক পরার ধরণ দেখলাম। কিন্তু তোমাদের এই Indian saree, বাঙ্গালায় যা দেখে গেলাম পৃথিবীর কোথাও এমন সুন্দর জিনিষটি আর দেখিনি। এ অপূর্ব্ব।" বলাবাহুল্য, এটা কিন্তু হব্‌ল্‌স্কার্ট শাড়ী পরার ধরনকেই বলা হয়েচে।

হিসাবের ও টানাটানির জন্য
ইস্ত্রী করা STREAMLINE যুগ

ভারতের এই হব্‌ল্‌স্কার্ট শাড়ী পরার পদ্ধতি কিন্তু প্রথমে এই রকম ছিল না। এখন আমরা যে ধরণে শাড়ী পরা দেখি, অর্থাৎ সুমুখে কিছুটা কুচি দিয়ে পা দুটোকে চলবার সুবিধা দিয়ে শেষে পেছনদিকে একটা ফের্ত্তা ঘুরিয়ে সমুখে বাঁ কাঁধের ওপর নিয়ে যাওয়া—এই ধরণটা আগে ছিলো না। এখনকার পদ্ধতিতে এগারো হাতের শাড়ী হলেও চলে, প্রথমকার হব্‌ল্‌স্কার্টের যুগে কিন্তু আড়াই ফেরতা দিয়ে শাড়ী পরা আরম্ভ হয়েছিলো, তাতে পা দুটো হাঁটুতে শাড়ীর ঐ ডবল ফেরতার জন্য অত সরগর থাকে নি, আর কাপড়ও লাগতো এই জন্য আরও তিন চার হাত বেশী, সেইজন্য প্রথম ফ্যাশানটা উঠে গিয়ে এখনকার ফ্যাশানটাই পৃথিবীময় চালু হয়ে গিয়েছে।

এবার শেষ কথাটা বলি। আমাদের এখনকার এই চলতি শাড়ী পরার ধরণ কিছুটা তেলেঙ্গী

ও কিছুটা গুজরাটী ধরণ থেকে নেওয়া। তবে আমাদেরটায় মডার্ণ ও stream lining ও curve এর ছাপ রয়েচে। তাই এটা এত সুন্দর। এতে আরেকটা জিনিষ আছে। আমরা শাড়ীর আঁচল তুলে দিই বাঁ কাঁধে। অর্থাৎ ঠিক যে ভাবে বামুনেরা পৈতা ব্যবহার করে। ভারতের সমস্ত অনার্য্য জাতিই শাড়ীর আঁচল তুলে দেয় বাঁ কাঁধে। এক গুজরাটী, পার্শী ও হিন্দুস্থানী মেয়েরা দেয়না। তাদের শাড়ীর আঁচল ওঠে ডান কাঁধে। কেন, জানো? তবে শোন! বামুনদের তর্পণ ও শ্রাদ্ধের সময় পৈতাকে তিন রকমে ঘুরিয়ে পরতে হয়। যেমন, ডান কাঁধে পৈতা পরলে তার নাম হলো 'প্রাচীনাবীতী'। গলায় মালার মতো করে পৈতা পরলে তার নাম হলো 'নিবীতী'। অর্থাৎ নিবী বন্ধন বা কোমরের বাঁধন পর্য্যন্ত যে পৈতা ঝুলে রয়েছে। আর বাঁ কাঁধের উপর পৈতা পরলে সেটা হয় 'উপবীতী'। 'প্রাচীনাবীতী' মানে জানো? বামুনের উপনয়ন ও গায়ত্রী এসব হলো বৈদিক আমলের আর্য্যদের জিনিষ। আর্য্যরা ভারতে আসার আগে অর্থাৎ ইরাণে ও

পৈতা ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি

মধ্য এশিয়ায় তারা যে ধরণে পৈতা ব্যবহার করতো সেটা ডান কাঁধ থেকে বাঁদিকে ঝোলানো হতো। এটাই ছিল প্রাচীন পদ্ধতি, তাই 'প্রাচীনাবীতী'। সেই প্রাচীন ইরাণের পার্শী নিয়মটা পার্শী এবং পূর্ণ আর্য্যসভ্যতাসম্পন্ন গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী মেয়েরা এখনও মেনে চলে বলেই ওদের আঁচল ডান দিকে। এমন কি এই প্রাচীনাবীতী ইউরোপের Military-তেও দেখা যায়। তাদের চামড়ার চাপরাশ সব ডানদিকের কাঁধ থেকে বাঁ দিকের নিচে নেমে আসে। (শেষ)

অদ্ভুত যত জন্তু-জানোয়ার

প্ল্যাটিপাস

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আজ তোমাদের আর একটি সৃষ্টিছাড়া জন্তুর কথা বলব। এর নাম হচ্ছে হাঁসঠুঁটি প্ল্যাটিপাস। ওর ঠোঁটদুটো অনেকটা হাঁসের মত বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক নাম আছে ওর, যেমন, জল-ছুঁচো, হাঁস-ছুঁচো ইত্যাদি।

কবি সুকুমার রায় হাঁস আর সজারুকে মিলিয়ে বানিয়েছিলেন 'হাঁসজারু', কিন্তু ভগবান অনেকগুলো জীবজন্তুর আকৃতি আর প্রকৃতিকে মিলিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই প্ল্যাটিপাসকে। ওর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সাপজাতীয় জীবের, মাছ, পাখী আর কুকুর-ঘোড়ার প্রকৃতি আর আকৃতির কিছুটা। ও জলে সাঁতার কাটে, ডাঙ্গায় হেঁটে বেড়ায়, ও নদীর তীরে গর্ত করে ডিম পাড়ে, কিন্তু ওর বাচ্চারা দুধ খেয়ে বড় হয়। কেমন মজার ব্যাপার, তাই না ?

এই অদ্ভুত জন্তুটিকে দেখতে পাওয়া যায় কেবল টাসমেনিয়া আর অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলসমূহে। অন্য কোথাও এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলেও এর দেখা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, যে সব অঞ্চলে ওর বাসস্থান সেখানেও সচরাচর ওদের দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, জীবটি হচ্ছে অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির আর নিরীহ। দিনের বেলায় বড় একটা গর্ত ছেড়ে বের হতে চায় না। কিন্তু তবু প্ল্যাটিপাস নিজের বংশকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। কারণ প্ল্যাটিপাসের ফার বা লোম এবং লোমের তৈরী 'কোট' ও 'রাগ' খুব চড়া দরে বিক্রী হয়। তাই অনেকে নির্বিচারে ওদের হত্যা করতে একটুও মায়া করত না। অথচ আমি জানি তোমরা যদি দেখ তবে নিশ্চয় ওকে কোলে নিয়ে আদর করতে,

বিশেষ করে ওর ওই ধূসর রঙের লোমের জন্য। যাক্, লোকে যাতে মেরে মেরে এই সুন্দর জীবটির অস্তিত্ব লোপ না করে ফেলে তাই পরে প্ল্যাটিপাস মারা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৭৯৭ সালে সর্বপ্রথম এই প্রাণীটিকে দেখতে পাওয়া যায়। পশুপাখী সম্বন্ধে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন, প্ল্যাটিপাস হচ্ছে প্রাচীন অর্থাৎ পুরাকালের জীবজন্তুর শেষ চিহ্ন। ওর পর থেকেই আধুনিক কালের জীবজন্তু সৃষ্টি হতে থাকে, অর্থাৎ প্ল্যাটিপাস হচ্ছে জীবজগতের বিবর্তনের একটি ধাপ।

ঠোঁট থেকে লেজ পর্য্যন্ত প্ল্যাটিপাসের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২০ ইঞ্চি। তবে মাদী প্ল্যাটিপাস এর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক ছোট হয়। কিন্তু পুরুষের চেয়ে মাদী প্ল্যাটিপাস পরিশ্রমী বেশী।

প্ল্যাটিপাসের চেহারাটা অনেকটা ডিমের মত কিন্তু ডিমের মত তেমন সুন্দর নয়, কেমন যেন
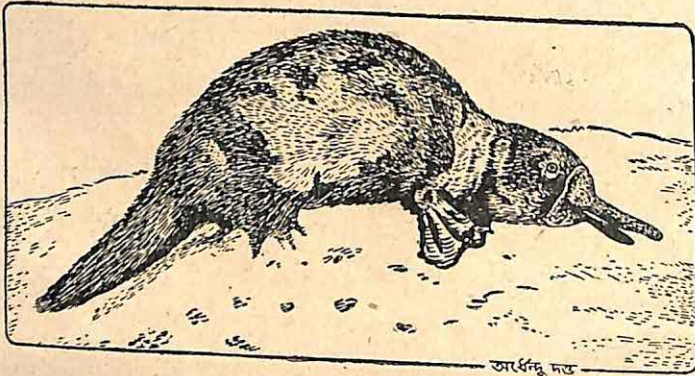
বাঁকাচোরা। সারা গায়ে ওর রয়েছে খুব ঘন নরম আর ছোট ছোট লোম অনেকটা ভোঁদড়ের মত। পিঠের দিকে এই লোমের রং হচ্ছে গাঢ় ধূসর আর পেটের দিকের লোম সামান্য ফ্যাকাশে। প্ল্যাটিপাসের লেজটা খাটো আর চ্যাপ্টা, অনেকটা বীবরের মত কিন্তু প্ল্যাটিপাসের লেজটা ওর মত নগ্ন আর আঁশযুক্ত নয়, তাতে লম্বা, খসখসে, ঝাঁটার কাঠির মত চুল রয়েছে। দেখলেই মনে হয় ওগুলো অত্যন্ত অযত্নবর্ধিত।

প্ল্যাটিপাসের ঘাড় বলে কিছু নেই। ওর দেহের সঙ্গেই যেন মাথাটা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ মাথাটা শেষ হয়েছে হাঁসের মত ঠোঁট জোড়াতে। এই ঠোঁট দুটো হাঁসের ঠোঁটের চেয়ে চ্যাপ্টা আর চওড়া। পাখীর ঠোঁটের চেয়ে ও দুটো বেশী স্পর্শকাতর। ওদের ঠোঁটদুটোকে বলা যেতে পারে সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ওষ্ঠ আর নাসিকার সমবায়। ওদের এই ঠোঁটদুটো ঠিক কিন্তু ওদের মাথার খুলি থেকে বেরয়নি। এদুটো সম্পূর্ণ পৃথক—কেবল শরীরের চামড়ার সঙ্গে আটকান আছে। . এই ঠোঁটদুটোর কাজ হচ্ছে কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে ছোট্ট ছোট্ট পোকা, মাছ ইত্যাদি বের করা।

কারণ এসব খেয়েই সে বেঁচে থাকে। ঠোঁটদুটো যখন সে কাদার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তখন যাতে ওর চোখে কাদা না ঢোকে তারও বন্দোবস্ত রয়েছে। ঠোঁটের উপরের চামড়াটা এসে কুঁচকে ঢেকে দেয় চোখকে।

প্ল্যাটিপাস হচ্ছে উভচর প্রাণী অর্থাৎ এটা মাটিতে যেমন হেঁটে চলতে পারে তেমনি জলেও সাঁতার কাটতে পারে। ওর চারটি পায়ের নখগুলোই ঠিক হাঁসের পায়ের মত পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। সাঁতারের সুবিধার জন্যই এভাবে রয়েছে। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াবার জন্য এরা ইচ্ছে করলেই নখের উপরের চামড়াটা গুটিয়ে নিতে পারে। প্ল্যাটিপাস এমনিতে খুবই নিরীহ প্রাণী, কিন্তু শত্রুকে ঘায়েল করবার জন্য সে নখ দিয়েই আঁচড়ে দেয়। এই আঁচড়ের ফলে যে ঘা হয় তা সহজে শুকুতে চায় না।

প্ল্যাটিপাস জলের জীব হলেও একে কেবল জলচর জীব বলা যায় না। বেশীক্ষণ জলে থাকলেও ওর ডুবে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ও বেশীক্ষণ জলে থাকতে চায় না। গভীর জলে যেতেও ও পছন্দ করে না। কিন্তু প্ল্যাটিপাস সাঁতরাতে আর 'ডাইভ' দিতে খুবই ওস্তাদ। এদের দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। সামান্য শব্দ শুনেই এরা সতর্ক হয়ে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে যায়।

ধাড়ী প্ল্যাটিপাসের মুখে কোন দাঁত নেই। অথচ মজার ব্যাপার এই, বাচ্চা প্ল্যাটিপাসের মুখে দাঁতের মত চোখা চোখা কতকগুলি বস্তু থাকে। ধাড়ী প্ল্যাটিপাশের মুখে থাকে কয়েকটি শক্ত পাত, যাতে ছোট ছোট ছুঁচলো বস্তু থাকে। এদের চোখ আছে, কিন্তু বাইরের দিকে কোন কান নেই। এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব ছোট, কিন্তু খুব শক্ত।

এরা নদীর ধারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট লম্বা গর্ত করে এবং গর্তের শেষ মাথায় শিকড়বাকড়, গাছপাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং ওখানেই ডিম পাড়ে। একবারে একটি থেকে চারটি ডিম পাড়ে ওরা। ডিমগুলোর খোল শক্ত নয়, নরম। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে মাদী প্ল্যাটিপাস বাচ্চাগুলোকে বুকে নিয়ে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকে। বাচ্চাগুলো মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়। কুকুর ইত্যাদির মত এদের মাই নেই। এদের বুকে বড় বড় গর্ত থাকে। তা দিয়েই দুধ বেরিয়ে আসে এবং বাচ্চারা তা চেটে চেটে খায়। কুকুর ছানা বা বেড়ালের বাচ্চার মত এই বাচ্চাগুলো যখন খেলা করে তখন দেখতে ভারী চমৎকার লাগে।

রাজার চোখে সরষে ফুল

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

হায় কি কাণ্ড! সরষের ফুল
দেখছে রাজা চক্ষে।
রাত দুপুরে মন্ত্রী এল
দুরু দুরু বক্ষে।

রাজা বলে—কেন মন্ত্রী নাকটা হল বন্ধ?
ঢোকেনা যে নাকের ভেতর আলো হাওয়ার গন্ধ।
একশো তোলা নস্যি উজার
হল নিদেন পক্ষে।
হায় কি কাণ্ড! সরষের ফুল
দেখছে রাজা চক্ষে!

হদিস কিছু মিলল না আর
ঘেটে পুঁথিপত্র;
দেখল তিথি, লগ্ন, রাশি
নাড়ী ও নক্ষত্র।

বলল রাজা—মন্ত্রি, সবার নাকগুলো দাও খুবরে;
লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি গুণে ফেলো উপড়ে।
মন্ত্রী বলে—দাড়ির মাঝে বেজায় পঁচা গন্ধ,
ধরতে গেলে ফসকে পালায়, দম হয়ে যায় বন্ধ।
দেখুন রাজা পরখ করে
সকলের সমক্ষে।
হায় কি কাণ্ড! সরষের ফুল
দেখছে রাজা চক্ষে।

রাজা তখন এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে ধরতে,
দাড়ির কাছে নাকটি রেখে শুঁখে পরখ করতে।
নাকের ভেতর দাড়ি ঢুকে হল বিষম কাণ্ড।
উঠল কেঁপে রাজার মাথা—যেন রে ব্রহ্মাণ্ড!
সাড়ে সাতশো হাঁচি হেঁচে
পেল রাজা রক্ষে।
হায় কি কাণ্ড! সরষের ফুল
দেখছে রাজা চক্ষে।

বরফের ভেল্কী

যাদুকর এ. সি. সরকার

'বরফের ভেল্কী' খেলাটা চমৎকারিত্বে অন্যান্য খেলার চেয়ে কোন অংশেই কম নয় যদিও এর কৌশলটা খুবই সহজ। টেবিলের উপরে সামান্য ব্যবধানে রয়েছে ছুটো কাঠের টুকরো। যাতুকরের সহকারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন একটা ফুট দেড়েক লম্বা প্রায় ৬" × ৬" মোটা বরফের টুকরো হাতে নিয়ে আর রাখলেন কাঠের টুকরোর ওপরে, ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে। একটা লোহার সরু মতন তার (যে রকম মোটা তার সেতার এসরাজ ইত্যাদিতে প্রথম তার হিসাবে ব্যবহার করা হয়) নিয়ে যাতুকর দিলেন দর্শকদের হাতে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। এরপর যাতুকর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে কোন জিনিষ না কেটে তার ভেতর দিয়ে কোন কিছু ভেদ করে যেতে পারে না কিন্তু আমি আপনাদের দেখাবো যে সে কথা সত্যি নয়।" এই কথা বলে যাতুকর বরফটার ঠিক মাঝ বরাবর তারের একটা ফাঁস লাগিয়ে ফাঁসের নীচের দিকে গাঁঠ দিয়ে সেই গাঁঠের সঙ্গে একটা সের দশেক ওজনের আংটাওয়ালা বাটখারা ঝুলিয়ে দিলেন।

এই বারেই আরম্ভ হয় আজব কাণ্ড। বাটখারার ওজনের ভারে তার বরফ কেটে নামতে থাকে নীচের দিকে এবং অল্প কিছু-কাল পরেই পুরোপুরি বরফের খণ্ডটা ভেদ করে নীচের দিকে নেমে আসে। দর্শকেরা দেখে অবাক হন যে বরফের খণ্ডটার কোন ক্ষতিই হয় না এতে। কেটে যাওয়া তো দূরের কথা—সামান্য একটু দাগও পড়ে না এর ফলে বরফের টুকরোর গায়ে। বরফের ধর্ম্মই হচ্ছে এই। বাটখারার ওজনের টানে তারের চাপ পড়ে বরফের ওপরে আর ওই অংশের বরফ যায় গলে। সেই বরফ গলা জলে তার ডুবে যায় আর নীচের শক্ত বরফের গায়ে দেয় চাপ সেই চাপে নীচের স্তরও গলে যায় কিন্তু ইত্যবসরে ওপরের বরফ গলা জল আবার জমে বরফ হয়ে যায়। এই কারণেই বরফের টুকরো কেটে ছুখানা হয়ে যেতে পারে না কোন মতেই।
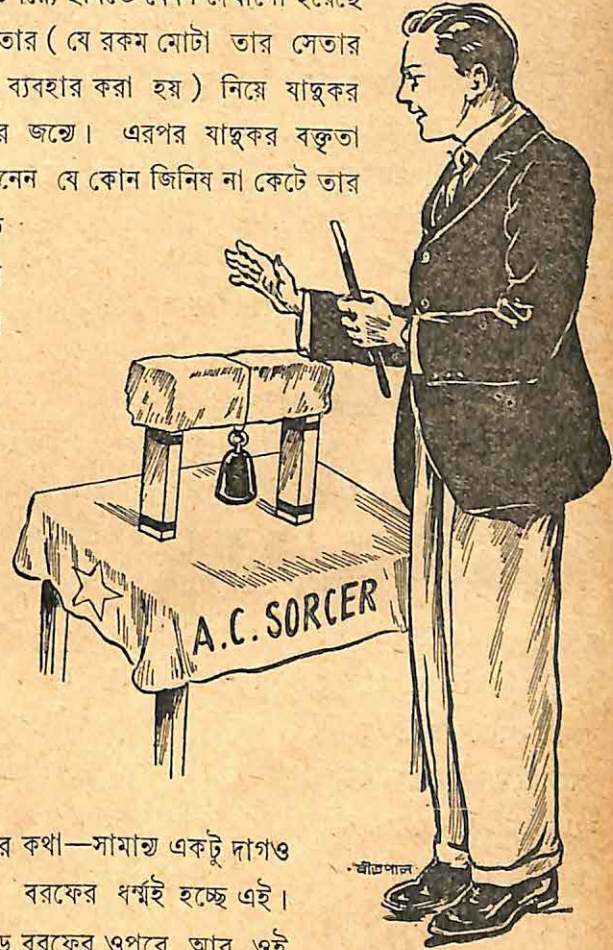
রণজিত মুখোপাধ্যায়

[সত্যি ঘটনা অনেক সময় রোমাঞ্চক কল্পনার থেকেও রোমাঞ্চকর। অতীত ও বর্তমানের পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত সেই সব সংবাদ এই নতুন বিভাগটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। নিছক গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাবে এতে। —সম্পাদক]

রবিনসন ক্রুশো

১৬৯৫ সাল। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে এক ডানপিটে তরুণ আর তার বন্ধু ড্যাম্পিয়ের নামে সমান ডানপিটে আরেক তরুণ অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে ঘর ছাড়লো। দুজনেরই বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে। দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযাত্রী একটি দলে নাম লিখিয়ে তারা পাড়ি জমালো অথৈ জলে। দিনের পর দিন কাটতে থাকে সমুদ্রের বুকে। সেলকার্ক ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়তে লাগলো—বৈচিত্র্যের মোহে সে রওনা দিয়েছিলো অজানার উজানে কিন্তু এরকম একঘেয়েমীতে মন ওঠে না তার। ফলে প্রায়ই জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হোলো। অবাধ্য তরুণের ঐ রকম ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে কাপ্তেন তাকে জানালেন যে, যদি সে নিজেকে সংযত করতে না পারে তাহলে কোনো এক নির্জন দ্বীপে জাহাজ থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। তিনি ভেবেছিলেন এতে বুঝি চৈতন্য হবে সেলকার্ক-এর। কিন্তু ফল হোলো উল্‌টো। কাপ্তেনকে সে মুখের ওপর বলে দিলো যে, অনায়াসে যে কোনো নির্জন দ্বীপে কাটাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তার। কাপ্তেন তো আগে থেকেই রেগে ছিলেন, এখন এই কথা শুনে তিনি ঘোষণা করলেন যে, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ চোখে পড়লেই জাহাজ থেকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হবে সেলকার্ককে।

জাহাজ একদিন থামলো একটি দ্বীপে। দ্বীপটির নাম জুয়ান ফার্নাণ্ডো। চারিদিকে ধূ ধূ সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটি বিন্দুর মতো। একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে সেলকার্ককে নামিয়ে দেওয়া হোলো এখানে। প্রথমে সেলকার্ক দেখিয়েছিলো খুবই তাচ্ছিল্যের ভাব। কিন্তু জাহাজ যখন চলে গেল তখন সে রীতিমতো মুষড়ে পড়লো। সে বুঝতে পারলো যে এমন নগণ্য একটি দ্বীপে কোনো জাহাজের আসবার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং তার উদ্ধার পাবার আশা সুদূরপরাহত। ক্রমে দিন কাটতে লাগলো। অতিক্রান্ত হোলো চারটি বছর। নির্জন

দ্বীপে একা একা জীবন সংগ্রামের চাপে অকাল বার্দ্ধক্য বাসা বাঁধলো তার দেহে এবং মনে। প্রবল মানসিক চেষ্টার ফলে সে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হোলো নিজেকে কোনো রকমে। উদ্ধার পাবার সব আশা যখন সে ছেড়ে দিয়েছে তখন একদিন সেলকার্ক একখানি জাহাজের দেখা পেলো। ক্রমে ক্রমে তার বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে জাহাজ এসে তীরে লাগলো। সেলকার্কের বন্ধু ড্যাম্পিয়ের, যার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলো সে রোমাঞ্চের সন্ধানে, ফিরে এসেছে বন্ধুকে উদ্ধার করতে।

তারপর যা ঘটলো তা অভূতপূর্ব। ধূ ধূ সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীপটির নির্বাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সেলকার্ক যখন লণ্ডনে উপস্থিত হোলো তখন সারা শহর ভেঙে পড়লো তাকে দেখবার জন্যে, সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লো সে! ড্যানিয়েল ডীফো নামে একজন ইংরেজ সাহিত্যিক তার এই কাহিনী নিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করলেন। আজকের দিনে অনেকেই হয়তো আলেকজাণ্ডার সেলকার্ককে ভুলে গেছে কিন্তু এই গ্রন্থখানি অমর হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে। বিশ্ব সাহিত্যের এই চির-নতুন গ্রন্থখানির নাম **"রবিনসন ক্রুশো।"**

জ্যষ্ঠির দুপুরে

পলাশ মিত্র

জ্যষ্ঠির দুপুরে
গাঁয়ের ঐ পুকুরে
ডুব দেয় মাছরাঙা
খায় পানা জল।
ময়না শালিক টিয়ে
গান গায় শিস্ দিয়ে
ফাঁকা মাঠে রোদ্দুর
করে ঝলমল।

জ্যষ্ঠির দুপুরে
হাসে খোকা খুকুরে
ঠাকুমা সেলাই করে
বুড়ো দাদু ঘামে।
কেউ শুয়ে ছবি আঁকে
কেউ পড়া দেয় মাকে
দিদি ব'সে মাখে নুন
আনারস জামে।

এ দুপুর লাগে ভালো
আচার আর আমে॥

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—শেঠ ঢুণ্ডুরাম—

ওঠো জোয়ান—হেঁইয়ো !

পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালা জ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনো লাফাতে দেখিনি—সুড়্ সুড়্ করে শুঁড় বের করতে দেখেছি কেবল। কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনো লাফায়—আনন্দে হাত পা তুলে নাচতে থাকে—তা হলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমনি করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট।

পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই—ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে! ও-ধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁতটাত বের করে সেটাকে বিচ্ছিরি করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে, কিচঁ—কিচঁ—কিচ্চুঁ—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু!—তারপরে টুক্ করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পায়ের তলার গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ুইয়ের গ্যাঙানি শোনা যাচ্ছে। শুনে আমার

বেশ লাগছিল। আমাকে বলে কিনা কাট্‌লেট্‌ করে খাবে। যাচ্ছেতাই সব ইংরেজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী! বেশ হয়েছে! পাহাড়ী কাঁকড়া বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে।

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে। এখনো তার ভেতর দিয়ে পিছলানোর দাগ—ওই পাষণ্ড গোবরই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ভারী রাগ হল। গোবরকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাকে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল! ভারী কঁ্যাচড়া গোবর তো। একেবারে নাকে মুখে ছিটকে এল যে! দুত্তোর!

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে? সরে পড়া যাক এখান থেকে। পত্রপাঠ।

যাই কোন্ দিকে? ঝন্টি-পাহাড়ী বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই কোন্ ধার দিয়ে? কিভাবে যে এসেছিলুম, ওই মোক্ষম আছাড়টা খাওয়ার পর মাথার ভেতরে সে-সমস্ত একেবারে হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে? আমার আবার একটা বদ্ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিশতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম: দেখেছ ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তর দিক থেকে কী চমৎকার সূর্য উঠছে!—শুনে ফুচুদা কড়াং করে আমার একটা লম্বা কানে মোচড় দিয়ে বলেছিল, স্ট্রেট্ এখান থেকে রাঁচী চলে যা প্যালা—মানে রাঁচীর পাগ্‌লা গারদে।

কোন্ দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই—আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চম্‌চম্। ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুঁটি গুঁটি মেরে ও কারা আসছে? 'কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মতো ও কা'র দাড়ী উড়ছে হাওয়াতে?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—নির্ঘাৎ! তাঁর পেছনে পেছনে আরো দুটো ষণ্ডা জোয়ান—তাদের হাতে দুটো মুখ বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি। নির্ঘাৎ যোগসর্পের হাঁড়ি—মানে দই রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব। একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ুয়ের পাল্লায় পড়তে চাইনা—উঁহু—কিছুতেই না। বেঁচে থাক আমার পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল আর গাঁদালের চচ্চড়ি—আমি কেটে পড়ি এখান থেকে।

সুট্ করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়ানো যাবে না—পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমি সুড় সুড়িয়ে এগিয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি! কোন্ দিকে চলেছি জানিনা। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, নালা-ফালা টপ্‌কে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উল্‌টে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। একবার যদি দস্যু ঘচাংফুর পাল্লায় পড়ি—তা হলেই গেছি! গজেশ্বর যে-রকম চটে রয়েছে—আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না। সোজা শুক্‌তো বানিয়ে ফেলবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পরে দেখি সামনে একটা ছোট্ট নদী। ঝুর্‌ঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তির্ তির্ করে তার নীল্‌চে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট বড় পাথর। আমার পা প্রায় ভেঙে আসবার জো—তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম। আকাশটা মেঘলা—বেশ ছায়া ছায়া জায়গাটা। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চারদিকে পলাশের বন—নদীর ওপারে আবার ছুটো নীলকণ্ঠ পাখি।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে। যেমন ঠাণ্ডা—তেমনি মিষ্টি জল। খেয়ে একেবারে মেজাজ শরীফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাংফু, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা—হাবুল সেন, সব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্‌তি হল, যে আমার চ্যারা-রা-রা-রা—রামা হো—রামা হো—বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল।

কেবল চ্যা-রা-রা-রা—বলে তান ধরেছি—হঠাৎ পেছনে ভোঁপ্-ভোঁপ্-ভেঁকে!

দুত্তোর—একেবারে রসভঙ্গ! তার চাইতে বড় কথাঃ এখানে মোটর এল কোত্থেকে? এই ঝন্টি-পাহাড়ীর জঙ্গলে?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা পাথুরে রাস্তা আছে বটে। আর একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশ বনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

কী সর্বনাশ—এরাও ঘচাংফুর দল নয় তো? ডিটেক্‌টিভ্ গল্পে এই রকমই তো পড়া যায়! নিবিড় জঙ্গল—একখানা রহস্যজনক মোটর—তিনটে কালো মুখোস পরা লোক—তাদের হাতে পিস্তল—আর ডিটেক্‌টিভ্ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেণ্টের চূড়োয়! ভাবতেই আমার পালা জ্বরের পিলেটা থপাস্ করে লাফিয়ে উঠল। প্রায় কচ্ছপ নৃত্য সুরু করে আর কি!

উঠে একটা রামদৌড় লাগাবো ভাবছি—এমন সময় আবার ভোঁপ ভোঁপ। মোটরটার হর্ণ বাজল। তারপরেই গাড়ী থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থমকে গেলুম। না—কোনো দস্যুর দলে এমন লোক থাকতে পারেনা। কোনো গোয়েন্দা-কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থল্‌থলে ভুঁড়ি—দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে চেন ছিঁড়ে পড়বে। গায়ের সিল্‌কের পাঞ্জাবীটা তৈরী করতে বোধ হয় এক থান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখ—নাক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হল্‌দে পাগড়ি। গলা-টলার বালাই নেই···পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে

হয়। ঠিক থুঁত্‌নির তলাতেই এক ছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দু' হাতের দশ আঙুলে দশটা আংটী।

একখানা মোক্ষম শেঠজী।

নাঃ—এ কখনো দস্যু ঘচাংকুর লোক নয়। বরং ঘচাংকুদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে—এ সেই দলের। এরকম একটি নিটোল শেঠ্‌জী খামোকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন ?

শেঠ্‌জী ডাকলেন : খোঁখা—এ খোঁখা—

আমাকেই ডাকছেন মনে হল। কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো খোঁখাকে আমি দেখতে পেলুম না ! সাত পাঁচ ভেবে আমি গুটি-গুটি এগোলুম।

– নমস্তে শেঠ্‌জী।

—নমস্তে খোঁখা।—শেঠ্‌জী হাসলেন বলে মনে হল। বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর দুটো মিট্‌মিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম আমি। শেঠ্‌জী বললেন, তুমি কার লেড়্‌কা আছেন ? এখানে কী করতেছেন ?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল, কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝন্টি পাহাড়ী জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠ্‌জীর অতবড় ভুঁড়ির আড়ালে রহস্যের কোনো খাসমহল লুকিয়ে আছে কিনা কে বলবে !

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারীবাগের স্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকৃনিক করতে এসেছেন।

—হাঁ ? পিকৃনিক করতে এসেছেন ? শেঠ্‌জীর চোখ দুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিট্‌মিট্টে করে উঠল : এতো দূরে ? তা দলের আর সোব্‌ লেড়কা কোথা আছেন ?

—আছেন ওদিকে কোথাও।—আঙুল দিয়ে আন্দাজী যে-কোনো একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্‌টা জিজ্ঞেস করলুম : আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন ?

—হামি ?—শেঠ জী বললেন, হামি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় হামার মোকাম আছেন—রাঁচীমে ভি আছেন। এখানে হামি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ও—জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে ?—আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল : কিন্তু এ জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠ্‌জী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত আছে।

—অ্যাঁ—ভালুক ! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভুঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল : ভালুক মানুষকে কামড়াচ্ছেন ?

—খুব কামড়াচ্ছেন। পেলেই কামড়াচ্ছেন !

—অ্যাঁঃ!

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুমঃ ভুঁড়ি দেখলে আরো জোর কামড়াচ্ছেন! মানে, ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে খুব ভালোবাসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁ—রাম—রাম!

শেঠ জী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতনা।

তারপর এক মনে সিল্কের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠলঃ এ ছগ্‌গনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও! জল্‌দি!

ভোঁপ্—ভোঁপ্! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা। কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে—

—হাল্লুম!

ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা! অর্থাৎ বাঘ। রসিকতার ফল এমন যে হাতে হাতে ফলে আগে কে জানত!

—বাপ রে গেছি - বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ। শেঠ্‌জীর চাইতেও জোরে।

আর লাফ দিয়েই ঝপাং করে একেবারে নদীর কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। পেছন থেকে সঙ্গে সঙ্গে আবার জোর আওয়াজঃ হাল্লুম!

[ক্রমশঃ]

কি দিয়ে মারলো? দেখি ত! পুকুরে মাছ আছে দেখছি। বাহবা! বেশ খাওয়া যাবে।

নানান দেশের মজার খেলা

শ্রীখেলোয়াড়

যার বল সেই ধর

কমপক্ষে ১০ জন এবং বেশী হলে ৩০ জন পর্য্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলাটি খেলা চলবে।

যেখানে খেলা হবে সেই মাঠের মাঝে ৩০ ফুট ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত মাটিতে দাগ কেটে করে নেবে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এক একটি করে নম্বর থাকবে। যেমন মনে করো যদি ৩০ জন
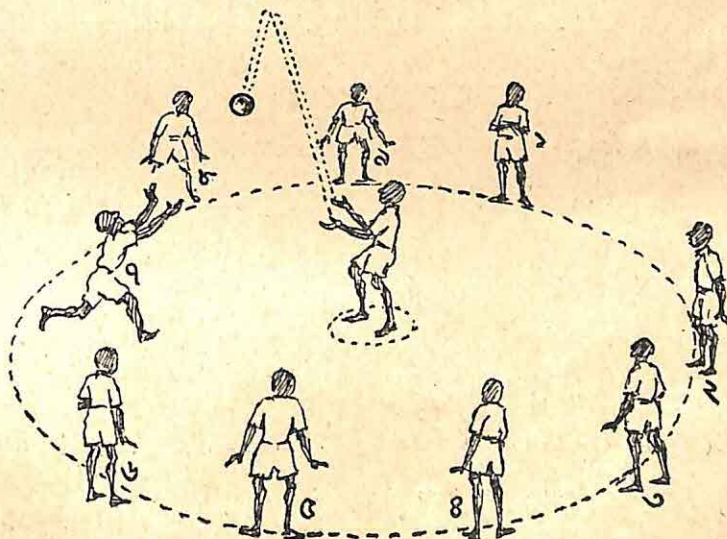
খেলোয়াড় থাকে তাহলে ১ থেকে ৩০ পর্য্যন্ত খেলোয়াড়দের নম্বর হবে। যে কোন একজন খেলোয়াড় ঐ বৃত্তটির মাঝখানে একটি বল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

খেলা সুরু হলে মাঝখানে যে খেলোয়াড়টি বল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে সে বলটি উঁচুতে ছুঁড়ে যে কোন একটি নম্বর বলবে এবং ঐ নম্বরের যে খেলোয়াড় আছে সে দৌড়ে এসে ঐ বলটি মাটিতে

পড়ার আগে ধরবে। যদি ঐ খেলোয়াড় বলটি মাটিতে পড়ার আগে ধরতে পারে তাহলে যে খেলোয়াড় বলটি ছুঁড়েছিল সে তখন গিয়ে যে বলটি ধরলো তার জায়গায় দাঁড়াবে। যে বলটি ধরলো সে আগের খেলোয়াড়ের মত বৃত্তটির মাঝখানে এসে বলটি উঁচুতে ছুঁড়ে আবার আর একজন খেলোয়াড়ের নম্বর বলবে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে। যদি কোন খেলোয়াড় বলটি মাটিতে পড়ার আগে ধরতে না পারে তাহলে সেই খেলোয়াড়ের এক পয়েন্ট কাটা যাবে। কোন খেলোয়াড়ের ৩ পয়েন্ট কাটা গেলে সে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। প্রত্যেক খেলোয়াড় বলটি উঁচুতে ছোড়বার সময় এমন অল্প উঁচু করবে না যাতে খেলোয়াড়দের দৌড়ে এসে বলটি ধরতে কষ্ট হয়, আবার এমন বেশী উঁচুও করবে না যাতে খেলোয়াড়েরা সহজেই বলটি ধরতে পারে।

ইউরোপের ছেলেমেয়েদের কাছে এ খেলাটি বিশেষ প্রিয়। 'ক্যাচ নাম্বার বল' নামে ওরা এ খেলাটি খেলে থাকে।

প্রস্তাব

সুশীলকুমার গুপ্ত

চল না দিদি এই সহর-বন্দীশালা ছেড়ে,
বেরিয়ে পড়ি পথে,
পদে পদে শাসন-বাধা-দুঃখে জীবন ঘেরে,
হৃদয় ভরে ক্ষতে!
পাব পথে রৌদ্রচুড় সবুজ বনের ছায়া,
ত্রিপুর্ণির ঘাট,
পাখীর ডাকে মুখর রাঙামাটি গ্রামের মায়া,
নক্সী কাঁথা মাঠ,

সোনাঝুরি নদীর আলাপ, মেঘের মুঠি খসা
তারার হীরে ফুল,
কমলাপুলি চরের হাসি, আকাশ-কোলে-বসা
পাহাড় সুবিপুল।
পাব অবাধ স্বাধীন খুশি, খেলার অবকাশ;
বাঁধব সুখে নীড়,
আল্‌তাসুড়ি নদীর তীরে, করব মনে চাষ
স্বপ্ন সুনিবিড়!

মেলাব গান আলোর সুরে, হাওয়ার হাত ধ'রে
চলব, মাটি-মার
স্নেহের দানে মিটবে ক্ষুধা, যাব দু'জন গ'ড়ে
স্বর্গ কামনার।
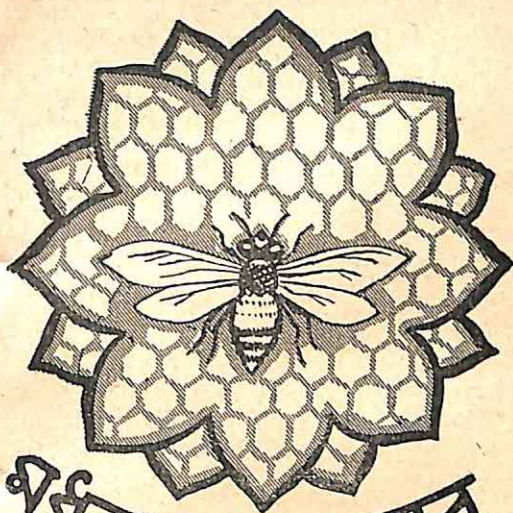
আমার প্রিয় ভাই বোনেরা—

এ মাসে আমরা সভ্যদের কাছ থেকে খুব বেশী লেখা পাই নি। যা পেয়েছি তার অধিকাংশই কবিতা। তাই আগে পাওয়া ও এখন পাওয়া লেখার মধ্য থেকে কয়েকটির আলোচনা করলাম ও ছাপালাম।

আগামী পূর্ণিমায় ভগবান তথাগত বুদ্ধের জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্ণ হবে। এ উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে বুদ্ধের জন্মদিন পালিত হবে। বুদ্ধ ভারতের আত্মার প্রতীক। তিনি যে বাণী পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে গেছেন তা পালন করতে পারলে আজকের দুনিয়ায় স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘর্ষ আসন্ন, যার ফলে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে তার অবসান ঘটবে। বুদ্ধের বাণী—শান্তির বাণী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী, মানুষে মানুষে হিংসাদ্বেষ ও সংঘর্ষের অবসানের বাণী। তোমরা তাঁর জীবনী আলোচনা করবে এ সময় আর তাঁর বাণী ও প্রচারিত আদর্শ অন্তরে উপলব্ধি করে তা পালন করবার চেষ্টা করবে। আমার অনেক স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

আসর পরিচালক

নরেন্দ্রচন্দ্র সরকার (গ্রাঃ নঃ ১৫৯১১)—পূর্ব্ব পাকিস্থানের বন্যার ওপরে লেখা তোমার 'বাংলায় বন্যা' কবিতাটি মোটামুটী মন্দ নয়। বর্ণনা ভালো, শব্দ চয়ন এবং শব্দের প্রয়োগও খারাপ নয়। তবে মিল ও ছন্দে ত্রুটী রয়েছে। এ দু'টী জিনিষ সংশোধন যদি না করতে পারো তবে কবিতা লেখায় তোমার হাত ভালো হবে না। আশা করি এদিকে লক্ষ্য রেখে তুমি লেখা অভ্যাস করবে। তাহলেই কালে সফল হতে পারবে। **রুনু মুখোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১১০৮২)**—তোমার লেখা গান্ধীজীর জীবনের একটি কাহিনী অবলম্বন করে লেখা 'গল্প হলেও সত্যি' পড়লাম। তোমার বলবার ঢংটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। তোমার ভাষাও মন্দ নয়। চর্চ্চা করলে কালে এ ধরণের লেখায় তোমার হাত ভালো হবে। **নিভা বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১৫৩৩৭)**—তোমার শ্যামা সঙ্গীতের অনুকরণে লেখা 'অনুরোধ' কবিতাটি মন্দ নয়। তবে এই ধরণের অন্য লেখার প্রভাব এর ওপরে খুব বেশী পড়েছে বলে আমার মনে হয়। তুমি স্বাধীন ভাবে লিখতে চেষ্টা করবে। তাহলে তোমার লেখায় বৈশিষ্ট্য থাকবে। তোমার 'দরিদ্র' ও 'কল্পনা' কবিতা দুটি অবশ্য এ দোষ থেকে মুক্ত। তবে সেগুলোতে আবার ছন্দপতন হয়েছে। যাক এ সব দোষ ত্রুটী

কাটিয়ে তুমি যদি চর্চ্চা করে যাও তবে আমার ভরসা হয় যে কালে তোমার হাত ভালো হবে। **মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১৬১৭)**—তোমার 'কবিগুরু স্মরণে' কবিতাটি পড়লাম। এটি কি তোমার প্রথম রচনা? যদি তা হয় তবে মন্দ নয়। একটা কথা তোমায় বলি—কবিতা লেখবার সময় তা মনে রেখো। ছন্দবদ্ধ বাক্যই হচ্ছে কবিতা। সুতরাং ছন্দের দিকে লক্ষ্য না রাখলে ছন্দ পতন হয়ে কবিতা বেসুরো হয়ে যাবে। তাহলে সেগুলো আর কবিতা হবে না। আর যাতে বেশ ভালো ভালো শব্দ কবিতায় ব্যবহার করতে পারো সে চেষ্টাও করবে, তাহলে দেখবে তোমার লেখা ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছে। **দেবীসাধন চৌধুরী (গ্রাঃ নঃ ৬৫১২)**—তোমার গল্প 'দুঃখীর বেদনা' এবং কবিতা 'কাঙ্গাল' পেলাম। তোমার হাত এখনও বেশ কাঁচা তাই আমার মনে হয় তোমার আরও কিছুকাল লেখার চর্চ্চা করতে হবে। লেখা যদি ছাপবার উপযুক্ত বলে আমরা মনে করি তবে নিশ্চয়ই ছাপাবো। তোমার গল্পের ভাবটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। তবে বলবার ঢং খুব ভালো নয় বলে গল্পটি তেমন জমেনি। তাহলেও নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই, অনুশীলন করলে আমার মনে হয় কালে তোমার হাত নিশ্চয়ই ভালো হবে। তোমার কবিতায় মিল এবং ছন্দের দোষ আছে। **সুনন্দা সেনগুপ্তা (গ্রাঃ নঃ ১৬৯৮৯)**—তোমার 'প্রার্থনা' কবিতাটি আমার কিন্তু মন্দ লাগেনি। তবে ঠিক ছাপবার মত হয় নি বলে ছাপাতে পারলাম না। তোমার প্রার্থনার ভাবটি ভালো। শব্দ প্রয়োগ ও চয়নে ত্রুটী আছে। মিলের দোষও আছে। যদি এ দোষগুলিকে দূর করতে পারো তবে সময়ে কবিতা লেখায় তোমার হাত ভালো হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

সভ্যের রচনা

খোকার বিপদ

শ্রীরমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাহক নং ১৪৭৫২)

সন্ধ্যা হয় হয়। দু'এক বাড়িতে শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে। 'রায়ভিলা' বাড়িতে ডাকাডাকির শব্দ শোনা গেল—'খোকা, খোকা। আর একটি স্বর ভেসে এলো—'কি দুষ্টু ছেলে রে, বাবা। ইস্কুল থেকে এসেই চম্পট। কোনো সাড়াশব্দ নেই! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে এলো!'

এমন সময় দেখা গেল খোকাকে। রায় ভিলার পেছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি বাড়িতে ঢুকছে। হঠাৎ একটা কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করতে করতে ওর দিকে তেড়ে গেল। খোকা (ফিস্ ফিস্ করে তর্জন করে ওঠে)। এই শয়তান কুকুর চুপ কর্ না! মা টের পাবে যে!

কুকুর। ঘেউ ঘেউ।

[কুকুরটা একেবারে খোকার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়] খোকা (আঁৎকে উঠে)। এই সর্। সোরে দাঁড়া।

[দু'পা পেছনে সরলো খোকা নিজেই]

[এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। একটা বেড়াল প্রবেশ করে ঘটনাস্থলে]

বেড়াল (উল্লাসে)। হাঁ কুকুর ভাই, আট্‌কেছ সেই পাজী ছোঁড়াটাকে? (খোকার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়ে তাকিয়ে) কি গো বাছা? আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে আর?

[খোকার মুখ শুকিয়ে গেল। কান্না পেতে লাগলো।]

খোকা (মৃদুস্বরে)। বারে, আমি কি করলুম তোমাদের? পায়ে পড়ি তোমাদের, আমায় ছেড়ে দাও!

কুকুর (স্বগত)। হাঁ, এবার কাঁদবে! (প্রকাশ্যে) ও খুব যে বিনয়ের অবতার হয়েছে। এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে। গত রবিবারের কথা মনে কর তো বাছা। তুমি রান্না ঘরের দুয়ারে বসেছিলে, আর সেই সময় আমি যাচ্ছিলাম সেখান দিয়ে। আমাকে দেখে তুমি ডাকলে—'আয়, তুতু।' তোমার এই অবহেলা দেখে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করলুম খুবই। তবু ভাবলুম, যদি খাবার পাই! তাই গেলুম তোমার কাছে। আর তুমি কিনা খাবারের বদলে একটা মোটা লাঠি দিয়ে ধাইসে পিটতে লাগলে আমাকে! লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সেদিন পালিয়ে এলাম। কিন্তু আজ? কি গো চাঁদ, বদন তোল!

[খোকা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো]

[সেখানেই ছিল একটা আম গাছ। একটা কাক তার বাড়িতে অর্থাৎ আম গাছে ফিরে এলো। নীচের তিন মূর্ত্তিকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো কাক]

কাক। কুকুর ভায়া, তাহলে ডেঁপো ছোঁড়াটাকে ধরেছ!

বেড়াল (কৌতুক মিশ্রিত স্বরে)। হাঁ, চেয়ে দ্যাখ না, ছোকরা মাথা তুলতে পারছে না।

[খোকা একবার বিস্মিত ভাবে কাকের দিকে তাকালো। তারপর বেড়ালের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে—]

খোকা। তোমাকে আবার কি করলুম আমি?

(বেড়াল খেঁকিয়ে ওঠে)। ওঃ, এর মধ্যেই ভুলে গেছি! আমার ইচ্ছা হচ্ছে নখ দিয়ে তোর চোখ দু'টো উপড়ে আনি। (খোকা ভয়ে ভয়ে তাকালো বেড়ালের দিকে)। সেদিনের কথা মনে নেই? বুঝলে কুকুর ভাই, সারা দিন কোনো শিকার জোটেনি। তাই ওদের বাড়িতে গিয়ে মাত্র এক কড়াই দুধ খাই। পেটপূরে খেয়ে একটু ঝিমুনি এসেছিল। ওদের ভাঁড়ার ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলুম। এমন সময়, বুঝলে কিনা, ছোঁড়াটা চুপিচুপি পেছন দিক থেকে এসে একটা লাঠি দিয়ে দমাদম পিটতে লাগলো আমাকে। আমার বাবা লোহার শরীর! লাগলো না বিশেষ। তবে চিনে রাখলুম ছোকড়াকে।

খোকা (অভিমান-মাখা স্বরে)। বারে, তুমি ঠাকুমার দুধ খেয়ে ফেলেছ, তাইতো ঠাকুমা আমাকে বললে—

[বেড়াল ওকে বাধা দিলে]

বেড়াল (তপ্তস্বরে)। চুপ কর ছোঁড়া! ঐ বুড়ীটাকেও দেখে নেবো একবার। উঁ, আমাকে চেন না!

কাক। বুড়ীটার কথা বলছো বেড়াল ভাই। মহা বজ্জাত ঐ বুড়ীট। ছাদে কত আচার রোদে দেয়। আর ছাতা মাথায় দিয়ে এই ছোকরাকে নিয়ে সারা দুপুর বসে থাকে। আমি ঘোরাফেরা করি। কিন্তু বুড়ী যেন উগ্রমূর্ত্তি। সেদিন শুধু এই ছোঁড়াটা বসে আছে। আমি ছাঁদের কার্নিসে বসে ওকে ভদ্রভাবেই বল্‌লুম একটু আচার দিতে। তা' ছোঁড়াটা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। আমি আবার ফিরে এলুম। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ও আর সেই ফাঁকে একছড়া তেঁতুল নিয়ে দিয়েছিলাম ভোঁ ছুট্। বাসায় এসে বস্‌লুম। ওমা! ছোঁড়াটা বড় বড় ঢিল ছুড়তে লাগলো আমার বাসায়। ভয়ে বাঁচিনে—যদি ছেলেটার গায়ে লাগে! এবারে মাণিক যাবে কোথায়?

খোকা (অভিমান-মাখা স্বরে)। সেদিন ঠাকুমা আমায় কত মারলে, তাইতো ঢিল ছুড়লাম তোমাকে।

কাক (খেঁকিয়ে ওঠে)। যা' যা' আর কৈফয়ৎ দিতে হবে না তোকে! এবারে কুকুর ভাই, এর ব্যবস্থা কর।

কুকুর (একটু ভেবে)। হুঁ। এমন শিক্ষা দেব যে, জীবনে ভুলবে না!

[ভয়ে খোকার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল]

বেড়াল (অট্টহাসি হেসে ওঠে)। হি-হি···হো-হো কেমন মজা!

[নেপথ্যে কার যেন গলার স্বর শোনা গেল।—'খোকা, খোকা সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।' পদশব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। এদিকে কুকুর-বেড়াল ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। ঠাকুরমা প্রবেশ করেন ঘটনাস্থলে।]

ঠাকুরমা (খোকাকে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে)। এ্যাঁ, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কুকুর-বেড়াল নিয়ে খেলা করছিস্? আর আমরা খুঁজে মরছি। চলে আয় তাড়াতাড়ি!

[বলেই ঠাকুরমা খোকার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। বিহ্বল খোকা ঠাকুরমার পিছনে পিছনে চলে গেল। কুকুর-বেড়াল আগেই দু'দিকে সটকে পড়েছে ঠাকুরমাকে দেখে। নেপথ্যে ঠাকুমার স্বর ভেসে এলো—]

—কি ডানপিটে ছেলে রে বাবা। দাঁড়াও আজ মজা দেখাচ্ছি তোমাকে!

—অষ্টাবক্র—

নিদারুণ প্রখর তাপে দগ্ধ করে বৈশাখী দিনগুলি চলে গেল, বর্ষণের ধারা আমাদের তাপিত দেহ শীতল করেনি এবার এখনও। এরই মাঝখানে খেলার রাজা ফুটবল আসন পাতল কলকাতার মাঠে। ৭ই মে থেকে সুরু হয়েছে লীগের খেলাগুলি। এবার কলকাতার লীগের খেলায় সেনাদলকে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যাবে না। কারণ হ'ল সার্ভিসেস দলটিকে গত বৎসর দ্বিতীয় ডিভিসনের সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করে থাকতে হয়। ফলে তাদের তৃতীয় ডিভিসনে নামিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতার ফুটবলের ইতিহাসে সেনাদল বরাবরই প্রথম ডিভিসনে স্থান পেয়ে এসেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সৈন্যদল প্রথম ডিভিসনের মান বজায় রাখতে না পেরে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায়। গত বছর সেখান থেকেও অবতরণ করতে হয় তাদের। তাই এবার তারা তৃতীয় ডিভিসনে খেলবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তবে লীগে না খেললেও তারা আই-এফ-এ শীল্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।

হকি লীগে মোহনবাগানের সাফল্য ঃ—কলকাতা প্রথম ডিভিসন হকি লীগে এবার মোহনবাগান দল অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানশিপ অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। গত বৎসরও মোহনবাগান দলই হকি লীগে বিজয়ী হয়েছিল। ফুটবলের মত হকিতেও মোহনবাগানের প্রাধান্য ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতের অলিম্পিক খ্যাতির মূল উৎস হকির প্রতি বড় বড় ক্লাবগুলির নজর দেওয়া সত্যই সুলক্ষণ। বিশ্বের হকিতে ভারতের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সকলকেই এইভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে। ভবানীপুর লীগে এবার রাণার্স-আপ হয়েছে, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মহমেডান স্পোর্টিং দল। এই তিনটি দলের লীগ তালিকার চূড়ান্ত পর্য্যায়ের অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ ঃ—

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মোহনবাগান—	১৮	১৭	১	০	৪৬	২	৩৫
ভবানীপুর—	১৮	১৪	৩	১	২৬	৭	৩১
মহঃ স্পোর্টিং—	১৮	১৩	২	৩	৩৭	৭	২৮

বাইটন কাপ ঃ—হকি প্রতিযোগিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রফি বাইটন কাপের খেলাও শেষ হয়ে গেল। এবার সার্ভিসেস হকেটস্ নামধারী বাছাই সেনাদলটি এই কাপে বিজয়ী হয়েছে এবং তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে হকিপ্রিয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল এবারে ফাইন্যালে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩—১ গোলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফাইন্যালের প্রথমার্দ্ধে সার্ভিসেস দল তীব্র আক্রমণে মোহনবাগানকে পর্য্যুদস্ত করে।

শেষার্দ্ধে মোহনবাগান পাল্টা আক্রমণ রচনা করে সার্ভিসেস দলকে ব্যতিব্যস্ত করলেও জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হলেও মোহনবাগান যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। বাইটন কাপে ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হকিদলকে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যায়। তন্মধ্যে ওয়েষ্টার্ণ রেল দল এবং বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ান টাটা স্পোর্টসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুটি দল সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হয়। ওয়েষ্টার্ণ রেল দল পরাজিত হয় সার্ভিসেস দলের কাছে এবং টাটা স্পোর্টস পরাজিত হয় কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের কাছে। অন্যান্য প্রতিযোগী দলগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশ দলের খেলাও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইষ্টবেঙ্গলের স্বুবর্ণকাপ জয়ঃ—কলকাতার জনপ্রিয় ফুটবল ক্লাব ইষ্টবেঙ্গল দল কালিকট ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইন্যালে হায়দরাবাদ ফুটবল এসোসিয়েশান দলকে ৩—২ গোলে পরাস্ত করে দশহাজার টাকা মূল্যের স্বুবর্ণ নির্ম্মিত কাপ জয় করেছে। ফাইন্যালের প্রথম দিনে উভয় পক্ষ তিনটি করে গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষই গোল করতে অসমর্থ হয়। অবশেষে উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয়ার্দ্ধে হায়দরাবাদের দু গোলের উত্তরে ইষ্টবেঙ্গল দল তিন গোল করে বিজয় গৌরব অর্জ্জন করে। কলকাতায় ফুটবল লীগের মরসুম সুরু হওয়ার মুখে ইষ্টবেঙ্গল দলের এই জয়লাভ সমর্থকদের প্রাণে আশার সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই।
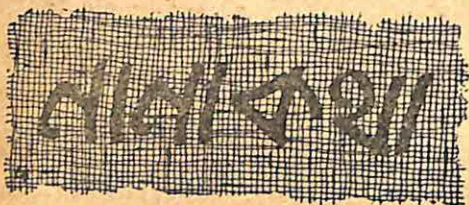
—বিশ্বদূত—

পরলোকে পশ্চিম বাংলার বিচার সচিব—পশ্চিম বাংলার বিচার, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সচিব সত্যেন্দ্রকুমার বসু আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ২০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার বহরমপুর হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। বুধবার দ্বিপ্রহরে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর কাছে তাঁর মেয়ে ও প্রাইভেট সেক্রেটারী সহ মোটর দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। সেখান থেকে তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সত্যেন্দ্রকুমার ব্যারিষ্টার হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্টে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পশ্চিম বাংলার সচিব হিসেবেও তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত আইন, বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতির পরিচালনায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র তেপ্পান্ন। সত্যেন্দ্রকুমার অতি অমায়িক, সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এই শোচনীয় অকালমৃত্যু সকলের নিকটেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা সত্যেন্দ্রকুমারের পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

দু'হাজার বছর আগের গ্রাম—কলকাতা থেকে তেইশ মাইল পূবে বেড়াচাঁপা নামে এক গ্রাম আছে। চন্দ্রকেতুর গড় নামেও গ্রামটি পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে দু'হাজার বছর আগে এখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের অস্তিত্ব ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ ছিল আর এর চারদিকে দেওয়াল ছিল। এই দেওয়ালের সমস্ত চিহ্ন আজও লোপ পেয়ে যায় নি। এখানে পোড়া মাটীতে তৈরী মূর্ত্তি, ভাঙা মাটীর পাত্রের টুকরো ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে মৌর্য্য, সুঙ্গ, কুশ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের কতকগুলো চমৎকার শিল্প-নিদর্শনও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন শিল্প নিদর্শনে প্রাচীন রোমক শিল্পের প্রভাব আছে। এ থেকে মনে হয় যে এখানকার লোকের সঙ্গে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এখানে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে এই অনুসন্ধানের ফলে বাংলার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অদ্ভুত গাছ—গল্পের চেয়েও সত্য ঘটনা যে কত বেশী অদ্ভুত তা তোমরা জানতে পারবে যে কথাটি তোমাদের বলছি তা থেকে। অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে রাক্ষুসে সিকোইয়া বলে এক রকম অদ্ভুত গাছ জন্মে। এর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা বেরুতেই দরকার হয় কুড়ি বছর। আর এই রাক্ষুসে গাছগুলো চার হাজার বছর বেঁচে থাকে। গাছগুলো আড়াই শ' ফুট উঁচু হয় আর এর কাণ্ডের ব্যাস হয় এক শ' ফুট।
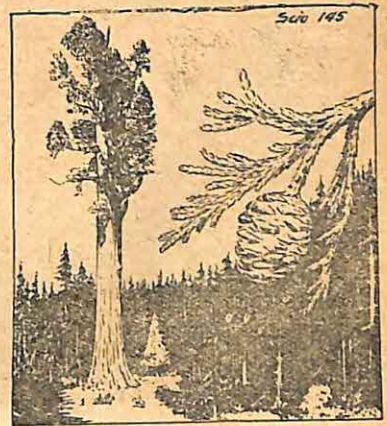
পরলোকে পূর্ণচন্দ্র দাশ—মাদারীপুরের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাশ ২১শে বৈশাখ কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে বর্ব্বর আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর হয়েছিলো। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু সকলের পক্ষেই শোকের কারণ হয়ে রইলো। পূর্ণবাবু দেশের সেবা করতে গিয়ে ইংরেজের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছিলো কারাগারে। কাপুরুষোচিত এই হত্যার নিন্দা করবার মত ভাষা আমাদের নেই। তিনি বিশেষ পরোপকারী এবং অত্যন্ত সৎসাহসী ছিলেন। ব্যবহার তাঁর অত্যন্ত মধুর ছিল। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি তাঁর গুণমুগ্ধ অন্যান্য স্বদেশবাসীর সঙ্গে।

নতুন ধাঁধা

বীতপাল

এই ছবিতে আঁকা যাদের আগু অক্ষর "বি" দিয়া আরম্ভ এইরূপ ৭টী বিষয়, বস্তু, প্রাণী ও ফল প্রভৃতির নাম বল।
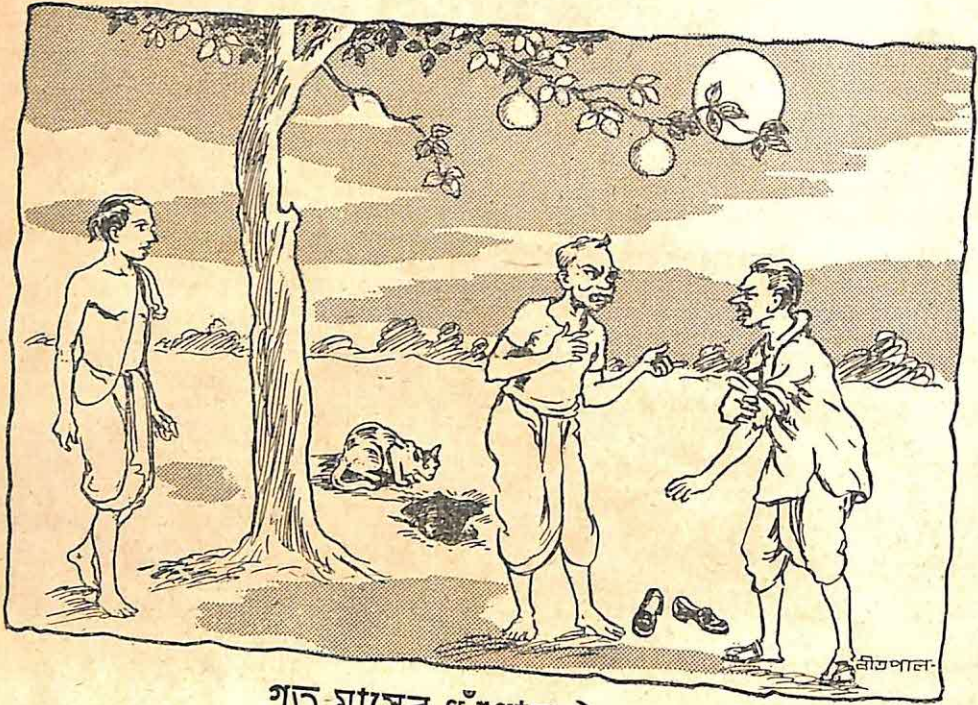
গত মাসের ধাঁধার উত্তর

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা

বিঃ দ্রঃ—তোমরা যারা গত মাসের ধাঁধার উত্তর পাঠিয়েছো তাদের কারো উত্তরই ভুল হয় নি। এজন্য আমরা আর এ মাসে নাম ছাপার ব্যবস্থা করিনি। আগামী মাস থেকে নিয়মিত ভাবে উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"বুদ্ধ জয়ন্তীর সার্থকতা কি ?" এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। প্রবন্ধটি ছাপায় শিশুসাথীর তিন পৃষ্ঠার ওপরে যেন না হয়। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে চার টাকা মূল্যের বই আর দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে তিন টাকা মূল্যের বই। পুরস্কারের বইগুলো আশুতোষ লাইব্রেরীর বই থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিযোগীর ইচ্ছামত। শ্রাবণ মাসে প্রতিযোগিতার ফল বার হবে।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরণ ধর**

৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

gistered No. C. 1104

মাসিক

শিশুসাথী

গল্পে ছবিতে ও সম্পাদনায়

ছোটদের মনের মত। তাই কাজে কর্ম্মে ও জ্ঞানে প্রতিটি শিশু গড়ে উঠে — একদা নিজেকে করবে পূর্ণ বিকশিত।

বার্ষিক মূল্য চার টাকা ★
★ প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

জ একটি করে
সা জমালে
মরা নিজেরাই
রা প্রতিমাসে
তে একটি করে
শুসাথী।

আশুতোষ লাইব্রেরী

তোমরাই পারো

দেশকে আরও এগিয়ে দিতে ...
যদি না জ্ঞান-বিকাশের আর একটা দিক, কোন শিশুরই অজানা না থাকে।

তবে এসো...

খেলার মত আনন্দ নিয়ে আগে শিল্প-বোধকে জাগিয়ে তোলো। তারপর যখন বড় হবে—দেখবে আমাদের সেই মানস-পটে দেশকে করেছি সমুজ্জ্বল!

শেখানো, রঙতুলি, কাগজ-পেন্সিল পিচ্ বোর্ড, রঙিন কাগজ ও বইসহ বার্ষিক চাঁদা ১৬৲ টাকা। শিক্ষার্থীর বয়স হবে ছয় থেকে দশ, শেখার সময় রবিবার সকাল নটা থেকে দশ—প্রথম ব্যাচ। বিকাল পাঁচটা থেকে ছয়—দ্বিতীয় ব্যাচ।

ART CRAFT & LITERARY CLUB for Children

পরিচালক—**শ্রীসমর দে ও শ্রীনীলিমা দে**
৪১।৬৪বি, রসা রোড সাউথ,
কলিকাতা-৩৩

শিশুসাথী
সম্পাদক
শ্রীহরিশরণ ধর

"শিশুসাথী"র নিয়মাবলী

১। "শিশুসাথী"র চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২।০। প্রতি সংখ্যা ।৵০। **চাঁদার টাকা শ্রীহরিশরণ ধর, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। "শিশুসাথী"র বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। চাঁদার টাকা পাইলেই গ্রাহক করিয়া পত্রিকা পাঠান হয়। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে। পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই, সমস্ত গ্রাহকের পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা, কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে, পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায় তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ।৵০ হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা যখনই কোন চিঠি-পত্র লিখিবেন, চিঠিতে নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৮। **লেখক-লেখিকারা ও গ্রাহকেরা** ছেলেমেয়েদের উপযোগী "শিশুসাথী"র জন্য 'লেখা' পাঠাইতে পারিবেন। সম্পাদকের মনোনীত হইলে উহা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়; তবে তাহা কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তোলা ফটো অথবা তাহাদের আঁকা ছবিও "শিশুসাথী"তে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয়। মনোনীত হইলে ছাপা হয়। সঙ্গে পোষ্টকার্ড না পাঠাইলে অথবা উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সকল সময় সম্ভব হয় না। কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদা ভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৯। ধাঁধার উত্তর ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদের আফিসে পৌঁছান দরকার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'**; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৩৫শে বর্ষ
৩য় সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

আষাঢ়
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দু'টি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া! —**রবীন্দ্রনাথ**

৩৫শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৬৩ { ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় এলো

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আষাঢ় এলো ঝম্ ঝমাঝম্ বিষ্টি ধারা সাথে
নতুন জলের ঝাপ্টা এসে লাগছে জানালাতে।
কাজল কালো মেঘে মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে,
গুর্ গুর্ গুর্ বাজের আওয়াজ উঠছে ডেকে ডেকে।
পূবে হাওয়ার আলতো ছোঁয়ায় দুলছে বাঁশের বন,
শঙ্খচিলের শঙ্খনাদে জাগছে শিহরণ।

আষাঢ় এলো কংসাবতীর ধূসর বালুচরে
আধফোটা ঐ কদমকুঁড়ির ঘুমভাঙানোর তরে।
কেয়াফুলের আমন্ত্রণে আসলো হেথা নেমে
তাইতো হঠাৎ চাতক পাখীর কান্না গেল থেমে।
ঝিল্লী মেয়ের ঝাঁঝর বাজে শিরীষ গাছে গাছে,
বিপিনচাষীর চোখের কোণে কোন্ সে পুলক নাচে।

আষাঢ় এলো উল্‌সে উঠে খুকুর কচি প্রাণ,
বর্ষাধারায় ভিজতে বুঝি করছে সে আনচান।
চিকমিকিয়ে চিকুর মেঘে ঝিলিক দিয়ে যায়,
দুষ্টু মেয়ে আঁৎকে উঠে আঁকড়ে ধরে মায়।
বাবলু হেথা দাঁড়িয়ে কেন রয়েছে চুপ করে?
আজ্ বাদলে মন ছুটে তার নিঝুম তেপান্তরে।
তোমার মনে আমার মনে খুসির দোলা দিয়া,
গ্রীষ্মশেষে আষাঢ় এলো অঝোর ধারা নিয়া।

'কিন্তু মহর্ষি,'—ব্যাসদেবের কথায় সেরূপ গুরুত্ব না দিয়ে জনমেজয় উত্তর করলেন,—'কাল নিরবচ্ছিন্ন, সব কালই এক মহাকালের অংশ ; এর যে দ্বাপর কাল কি, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হাসলেন ব্যাসদেব,—'রাজা, বৃথা তর্ক করোনা। বেদের বাক্য অলঙ্ঘ্য। এক মহাকালকেই বেদে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারভাগে অর্থাৎ চার যুগে ভাগ করা হয়েছে। এক এক যুগের নির্দ্দিষ্ট একটা সীমা আছে। কোন্ যুগের লোকের পক্ষে কি অনুষ্ঠেয়, অথবা কি নয়, তাও বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে বেদের মধ্যে। সে নির্দ্দেশ মেনে না চললেই মানুষের অমঙ্গল অনিবার্য্য।' —ব'লেই ব্যাসদেব আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে রাজসভা ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজসভা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো। রাজা জনমেজয় গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।···কিন্তু না, ব্যাসদেবের উপদেশ তাঁর মনে ধরলো না। আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, এ সময় কি আর যজ্ঞ বন্ধ করা চলে ? আর বন্ধই বা করবেন তিনি কেন ?—'যাগযজ্ঞ' মহা পুণ্যের কর্ম্ম। ইত্যাদি ভেবে, রাজা আরও দৃঢ় হয়ে উঠলেন তাঁর সংকল্পে। ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানের যেটুকু আয়োজন বাকী ছিল,—তা চ'লতে লাগলো প্রবল গতিতেই।

* * * * *

যজ্ঞ প্রায় সম্পূর্ণ। শুধু অশ্বের মুণ্ড ছিন্ন করে যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দেওয়া বাকী। বিরাট যজ্ঞাগ্নি সহস্র শিখায় জ্বলছে ধূ ধূ করে,—যেন সহস্রশীর্ষ ভুজঙ্গের সহস্র জিহ্বা লক্ লক্ করছে প্রবল উত্তেজনায়।

চারিদিক লোকে লোকারণ্য। অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে সকলে বিস্ফারিত চক্ষে যজ্ঞবেদীর দিকে,—যজ্ঞবেদীর সম্মুখে ক্ষৌমবাস পরিহিত যজ্ঞার্থী রাজা জনমেজয়—স্থির নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট হয়ে মুহুর্মুহু উচ্চারণ করছেন যজ্ঞমন্ত্র।

অলক্ষ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু তখন গভীর উদ্বেগে অধীর ; প্রগাঢ় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছেন সুরেশ্বর,—তাইত, বেদের বাণী সত্যিই কি তবে বিফল হবে। তাহলে আর কোথায় থাকবে বেদের মহিমা,—দেবপূজ্য বেদব্যাসের সদুপদেশের মূল্যই বা থাকবে কোথায় ?···

এদিকে যথারীতি শাস্ত্রের বিধানমতে অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করা হলো ; সাফল্যের আশায় রাজা জনমেজয়ের সর্ব্বাঙ্গে জাগলো এক অপূর্ব্ব শিহরণ ;—দেবরাজ ইন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, মন্ত্রবলে সেই ছিন্ন মুণ্ডের মধ্যেই করলেন তিনি জীবন সঞ্চার। তার পর যেই মুণ্ডটিকে আহুতি দেওয়া হলো আগুনে—অমনি সে ছিন্নমুণ্ড লাফিয়ে উঠ্‌লো প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চে।

অশ্বমুণ্ড তিড়িং তিড়িং করে সভার সর্ব্বত্র নেচে বেড়ায় ; আর মাঝে মাঝে এগিয়ে এসে শূন্যে স্থির হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে সভার লোক তো অবাক,—কারো চোখে আর পলক পড়ছে না,—মনে হচ্ছে যেন জেগে জেগেই তারা কোন দুঃস্বপ্ন

দেখছে !···আর রাজা জনমেজয়ের কথা তো আর বলে কাজ নেই। এ-কি ব্যাসদেবের অভিশাপ,—না আর কিছু ?

ক্ষোভে, লজ্জায়, হতমানে, উত্তেজনায় রাজার মাথা যেন খারাপ হয়ে গেল।···অন্তরে দাবানল জলে উঠলো।···মুখের ভাব তাঁর এমন বিকৃত হয়ে উঠলো যে, তাঁর দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো সকলে।···এদিকে অশ্বমুণ্ডের নাচারও বিরাম নেই,—আর ভেংচি কাটাও চলেছে যেন সমানে।

সহসা এক ব্রাহ্মণকুমার প্রবল কৌতুকে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো হো হো করে,—সেই আজগুবি ব্যাপার দেখে !···আর যায় কোথায় ? একে জনমেজয়ের মাথার তখন ঠিক নেই,—তার ওপর বালকের এই হাসি এবং হাততালি—তাঁর মাথায় যেন আগুন জেলে দিলে।···তিনি আর সহ্য করতে না পেরে—সভার শান্তিরক্ষক জনৈক সান্ত্রীর কোষ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে সবেগে এগিয়ে এলেন বালকের দিকে, এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই বসিয়ে দিলেন তার ঘাড়ে সজোরে এক কোপ ! নিরীহ বালকের মুণ্ড নিমেষে স্কন্ধচ্যুত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে ! ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলো অজস্র রক্তের ধারা !

দারুণ আতঙ্কে চোখ বুজলো সকলে। মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তাদের। কিন্তু সভায় সমবেত ব্রাহ্মণগণ মুহূর্ত্তে আসন ছেড়ে কোলাহল করে উঠলেন,—'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ ব্রহ্মঘাতী রাজার যজ্ঞে এসে আমরা পাপ করেছি ! এর রাজ্যে বাস করাও মহাপাপ ! ক্ষত্রিয়ের স্পর্দ্ধা আজ আকাশে উঠেছে.—তাই ব্রাহ্মণ-বধেও তারা কাতর নয়।···ভগবান এর বিচার করবেন !···চল, চল, এ রাজার একটি তণ্ডুলও আমরা গ্রহণ করবো না। এর বাতাসেও বিষ আছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতেই সভাস্থল ত্যাগ করলেন তাঁরা।···দেখাদেখি অনেকেই সভা ত্যাগ

করে চলে গেলেন যে যার স্থানে। দেখতে দেখতে বিরাট যজ্ঞস্থল নীরব-নিথর হয়ে উঠলো। যজ্ঞ পণ্ড হতেই অশ্বমুণ্ডও নির্জ্জীব হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মহারাজ জনমেজয় এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন দেব-দ্বিজভক্ত, প্রজা-বৎসল সদাশয় নরপতি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলাই ছিল তাঁর আদর্শ। শোচনীয় ব্যর্থতার ওপর ব্রাহ্মণ বালকের হাসি এবং হাততালিই তাঁকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তিনি করে ফেলেন এই মর্ম্মান্তিক অন্যায়।

ভুল বুঝতে পেরেই তিনি দারুণ লজ্জায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সারা মুখ তাঁর তখন ছেয়ে গেছে গভীর কালিমায়। অনুতাপে যেন জ্বলে যাচ্ছে হৃদয়, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন স্বীয় কৃতকর্ম্মের ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করে!

এ-দিকে ব্যাসদেব তখন ধ্যানযোগে সবই জানতে পেরেছেন। হাজার হোক, রাজা জনমেজয় তাঁর পরম স্নেহের পাত্র,—বিশাল কুরুকুলের গৌরব-শিখা,—তাঁর বিপদে ব্যাসদেব কি স্থির থাকতে পারেন? তিনি যোগবলে নৈমিষারণ্য থেকে অবিলম্বে এসে উপস্থিত হলেন হস্তিনায়।

তাঁকে দেখেই মহারাজ জনমেজয় লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে,—'মহর্ষি!'—বললেন ব্যগ্রকাতর কণ্ঠে—'আমায় ক্ষমা করুন, আপনার সদুপদেশ না শুনে আমি ঘোর অন্যায় করেছি। এক পাপ ক্ষালন করতে গিয়ে ভাগ্যদোষে আর এক মহাপাপে লিপ্ত হয়েছি। এ পাপের বুঝি আর ক্ষয় নেই। এখন কি করলে আমি পরিত্রাণ পেতে পারি,—দয়া করে সেই উপদেশ দিন।'

'বৎস জনমেজয় ওঠো'—মহর্ষি সস্নেহে রাজার হাত ধরে তাঁকে তুলে বললেন—'যা হবার হয়ে গেছে,—তার জন্যে অনুশোচনা করে আর লাভ নেই। তবে গুরুজনের উপদেশ অমান্য না করাই উচিত। যা হোক, তোমার পাপক্ষয়ের উপায় আছে।—তোমারই পিতৃ-পিতামহের পুণ্য জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে আমি এক মহাকাব্য রচনা করেছি,—তার নাম মহাভারত। এতদিন ধরে সে কাব্য পড়া হচ্ছে স্বর্গে,—এবং মুনি-ঋষি সমাজে। আমার শিষ্য বৈশম্পায়ন এসে—তোমাকে সেই কাব্য পড়ে শুনাবে—তুমি ধৈর্য্যভরে প্রগাঢ় নিষ্ঠায় তার আদ্যন্ত শ্রবণ কর। তাহলেই তোমার পাপের ক্ষয় হবে।'

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে রাজা গদগদ কণ্ঠে বললেন,—'মহর্ষি, আপনার করুণার অন্ত নেই। আমি আপনার চরণে—'

'শোন',—রাজার কথায় সহসা বাধা দিয়ে ব্যাসদেব আবার বললেন—'আরও কথা আছে। মহাভারত শুনবার জন্যে—একটি সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ কর,—তার ওপর কালো রঙের একখানা চাঁদোয়া খাটিয়ে দাও। মহাভারত শুনতে শুনতে একটু একটু করে যেমন তোমার পাপ ক্ষয় হবে—তেমনি একটু একটু করে ঐ কালো রঙের চাঁদোয়া শাদা হয়ে আসবে। যখন চাঁদোয়ার রঙ সম্পূর্ণ শাদা হয়ে গেছে দেখবে,—তখনি বুঝবে তোমার পাপও ক্ষয় হয়ে গেছে নিঃশেষে।...তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে আরও একটু

কথা আছে। সে সভায় তোমার পাত্র-মিত্ররাও থাকবেন,—আর ভক্তিমান প্রজারাও থাকবেন। সকলে মিলে শুনলে লোক-পরম্পরায় এই পুণ্য কথা জগতে প্রচারিত হয়ে লোক-কল্যাণ সাধন করবে। আর আমারও মহাভারত-রচনার আসল উদ্দেশ্য হবে তখনি সার্থক !'

গভীর মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে মহারাজ জনমেজয় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন পুণ্যাত্মা ব্যাসদেবকে। তখন তাঁর অন্তরের গুরুভারও অনেকটা লাঘব হয়ে গেছে।…অতঃপর মহর্ষি রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।…

এরপর আর কি ? মহর্ষির উপদেশ মত জনমেজয় অবিলম্বেই সমস্ত আয়োজন করে ফেললেন। আর তার পরেই কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপের তলে—

'জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত-কাহিনী।'…

বলা বাহুল্য মহাভারত পাঠ শেষ হতেই দেখা গেল,—কালো রঙের চাঁদোয়াখানা একেবারে শাদা হয়ে গেছে। আর সেই থেকেই মহাভারত ভারতের ঘরে ঘরে আবহমান কাল ধরেই লোকশিক্ষা প্রচার করছে। কবি কাশীরাম দাস ঠিকই বলেছেন,—'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।'

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর শ্রীপীযূষকান্তি চৌধুরী

(১০) শেষ চিঠি

আজ দেড় বছরের ওপর আমি তোমাদের আমেরিকার গল্প শোনাচ্ছি। তোমরা অনেকেই হয় ত ভাবছ হঠাৎ আমি তোমাদের এদেশের গল্প শোনাতে গেলাম কেন। আজকে এই 'কেন'রই উত্তর দেব।

আমি যখন তোমাদেরই মত ছোট ছিলাম তখন পূর্ব্ববঙ্গের একটা ছোট্ট সহরে স্কুলে পড়তাম। ছোটবেলায় তোমাদেরই মত ভাবতাম বিলেত দেশটা কি সত্যি সত্যিই সোনা দিয়ে তৈরী। ও দেশের লোকগুলো কি সত্যি সত্যিই পণ্ডিত। যা কিছু নতুন যা কিছু আশ্চর্য্য সবই ওদের মাথা থেকে বেরিয়েছে ভেবে খুবই আশ্চর্য্য হতাম আর ভাবতাম যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে দেখব ওরা কি করে বিজ্ঞানেব এত উন্নতি করল ?

স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। কলেজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে

ঢুকলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াও শেষ হ'ল কিন্তু সাগরের ওপার থেকে ডাক এল না। ছোটবেলার স্বপ্ন সার্থক হবার কোনই সম্ভাবনা দেখা দিল না। তারপর চাকুরী জীবনে ডালমিয়া নগর থেকে আরম্ভ করে করাচী পর্য্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি করেছি সত্যি কিন্তু সাগর পার হবার কোন সুযোগ হয় নি। সুযোগ দেখা দিল তখন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থেকে মাষ্টার মশাইএর স্থান দখল করলাম, ভারত সরকার যেদিন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিনই ঠিক করে ফেললাম যে ওদেশের মানুষের জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি এমনভাবে আমার দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে লিখব যাতে ওর বাস্তবিকই আমার চোখের ভেতর দিয়ে এদেশটাকে সহজ সরলভাবে দেখতে পারে, বুঝতে পারে! এই চিঠিগুলো এরই ফল।

আমার এই এতগুলো চিঠির মধ্যে কতকগুলো হয় ত তোমাদের খুব ভাল লেগেছে কতকগুলো হয় ত লাগে নি। ছাত্র, মাষ্টারমশাই, সাধারণ লোকের ছবি তোমাদের মনে নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব আনন্দ দিয়েছে। আবার নিগ্রোদের নির্য্যাতন, বুড়োদের অসহায়তা হয় ত তোমাদের মনে ব্যথা দিয়েছে। মানুষের সমাজে দোষগুণ থাকবেই কাজেই আমেরিকান সমাজেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমেরিকাতে এসে প্রায় দুই বছর এদের মধ্যে থেকে ওদের সঙ্গে মিশে, কথা বলে, একসঙ্গে চলে আমার আজ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমেরিকার সমাজ যে কোন দেশেরই মানুষের সমাজের মত। মানুষে মানুষে কোনই তফাৎ নেই। তফাৎ আছে কেবল বাইরের আবরণে কেন না বিজ্ঞানের সাধনা ও ব্যবহারের ফলে ওদের জীবন-যাত্রার মান হয়েছে অসম্ভব উন্নত আর তার সঙ্গে এসেছে প্রাচুর্য্য ও অবসর। এদেশ সোনা দিয়ে তৈরী নয় কিন্তু সোনা ফলিয়েছে এদেশের মানুষেরা। এদেশের সব লোকই কিন্তু পণ্ডিত নয় তবে যারা পণ্ডিত তারা সত্যিকারের পণ্ডিত। এদেশের এই যে উন্নতি এর মূলে আছে সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা—অর্থাৎ সকলে মিলে চারিদিক থেকে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে বিজ্ঞানী গবেষণা করছে, যে কারখানার মালিক কারখানা গড়ছে, যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করছে সবাইএর এক সাধনা কি ভাবে আরও উন্নতি করা যায়। এরা জানে এই উন্নতির মধ্যে আছে নিজেদেরও শ্রীবৃদ্ধি। এদেশের অনেক লোকই আমায় বলেছে যে দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে অর্থাৎ ১৯৪০এ অধিকাংশ লোকের মজুরি ছিল সপ্তাহে ১৫|২০ ডলার এখন সে জায়গায় ৭০|৮০ ডলার। ব্যবসাতে কেবল ফোর্ড, রকফেলার বড়লোক হন নি সাধারণ আমেরিকানও হয়েছে।

আমাদের দেশ গরীব, খুবই গরীব কিন্তু তার জন্যে হতাশ হবার কোনই কারণ নেই। এদেশের লোকের সঙ্গে যাচাই করে দেখেছি—আমরা ভারতীয়রা কোন অংশে তাদের চেয়ে কম নই। তবে আমরা অনেক দিন পরাধীন ছিলাম সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছি। বিজ্ঞানের সাধনা ও প্রয়োগ আমাদের কম। তবে আমাদের নেতারা এ সম্বন্ধে সজাগ—তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দেশও অদূর ভবিষ্যতে সোনার দেশে পরিণত হবে।

হনুমানের পুরস্কার

(পৌরাণিক কাহিনী)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

অযোধ্যায় ফিরে এসে রামচন্দ্র রাজা হয়েছেন। সীতাকে লঙ্কা হ'তে উদ্ধার করার জন্য বানরেরা ছিল তাঁর প্রধান সহায়। তারাও রামের সঙ্গে অযোধ্যায় এসেছে।

রাজা হ'য়ে রাম রাজ্যের সকলকে নানা উপহার দিতে লাগলেন! বানরেরা তাঁর বিপদের বন্ধু, তাদেরও পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লো। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন। সেই উপহার বানরদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে লাগলেন।

বানরদের প্রায় সকলকেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র হনুমানকেই দেওয়া বাকী। লঙ্কার রাজা রাবণ যখন সীতাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল তখন সাগর ডিঙ্গিয়ে হনুমানই তাঁর খোঁজ নিয়ে এসেছিল। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়ে রামের আর লক্ষণের প্রাণ-রক্ষার উপায়ও করেছিল হনুমানই। তাকে পুরস্কার দেবার ভার নিলেন সীতা নিজেই। তিনি নিজের গলার হার খুলে হনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন। হনুমান তাঁকে প্রণাম ক'রে সে হার মাথায় তুলে নিল।

সীতার গলার হার সেরা মণি-মাণিক্যের তৈরী। তার জৌলুসে হনুমানের সারা অঙ্গ ঝলমল ক'রে উঠল। কিন্তু তবু যেন হনুমান মনে ফুর্ত্তি পাচ্ছিল না। সে হারছড়া হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে অনেক ক্ষণ ধরে দেখতে লাগল। তারপর তার এক-একটা মণি-মাণিক্য দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে কেটে একবার চোখ বুলিয়েই বিরক্ত হ'য়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রামের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষণ হনুমানের এ কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। তিনি রামকে বল্লেন—'দাদা, মা জানকী হনুমানকে যে-পুরস্কার দিয়েছেন তার দুর্দশা দেখুন। কথায় বলে—বানরের গলায় মুক্তোর মালা! হনুমান আমাদের মহাউপকারী বান্ধব বটে, কিন্তু জাতের স্বভাব যাবে কোথায়? মণিমাণিক্যের হারের কদর বুঝে তার সাধ্য-ই-বা কি?'

রাম হেসে বল্লেন—'ভাই, হনুমানের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রচুর; তাছাড়া আমাদের উপর তার ভক্তিশ্রদ্ধারও তুলনা নেই। তবু তার পুরস্কার কেন যে সে ফেলে দিয়েছে তার কারণ সে ছাড়া আর বল্‌তে পারে কে?'

লক্ষণ হনুমানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'মহাবীর, এ কি ব্যাপার? সীতাদেবীর নিজের গলার মালা কি এই রকম হেলাফেলা করার জিনিষ?'

হনুমান হাতজোড় ক'রে বলুলেন—'আমাকে মাপ করুন। যে-জিনিসে রামসীতার মূর্ত্তি নেই,—হোক্ না তা মণিমাণিক্য,—তা দিয়ে আমার কি লাভ হবে? পথের ধুলোর চেয়ে তার মূল্যই বা বেশি কি!'

লক্ষণ বললেন—'বটে! তাই বুঝি ও মণিমাণিক্যের হার ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে! সে হারে নয় শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাদেবীর মূর্ত্তি নেই, তোমার নিজের শরীরে কি তা আছে? ও শরীরটাকে তবে রেখেছ কেন, পথের ধূলোর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাওনি কেন?'
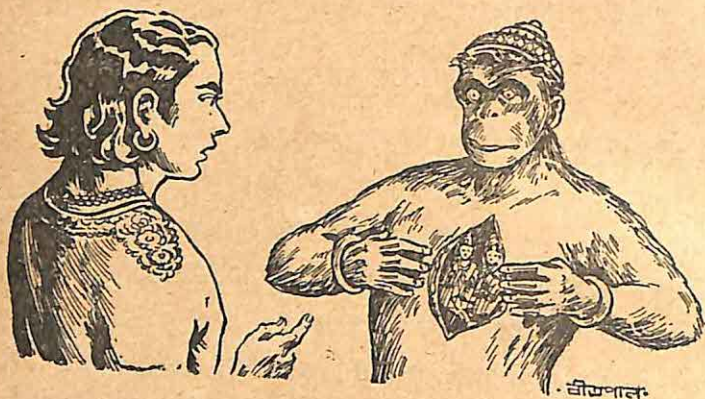
হনুমানের মনে কি হ'লো, তক্ষুনি সে দুহাতের নখ দিয়ে আপনার বুক চিরে ফেল্‌ল। দরদর ক'রে রক্ত বেরিয়ে যেতই সে-বুকের পাঁজরে পাঁজরে দেখা গেল শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী একসঙ্গে বসে রয়েছেন।

লক্ষণ অবাক্ হ'য়ে সেই মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হনুমান চোখ বুজে 'জয় সীতারাম' 'জয় সীতারাম' ব'লে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

আষাঢ়ের গান

শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

আষাঢ়ে সন্ধ্যা নামে বর্ষার গানে,
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ নূপুরের তানে।
আকাশ সেতারে গায় মেঘ-মল্লার···
তারই সুরে জেগে ওঠে হৃদয় আমার!
নেচে যেন ওঠে ধরা, নদী চলে বেগে,—
ময়ূরী পেখম তুলে নাচে মেঘে মেঘে।
ঝর্ণা চলার গানে কতো তোলে সুর:
রিণিরিণি রিণিরিণি হাওয়ার নূপুর!

ঝিলেতে ডোঙায় চেপে কতো চাষী ছেলে
প্রকৃতির দিকে চায় দু'চোখ মেলে,—
সোনা-ধান, কচি-ধান সাঁতার কাটে,
জল যে দাঁড়িয়ে আছে চাষের মাঠে;
শালুক ফুটেছে খুব, ডাঙায় কদম,
থরে থরে পড়ে নুয়ে···নানান রকম!
কুয়াশা কুয়াশা মেঘ: টিপ্ টিপ টিপ,
যায় যায় নিভে যায় দিবসের দীপ।

আষাঢ়ে সন্ধ্যা নামে বর্ষার গানে,
রিম্‌ঝিম্ সুর তোলে আমার প্রাণে॥

সাহেবের দেশে

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

হবুচন্দ্র রাজার আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর গল্প তোমরা নিশ্চয় জান। সে রাজ্যে মুড়ি-মিছরির এক দর। কিন্তু এমন কোন দেশের নাম বলতে পার, যেখানকার বাজারে মিছরির ছড়াছড়ি, সোনার দামে বিক্রি হয় মুড়ি। যদি বলি সে দেশটা বিলেত, ভাবছি তোমাদের অবস্থাটা কি হবে। কেউ বলবে কখ্খনো হতে পারে না, কেউ বলবে এত লোক বিলেতে গেছে কারো মুখে ত এমন কথা শুনিনি। কেউ বা বলবে, স্রেফ ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে চান কি !

আচ্ছা তোমরাই বিচার কর। বিলিতীবেগুন দেখতে কেমন লাল টুকটুকে···কিসমিস দিয়ে আদা কুচিয়ে চাটনি, নাম শুনলে জিবে জল আসে তার ওপর কত স্বাস্থ্যকর—এক এক ফোঁটা বিলিতীবেগুনের রস নয়ত যেন এক একটা ভিটামিন ট্যাবলেট। আর দিশী বেগুনের কোন গুণ নেই, ঢ্যাবঢেবে গড়ন, একটু বড় হলেই বিচি প্যাটপ্যাট করে, বোঁটাতেও কাঁটা, আর কি বলব ওর আস্বাদ নয়ত যেন বিস্বাদ।

কিন্তু এদেশের কি দুরবস্থা। এক শিলিং-এ এক পাউণ্ড সেরা বিলিতী বেগুন পাওয়া যায় অথচ একটা ছোট বেগুনের দাম শিলিং তিনচার অর্থাৎ দু টাকা আড়াই টাকা। এখানে বসে বেগুন ভাজা খাওয়া আর ভারতে বসে প্যারিস থেকে কাপড় কাচিয়ে এনে বাবুয়ানী করা একই কথা। অবশ্য এ দেশের কোন লোক বেগুন ভাজা খায় না আমাদের মত দু'চারজন ভারতীয়, লোভে পাপ কথাটা ভুলে যায় এবং পালপার্বনে জোট পাকিয়ে বেগুন ভাজা দিয়ে খাওয়া সুরু করে। অপরিণামদর্শী, 'অমিতব্যয়ী' এইসব গালভারী বিশেষণ আমাদের পেছনে জুড়ে দিয়ো না যেন। কি করি বল হ্যাম-ড্যাম খেয়ে জিবে চড়া পড়ে গেছে। ঝাল নেই, মসলা নেই, এমন কি এক ছিটে হলুদের গুঁড়োও নেই। দই গরমমসলা আদা-বাটা দিয়ে মাংসটা কসে নেওয়া ত দূরের কথা, নুনটাও রাঁধার সময় দেবে না। ওপর থেকে ছড়িয়ে নিতে হবে। আর নিতে পারা যায় মরিচের গুঁড়ো কিম্বা ভিনিগার। ওই সব ঝালমিষ্টি বিহীন একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে। দেশী খাবারের নাম শুনলে পয়সার দিকে খেয়াল থাকে না।

এখন কি খেতে চাও আমিষ না নিরামিষ ? এদেশে নিরামিষভোজীর সন্ধান পাওয়া যায় না বরং বলা যায় গরুর ঘাড়টা, ভেড়ার ঠ্যাংটা বা শুয়োরের চর্বিভরা মাংস না হলে এদের দিন চলে না। ঠাণ্ডা দেশ। শীতের সংগে যুদ্ধ করার জন্যে মাংস খাওয়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে তেতো ওষুধ নাক টিপে খাওয়া যায়। কিন্তু খাবার, তাও জল খাবার নয়, পেট ভরাবার খাবার যদি মুখরোচক না হয়, মনে হয় কালই দেশে ফিরে যাবার টিকিট কাটি।

যদি সবে মাত্র বিলেতে পা দিয়ে থাক, মাংস চাইলে কি বলতে কিসের মাংস হাজির করবে তার ঠিক নেই, খেতে বসে অপ্রস্তুত হয়ে উঠে আসতে হবে তার চেয়ে নিরামিষ খাওয়া ভালো—কোন হাংগামা নেই। এদেশে ডিম নিরামিষের দলে পড়ে। অনায়াসে এগ এণ্ড চিপ্‌স হুকুম দিতে পার। ওমলেট চিপসও একই জিনিস। এগ চাইলে পোচ এনে হাজির করে। ওমলেট ত জানই, যাকে আমরা বলি মামলেট। আর চিপস হল পট্যাটো চিপস তবে আমাদের দেশের মত পাতলা কুড়কুড়ে ভাজা নয়, বড় বড় ডুমো ডুমো আলু গরম ভেজে দেয়। দেশের খাবারের সংগে তুলনা করলে বলতে হবে ভাতের বদলে আলুভাজা, তরকারির বদলে ডিম, পেট না ভরলে ২-পিস মাখনরুটি নিতে পার, শেষে সুইট ডিস আর জলের বদলে চা।

প্রথম পর্ব থেকে সুরু করা যাক। সকালে আমরা জলখাবার খাই এরা করে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট কথাটা শুনলে আমার যেন মনে হয় এ একটা শাস্ত্ররক্ষা—উপোসী নাম ঘোচান। আমাদের দেশে জলখাবারের পক্ষে এক কাপ চা, এক পিস মাখনরুটি বা দুটো কচুড়ি ও একটা জিনিস কিন্তু এদের ব্রেকফাস্টের নমুনা শুনলে মনে হবে ভুরিভোজ। অভিজাত মহল প্রথমে এক গ্লাস ফলের রস খায়। সাধারণ লোক দ্বিতীয় দফা দিয়ে আরম্ভ করে। তারা খায় দুধের সংগে কর্নফ্লেকস বা পরিজ। একটা ভাজা বা সিদ্ধ ডিম তার সহকারী হিসেবে বেকন। এরা বলে বেকন খাওয়া মানে স্বাস্থ্য ভোজন করা—এইটেই শূয়োরের সেরা মাংস। আর দু'পিস টোস্ট। মাখনের দলা টেবলের ওপর থাকে নিজে মাখিয়ে নিতে হয়, ইচ্ছে করলে টোস্টে মার্মারেড বা জ্যামও মাখিয়ে নিতে পার—পার আর বলছি কেন, তোমরা হয়ত রুটিতে মার্মারেড না মাখিয়ে মার্মারেডে রুটি ডুবিয়ে খেতে লেগে যাবে। মিষ্টি খেতে কার না ভালো লাগে। চায়ের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালান যায়। টেবলের ওপর থাকে চা ভর্তি টিপট।

এদেশে থাকতে হলে গুটি গুটি করে এগোন ভালো। লাঞ্চ বা ডিনারে নিরামিষ খাওয়া ছেড়ে আমিষ ধরা যাক। এদেশে এসে প্রথমতঃ প্রিয় খাদ্য হয়ে দাঁড়াবে ফিস এণ্ড চিপস। হ্যারিং কড, ফিলেট মাছ খুব পাওয়া যায়। একটা বড় দাগা ব্যাসন ও আটা গোলায় ডুবিয়ে কড়া করে ভেজে দেয়। এদেশের লোকের এটা প্রিয় খাদ্য। লোকের এত প্রিয় হয়ে দাঁড়াবার একটা কারণ এটা সবচেয়ে সস্তা খাবার।

এখানকার আর একটা সস্তা খাবার স্যানডুইচ। তার চেয়ে সস্তা রোল স্যানডুইচ। ছোট ছোট গোল পাঁউরুটিকে বলে রোল। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্যান্‌ডুইচ খেয়েছ। তারা হয়ত ভাবছ, ওটা আর এমন কি সুখাদ্য। দু'চিল্‌তে পাঁউরুটির মধ্যে কি গোচ্ছার আজেবাজে শাকপাতা পোরা। কিন্তু ওই স্যান্‌ডুইচ ছাড়া ইংরেজের দিন চলে না। সেলোফেন পেপার মোড়া হরেক রকমের স্যান্‌ডুইচ দোকানে সাজান থাকে। মনোমত একটা চেয়ে নেয়। হ্যাম স্যান্‌ডুইচ, বিফ-স্যান্‌ডুইচ, পোর্ক স্যান্‌ডুইচ, ডিম এবং টমাটোর স্যান্‌ডুইচ পাওয়া যায়। এমন কি একাদশী পালন

করার পর খাওয়া চলে এমন স্যান্ডুইচও তৈরী হয়—শশা টমাটো ও ল্যাটুস দেওয়া। চিস্ স্যান্ডুইচ খেতেও এরা খুব ভালবাসে। চিস্ কি জানত, পনীর। যাই হোক বহু ইংরেজ দুপুরে স্যান্ডুইচ ও চা খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। রাত্রে বাড়ী গিয়ে বেশী করে ডিনার খেয়ে নেবে।

বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্য কি, একথা জিজ্ঞাসা করলে ভাবনা-চিন্তা না করেই বলে দেওয়া যায় ভাত আর মাছের ঝোল। ইংরেজের বেলা বলতে হয় স্যান্ডুইচ! গরীব হলে ত কথাই ওঠে না। এদেশে যারা সাধারণ চাকরী করে তারাও বেশ মোটা মাইনে পায়, ধর সপ্তাহে ৮০-৯০ টাকা। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে যা উপায় করে সে তুলনায় ও টাকা মাত্র যথেষ্ট বললেও কম বলা হয়, বলতে হয় লোকটা সত্যি মোটা মাইনের চাকুরে। কিন্তু এদেশের পক্ষে টাকাটা, নস্যি। বাড়ী আর গাড়ী ভাড়া দিতেই হয়ত অর্দ্ধেকের বেশী টাকা খরচ হয়ে যায়। দুপুরে দোকানের খাবার কিনে খাবার মত পয়সা আর থাকে না। তাই বাড়ী থেকে তৈরী স্যান্ডুইচ ব্যাগে পুরে অফিসে আসে। লাঞ্চের সময় সেই শক্ত স্যান্ডুইচে কামড় দেয়, দোকান থেকে কিনে নেয় এক কাপ চা কিম্বা কফি। বাড়ী থেকে তৈরী করে আনার সুযোগ সুবিধে না থাকলে, দোকানে গিয়ে হুকুম চালায়। হয়ত সেখানে দাঁড়িয়েই পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা-স্যান্ডুইচ খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ে। সময় হাতে থাকলে বা বন্ধুবান্ধবের দল থাকলে একটা টেবল বেছে নেয়, আস্তে আস্তে খায় আর গল্প করে।

এটাকে কিন্তু ঠিক লাঞ্চের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। লাঞ্চ মানে কম করেও দু তিন দফা খাবার। প্রথমে আসবে সুপ—টোমাটোর সুপ, মাংসের সুপ বা মুসুর ডালের সুপ। দ্বিতীয় দফায় আসল খাবার। তৃতীয় দফার মিষ্টিমুখ। চা বা কফি দিয়ে শেষ গণ্ডুষ। গরমকালে তৃতীয় দফা শেষ হলে অনেকে আইসক্রিম খায়—ঠাণ্ডা খাবার খেলো বলে গরম চা খাওয়া বন্ধ রাখবে না।

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত বা রুটি। এরা ভাত খায় না, তার বদলে খায় আলুভাজা না হয় আলু সিদ্ধ। অনেক দোকানে সিদ্ধ আলু খোসা ছড়িয়ে পরিবেষণ করে। বড় দোকানে আলু মেখে মোণ্ডা পাকিয়ে দেয়। তবে আমরা যে পরিমাণ ভাত খাই ওরা সে তুলনায় খায় অনেক কম। সংগে এক আধ টুকরো মাখন মাখান রুটিও খায়। আসল খাবারের এখনও উল্লেখ করিনি। সেটি হবে সার বস্তু। কোন খাবারের পাত্রে মাংসের নাম গন্ধ না থাকলে তাকে খাদ্যই বলা হয় না। আমরা খাবারের পরিমাণের দিকেই বেশী নজর দেই, বলি, আহা পাখীর আহার, লোকটা বাঁচবে কি করে! এরা বলে খাবে কম, কিন্তু জিনিসটি হওয়া চাই তোফা। যা খেয়ে গায়ে জোর পাবে কর্মশক্তি বাড়বে। অথচ খাওয়ার পর হাঁসফাস করতে হবে না, মনেই হবে না এইমাত্র ভোজনপর্ব সমাধা করে এসেছি।

[সামনের মাসে শেষ হবে।]

গানের গুঁতো

আশা দেবী

অনেক চিন্তা করে কেষ্টা মামা বললেঃ জানিস্ গানটা অতি স্বর্গীয় জিনিষ, একটা শ্রেষ্ঠ কলা।

আম গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গুল্‌তি দিয়ে একটা কাককে তাক্ করতে করতে বিন্থ বললে—

ঃ কি কলা—কাঁচা না পাকা।

ঃ তুই একটা গরু—যেমন বুদ্ধি তেমনি কথা। বলছিলাম গানের কথা, কিন্তু তোর কাছে কোন কথা বলাই ভুল।

ঃ না—না, বল বল কেষ্টা মামা, একটু বিব্রত হয়ে বিন্থ বললে।

ঃ দূর, বলে আর কী হবে! তোর মত লোকের কাছে ওসব কথা বলা বৃথা। ভেবেছিলাম, বলবো কিন্তু তুই তো বলতেই দিলি না।—মুখের কাছে একটা উড়ন্ত নীল মাছিকে থাবা মেরে সরিয়ে কেষ্টা মামা বললেঃ শোন, বীরুর পিশেমশায়ের নাম থরহরি, তার বন্ধুর নাম নরহরি, তার মামার নাম বিষহরি। তিনপুরুষের গানের চর্চ্চা এদের। কিন্তু তিনজনই কানে কালা।

ঃ তবে তারা গান গাইত কি করে?—বিন্থ একটা কঞ্চি মাটির ওপরে আছড়াতে আছড়াতে বললে।

ঃ কানে না শুনলে যে প্রাণে গান থাকবে না এ কথা তোকে কে বললে! গান তো আর লোকে কান দিয়ে করে না, করে মুখ দিয়ে। কিন্তু ওরা তিনজনে যখন গান গাইত পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসে গাইতো। তবে বাঁচোয়া, কেউ কারুর চিৎকার শুনতো না।

ঃ তবে গানের ভালমন্দ বুঝতো কি করে? - বিন্থ বললে।

ঃ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতো যার হাঁ যত বড় হয়েছে, সেই তত ভাল গাইছে—এইটেই হয়তো তারা মনে করতো।

ঃ কি করে বুঝলে?—বিন্থ প্রশ্ন করলে।

ঃ কারণ তারা তখন খুব জোরে পরস্পর মাথা নাড়তো—আর মিটিমিটি হাসতো। যেন বলতে চাইতো—বহুত-আচ্ছা—কেয়াবাৎ—

একদিন আমাদের শ্যামনগরের মাসীমা আমাকে ভীষণভাবে ধরে বসলো তাকে ওদের গান শোনাতে নিতে হবে।

আমি বললামঃ সে কি! ওসব যে সাংঘাতিক গান!

ঃ তাই শুনবো। ওরা ঠাকুর দেবতার নাম করে—কেত্তন—রে কেত্তন! তোরা আমাকে একটু শোনা।—শ্যামনগরের মাসীমা এমন নাছোড়বান্দা লোক যে যা জিদ্দি করবে তা সিদ্ধি করে তবে ছাড়বে।

ঃ তারপর?—

ঃ তারপর আর কি! সেদিন বিকেলে মাসীমা হাতে হরিনামের মালা, নাকে তিলক কেটে একেবারে তৈরী। বললে, চল্ কেষ্টা, এই বেলা একটু হরিনাম শুনে আসি। মাসীমার তাগাদায় শেষে যেতেই হলো। বাড়ীটা আমার চেনাই ছিল, বেশী খুঁজতে হলো না। মাসীমাকে নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তাঁর তো কাজ সারা—এর মধ্যেই প্রায় আধমরা হয়ে গেছেন। তবু তিনি ফিরবেন না, যাবেনই। ঘুরতে ঘুরতে এর ঘরের পাশ দিয়ে ওর উনুনের কোণা ঘেঁসে যখন গানের ঘরে গিয়ে পোঁছুলাম তখন তো অবাক কাণ্ড! একটা প্রকাণ্ড হল ঘর তার এক কোণায় বাথটব ভর্ত্তি রসগোল্লা। বোধহয় পাশের ময়রার দোকানের ভাঁড়ার এটা।—আর এক পাশে একটা বিরাট তক্তপোষে মশারি ফেলে তিন পণ্ডিতে বসে পাঁয়তাড়া কষছেন। তখনও গান সুরু হয়নি। এ ও মুখের কাছে কলা দেখাবার মত মুদ্রার ভঙ্গীতে হাত এগিয়ে দিচ্ছে—আবার আর একজন অন্যের মুখের কাছে খোঁচা মারার মত ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিনু মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।—হঠাৎ বললে—তারপর?

কেষ্টামামা বললেঃ আমি বললাম, মাসীমাকে, বোসো একটু সরে। মাসীমা বেশ গ্যাঁট হয়ে ঘটের মত বসলো। হাতে হরিনামের মালাটা নিয়ে মুখে যেন কি পুট-পুট করে বলতে বলতে একটু ধ্যানস্থ হয়েছেন। মাসীমাকে দেখে একটা বেড়াল গুটি গুটি-রসগোল্লার টবের কাছে রস চাটছে। বেশ শান্ত সমাহিত পরিবেশ। হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে একটু চিৎকার উঠলো—তা—না—না। আর সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা এক লাফে পালাতে গিয়ে বেড়ালটার লেজে পা পড়তেই একেবারে রসগোল্লার টবে পড়ে রাজভোগের মতো হাবুডুবু খেতে লাগলো। আমি আর কি করি! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললাম মশারী তুলেঃ ওগো শুনছো আমার মাসীমা যে—

ঃ সাট্—আপ্—এখন আমরা তান ছাড়ছি গোল করো না।

ঃ তান শুনেই তো আমার মাসীমা রসে হাবুডুবু খাচ্ছেন, গান সুরু হলে তো হার্টফেল করবে!

মাসীকে তুলে দেখি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ডেঁয়োপিঁপড়ে সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত; তাঁর গা ভর্ত্তি রস। তাকে কোন রকমে তুলে বাড়ী নিয়ে আসতে আসতে বললামঃ মাসী তুমি ভারি বোকা। রসের সঙ্গে দু' একটা রসগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে না?

মাসী কেঁদে বললে : আমাকে সোজা পুকুরের দিকে নিয়ে চল কেষ্টা একটা ডুব না দিয়ে যেতে পারবো না।

: আহা—মাসীর কি কষ্ট।—বিন্থ বললে।

: কষ্ট? কষ্ট কি রে?—কেষ্টামামা বললে, বল, মজা!

: মজা কেন? বিন্থ বললে ভীষণ অবাক হয়ে।

: সেই কথাই তো বলবো। শ্যামনগরের মাসীমা এতো রেগে গেলেন যে একেবারে সোজা শ্যামনগরেই চলে গেলেন। আমরা অনেক সাধলাম কিন্তু মাসীমা একেবারে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, যাবেনই চলে।

শ্যামনগরে পৌঁছেই মাসীর চক্ষু স্থির! বিশ্বনাথ গয়লাকে বাড়ীতে পাহারা রেখে গিয়েছিলেন, এখন সেই বাড়ীর কর্তা। মাসী যেন কেউ নয়। উঠোনে একটা মস্ত গরু বাঁধা—সেটা নিশ্চয়ই পাগল, নইলে মাসীকে দেখে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে? বারান্দায় একটা কুকুর বাঁধা—একেবারে আলুর চপের মত বাদামী হয়ে গেছে রোঁয়া উঠে।

মাসী বাড়ী ঢুকবে কি বিশ্বনাথ যেন এই মারে তো এই মারে। কি করে! মাসী ভারি বিপন্ন হয়ে বাড়ী থেকে বেরুতেই দেখে সেই তিন মূর্ত্তি যেন কোথায় গানের বায়না নিয়ে চলেছে।

: ওগো ভালমানুষরা—একটু শোনো না বাছা?—

কিন্তু তারা তো শব্দ ব্রহ্মকে গুলে খেয়েছে কাজেই শুনতে না পেয়ে পরস্পর পরস্পরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। মাসীর তখন বড় বিপদ। তিনি ছুটে তাদের পথ আটকে দাঁড়ালেন—

: বাবা সকল, একবার আমাকে রসগোল্লায় ফেলেছ। গান গেয়ে সেবার শুধু রসই খেয়েছি, রসগোল্লা খাইনি। কিন্তু যদি বাবারা আমার দাওয়ায় বসে সেই গানটা গাইতে পার তবে রসগোল্লা খাওয়াবো—এ একেবারে খাঁটি কথা। গাইয়েরা ভাবলেন—গান নিয়ে কথা—গাইলেই হলো! সে শ্যামনগরের দাওয়াই বা কি আর দিল্লীর দরবারই বা কি। তখুনি তারা বেশ করে গিয়ে দাওয়ায় বসে, বিশ্বনাথ কিছু বলবার আগেই, সেই "ননদী-ই—ই—ই-র" গানটা ধরে দিলে।

গান সুরু হতে না হতেই চারদিকে যত দাঁড়কাক, পাতিকাক—নাকে টিনের কৌটো পরা কাক সব একে একে কা—কা—করে তাদের কাকাদের ডাকতে ডাকতে এসে জুটলো। উঠোনের গরুটা হঠাৎ পটাস্ করে দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মত মাঠের দিকে ছুট দিলো। ক্রমে গান জমে উঠতেই ঘরের মধ্যে বিশ্বনাথ একেবারে কেঁচোর মত কুঁকড়ে বসেছিল শেষে আর

না পেড়ে সেই মাথা বের করেছে—অমনি আলুর চপের মত কুকুরটা হঠাৎ পটল ভাজার মত মুখ করে কট করে বিশ্বনাথের পা কামড়ে ধরলে। তারপর গানে আর কান্নায় যেন সেখানে দক্ষযজ্ঞ লেগে গেল। মাসী শেঁওড়া গাছ তলায় বসে বসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সমস্ত দিন সমস্ত রাত গান গাইবার পর তখন তিন সঙ্গী নিজেদের মুখের কাছে কেবল হাত নাড়ছে। গলা এমন ভেঙ্গে গেছে যে তাতে আর আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কেবল প্রকাণ্ড এক একটা হাঁ দেখা যাচ্ছে!

শ্যামনগরের মাসীমা তাড়াতাড়ি এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়ে তার থেকে এক একটা তাদের খোলামুখে পুরে দিয়ে বল্লেন: এবার মুখ বন্ধ করো বাবারা। সাধে কি আর নারদের কেত্তনে মাধব গলে গিয়েছিলেন। এখন খ্যামা দিয়ে বাড়ী যাও বাবারা। আমার কাজ শেষ হয়েছে। কেষ্টা মামা থামলেন।

: বিনু বললে—সাবাস্ কেষ্টা মামা—থ্রি-চিয়ার্স ফর শ্যামনগরের মাসীমা। হিপ—হিপ—হুর্‌রে!

সিসিন

শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা

ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে কখন সে সময়টি আসবে যখন গম ফলবে তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে কেন? আমরা বছরের সব সময়েই গম চাই, শীতেও চাই, গ্রীষ্মেও চাই। আর তাই বা কেন, আমরা এমন গম গাছ চাই যা বছরের সব সময়েই থাকবে—ঋতু পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে শুকিয়ে মরে যাবে না। সকল মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর নিয়ে এলেন বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই সিসিন। সিসিন তৈরি করলেন চিরন্তন গমের গাছ—মানুষের এক অদ্ভুত বিস্ময়। সিসিন তৈরি করলেন এমন গমের গাছ যা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মরে যায় না। আর এরই সাথে সাথে সিসিন তৈরি করলেন আরও একটা আদর্শ—অনুসন্ধিৎসু মন ও প্রবল আগ্রহ থাকলে দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থা মানুষের উন্নতির পথ আটকাতে পারে না।

অত্যন্ত গরীব এক চাষীর ঘরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সারাতভ্ গ্রামে জন্ম হয়েছিল নিকোলাই ভ্যাসিলিয়েভিচ সিসিনের। পয়সার অভাবে লেখাপড়া হল না। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সংসারের কাজে নেমে পড়লেন সিসিন। অতটুকু ছেলে আর লেখাপড়াও জানা নেই! কে আর কাজ দেয়। এক কারখানায় ঢুকলেন সিসিন—জিনিষপত্র প্যাক করার কাজ। তারপর কাজ পেলেন রেললাইনে প্লেট লাগানোর। কারিগরী কাজের আর একধাপে উঠলেন। এর পর হলেন টেলিগ্র্যাফ অপারেটর।

এমন সময়ে বাঁধল যুদ্ধ—ঘরে ও বাইরে। সোভিয়েট রিপাব্লিকের রক্ষাকারী দলে নাম লিখিয়ে রণক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন ভাবীকালের বৈজ্ঞানিক নেহাৎই বাঁচবার তাগিদে। ভয়ানক যুদ্ধে প্রতিদিন মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা করলেও মনকে মরতে দিলেন না সিসিন। মানুষের সাজ্ঘাতিক মৃত্যুকে প্রতিদিন এত সহজে চোখের উপর দেখে মানুষকে বাঁচবার জন্য সাহায্য করবার একটা বিপুল আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠল সিসিনের মনে।

যুদ্ধ শেষ হতেই লেখাপড়া শুরু করলেন তিনি—ভর্ত্তি হলেন লেনিন ওয়ার্কার্স ফেকাল্‌টিতে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী পরীক্ষা পাশ করলেন তিনি। সেদিন থেকেই শুরু হ'ল সিসিনের সত্যিকারের জীবন—বিজ্ঞানের সাধনা। ডিগ্রী পাবার পর তিনি যোগ দিলেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শস্য গবেষণা কেন্দ্রে। সেখান থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে চলে গেলেন ওমস্কে—সাইবেরিয়ার শস্য গবেষণা কেন্দ্রে। দারুণ উৎসাহে গবেষণার কাজ শুরু করলেন সিসিন। এখানেই সিসিন তাঁর বিখ্যাত চিরন্তনী গমের গাছ সৃষ্টি করেন কাউচ ঘাস ও গমের সংমিশ্রণে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রুশ প্রধান মন্ত্রী ষ্ট্যালিনকে তাঁর গবেষণার কথা জানালে ষ্ট্যালিন প্রচুর উৎসাহ দিলেন সিসিনকে, বললেন নির্ভাবনায় গবেষণা চালিয়ে যেতে। সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এ গবেষণাকে সাহায্য করবে। সকলের উৎসাহ পুষ্ট সিসিনের দারুণ অধ্যবসায়ের ফল অবশেষে ফলল। সমস্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে মেটালেন সিসিন।

১৯৩৭ সনে সাইবেরিয়ার গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন সিসিন। ১৯৩৮ সনে তাকে নিয়োগ করান হল লেনিন কৃষি বিজ্ঞান মন্দিরের (লেনিন অল ইউনিয়ন একাডেমি অব এগ্রিকালচারেল সায়েন্স) সহ-সভাপতির পদে। ১৯৩৯ সনে তিনি হলেন রাশিয়ার বিজ্ঞান সংসদের (একাডেমি অব সায়েন্সেস অব দি ইউ. এস. এস. আর) সদস্য।

এমনি করে চাষীর ছেলে সিসিন নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও কঠোর পরিশ্রমে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে উঠে গেলেন। কিন্তু পরিশ্রম ছাড়লেন না। সুযোগ বাড়ার সাথে সাথে গবেষণার কাজও বাড়িয়ে গেলেন। কাজ শুরু করলেন রাই বার্লি ইত্যাদি নিয়ে। আর দিন দিন লেনিন পুরস্কার ষ্ট্যালিন পুরস্কার ইত্যাদি নূতন নূতন পুরস্কার পাচ্ছেন সিসিন। বর্ত্তমানে রাশিয়ার কৃষি-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সংস্থার সহকারী অধ্যক্ষ হয়েছেন সিসিন। আর তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে তিনি একটি বাণী প্রমাণ করছেন যে, পয়সার অভাব বা সুযোগের অভাব সত্যিকারের আগ্রহশীল লোকের উন্নতির অন্তরায় হতে পারে না।

জাগলো আজি বর্ষা

আনোয়ার হোসেন

কাজল কালো আকাশে
বাদল বাউল বাতাসে
কে এলো ঐ নেচে!
কার নূপুরের বোলেতে
বসুন্ধরার কোলেতে
উঠলো তৃণ বেঁচে!
জলের ঝারি মাথাতে
আনলো কারা জুরাতে
তপ্ত ধরার প্রাণ!
উতল করা সুরেতে
ঘন-সবুজ পুরেতে
গাইছে কারা গান!

কার মাধুরী পরশে
দীঘির বুকে হরষে
জাগলো কুমুদ বালা!
কদম যূথী মালতী
করছে কাহার আরতি
পরিয়ে বরণ মালা!
নিখিল চিত হরষা
নাচছে ও-যে বরষা
তাইতো শিখা জাগে!
বর্ষা রাণী জাগলো
তাই মনে দোল লাগলো
শ্যামল বনের রাগে!

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—বাঘা কাণ্ড—

বাপ স—কী ঠাণ্ডা জল! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল। আর স্রোতও তেমনি। পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি। আঁজু পাঁজু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম—খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢুকল নাকমুখের মধ্যে। আর তক্ষুণি মনে হল বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে!

আর তৎক্ষণাৎ—

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল।

বাঘ হাসছে! বাঘ কি কখনো হাসতে পারে? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম্ হাম্ করে খায়, হুম্ হুম্ করে ডাকে—নয়তো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোয়। আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনো নাক ডাকে কিনা! আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায়।

একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে এক ডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুঁড়ে দেব ভেবেছিলুম—কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাৎ করে একটা গাঁট্টা মারল। কিন্তু বাঘের হাসি যে কখনো শুনতে পাওয়া যাবে—সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে, উঠে আয় প্যালা—খুব হয়েছে! এর পরে নির্ঘাৎ ডবল-নিমোনিয়া হয়ে মারা যাবি!

এ তো বাঘের গলা নয়!

আর কে? নির্ঘাৎ ক্যাবলা। পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে। দু'জনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে– যেন পাশাপাশি এক জোড়া শাক আলুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটু বাঘের ডাক ডাকলুম, আর তাতেই অমন করে লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি! ছোঃ ছোঃ—তুই একটা কাপুরুষ।

অ। দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিট্‌কেল্ রসিকতা হচ্ছিল। কী ছোটলোক দেখেছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমায় ভূত করে দিলে—কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে!

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামোকা এ রকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এ-সব ইয়ার্কির মানে কী? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুঁড়ি মেরে আসছিলি—তারপরেই একেবারে নো-পাত্তা! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি! ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান। শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে। তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি? আমি পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুর গর্তে!

—দস্যু ঘচাং ফুর গর্তে! সে আবার কী?—ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিংবা ঘুট্‌ঘুটানন্দের গর্তেও বলতে পারো।

—স্বামী ঘুট্‌ঘুটানন্দ!—ক্যাবলা বার তিনেক খাবি খেল! টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড় কাকের মতো।

—সেই সঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতীর মতো লোকটা।

—অ্যাঁ!

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর গাড়ী।

—অ্যাঁ!

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারী মজা লাগছিল। ভাবলুম চ্যারা-র‍্যা-র‍্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই—কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুড়গুড়িয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন

গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিট্‌কিরি বেরুবে! বললুম, বাংলোয় আগে আগে ফিরে চলো — তারপরে সব বলছি।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ। সঙ্গে সেই গজেশ্বর গাড়ুই। তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে! যাঃ যাঃ! বাজে গপ্প করবার আর জায়গা পাস্‌নি!

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্যালার পালা জ্বর এসেছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উষ্টুম ধুষ্টুম খেয়াল দেখেছিস্!

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়া বিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে। তারপর আসবে ওই গজেশ্বর গাড়ুই। তুমি আমাদের লীডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে।

ক্যাবলা বললে, ফাউল মানে হল মুরগী। টেনিদা মুরগী নয়—কারণ টেনিদার পাখা নেই, তবে পাঁটা বলা যায় কিনা জানিনে! মুস্‌কিল হল পাঁটার আবার চারটে পা! আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাতদুটোকে কি পা বলা যেতে পারে?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল। চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না—লাগল চেয়ারের পিঠে! 'বাপরে গেছি'—বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়োলকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে। ওদিকে হতচ্ছাড়া হাবলাটা যে কোথায় গিয়ে বসে আছে তার পাত্তা নেই! আমি একা কতদূর আর সামলাব!

—আহা-হা—কত সামলাচ্ছ!—ক্যাবলা বললে, তুম্ কেইসা লীডার—উ মালুম হো গিয়া! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই!

টেনিদা আবার চাঁটি তুলছিল—চেয়ার থেকে চট্ করে সট্‌কে গেল ক্যাবলা।

আমি রেগে বললুম, তোমরা এই করো বসে বসে। ওদিকে গজেশ্বর ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক।

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ। হাবলাটা এক নম্বরের ভেড়া। কিন্তু আপাততঃ ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কিনা একবার যাচাই করে দেখা যাক। চল্ প্যালা—কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি। ওঠো টেনিদা—কুইক্!

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একবার ভেবে দেখি।

ক্যাবলা বললে, ভাববার আর কী আছে। রেডি—কুইক মার্চ! ওয়ান—টু—থ্রী—

টেনিদা কুইনিন-চিবোনোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম—ঠিক এ-ভাবে

পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে ? আমাদের তো দু-এক গাছা লাঠি ছাড়া কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়তো পিস্তল-বন্দুক আছে। তা ছাড়া ওদের দলে হয়তো অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—কী আর হবে টেনিদা ? বড় জোর মেরে ফেলবে—এই তো ? কিন্তু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালো। নিজেদের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা ? পটলডাঙ্গার ছেলে হয়ে ?

বললে বিশ্বাস করবেনা—ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারই যেন কেমন তেজ এসে গেল ! ঠিক কথা—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! পালাজ্বরে ভুগে ভুগে এমন ভাবে নেংটি ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। ছ্যা-ছ্যা ! আরে—একবার বইত তো দুবার মরব না !

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সর্দার টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ! সেই ভীতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠে গোড়া পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ান—এ সেই লোক ! বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস ! একটা নয়—এক জোড়া। হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব—নইলে এ পোড়া প্রাণ আর রাখব না !

হ্যাঁ একেই বলে লীডার ! এই তো চাই !

তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম তিনজন। ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙ্গা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম।

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হলনা। এই তো সেই কামরাঙ্গা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা ? গর্তটা গেল কোথায় ?

গর্তের কোনো চিহ্নই নেই। খালি একরাশ ঝোপঝাড় !

ক্যাবলা বললে, কইরে—তোর সে গহ্বর গেল কোথায় ?

তাই তো— !

টেনিদা বললে, আমি তখুনি বলেছিলুম—পালা জ্বরের ঘোরে তুই খেয়াল দেখেছিস ! হুঁঃ ! স্বামী ঘুটঘুটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফুঃ ! পাগল না প্যাঁজফুলুরি !

আবার মাথা ঘুরতে লাগল ! সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খেয়াল দেখেছি ! তা হলে পিঠে এখনো টন্‌টনে ব্যথা কেন ? ওই তো গোবরে আমার পা পেছলানোর দাগ। তা হলে ?

ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি ? পাখি ওড়ে,—রসগোল্লা উড়ে যায়,—চপকাটলেট হাওয়া হয়—মানে পেটের মধ্যে কিন্তু অত বড় গর্তটা যে কখনো উড়ে যেতে পারে—সে তো কখনো শুনিনি !

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে—বুঝলি ? বলেই, বীরদর্পে ঝোপের ওপরে এক পদাঘাত !

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে !—আরে—আরে—বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড় শুদ্ধ টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল। একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো। তলা থেকে শব্দ উঠল : খচ্‌মচ্‌—ধপাস্‌ !

ওগুলো তবে ঝোপ নয় ! গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল !

আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কী বলব—কী যে করব—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না !

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চীৎকার শোনা গেল, ক্যাবলা—প্যালা—

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা ?

—একটু লেগেছে কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি ! তোরা শিগ্‌গির গর্তের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয় ! ভীষণ ব্যাপার এখানে—লোমহর্ষণ কাণ্ড !

শুনে, আমাদেরও লোম খাড়া হয়ে গেল ! আমার মনে পড়ল, করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা। আমি তৎক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম—ক্যাবলাও আমার পেছনে পেছনে। —ক্রমশঃ
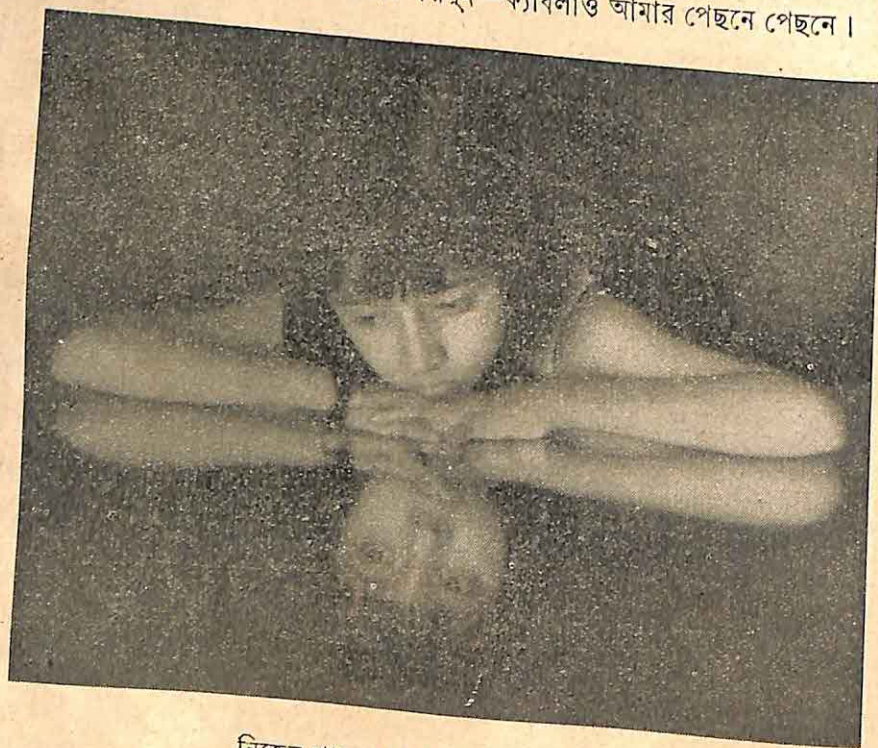
নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে চাহে
যেন বাঁশি মম
উতলা পাগল সম। —**রবীন্দ্রনাথ**

ফটো : বাদল মুখোপাধ্যায়

কচি ও কাঁচা

বরষা

ন. কু. ম.

বরষার জলে জলে ভরে গেছে রাস্তা,
এসময়ে ভাল লাগে খেতে লুচি খাস্তা।
কড়কড়ে চিড়ে ভাজা, মুড়ি দিয়ে বেগুনী,
গরম বাদাম ভাজা—ডালমুট ঘুঙুনি।
টাট্‌কা পাঁপড় ভাজা পেলে আর চাই কি ?
সাধ জাগে খেতে আজ তবু খেতে পাই কি ?
চারদিকে থৈ থৈ জল যেন খেল্‌ছে,
ঝড় যেন তীর বেগে ঘর-দোর ঠেল্‌ছে।
পেটে শুধু ধরে খিল—পায় শুধু কান্না,
থাম্ থাম্ ঝড় তুই—বৃষ্টিও আর না!
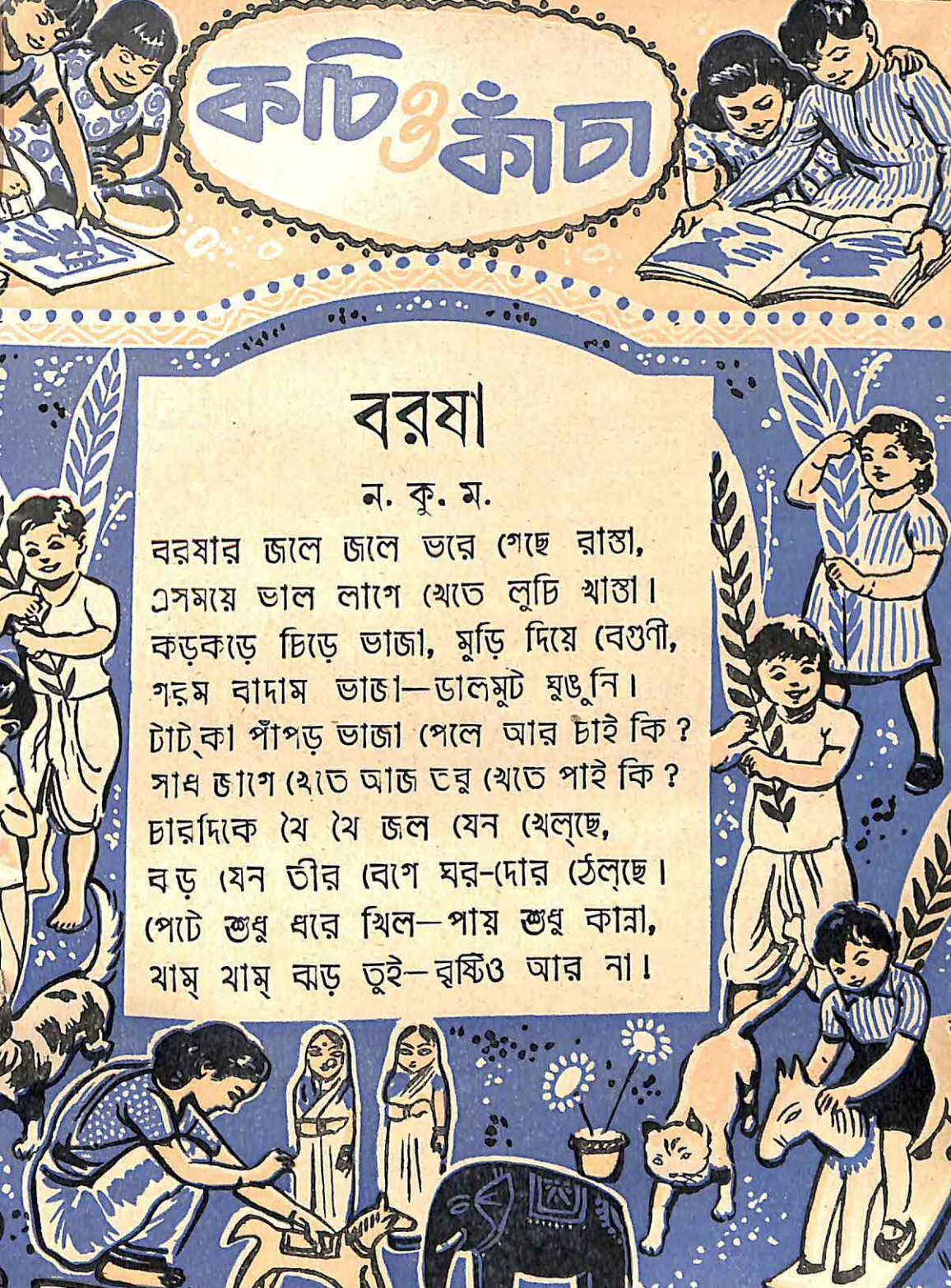
সাঁওতালিদের মাসী

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

ভাই বোন ছুটি—কথা নেই বার্ত্তা নেই দিন রাত্তির এদিক ওদিক করে ছুটোছুটি। পড়ার কথায় সাদা মুখ ছুটি কালো হাঁড়ির মত হয়ে যায়। সকাল বেলায় পড়ার বইয়ের ছবিতে কালি দিয়ে দাড়ি গোঁফ আঁকে—আর ছুপুর বেলায় ছু'জনে হাত ধরে পিসীমার ঘরের পেছন দিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়।

এমনি করে কি চলে? মা বকেন, বাবা মারেন, শেলেট পেন্‌সিল নিয়ে তারা আবার পড়তে বসে। মাথাটা বইয়ের দিকে ঝুঁকিয়ে তারা আড় নয়নে ছুজনে ছুজনের দিকে চায় আর প্রাণ ছুটো আঁকুপাঁকু করে বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় খেলবার জন্য।

খুকু চট্ করে খোকনের পায় একটা রামচিমটি কাটলো। খোকা এইসা জোর চেঁচালো যে দাছুর ঘুম গেল ভেঙে, তিনি ব'কলেন খুকির মা'কে। অমনি তাদের ছুটি। ভাইবোন হাসিমুখে পালিয়ে যায় বাইরে। হাত মিলিয়ে নৃত্য করে তারে নারে নাইরে।...
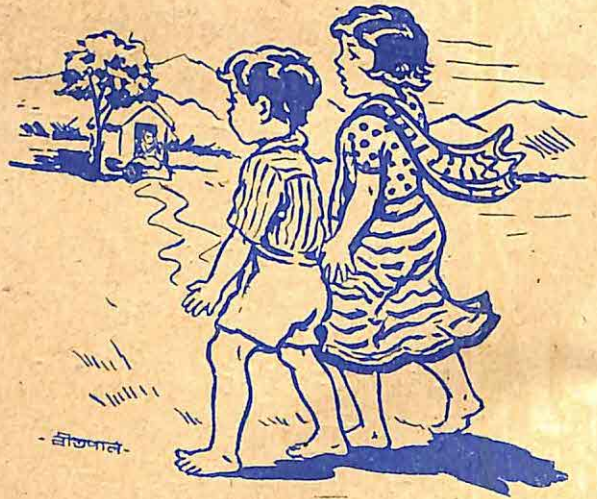
হাওয়ায় তাদের উড়লো জামা,
উড়লো কালো চুল
বনের ধারে সাঁওতালিরা
ছুঁড়লো বন ফুল
সাঁওতালিদের মাসীর বাড়ী
পাহাড়তলির শেষে—
মন্টু—ঝুনী থামলো হঠাৎ
সেইখানেতে এসে।

খোকন আর খুকীর যে ছুটো নাম ধোপ দেওয়া বাক্সে তোলা থাকে—দূরে কোথাও গেলে তারা সে ছুটোকে চেহারার গায় পরিয়ে তারপর বেরোয়। নামতো শুধু চেহারার লেবেল তা তারা জানে।

সাঁওতালিদের মাসীর মাথাটা প্রকাণ্ড হাঁড়ির মত। মন্টু ঝুনী দেখলে তার মাথায় একরাশ ফ্যানা ফ্যানা কাঁচাপাকা চুল তাই বেয়ে বেয়ে উকুনের সারি নামছে আর উঠছে। নাকের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মোটা কাঠি গোঁজা আর সেটা প্রায় কাণ অবধি এসেছে।

চূণকাম করা, কোদালের মত কতগুলি দাঁত, তাদের মধ্যে মধ্যে আবার গলি। উকুনগুলো বেছে বেছে সাঁওতালিদের মাসী টপাটপ গিলছে আর খাচ্ছে। মন্‌টু ঝুনীর দিকে তাকিয়ে সাঁওতালিদের মাসী বল্‌লে,

'ছোট্ট খোকা ছোট্ট খুকি আয়না কাছে ভাই
পেট্‌টি ভরে খেতে দেবো যা···ইচ্ছে তাই।'

ঝুনী চোখ ছুটো বড় বড় করে বল্‌লে—'তুমি মানুষ নও, তোমার কাছে কিচ্ছু খেতে চাই না। মন্‌টু দিদির জামাটা শক্ত করে চেপে ধ'রে আস্তে বল্‌লে—'কি খেতে দেবে শুনি?' সাঁওতালিদের মাসী বল্‌লে—

'পিঁপড়ের কাট্‌লেট্‌
টিক্‌টিকি ভাজা
ইঁদুরের জেলি আর
মাছিদের খাজা।'

মনটু ঝুনী খুব জোরে হেসে উঠলো। কি ঘেন্না, ঘেন্না জিনিষ খায়—মাগো! মন্‌টু একটু ছুষ্টু ছুষ্টু মুখ করে বল্‌লে, 'দেখিতো কি রকম খাবার?'

ঝুনী একটান মেরে তার হাতখানা সরিয়ে বল্‌লে—'যাসনি ভাই, যাসনি। ওরা উঠতে পারে না—কিন্তু ধরতে পারলে মানুষ খায়। দেখছিস না কেমন করে চাইছে।' সাঁওতালিদের মাসী নেকু নেকু কাঁদতে লাগলো। মনটু ঝুনী আবার পালিয়ে গেল!—তারপর?

পাহাড়ের গায় গায় ওই কত ঝরণা
ঠেলাঠেলি ভীড় ক'রে নদী বলে সর না।
নেচে নেচে খোকাখুকু সেই দিকে চললো
মাত্‌লামো হাওয়া লেগে মন ছুটি টল্‌লো।
খোকা বলে 'বাড়ী চল্‌', ঝুনী বলে 'ইস্‌—না,
কেউ যদি ডাকে ভাই, সাড়া তাকে দিস্‌—না।

আয় ভাই চল্ চলি যদ্দূর দেখা যায়
ভয় পাস ?—দূর ছাই জোর কত তোর গায়।'
কোত্থেকে আকাশেতে কাল মেঘ ঘিরলো
চট করে ভাই বোন বাড়ী পানে ফিরলো।

যাবার সময় আবার তারা সাঁওতালিদের মাসীর বাড়ীর পাশ দিয়েই ফিরছিলো। তাদের আবার আসতে দেখে সাঁওতালিদের মাসীর মুখখানা আনন্দে ফাঁক হ'য়ে গেল। একগাল হেসে যেন শূন্যের ওপর কোদাল চালিয়ে বললে—

খোকন সোনা খুকুমণি তুইটি ভাই বোন
চুপ্‌টি করে কাণে কাণে একটা কথা শোন।

ওমা কথা কইতে গিয়ে যেন খানিকটা শূন্যি খুঁড়ে তুললো এমনি ধারালো দাঁত। খোকা বললে—'কী ?'

সাঁওতালিদের মাসী আবার হাসলো। বললে, 'ওইখানে আমার বোনঝিরা থাকে, আমায় ধরাধরি করে নিয়ে যাবি ?'

মনটু ঝুনী হেসে বললে—

'সাঁওতালিদের মাসী তুই থাকিস বনের ধার
তোর চালাকি বুঝতে বাকি নাইকো কারু আর।
সত্যি ক'রে বলনা বুড়ি—মাংস খেতে চাস ?
বোনঝিদের এনেই দেব, ধরে ধরে খাস।'

আবার তারা নাচতে নাচতে বাড়ীর দিকে ছুটলো—আর সাঁওতালিদের মাসী সব আশা ছেড়ে পা'টা যতদূর যায় ছড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।—

মার ঘরে ঢুকে মনটু ঝুনী দেখলে মা উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছেন। তারা উলটো রকম কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর মা'র কাছে খুব করে মার খেলে। রাত্রে স্বপন দেখলো সাঁওতালিদের মাসী তাদের দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে আর বলছে—

'ছোট্ট খোকা ছোট্ট খুকু আয়না কাছে ভাই
পেট্‌টি ভরে খেতে দেবো যা—ইচ্ছে তাই।'

তারা খুব ক'রে মার খেয়েছিল কি-না, তাই আর—কিছু খেলেনা।
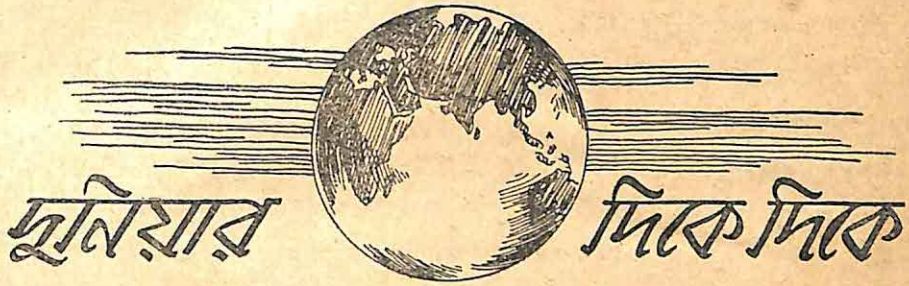
রণজিত মুখোপাধ্যায়

[সত্যি ঘটনা অনেক সময় রোমাঞ্চক কল্পনার থেকেও রোমাঞ্চকর। অতীত ও বর্তমানের পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত সেই সব সংবাদ এই নতুন বিভাগটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। নিছক কল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাবে এতে। —সম্পাদক]

রহস্য কাহিনীর জনক

১৩ই এপ্রিল, ১৮৪৪। সারা নিউইয়র্ক শহরের লোক সচকিত হয়ে উঠলো সংবাদপত্রের হকারদের চিৎকারে। এত সোরগোলের কারণ 'নিউ ইয়র্ক সান' নামে একখানি দৈনিকপত্রের বিশেষ সংস্করণ। মস্তো বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রথম পাতায় ছাপা। "বায়ুযানে আট ব্যক্তির অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রম।" যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখনো বিমানের আবিষ্কার হয়নি, কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই ঘটনার ৬০ বছর পরে মানুষের তৈরি বিমান সাফল্যজনকভাবে আকাশে উড়তে সমর্থ হয়। সুতরাং বায়ুযানে দুস্তর অতলান্তিক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সংবাদ বিরাট চাঞ্চল্যের স্বষ্টি করলো, সুধু নিউইয়র্কে নয় সারা যুক্তরাষ্ট্রে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো এই খবর সর্ব্বত্র।

খবরটি সংক্ষেপে হোলো এই : খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক হ্যারিসন এইন্সওয়ার্থ, বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্যার ইভরার্ড ব্রিংহার্ষ্ট ও দুজন নামজাদা বৈমানিক সমেত আটজন লোক ইংলণ্ড থেকে রওনা হয়ে বেলুনের সাহায্যে তরঙ্গসংকুল অতলান্তিক সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছেন। সমুদ্র অতিক্রম করবার সময় কি ভাবে তাঁরা প্রবল ঝড় ও প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়েছিলেন তার কাহিনী বর্ণনা করে উপরোক্ত সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধির কাছে তাঁরা জানিয়েছেন যে, অতলান্তিক সমুদ্রের ওপর দিয়ে নিয়মিত বিমান চলাচল সম্ভবপর হবে বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা।

এই একটিমাত্র সংবাদ প্রকাশের জন্যে 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকার চাহিদা অসম্ভব রকম বেড়ে

গেল। অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রমকারী দুঃসাহসিক আটজন ইংরেজ সম্পর্কে আরো খবর জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত জনসাধারণ উদ্‌ব্যস্ত করে তুললো পত্রিকাখানির পরিচালকদের। তাঁরা চাপ দিতে লাগলেন বিশেষ সংবাদদাতাটিকে যিনি এমন একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ সকলের আগে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংবাদদাতাটি নীরব। দুঃসাহসিক বায়ুযান আরোহীদের আর কোনো সংবাদ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

অবশেষে সকলের ক্রমাগত প্রশ্নবাণে বিব্রত হয়ে সংবাদদাতাটি জানালেন যে, আসলে ঘটনাটি তাঁর নিজেরই কল্পনায় ঘটেছে। চাঞ্চল্যকর সংবাদ সংগ্রহে অপারগ হওয়ার জন্যে 'সান' পত্রিকার কর্তা সম্পাদক তাঁকে তিরস্কার করেন। ফলে, তিনি ঠিক করেন যে, এমন এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ তিনি পরিবেশন করবেন যা সোরগোল তুলবে সারা দেশে। হোলোও তাই। তাঁর উদ্‌ভট কল্পনাপ্রসূত এই সংবাদটি সত্যিই চাঞ্চল্য আনলো সারা দেশে। এই প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির অধিকারী সংবাদদাতাটি পরে একজন খ্যাতনামা লেখক হিসাবে সারা জগতে স্বীকৃত হন। ইনি হলেন ডিটেক্‌টিভ, রহস্য ও রোমাঞ্চ গল্পের জনক **এডগার অ্যালান পো**। প্রতি বছর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ গল্প লেখককে তাঁর স্মৃতিপূত 'এডগার' পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং এই পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক অন্য সকলের ঈর্ষ্যার পাত্র হয়ে ওঠেন।

এডগার অ্যালান পো

আমেরিকার বোষ্টন শহরে এডগার অ্যালান পো-র জন্ম হয় ১৮০৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে। তাঁর বাবা ও মা দুজনেই অর্থোপার্জনের জন্যে পেশাদারী অভিনয়কে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নাম এবং অর্থ কোনোটিই তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্জন করতে পারেন নি। এডগারের জন্মের দু'বছর পরেই তাঁরা দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে পরলোক গমন করেন। ভার্জিনিয়া প্রদেশের সম্ভ্রান্ত অ্যালান পরিবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন অনাথ এড়গারকে। বনেদী বংশের উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্যে প্রথমে স্থানীয় একটি শিক্ষায়তনে এবং পরে ইংলণ্ডের বিখ্যাত একটি বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার্জনে এডগারের আগ্রহ না থাকায় কোনো জায়গাতেই তাঁর সুনাম হয়নি।
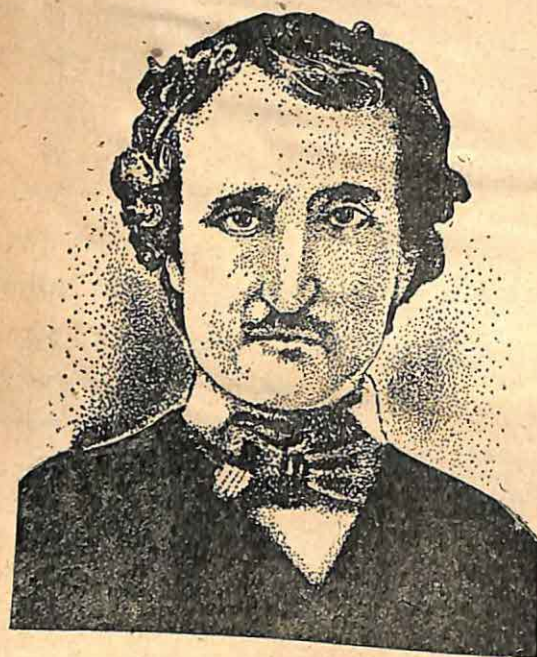
১৮২৬ সালে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেনামীতে সৈন্য দলে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালান পরিবারের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। পরের বছর সৈন্যদল ত্যাগ করে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন এডগার এবং সেই বছরই তাঁর প্রথম কবিতার বই "তৈমুর লং" প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ সালের মধ্যে তাঁর আরো দু'খানি কবিতার বই প্রকাশিত হয় কিন্তু অর্থ বা যশ কিছুই লাভ হয় না। তার পর থেকে সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বহু কবিতা, কাহিনী ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। ১৮৪৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বাল্টিমোর শহরের রাজপথে আধুনিক রহস্য কাহিনীর জনক এডগার অ্যালান পো-র মৃত্যু হয়।

মেঘ উঠেছে

অতুলকৃষ্ণ সিংহ

কাজল কালো মেঘ উঠেছে নীল আকাশের কোণে,
গুরু গুরু আওয়াজ ওঠে, শঙ্কা জাগায় মনে।
নিকষ কালো মেঘের মেলা,
সন্ধ্যা হ'লো দুপুর বেলা,
ঝরবে কি আজ সোনালী রোদ নিবিড় বেণু বনে?
বিকেল বুঝি আসবেনা আজ, আজ বুঝি তার ছুটী!
সন্ধ্যা-তারার চিকণ আলো রইবে কি আজ ফুটি'?
থম্ থমিয়ে বইছে হাওয়া,
হবেনা আজ পারে যাওয়া।
সারা আকাশ-অঙ্গনে আজ মেঘের লুটোপুটি।

কাজল মেঘ আঁচল ছড়ায় সারা আকাশ ঘিরে,
বাইরে যারা বেরিয়েছিল, আসছে ঘরে ফিরে।
আপন নীড়ে ফিরছে পাখী,
যদিও বেলা অনেক বাকী।
বাঁধলো মাঝি, নৌকাগুলো নদীর তীরে তীরে।
মেঘ জমেছে, মেঘ জমেছে, কাজল কালো কালো,
নিবিড় ছায়ায় পড়লো ঢাকা, দিনের যত আলো।
মাঠের ধারে, বনের শেষে,
বিজুলি লতা উঠছে হেসে,
বলছে মেঘে,—অঝোর ধারায় বৃষ্টি ধারা ঢালো।

ভয়টা কিসের, উঠুক না মেঘ, ঝরাক ধারাজল,
কাট্‌বে গো মেঘ, ফুট্‌বে আবার আলোর শতদল।
আবার ফুটে উঠ্‌বে হাসি,
বাজবে আবার প্রাণের বাঁশী,
বিশ্ব-চাতক মেঘের কাছে খোঁজেরে ফটিক জল।

ভিটের মায়া

মুরারিমোহন বিট্

এক ফালি রূপোর পাতের মত সংকীর্ণ নদীটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরে—বহুদূরে।

নদীটার পুব পাড়ে হিরণপুর গাঁ। পঞ্চাশ ঘর লোকের বেশি বাস নয়। কিন্তু মাত্র একশো বছর আগেও যে হিরণপুরের জনসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, এবং অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী ছিল, তা বুঝতে পারা যায় কতকগুলো পুরাণো কোঠাবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখে।

এমনি একটা পুরাণো বাড়ি হল রায়েদের বাগানবাড়ি। বাড়িটা দোতলা। ছোটখাট! সামনে নীচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বিস্তৃত পোড়ো জমি। কাঁটা ঝোপ আর আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। রায়েদের আমলে ঐ জমিটাকেই বলা হত 'কমপাউণ্ড'।

প্রায় নব্বই বছর আগে হিরণপুরে একবার ভীষণ কালাজ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। বহুলোক মারা পড়েছিল তাতে। বহুলোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। যারা পালিয়েছিল, তারা আর ফেরে নি। রায়েদের বাগানবাড়িটাও সেই থেকে অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে। এই নব্বই বছরের মধ্যে এ-মুখো আর হয় নি কেউ। ঘন জঙ্গলে ঢেকে গেছে সারা বাড়িটা। আজ আর চেনাই যায় না বাগানবাড়ি বলে।

প্রায় আশী বছর আগেকার কথা। গ্রীষ্মের এক নিশুত রাতে গাঁয়ের রাখাল ভটচাজ গরমের দাপটে অস্থির হয়ে তাঁর মাটির দাওয়ায় বসে বসে হুঁকো টানছিলেন, এমন সময় ঐ বাগানবাড়ি থেকে কানে ভেসে আসে বিকট অট্টহাসির শব্দ।

কথাটা রটে গেল হু-হু করে। সারা হিরণপুর তৎক্ষণাৎ নিঃসংশয়ে মেনে নিল যে, হ্যাঁ, ঐ বাড়িটাতে ভূতই থাকে বটে! কিন্তু একটি ছেলে—নাম তার গোপেন, সে তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলো,—হুঁ! যত সব গাঁজাখুড়ি কথা! রাখাল জ্যেঠা হুঁকোর নেশায় বুঁদ হয়ে…

কিন্তু পরদিন রাতে গোপেনও যখন শুনলো সেই হাসির শব্দ, তখন আর তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। এর পর থেকে অনেকেই রাত জেগে শুনলো হাসির আওয়াজ…কেউ কেউ আবার কান্নার শব্দও শুনলো। কে যেন করুণ স্বরে কাঁদে। কী গভীর ব্যথা আর বেদনা মেশানো সে কান্নার সুরে সুরে।

সারা হিরণপুরের লোকের আর কোন সন্দেহ রইলো না। গোপেনের মত আর কেউ বিদ্রূপ করেও বলে নি "যত সব গাঁজাখুড়ি কথা! অমুক জ্যেঠা হুঁকো বা গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে…"

ঐ বাগানবাড়ির ত্রিসীমানাতেও কেউ যায় না আর। প্রখর দিনের আলোয় ওর আশ-পাশের পথ দিয়ে অনেকে যাতায়াত করলেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার অনেক আগে থেকেই ওদিকটা জনবিরল হয়ে আসতো। ঠিক এই রকম ভাবেই চলে আসছিল গত আশী বছর ধরে।

আশী বছর পর আজ আবার ঐ ব্যাপারটা নিয়ে চাঞ্চল্য জেগেছে হিরণপুরে।

* * * *

হিরণপুরের সুরেশ চক্রবর্তীর ছেলে অজয় কোলকাতায় থেকে কলেজে পড়াশুনো করে। তারই এক বন্ধু শ্যামা বিট্ একদিন কথায় কথায় অজয়ের কাছ থেকে জানতে পারে রায়েদের বাগান-বাড়ির ভৌতিক ব্যাপারটা। বরানগরের ময়রাডাঙ্গা রোডে শ্যামার আস্তানা, অর্থাৎ বসতবাড়ি। অবসর সময়ে খেয়ে-দেয়ে গল্পের বই পড়ে, বন্ধু মহলে আড্ডা দিয়ে বেশ মজাসে দিন কাটায়। কিন্তু ওর এই নিরুদ্বিগ্ন স্বাভাবিক জীবন যাত্রা দেখে ওর মনের আরেকটা দিক বুঝতে সাধারণের কষ্ট হয়। যারা ওর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশেছে একমাত্র তারাই জানে যে, ওর আরও একটা মন আছে, সে মনটা হল এড্‌ভেঞ্চার-প্রিয় মন। যদি কোথাও এতটুকু রহস্যের ইঙ্গিত সে পায়, অমনি ছুটে যাবে সেই রহস্যের পিছনে। সে রহস্যের সমাধান করা না পর্য্যন্ত তার শান্তি নেই। সে হিরণপুরে পাড়ি জমাবে ঠিক করলো!

অজয় তাকে বারবার সাবধান করলো,—বেশ ভাল করে বিবেচনা করে দেখ শ্যামা! আমি যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি নিজের কাণে শুনেছি সে পৈশাচিক হাসি!

শ্যামা মৃদু হেসে বললো,—আমি তো অস্বীকার করছি না তোর কথা। ভূতের কথা, ভূতের গল্প শুনে আসছি বহুদিন থেকে, তাই জীবটিকে চাক্ষুষ দেখবার সখ আছে।

শ্যামার এ অভিযানের কথা আর একজন শুনলো, সে হল শ্যামল মল্লিক। শ্যামার আর একজন বন্ধু। কোন কিছু রহস্যের ইঙ্গিত পেলে যারা অস্থির হয়ে ওঠে, শ্যামলও তাদের একজন। ঠিক হল, ওরা দুজনেই অজয়ের সঙ্গে হিরণপুরে যাবে।

* * * * *

শ্যামা আর শ্যামল—এদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরেই বহুকাল পর আবার হিরণপুরের অধিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা অনেকেই ওদের নিষেধ করলেন এ-ব্যাপারে অগ্রসর হতে। কিন্তু ওরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

ওদের উৎসাহ দেখে গাঁয়ের দু-একটা রোগা-পট্‌কা ছেলে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। জামার আস্তিন গুটিয়ে বললো, কাজ কি বাড়িটা ওখানে রেখে? আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব বাড়িটা! মাঠ তৈরী করে চাষ করবো ওখানে!

শুনে প্রবীণ ব্যক্তিরা বললেন,—কাজ কি বাবা এসব নিয়ে হৈ-হাঙ্গামা করবার? যেমন আছে থাক্। ওঁনারা তো কোন ক্ষতি করছেন না আমাদের?

আর মেয়েরা সভয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো,—না, না, মনেও ওসব কথা স্থান দিও না বাছা! ওঁনারা স্বয়ং ব্রেহ্মদত্যি! ওঁদের কোপে পড়লে আর রক্ষে নেই! বরং জোড়া পাঁঠা দিয়ে ওঁদের একটা পূজো দাও, তাহলে ওঁরা সন্তুষ্ট হয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেলেও যেতে পারেন।

ক্রমে রাত ঘনিয়ে এলো। প্রবল উত্তেজনা আর উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে রাত দশটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শ্যামল আর শ্যামা দুজনে গেট পেরিয়ে বাগান-বাড়িতে ঢুকলো। দুজনের কাছেই পাঁচ সেলের দুটো টর্চ, আর শ্যামার কাছে আরও একটা জিনিষ আছে, সেটা হল একট রিভলভার। কোনও এক জানাশোনা লোকের কাছ থেকে শ্যামা ওটা চেয়ে এনেছে।

মোট ছ'খানা ঘর বাগান-বাড়িটাতে। নীচে চারখানা, ওপরে দুখানা। নীচের চারখানার মধ্যে একটা বড় হলঘর। এই হলঘরটাতেই বোধ করি গান বাজনার আসর বসতো। ওরা দুজনে প্রথমে সব ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখে নিল। জানলা-দরজাগুলো উইপোকায় সব নষ্ট করে ফেলেছে। কড়ি বরগাতেও উই ধরেছে। তার ওপর নব্বই বছরের জমে ওঠা ধুলো, দেওয়ালের চুণবালি, আর উড়ে আসা শুকনো পাতায় একেবারে সত্যিই ভূতুরে বাড়ির মত দেখাচ্ছে!

ওর মধ্যেই দেখে-শুনে ভেতর দিকের একটা ঘর ওরা নির্বাচন করে নিল। তারপর দুটো বনতুলসীর গাছ উপড়ে এনে ঘরটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করে মাদুর বিছিয়ে বসলো। শ্যামল বললো,—দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যার সুখটা আজ তাহলে এই পোড়োবাড়িতে মাদুরের উপরে শুয়েই মিটিয়ে নিতে হবে?

শ্যামা দেহটা মাদুরের ওপর এলিয়ে দিয়ে বললো,—সবই বিধির লিখন!

গল্প-গুজব করতে করতে আর মশা তাড়াতে তাড়াতে ওদের সময় কাটতে লাগলো। নিঝ্‌ঝুম বাগানবাড়ি। মশার ভন্‌ভনানি আর ঝিঁ-ঝিঁ পোকার অশ্রান্ত চীৎকারে ক্রমশঃই ওরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে শিয়ালের 'হুক্কা হুয়া', আবার কখনো বা বন-ঝোপের ওপর দিয়ে কোন নিশাচর প্রাণীদের লুটোপুটি ছুটোছুটির শব্দ—সব মিলে বেশ একটা রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

রাত পৌণে একটায় পাশের ঘরে মৃদু খস্‌ খস্‌ শব্দে দু'জনে সচকিত হয়ে উঠলো। একটু মনোযোগী হতেই ওরা বুঝলো শব্দটা পায়ে চলার শব্দ। এত রাতে আবার কে চলে বেড়ায় ওঘরে?

শ্যামল রসিকতা করে বললো,—ভূত!

শ্যামা বললো,—তোর মুণ্ডু!

—ভূত বা মুণ্ডু যাই হোক, ব্যাপারটা দেখতে হবে তো?

—অবশ্যই! আয় বেশ পা টিপে টিপে, সাবধানে—শব্দ যেন না হয়!

দুজনে টর্চ নিয়ে উঠলো। ঘরের বাইরে বেরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। ঘরটার মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে। এত রাতে ভূতুরে বাড়িতে আবার এলো কে? দরজার ফাঁক দিয়ে ওরা উঁকি মেরে দেখলো, ঘরের মেঝের ওপর একটা লণ্ঠন টিম্ টিম্ করে জ্বলছে, আর একটা বুড়ো ছোট ছোট কাঠ-কুটো কুড়িয়ে ঘরের একটা কোণে জড়ো করছে। ঐ কোণটাতে দুটো ইঁট বসিয়ে একটা উনুন তৈরী করা হয়েছে, আর ঐ উনুনের ওপর বহুদিনের পুরাণো কালিমাখা একটা হাঁড়িও বসানো রয়েছে দেখা গেল। ওদের বুঝতে কষ্ট হল না যে, বুড়োটা রাঁধবার জোগাড় করছে। এবং এ-ও ওরা অনুমান করে নিল যে, বুড়োটা বোধ হয় পথের ভিখারী—রাতে এখানেই বোধ হয় রাঁধে, খায়, থাকে। কিন্তু এত রাতে রান্নার আয়োজন কেন? হয়ত দূর গ্রামে কোথাও কাজের তাগিদে আটকে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে।

শ্যামলকে ইঙ্গিতে আসতে বলে শ্যামা ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। মানুষের শব্দ পেয়ে বুড়োটাও অমনি চকিতে ফিরে দাঁড়ালো। ইস্, কী রোগা মূর্ত্তি! হাড় আর চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই শরীরে। দেহে প্রাণ আছে বলেও সন্দেহ হয়। অথচ কোটরগত চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল—লণ্ঠনের আলো লেগে যেন আগুনের মত জ্বল্‌ছে!

দেখে ওরা দুজনেই কেমন যেন অশ্বস্তি বোধ করতে লাগলো। যেন বুড়োটার সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে! বুড়োটাও যেন কি! জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে ওদের দিকে!

শ্যামা হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে বলে উঠলো,—অমন করে তাকিয়ে রয়েছো কেন?

শুনে বুড়ো খিল খিল করে হেসে উঠলো। কী বিশ্রী সে হাসি! হেসে বললো,—ভয় করছে বুঝি?

শ্যামা বললো,—ভয় করবে কেন? তুমি তো আর বাঘ-ভাল্লুক নও! তুমিও মানুষ আমরাও মানুষ!
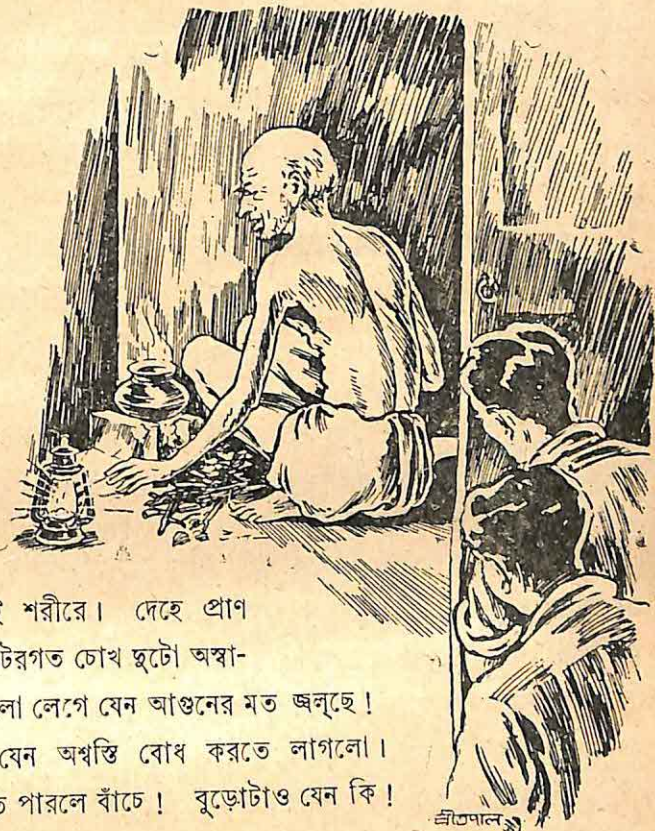
—'তুমিও মানুষ, আমরাও মানুষ'—শ্যামার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বুড়োটা আবার হা হা করে ভীষণ জোরে হেসে উঠলো। যেন অপার্থিব হাসি।

ওরা চমকে উঠলো।

হাসি থামিয়ে বুড়ো বললো,—তোমরা বসো, আমি ততক্ষণে রান্নার জোগাড়টা করে নিই। তারপর তোমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে গল্প করবো। কতদিন যে মানুষের সঙ্গে কথা বলি নি! না না দিন নয়, কত বছর……কয়েকটা যুগ!

—কি বলছো পাগলের মত?

শুনে বুড়ো ঠিক তেমনই অপার্থিব হাসি হেসে বললো,—তোমাদের কথাগুলো শুনতে বেশ লাগছে। বয়স অল্প কিনা পৃথিবীর অনেক কিছুই জানো না তোমরা। তাই তোমাদের বোকা বোকা কথাগুলো শুনতে বেশ লাগছে আমার। ঠিক দু-তিন বছরের কচি ছেলেদের মত কথা আর কি!

শ্যামার শরীর রী রী করে উঠলো বুড়োর কথা শুনে। কিন্তু মুখে সে-রকম কোন ভাব প্রকাশ না করে বললো,—তা এত রাতে রান্না কেন? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

একথার কোন জবাব না দিয়ে বুড়ো উনুনের মধ্যে কাঠ-কুটো দিতে লাগলো। শ্যামল আর শ্যামাও আর কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

একটু পর বুড়ো আড়চোখে চেয়ে বললো,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো বসো। ঘরটা বড় নোংরা না? ঝাড়ুও তো নেই—

—আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।

বলে শ্যামল বনতুলসী গাছ দুটো নিয়ে এসে বসবার মত খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে দুজনে বসলো। বুড়োটাও ততক্ষণে লণ্ঠন থেকে আগুন নিয়ে উনুন জেলে দিয়েছে। উনুনের ওপর হাঁড়িটা যেমন বসানো ছিল, তেমনিই রইলো।

শ্যামল বললো,—হাঁড়িতে কিছু দিলে না তো? তরি-তরকারি, চাল-ডাল এসব কোথায়?

কোন জবাব না দিয়ে বুড়োটা ওদের দিকে পিট্‌পিট করে চেয়ে হাসতে লাগলো।

—পাগল! শ্যামার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শ্যামল বললো।

—বোধ হয়!

সংক্ষেপে জবাব দিল শ্যামা। তারপর বুড়োকে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার দেশ কোথায়?

বুড়ো চুপচাপ রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বেশ গম্ভীরকণ্ঠে বললো,—এটাই আমার দেশ, এই হিরণপুর।

—ঘর-বাড়ি নেই?

—আছে বৈকি! আগে চালাঘর ছিল, এখন হয়েছে কোঠাঘর।

—তবে সেখানে না থেকে এই পোড়োবাড়ির মধ্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?

বুড়ো আরো গম্ভীর হয়ে বললো.—কেন বেড়াচ্ছি, শুনবে সে-কথা?

—বল?

ওরা দুজনেই বুড়োর দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে বসে রইলো। বুড়ো সুরু করলো কাহিনী। সংক্ষেপে সে-কাহিনী এইরূপ:

যেখানে আজ রায়েদের বাগানবাড়ির কংকালটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐখানে আগে ছিল বাঁশবন, বেতবন, বুনো লতাগুল্মের ঝোপঝাড়, আর ছিল শ্রীদাম মাঝির কুঁড়েঘর। লোকে 'ছিদাম' বলে ডাকতো। আবার কেউ বা ডাকতো 'মাঝির পো' বলে। পরের জমিতে লাঙল দেওয়া, ধান কাটা—এইসব ছিল ওর পেশা। তাতেই কোনরকমে নিজের এবং তার ছোট্ট নতুন বউটার ভরণপোষণ চলে যেত।

এমনি সময়ে একদিন কোলকাতার রায়েদের মেজকর্তা হরিশঙ্করবাবু হিরণপুর এসে হাজির হলেন বাগানবাড়ির জন্য জমি দেখতে। অনেক দেখেশুনে ঐ জমিটিই তাঁর পছন্দ হল। কিন্তু সেইসঙ্গে খানিকটা অসুবিধাও হল ছিদামের ঘরখানা নিয়ে। ঘরখানা পড়েছে তাঁদের পছন্দ করা জমির এক কোণে। ঘরটা ছেড়ে দিয়ে যদি বাগানবাড়ি তৈরী করা যায়, তাহলে একটা কোণ ভাঙা হয়ে থাকে—খুঁত থেকে যায় বাগানবাড়ির সৌন্দর্য্যে। তাছাড়া অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও অমন একটা বিলাস-ভবনের পাশে অমন একটা দরিদ্র কুশ্রী কুঁড়েঘর—নিটোল শরীরের ওপর ঠিক একটা দুষ্ট ব্রণের মতই!

তাই হরিশঙ্করবাবু প্রথমে ছিদামের কাছেই গেলেন এর একটা মীমাংসা করবার জন্য। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, ছিদাম কুঁড়েটা তাঁকে দিয়ে দিক, পরিবর্তে মূল্যস্বরূপ টাকা নেবার ইচ্ছা হয় নিক্, কিংবা তার পছন্দমত আশপাশেই কোথাও এক টুকরা জমি কিনে তিনি ঠিক ঐ রকমেই একটা ঘরও তৈরী করে দিতে পারেন তাকে। এখন ছিদামের যা অভিরুচি।

এতে আপত্তি করার বিশেষ কিছু না থাকলেও ছিদাম এই আপত্তি জানালো যে, সে তার সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। তবুও নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন হরিশঙ্করবাবু। কিন্তু ওর ঐ এক কথা! এখানকার মাটি সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। ছাড়া যায় কখনো? এখানকার মাটি তার সাতপুরুষের কথা বলে!

গাঁয়ের দু'একজন মাতব্বর গোছের লোকও তখন হরিশঙ্করবাবুর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন একবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন,—দেখ ছিদাম, এতক্ষণ তোর পায়ে যথেষ্ট তেল দেওয়া গেল, তবুও যখন আমাদের কথা রাখলি না, তখন তোর কপালে নিতান্তই দুঃখু আছে বুঝতে পারছি!

এই কথা শুনে ছিদামের চোখ দুটো শুধু একবার দপ্ করে জ্বলেই উঠেছিল—কিন্তু করবার কিছুই ছিল না।

ছিদাম উঠে গেল ঘর ছেড়ে দিয়ে। হরিশঙ্করবাবু খানিকটা তফাতে তার জন্য নতুন কুঁড়ে তৈরী করে দিলেন। আর এদিকে দেখতে দেখতে ছিদামের সাত পুরুষের ভিটের ওপর গড়ে উঠলো রায়েদের বিলাস-ভবন।

এর কয়েক বছর পরেই হিরণপুরে কালাজ্বরের মড়ক সুরু হয়। গাঁয়ের অনেকেই তাতে মরলো—ছিদাম মাঝিও মারা গেল।

এই পর্য্যন্ত বলে, বুড়ো একবার থেমেছিল। ওরা দুজন শুনতে শুনতে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, বুড়ো থামতেই বলে উঠলো,—তারপর ?

—তারপর ?

বুড়ো একটু হাসলো। হেসে বললো,—ছিদাম মাঝি মারা গেল বটে, কিন্তু ভুলতে পারলো না সে তার সাত পুরুষের ভিটেকে। তাই রায়েরা চলে যেতেই ছিদাম এসে আবার আঁকড়ে ধরলো তার পুরানো ভিটেকে। আমরা এখন যেখানে বসে রয়েছি, ঠিক এই জায়গাতেই ছিল তার কুঁড়েটা।

হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে বুড়ো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো,—আর নয়, উঠি, আমার সময় হয়ে এসেছে……

অদ্ভুত কাণ্ড !

সাথে সাথেই লোকটি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলো। দুই বন্ধু হতভম্ব হয় বসে রইলো।

ম্যাপের মতো গোটানো বইএর লাইব্রেরী

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

অনেকগুলো পাতা একসঙ্গে সেলাই ক'রে বাঁধানো, চ্যাপ্টা, চৌকো চৌকো যে-ধরণের বই তোমরা এখন পড়ো তেমন বই নয়—এক একটা লাঠির গায়ে জড়ানো লম্বা লম্বা কাগজে লেখা এক একখানা বই। ঠিক তোমাদের ইস্কুলের দেওয়ালে টাঙ্গানো ম্যাপগুলোর মতো। ঐ রকম একখানা দু'খানা নয়—সাতলক্ষ বই ছিল আলেকজান্‌ড্রিয়ার লাইব্রেরীতে।

সে কি আজ? এখন থেকে সওয়া দু'হাজার বছরেরও আগেকার কথা। সে সময়ে ঈজিপ্টের ঐ আলেকজান্‌ড্রিয়া শহরটাই হ'য়ে উঠেছিল সেদিনে গ্রীক বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। ঈজিপ্টে মাসিডোনিয়ান রাজবংশের শাসনকর্তা রাজা প্রথম টলেমি তাঁর রাজধানী আলেকজান্‌ড্রিয়াতে এই লাইব্রেরীটি স্থাপন করেন। গ্রীক ভাষায় লেখা গ্রীক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি যোগাড় ক'রে তিনি এই গ্রন্থাগারটির পত্তন করেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করার পরে দ্বিতীয় টলেমি এবং তারও পরে অন্যান্য টলেমিরাও অনেক ভাল ভাল বই সংগ্রহ ক'রে এই গ্রন্থাগারে রাখেন। ফলে, শেষ পর্যন্ত ঐ লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বই-এর সংখ্যা দাঁড়ায় সাত লক্ষ। লাইব্রেরীটি হ'য়ে ওঠে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার।

এই বইগুলোর বেশির ভাগই ছিল পেপিরাস্‌-এর ওপর লেখা। পেপিরাস ছিল ঈজিপ্টের এক ধরণের শরগাছের কাণ্ডের ভেতরকার মজ্জা থেকে তৈরি একরকম কাগজের মত জিনিষ। অবশ্য সমস্ত বইই যে এই পেপিরাসের ওপর লেখা ছিল, তা নয়। ঐ সঙ্গে পার্চ্‌মেণ্টের ওপর লেখা বইও কিছু ছিল, তবে সেগুলোর সংখ্যা কম ছিল। কেননা পার্চ্‌মেণ্টে লেখা বই-এর সংগ্রহ আরম্ভ হয় শেষের দিকের মাত্র কয়েকটা বছর। পার্চমেণ্টের ব্যবহার আবিষ্কৃতই হয়েছিল লাইব্রেরীটি নষ্ট হয়ে যাবার মাত্র একশো বছর আগে।

পার্চমেণ্ট জিনিসটা কি তাও এখানে ব'লে দিই। পার্চমেণ্ট হচ্ছে বাছুর, হরিণ, ছাগল বা ভেড়ার চামড়া। কিন্তু সে-চামড়া জুতোর চামড়ার মতো মোটা চামড়া নয়, কাগজের মতো পাতলা চামড়া। এতে চমৎকার লেখা যায় আর এর তৈরি বই খুব মজবুত আর টেকসই হয়। পার্চমেণ্টের ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বর্তমান কালের কাগজে ছাপা বই-এর প্রচলন হওয়ার আগে পর্যন্ত হাজার দেড়েক বছর ধ'রে পৃথিবীর বহু দেশে লক্ষ লক্ষ বই লেখা হয়েছে এই পার্চমেণ্টে।

যাই হোক, আলেকজান্‌ড্রিয়ার লাইব্রেরীর ওই পেপিরাসে লেখা বইগুলোর কথাই বলি। এ বইগুলো পেপিরাসের এক পিঠে লেখা হোতো। পেপিরাসের ফালিগুলো চওড়ায় ফুটখানেক ক'রে হলেও লম্বায় খুব বড় বড় হ'তো। লম্বার দিকে বড়ো হবার কোনো বাধা ছিল না।

কেননা বইএর পাতা যত লম্বাই হোক না কেন, একমুখে লাঠির গায়ে সেগুলোকে মাদুরের মতো গুটিয়েই তো রাখা হবে? তবে সাধারণতঃ এগুলো যাতে বড্ড বেখাপ্পা রকম লম্বা হ'য়ে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হেতো। বইএর (পেপিরাসের) পাতার বাঁদিকের কিনারা থেকে আরম্ভ ক'রে ডানদিকের কিনারা পর্যন্ত লম্বা লম্বা একটানা লাইনে সে বই লেখা হোতো না। আজকালকার খবরের কাগজের মতো কলাম ভাগ ক'রে ক'রেই সে বইগুলোও লেখা হোতো। তবে পেপিরাসখানা যতটা লম্বা হোতো তার কলামগুলোও প্রায় ঠিক ততটা ক'রেই লম্বা হেতো। কেবল যা 'মার্জিন'টুকু বাদ থাকতো। কাজেই একটা কলম পড়বার সময় ক্রমশঃ নিচের দিকে নামতে নামতে তলার লাইনগুলো পড়বার জন্যে শেষ পর্যন্ত গোটা বইখানাকেই খুলে ফেলবার দরকার হোতো। তারপর দ্বিতীয় কলাম পড়া আরম্ভ করবার জন্যে আবার কাগজের অন্য মাথাটার আরম্ভের দিকে দেখতে হেতো। এইভাবে ক্রমাগত গুটিয়ে, আর খুলে, তবে বইখানা পড়ে শেষ করা যেতো। যাই হোক, বইএর এই কলামগুলো চওড়া হতো সাধারণতঃ দু'ইঞ্চি থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চিরই মধ্যে। অর্থাৎ আজকালকার খবরের কাগজের কলামের থেকে খুব একটা বেশি চওড়া নয়। মাঝখানে লালরঙের লম্বা লম্বা লাইন টেনে ঐ কলমগুলোকে ভাগ ক'রে রাখা হোতো।

আমাদের বোঝবার সুবিধের জন্যে এই রকমের এক একটা গোটানো বইকে এক একটা আলাদা 'লাটাই' বলা যাক। এখন, হোমারের গোটা 'ইলিয়াড' বইখানাকে এইরকম একখানা 'লাটাই'তে ধরানো সম্ভব ছিল না। অন্ততঃ খান চব্বিশেক 'লাটাই' হ'লে তবে 'ইলিয়াড'-এর একটা সেট্ সম্পূর্ণ হ'তে পারতো। যেমন আজকালকার 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র চতুর্দশ সংস্করণটা চব্বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ; অথবা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনাবলী এর চেয়েও অনেক বেশি খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে।

কাজেই গুণতিতে সাত লক্ষ লাটাই থাকলেও আলেকজান্‌ড্রিয়ার লাইব্রেরীতে তা' ব'লে সাত লক্ষ আলাদা আলাদা বই ছিল মনে করলে ভুল হবে। তাছাড়া একই বই-এর অনেকগুলো 'কপি'ও আবার ওর মধ্যে যে না ছিল তাও নয়। মনে রাখতে হবে যে, সে-সব বই, ছাপা বই ছিল না। প্রত্যেকখানি বই-এর প্রত্যেকটি অক্ষর অনেক যত্নে কত সাবধানে হাতে ক'রে পরিচ্ছন্নভাবে লিখে তবে এক একখানি বই তৈরি হোতো। কাজেই—এখনকার চেয়ে তখন বই-এর কদর অনেক বেশি ছিল।

খুব ভাল হাতের লেখাওয়ালা লেখক, পেপিরাসের ওপর বই নকল করা শেষ করলে পর আবার বইখানা যেতো শিল্পীর হাতে, চিত্রবিচিত্র হবার জন্যে। শিল্পীর হাতে বাহারী চিত্র-বিচিত্র করা হ'য়ে গেলে সেটা যেতো বাঁধাই-ওয়ালার হাতে। বাঁধাই-ওয়ালা, ত্যাবড়া তোবড়া পেপিরাস বা পার্চমেণ্টকে ইস্তিরী করার মতো ক'রে মসৃণ করতো, তার মার্জিন ছেঁটে সমান করতো, তার কিনারায়

লাঠি লাগিয়ে দিতো এবং লাঠি ছুপাশে ছুটো 'মুণ্ডি'র (knob) ওপর ধাতুর তৈরি কারুকার্যওয়ালা অলঙ্কার লাগিয়ে বইটিকে একটা সুন্দর চেহারা দিত।

আঠার সঙ্গে ভুষোকালি গুলে মিশিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কালি তৈরি ক'রে সেই কালি দিয়ে শরের কলমে বইগুলো লেখা হোতো। একপিঠে লেখা ঐ বই-এর উল্‌টো দিকের শাদা পিঠটাকে জাফরান-রঙে রাঙানো হেতো। লাটাই-এর মতো জড়ানো এই বইগুলোকে বেগুনী কিম্বা হলুদে রঙে রাঙানো পার্চমেণ্টের তৈরি খাপ-এর মধ্যে যত্ন ক'রে ভ'রে রাখা হোতো।

এত যত্ন সত্ত্বেও ঐ বইগুলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব রইলো না। কতো বিভিন্ন বিষয়ে লেখা অমূল্য বিদ্যা সংগ্রহ এই সাতলক্ষ বই-ওয়ালা লাইব্রেরীটির অধিকাংশ বইই আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে শেষ করলেন রোম-নায়ক জুলিয়াস সীজার, আলেকজান্ড্রিয়া আক্রমণ ক'রে। সে হোলো আজ থেকে ছু'হাজার বছর আগে—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার আটচল্লিশ বছর আগে। হিংসাত্মক যুদ্ধের পরিণাম ভেবে দেখ এখন। এমন অপূর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারটিও যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়ে গেলো।

আষাঢ়ে

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

টুপ্‌ টাপ্‌, টুপ্‌ টাপ্‌ ঝরে খালি বর্ষা,
আষাঢ়ের নবমেঘ দেয় মনে ভরসা।
ভরে গেলো খাল ডোবা,
বনানীর নব শোভা,
দিন আসে তবু ধরা হয় নাকো ফর্‌সা;
টুপ টাপ্‌, টুপ টাপ্‌ ঝরে খালি বর্ষা।

চাতকের মনে জাগে পুলকের ছন্দ,
বৃষ্টির ছাট আসে—কর দোর বন্ধ।
আকাশের কোলে আজ
ওই শোনো হাঁকে বাজ—
বাতাসের সাথে আসে কেয়াফুল গন্ধ,
চাতকের মনে জাগে পুলকের ছন্দ।

ওই দেখো, ওই দেখো ময়ূরের নৃত্য,
কালো মেঘে আলো ঢাকা কোথায় আদিত্য!
ঝরে জল অবিরল,
নদী ছোটে কলকল,
খোকাখুকু সকলের পুলকিত চিত্ত;
ওই দেখো, ওই দেখো ময়ূরের নৃত্য।

মাষ্টারমশাই

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

হঠাৎ চোখে পড়তেই চমকে উঠেছিলুম, এতটা মিল সাধারণতঃ দেখা যায় না। আর একটু হলেই মাষ্টারমশাই বলে চেঁচিয়ে উঠতুম।

ভদ্রলোক ট্রেণে উঠে বসলেন। সত্যি, দূর থেকে বিভূতিবাবু বলে ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক!

ট্রেণটা ছেড়ে দেবার পর আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। আমার গাড়ী আসার তখনও আধঘণ্টা বাকি।

বিভূতিবাবুর কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। আমাদের গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারমশাই। সহপাঠীদের মধ্যে কেউ বোধহয় তাঁর কথা ভুলতে পারেনি, বীরেনও হয়ত তাঁর কথা মনে রেখেছে। তখন ত বোঝবার কিছু ক্ষমতা ছিল না। এখন বুঝতে পারছে। আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর লজ্জা ও দুঃখে ওর মন ভরে উঠছে নিশ্চয়ই। বীরেনের সঙ্গে দেখা হলে একবার জিজ্ঞেস করতুম।

মাষ্টারমশাই-ই বা এখন কোথায় আছেন কে জানে। হয়ত কোনও গ্রামের স্কুলে এখনও পড়িয়ে চলেছেন, ক্লাশের সব থেকে দুষ্টু ছেলেটার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে চড় মারবার জন্যে হাত উঠিয়েছেন, আর অমনি সে হাতের পাঁচটা আঙুল সামনে তুলে ধরে, হয়ত ঠিক বীরেনের মতই—

সে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। ভর্ত্তি হবার পর প্রথম দিন ক্লাশে ঢুকেই টের পলুম, ক্লাসের মধ্যে সব থেকে দুষ্টু ছেলে হচ্ছে বীরেন, বছরের পর বছর ফেল্-করা অন্যান্য বদ্ ছেলেদের সর্দ্দার।

প্রথম পিরিয়ডে ছিল ইংরেজি। রামবাবু ভালই পড়াতেন। মারধোর করতেন না। কিন্তু এমন ভাবে বকুনি দিতেন যে লজ্জায়-অপমানে মাথা হেঁট করে থাকতে হত। ক্লাশ সেভেন্-এ উঠেছি, একেবারে অবুঝ ত নই।

তার পরের পিরিয়ডে অঙ্ক। পরিমলবাবু দারুণ কড়া লোক। একটু ফিস্‌ফাস্ শব্দ হলেই কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন।

হ্যাঁ, এখনও সে সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘণ্টা পড়ার পর পরিমলবাবু চলে যেতেই বিভূতিবাবু ঢুকলেন। ইতিহাসের মাষ্টারমশাই। রোগা বেঁটে খাট চেহারা।

পাশের ছেলেটা ফিস্ ফিস্ করে আমার কানে কানে বলল; এবার কি রকম মজা হয় দেখিস্।

বিভূতিবাবু পড়াতে শুরু করলেন। পেছনের বেঞ্চিগুলোর দিকে গোলমাল ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল। তিনি দু তিনবার ধমক দিলেন। একটা ছেলেকে ধরে চড়ও মারলেন।

হৈ চৈ একটু থামল, কিন্তু দু এক মিনিট পরেই আবার বেশ সতেজেই শুরু হল। বীরেনই সব থেকে বেশী গোলমাল করছিল।

—বীরেন, তোমাকে ধরলে কিন্তু আস্ত রাখব না।

—আধখানা করে ফেলবেন, স্যার ?

বিভূতিবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। বীরেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বীরেন কিন্তু একটুও ভয় পেল না, মুচকি হাসতে লাগল।

মাষ্টারমশাই চড় মারার জন্য হাত ওঠাতেই বীরেন অমনি ডান হাতের পাঁচটা আঙুল তাঁর সামনে ধরে চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই দেখুন স্যার, এই দেখুন—

উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর সমস্ত মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। চোখের চাউনিটাও অদ্ভুত রকমের বিষণ্ণ। কিছুক্ষণ ঐ রকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো একবার মুছে নিলেন।

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ক্লাশ শেষ হওয়ার পর অনেককেই বিভূতিবাবুর ঐ অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করেছিলুম। কেউ ঠিক করে বলতে পারেনি। ওরা অনেক দিন থেকেই বিভূতিবাবুর এই ব্যাপার লক্ষ্য করে আসছে।

উত্তর পেয়েছিলুম অনেক দিন পর, মাষ্টারমশাইয়ের মুখ থেকেই। তখন আমি ক্লাস নাইনে উঠেছি। সেই সময় বিভূতিবাবু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন। আমরা যথারীতি তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালুম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার জন্য আমার মন ছটফট করছিল। তাই স্কুল কামাই করে তাঁকে স্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে গেলুম।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠলেন ঃ মানুষ হও, তোমার ব্যবহারে কেউ যেন কোনদিন দুঃখ না পায়।

দু'এক মিনিট ইতস্ততঃ করার পর আমি বলি—আচ্ছা, মাষ্টারমশাই—

—কি বল, থাম্‌লে কেন ?

—পাঁচটা আঙুল তুলে ধরলেই বীরেনকে আপনি কিছু বলতেন না কেন ?

বিভূতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন ঃ জানো সুবিনয়, আমার পর পর পাঁচটি ছেলে মারা গেছে, এই তোমাদের বয়েসেই। একটাকেও ধরে

রাখতে পারিনি। ঐ পাঁচটি সামনে তুলে ধরা আঙুল দেখিয়ে সে কথাই মনে করিয়ে দিতো আমায় বীরেন। আমার হাত আর উঠতো না, অসার হয়ে যেত যেন। এ ফন্দী প্রথম কার মাথায় এসেছিল জানি না। ওর ভালর জন্যই যে শাসন করি তা একবারও বুঝল না।

বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁর ঠিকানাটা দেন্‌নি। ম্লান হাসি হেসে শুধু বলেছিলেন—ঠিকানা নিয়ে কি হবেরে পাগ্‌ল, ও থাক্।

অনেক দিন পর মাষ্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। কে জানে, হয়ত আজও বীরেনের মত কোনও ছেলে তাঁর চোখের সামনে পাঁচটা আঙুল তুলে ধরছে, আর তিনি অমনি······

দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। আমার ট্রেণ এসে গেল।

এক মনভোলা বৈজ্ঞানিক

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের অফিস। জগদ্বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক এ পদে তখন কাজ করছেন। খুব ব্যস্ত লোক, অনেকরকম কাজের মধ্যে সব সময়ই ডুবে থাকেন অধ্যাপক মশায়। সেদিন কাজ করতে করতে একটা জরুরী কথা তাঁর মনে পড়ল। বেল টিপলেন। বেয়ারা এলে ফাইলবাবুকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক।

ফাইলবাবু এলেন। খুবই সামান্য মাইনেতে কাজ করেন ভদ্রলোক। অধ্যাপক বললেন, দেখ, অমুক কমিটির ফাইলটা নিয়ে এস তো।

ব্যাপারটা হয়েছে এই। বহু সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অধ্যাপক মশায়। একটি নামকরা সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মোটা মাইনের একটি পদ সম্প্রতি খালি হ'য়েছে। সেজন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'য়েছিল। অনেক দরখাস্ত এসেছে। দরখাস্তকারীদের বিবরণ সহ কাগজপত্তর অধ্যাপক মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁর মতামতের জন্যে। নানাকাজের চাপে সে ব্যাপারটা অধ্যাপক একদম ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেলে অধ্যাপক দেখলেন শীঘ্রই তাঁর মতামত পাঠানো দরকার। তারপর একবার ভেবে দেখলেন দরখাস্তকারীদের মধ্যে কে এ পদের উপযুক্ত। একটু ভেবে মন ঠিক করে ফেললেন যে, অমুক ব্যক্তিই এ পদের যোগ্য ব্যক্তি; তাকেই তিনি রেকমেণ্ড করবেন।

ফাইলবাবু কাগজপত্তর নিয়ে হাজির হলেন। তার নিকট থেকে কাগজপত্তর নিয়ে অধ্যাপক মহোদয় তাঁর মতামত লিখলেন। কিন্তু এমনি তাঁর ভোলা মন যে, যাকে তিনি যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন তাকে আর 'রেকমেণ্ড' করা হ'ল না। যোগ্য ব্যক্তি লিখলেন এমন একজনকে যার কথা তিনি এ পদের জন্যে যোগ্য বলে একবারও ভাবেন নি।

লেখা হ'য়ে গেলে কেরাণীবাবুকে বললেন অধ্যাপক, এ কাগজপত্তর ডাকে পাঠানোর দরকার নেই। বিশেষ কাজে একটু পরেই আমাকে রাজভবনে যেতে হচ্ছে। ওদের আফিস তো কাছেই। আমিই না হয় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব।

কিছুক্ষণ পর অন্যান্য কয়েকটি ফাইলের সঙ্গে উক্ত ফাইলটি নিয়ে অধ্যাপক গেলেন রাজভবনে।

সেখানকার কাজ হ'য়ে গেল। অধ্যাপক ফিরে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে পড়ল, তাইতো, ভুলে একজনার বদলে অন্য একজনকে রেকমেণ্ড করা হয়ে গেছে যে।

ডাকা হ'ল কেরাণীবাবুকে। তাকে আনতে বলা হল, সেই সরকারী ফাইলটি। ভদ্রলোক তো অবাক! বললেন, সে ফাইল তো আপনি রাজভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রেগে উঠলেন ; বললেন, রাজভবনে ও ফাইল নিয়ে আমি কি করব? হারালে তো দরকারী ফাইলটা।

কেরাণীবাবু বললেন, আজ্ঞে কথা ছিল, রাজভবন থেকে ও ফাইলটা ওদের আফিসে পাঠিয়ে দেবেন আপনি।

হ'য়েছে, হ'য়েছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা আর কর না। কি যে তোমাদের হ'য়েছে আজকাল, এই একটু সময়ের মধ্যে অমন দরকারী একটা ফাইল হারাও কি করে বল তো? একদম মাথার ঠিক নেই, গাঁজাটাজা খাও নাকি?

ভীষণ চটে যেতেন অধ্যাপক মহোদয়, তবে ঠাণ্ডা হতেও বেশী সময় লাগতো না। কেরাণীবাবুরও সেকথা বেশ জানা আছে। মাথা চুলকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, আজ্ঞে, মাইনে যা পাই তাতে আর কি-ই বা খাওয়া চলে।

বটে, খুব কথা শিখেছ দেখছি। কত মাইনে পাও তুমি?

সবিনয়ে নিবেদন করলেন কেরাণীবাবু তার সামান্য মাইনের কথা।

অধ্যাপক নরম হ'য়ে গেছেন ইতিমধ্যে, বললেন, এখন যাও, তবে ফাইলটা হারিয়ে একরকম ভালই করেছ। আমি ভুলে একজনার বদলে আর একজনের নাম সুপারিশ করেছিলাম।

একটু পরে আবার এলেন কেরাণীবাবু অধ্যাপকের নিকট। ভদ্রলোকের সামান্য মাইনের খবর শুনে অবধি অধ্যাপকের মনটা ছিল নরম। বললেন, কি চাই তোমার আবার?

আজ্ঞে, আপনার ফাইলের মধ্যে অন্য কার যেন একটা ফাইল এসে গেছে। মনে হচ্ছে কোন দরকারী ফাইল। রাজভবনে একবার টেলিফোন করে দেখব কি? বললেন ভদ্রলোক।

দেখতে পার, বললেন অধ্যাপক।

টেলিফোন করা হ'ল। প্রকাশ পেল যে, অধ্যাপক ভুলে তাঁর একটা ফাইল ওখানে ফেলে এসেছেন। তার বদলে অন্যের একটা ফাইল অধ্যাপকের ফাইলের মধ্যে এসে গেছে।

রাজভবন থেকে অধ্যাপকের ফাইলটি সংগ্রহ করা হ'ল। দেখা গেল, চাকুরী সংক্রান্ত ফাইল সেটিই।

এ গল্পের এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। কিছুদিন পর দেখা গেল যে, কেরাণীবাবুর মাইনে বেশ বেড়ে গেছে। এখনও ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাল মাইনেতে কাজ করছেন। আর এ সবই হ'ল সেই মনভোলা অধ্যাপকের জন্য।

এ অধ্যাপক আর কেউ নন। বিশ্ববরণ্যে বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা। বাইরে থেকে ডক্টর সাহার ব্যবহার কখনো কখনো বড় কঠোর বলে মনে হত; কিন্তু তাঁর অন্তরটা ছিল বড়ই কোমল—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্নিগ্ধ।

ঘুমের হাসি

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

ঘুমপরী চুম্ খায় খোকনের চোখে,
  ঢুলুঢুলু আঁখিপাতা ধীরে মুদে' আসে;
আঁধার কাজল কাঠি বুলায় পুলকে,
  স্বপনের মায়া নামে অলস বাতাসে।

জোনাকী ছড়ায় ঘরে আলেয়ার আলো,
  মশারির চারিধার রঙে ঝিল্‌মিল্;
ঝিঁঝি ডাকে জান্‌লায় ভেদি' ছায়া কালো,—
  ঝিম্‌ধরা খাটে খোকা হাসে খিল্‌খিল্॥

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

১০। ফুলের গন্ধ

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হল্যাণ্ড এর লিডেন সহরের বটানিক গার্ডেনে একটি গাছের ফুল হয়; তাই দেখার জন্য সহরের লোক দলে দলে বটানিক গার্ডেনে ভিড় করতে লাগল। এই গাছটি হ'ল এক রকম 'ওল'। সুমাত্রা দ্বীপের গভীর জঙ্গলে এই রকম বুনো ওল গাছ হয়। এই গাছের ওল অতি প্রকাণ্ড এবং এর পাতাও অতি প্রকাণ্ড, সুতরাং এর পুষ্পমঞ্জরীটিও সেই অনুপাতেই বিরাট আকারের হয়। মাটির উপর একটি ছয় ফুট উঁচু মোচার মত এই মঞ্জরীটি দণ্ডায়মান থাকে। এর একটি আবরণী থাকে, তা একটি ঠোঙ্গার মত মঞ্জরীটির নিম্নাংশকে ঘিরে থাকে। এই আবরণীটি উচ্চতায় ও বিস্তারে প্রায় তিন ফুট। ধীরে ধীরে এই আবরণীটি খুলতে থাকে আর সেই সময় এই ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। এই গন্ধ মোটেও সুগন্ধ নয়। অতি বিশ্রী এক দুর্গন্ধ। তিন দিন পর্য্যন্ত এই দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, তার পর কমে যায়। পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে লিডেনের বটানিক গার্ডেনে দর্শকেরা—নাক চাপা দিয়ে ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন।

ফুল আমাদের কাছে বড়ই প্রিয়; কোনওটি সুগন্ধের জন্য, কোনওটি বা রং এর জন্য আবার কোনওটি তার অদ্ভুত আকৃতির জন্য। ওল বা কচু জাতীয় উদ্ভিদের ফুল খুবই ছোট ছোট হলেও পুষ্পমঞ্জরী আর তার আবরণী বিচিত্র বর্ণে আর অদ্ভুত আকৃতিতে সৌন্দর্য্য-পিপাসু লোককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এগুলোর বেশীর ভাগ ফুলে এমন দুর্গন্ধ থাকে যে সৌন্দর্য্যের কথা ভুলে ফুলের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কচু জাতের—এক রকম ছোট ছোট গাছ হয়, তাকে কেউ বলে ঘেঁচু, কেউ বলে ভেটকোল। এই গাছটিও ফুলের দুর্গন্ধের জন্য কুখ্যাত। এর যখন ফুল ফোটে তখন ১৫-২০ গজের মধ্যে দাঁড়ান যায় না।

কলকাতার রাস্তার ধারে অনেক জায়গায় শিমুল গাছের মত একরকম গাছ দেখা যায়। এর ফলের বীজ আগুনে সেঁকে নিলে বাদামের মত খাওয়া যায় বলে অনেকে একে জংলিবাদাম বলে। এই গাছের ফুলও দুর্গন্ধ। শীতের শেষে এই গাছে ফুল হয়, আর ঝরা ফুলের গন্ধে এই সময় গাছের নীচে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

র‍্যাফলেশিয়ার ফুল পৃথিবীর মধ্যে সব ফুলের চেয়ে বড়; এক একটি ফুল এক একটি

বড় গামলার মত। কিন্তু সেই ফুলে এমন দুর্গন্ধ যে কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে এই ফুল দেখার উপায় নেই। তা ছাড়া এই দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পালে পালে মাছি এসে ফুলটিকে ছেয়ে ফেলে।

অর্কিডের ফুলের আদর সব দেশেই খুব বেশী। এই সব ফুলের গঠনের বৈচিত্র্যও যেমন আর এদের বর্ণ সম্ভারও তেমনই মনোহর। এই সব অর্কিডের বেশীর ভাগ ফুলই গন্ধহীন। কিন্তু ভ্যানিলা অর্কিডের ফুলের সুগন্ধ অতুলনীয়। আবার এমন অর্কিড আছে, যার দুর্গন্ধের জন্য ফুলের ত্রিসীমানায় তিষ্ঠান যায় না। বোর্ণিও দ্বীপে এই রকম এক শ্রেণীর অর্কিড পাওয়া যায়। তার নাম বালবোফিলাম বেকারি। এই অর্কিডের গাছটি একটি বৃক্ষারোহী লতা। এর ফুলগুলি ছোট ছোট, লাল ও বেগুনি এর রং। একটি বড় মঞ্জরীতে এক সঙ্গে অনেকগুলি ফুল ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ফুটে থাকে। এক সঙ্গে অতগুলি ফুল ফুটে থাকায় এর সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই সকলকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু এই ফুলগুলি থেকে এরকম একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হয় যে তা সহ্য করা শক্ত। বিলাতে এক ভদ্রলোক এই অর্কিড আনিয়ে গাছ করেছিলেন এবং তাতে যথাসময়ে ফুল হয়। তখন একজন চিত্রশিল্পী তার ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা সে ফুলের কাছে থাকায় ফুলের দুর্গন্ধে তাঁর মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো।

মনঃসমীক্ষণের খেলা

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

আমার এই খেলাটি আমি বন্ধুবান্ধব মহলে দেখাইয়া খুবই সুনাম পাইয়াছি। আমি বাহিরের একটি ঘরে টেবিলের উপর সাদা খাম—সাদা কাগজ—একটি নীলপেন্সিল ও একটি বড় ডিক্সিনারী রাখি এবং নিজে পাশের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকি। দর্শকগণ টেবিলের উপরস্থ অভিধান হইতে যে কোন শব্দ মনে মনে বাছিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন ৭২ পৃষ্ঠার দ্বাদশ শব্দ কি? কাগজটিতে ৭২ এবং ১২ লিখিয়া খামে ভর্ত্তি করিয়া উহা সীল করিয়া দরজার তলার ফাঁক দিয়া আমার নিকট দেওয়া হইল। আমি ঐ অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ পরে লাল পেন্সিল দিয়া খামের উপর ঐ ৭২ পৃষ্ঠায় ১২নং শব্দ যেমন মনে করুন বিদ্যালয় এই কথাটা লিখিয়া দিলাম।

বলাবাহুল্য, দর্শকগণ অভিধানের ৭২ পৃষ্ঠায় ১২নং শব্দ ঐ বিদ্যালয় দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। সকলেই দেখিলেন যে খামটি ঠিকমতভাবেই সিল করা আছে অথচ উহা না খুলিয়াই যাদুকর কিভাবে উহার ভিতরকার সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন এবং অভিধানের শব্দ জানিতে পারিলেন।

খেলাটি কিন্তু দেখিতে খুবই আশ্চর্য্যজনক। আমি ইহা একটি অতিশয় সাধারণ সহজ উপায়ে দেখাইয়া থাকি। দুইটি একই প্রকারের অভিধান একই সংস্করণের হওয়া প্রয়োজন। একটি বাহিরের ঘরে দর্শকদের নিকট থাকিবে এবং অপরটি যাদুকরের নিকট ঐ অন্ধকার ঘরে লুকান থাকিবে।

অন্ধকার ঘরে একটি ভাল টর্চ্চ এবং একটি লাল পেন্সিলের প্রয়োজন হইবে মাত্র। দর্শকগণ নিজেদের ইচ্ছামত অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং শব্দ সংখ্যা (এ ক্ষেত্রে যেমন ৭২ এবং ১২ মনোনীত করিয়া কাগজে ৭২ এবং ১২) লিখিয়া দিলেন এবং খামের মুখ আঁঠা দিয়া বন্ধ করিয়া যাদুকরের নিকট অন্ধকার ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। যাদুকর তখন অন্ধকার ঘরে খামের নীচে টর্চ্চ ধরিলেই ভিতরের নীল পেন্সিলে লেখা ৭২ এবং ১২ স্পষ্ট দেখা যাইবে। যাদুকর তখন ঐ দ্বিতীয় ডিক্সিনারীটি খুলিয়া ৭২ পৃষ্ঠায় ১২নং শব্দ গুনিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন যে "বিদ্যালয়" এবং তিনিও বিদ্যালয় কথাটি কাগজে লিখিয়া দরজার তলার ফাঁক দিয়া ফেরৎ দিলেন। দর্শকগণ ঐ কাগজে লেখা দেখিয়া ও অভিধান খুলিয়া উহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন যে কথাটি যথাযথই লেখা আছে এবং ইহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইবেন। খেলাটার কৌশল খুবই সামান্য কিন্তু ঠিকমত দেখাইলে বড় বড় বিশেষজ্ঞ লোকেরাও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইবেন। এ খেলাটি আশাকরি পাঠকপাঠিকাগণ ঠিকমতভাবে দেখাইতে পারিবে। যাহারা ঠিকমত দেখাইতে পারিবে তাহারা যাদুকর পি, সি, সরকার, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ এই ঠিকানায় আমাকে একটি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলে খুশী হইব। ভবিষ্যতে আমি সেইভাবে শিশুসাথীতে লেখা পাঠাইব।

মিনুর মায়ের সংসার

শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার

মিনুর মায়ের বিড়াল ছানা,
পাড়ার লোকের নাই অজানা!
ছেলে মেয়ে নাইকো কোন তার,
সংসারে ওই বিড়াল ছানাই সার।
মাছ মাংস দুধে তাহার লোভ,
পায়না যেদিন বাড়ে তাহার ক্ষোভ।
শিকারী সে তাইতো শিকার খোঁজে,
চুরি করার দোষ কি মোটে বোঝে।
খোলা পেলেই এর ওর বাড়ী গিয়ে,
মাছ মাংস পালায় খেয়ে দেয়ে!

পাড়ার লোকে আসে যখন তেড়ে,
মিনুর মায়ের রাগ আরও যায় বেড়ে!
বেতের ছড়ি লাগায় তখন কষে,
পরক্ষণেই মরে সে আফশোসে!
আদরে কয়—জড়িয়ে ধরে গলা,
"যা বলেছি মিছে সবই বলা!"
শোনায় তখন কত নীতির কথা,
এমনি করে জুড়ায় তাদের ব্যথা।
মিনুর মায়ের নাইতো কেহ আর,
সংসারে ওই—বিড়াল ছানাই সার।

নির্ম্মল চৌধুরী

বার্থেলোমিউ হাঁকলে, "পাহারাদার!"

পাহারাদার এসে দাঁড়াতেই বললে, "একে নিয়ে যাও।...কালীকিঙ্কর।"

পাহারাদার বা-সিনকে সেই ঘরে এনে বন্দী করে রেখে কালীকিঙ্করের উদ্দেশ্যে চলে গেল।

—ছয়—

কালীকিঙ্করকে বার্থেলোমিউর সামনে হাজির করে পাহারাদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বার্থেলোমিউ একখানা টুল দেখিয়ে কালীকিঙ্করকে বললে, "বোসো।"

কালীকিঙ্কর এমন ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন; বার্থেলোমিউ তো তাঁকে ভৃত্যের পর্যায়ে ফেলেছে। তবে হঠাৎ এমন আচরণ কেন? তিনি প্রশ্নটির ঠিক উত্তরটি খুঁজে পাবার আগেই বার্থেলোমিউ তাঁকে সোজা প্রশ্ন করলে, "তুমি মালয়ের জঙ্গলে দেবদত্ত বিহারের অধ্যক্ষের কাছ থেকে মঠের যে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছো তা কি? সে গুপ্তধন কোথায় আছে?"

বার্থেলোমিউয়ের প্রশ্নে কালীকিঙ্কর চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন বিশ্বাসঘাতক বা-সিন তাঁর ও সন্ন্যাসীর কথাবার্তা কোন রকমে জানতে পেরেছে এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় বার্থেলোমিউকে তা জানিয়েছে। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "কোন গুপ্তধনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নেই।"

বার্থেলোমিউ বললে, "আমি তা জানতে চাই না—জানতে চাই কোথায় তা আছে?"

"দেবদত্ত বিহার কোথায় আমার তাও জানা নেই। আমি সেখানকার কেউ নই—একজন বাঙালি নাবিকমাত্র। কি করে তা জানবো?"

"জানবে তার অধ্যক্ষের কাছ থেকে যে তোমার জাহাজেই মারা যায়। তুমিই সে কথা আমায় বলেছো।"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। তবে কি বা-সিন বলে নি, বার্থেলোমিউ অনুমান করেছে মাত্র?

বার্থেলোমিউ গর্জন করে উঠলো, "বল।"

কালীকিঙ্কর বললেন, "সন্ন্যাসী আমাকে মঠের ধনদৌলত সম্বন্ধে কিছুই বলে যান নি।"

"কালীকিঙ্কর! সাবধান! এখনই তোমার সামনে প্রমাণ হাজির করবো।"

কালীকিঙ্কর এবার সব পরিষ্কার বুঝতে পারলেন; আর এও বুঝলেন যে, বার্থেলোমিউ তাঁর মুখ থেকে কথা বার করতে যে কোন উপায় অবলম্বন করবে; বললেন, "কি প্রমাণ?"

"প্রমাণ তোর ভৃত্য। উঠে দাঁড়া, কুকুর!"

কালীকিঙ্করের চোখ জ্বলে উঠলো, তবুও বললেন, "তোমার সামনে বসতেও প্রবৃত্তি হয় না।"

"বটে! দাঁড়া; দাঁড়িয়ে বল, সে গুপ্তধন কোথায়।"

"বলবো না।"

"তোকে বলতেই হবে।"

"বলবো না।"

"দেখ্‌ কালীকিঙ্কর! তোর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু। কিন্তু তার আগে তোর মুখ থেকে কথা আদায় করবোই।

কালীকিঙ্কর ঈষৎ হাসলেন।

বার্থেলোমিউ হাঁকলো, "পাহারাদার! এর হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখবি। খেতে চাইলে দিবি পাথর, পান করতে চাইলে দিবি বালি। নিয়ে যা এই ঘেয়ো কুকুরটাকে।"

কালীকিঙ্করকে সেখান থেকে নিয়ে গেলে, বার্থেলোমিউ উঠে পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলো, 'যদি কালীকিঙ্কর জেদের বশে প্রাণ দেয়, সত্য খবরটা না বলে? তাতেই বা তাঁর ক্ষতি কি? কিন্তু মঠের গুপ্তধন, সে তো অনেক। তা হাতে পেলে একটা রাজ্যই গড়ে তুলতে পারা যায়। না, তা ছাড়া হবে না। কিন্তু এই বা-সিনটাকে নিয়ে কি করা যায়? এ বেঁচে থাকলে লোকসান বই লাভ নেই। ওটা একটা অসভ্য মগ। গুপ্তধন হাতে পেলে ওর ক্ষমতা বাড়বে! তখন হয়তো আমারই সঙ্গে টক্কর দেবে। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে, গুপ্তধন উদ্ধারের আগেই ও আমার দলের কাউকে তার সন্ধান দিয়ে আমারই বিরুদ্ধে একটা দল গড়ে তুলবে। দলের মধ্যে আমার শত্রুও যে অনেক আছে তা কি আমি বুঝতে পারি না? যে কয়জন মাত্র আমার অনুরক্ত কেবল তাদের নিয়েই সেখানে যাবো। বা-সিনের কাছ থেকে যা জানা গেছে তার বেশি আর জানা যাবে না। ও নিজেই এখন কালীকিঙ্করের ওপর চোখ রেখেছে। কে জানে, এই দুই কালা আদমীর শেষে মিলন হবে কিনা। এ দিক থেকে বিচার করলে, বা-সিন আমার শত্রু। ওকে শেষ করাই ঠিক।'

এই সিদ্ধান্ত করে বার্থেলোমিউ একদল সহকারীকে ডেকে বললে, "সেই মগ কুকুরটাকে শেষ করে ফেল। একটা মাত্র গুলি।" বলেই বার্থেলোমিউ সদর্পে চলে গেল।

বলা বাহুল্য সেইদিন রাত্রেই বা-সিনের মৃতদেহটাকে পাহাড়ের এক গহ্বরে ফেলে দেওয়া হলো।

কালীকিঙ্কর তখন একথা জানতে পারলেন না। পরদিন এক পাহারাদার তাঁর মনে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে ব -সিনকে গুলি করে হত্যা করার কথা জানালে। শুনে কালীকিঙ্কর দুঃখিত হলেন।

তাঁর নিজের অবস্থাও তখন শোচনীয়। তাঁর হাতে-পায়ে বেড়ি, সেজন্য কষ্ট হচ্ছিল। এই অপমানের চেয়ে মৃত্যু শতগুণে ভাল। কিন্তু তাঁর জীবন-মৃত্যু এমন অসভ্য বোম্বেটেদের হাতে, তবে এটা ঠিক যে, বার্থেলোমিউ গুপ্ত ধনের লোভে এখন তাঁকে মারবে না। তা যেদিন তার হস্তগত হবে সেদিনই তাঁরও জীবনের অবসান। সন্ন্যাসী হ্যাংলির হাতে এই গুপ্তধনের জন্য কত যন্ত্রণা সয়েছিলেন। আবার ঠিক সেই জন্য তাঁদেরও সইতে হচ্ছে। তিনিও সন্ন্যাসীর মতই সব সইবেন। তবু এই বোম্বেটেদের তার অধিকারী করবেন না, কিছুতেই না।

তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, বার্থেলোমিউয়ের ওপর অনেকে মনে মনে রুষ্ট, এমন কি ঐ পাহারাদাররাও। এখানে যদি বিরোধীদের নিয়ে তিনি একটি দল গড়ে একদিন বিদ্রোহ করে দ্বীপটি দখল করতে পারেন তাহলে বোম্বেটেরাজও শেষ হবে, বহুলোক শান্তি ও মুক্তি পাবে। এখন সব সহ্য করে সেই উদ্দেশ্যে কাজ করাই উচিত। তাই তিনি পাহারাদারটার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু পাহারাদারেরও পাহারাদার ছিল। তাই সে কালীকিঙ্করকে এড়িয়ে যেতে লাগলো।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই হয় রতনপুরে বার্থেলোমিউয়ের অভিযান। আমরা জানি যে, সুবর্ণকে জাহাজে নিয়ে আসবার হুকুম দিয়ে বার্থেলোমিউ আগেই চলে যায়। তারপর যা হলো তা এই—

তার হুকুম মতো সুবর্ণকে ও লুঠের মাল-পত্র সব জাহাজে তুলে বোম্বেটেরা রতনপুর ত্যাগ করলে এবং তাদের ঘাটি এই সাগরদ্বীপের কেল্লার দিকে জাহাজ চালাতে লাগলো।

জাহাজে সুবর্ণ একটি কামরায় বন্দী মাত্র। এ ছাড়া তার ওপর আর কোন মন্দ ব্যবহার করা হলো না। কেন করা হলনা তা সুবর্ণও জানবার চেষ্টা করলে না, সাধারণ বোম্বেটেরাও কেউ বুঝতে পারলে না।

এরই কয়েক দিন পরে বার্থেলোমিউ পেড্রো ও আর দুজন সহকারীকে নিয়ে খেতে বসেছে।

পেড্রো বললে, "কাপ্তেন! ঐ বাঙালি কুকুর বাচ্চাটাকে মাড়িয়ে না মেরে ফেলে ওর চমৎকার থাকবার খাবার ব্যবস্থা করলেন কেন? ওকে দলে নেবেন নাকি?"

বার্থেলোমিউ বললে, "কিসে বুঝলে, ওকে দলে নেওয়া হবে? উদ্দেশ্য না বুঝে বাতাসের থলের মতো ভোঁ ভোঁ করছো কেন?"

"জানতে পারি কি ওকে ওভাবে রেখে কোন্ উদ্দেশ্য সাধন হবে?"

"এই ছোকরা কালীকিঙ্করের কে তা জান তো?"

"হাঁ। ভাইপো।"

"কালীকিঙ্করের মুখ থেকে কথা বার করবার এক মস্ত উপায় হবে ঐ ছোক্‌রা। সে গুপ্তধনের সন্ধান না দিলে তার সামনেই ওকে কেটে ফেলবার ভয় দেখাবো। তার ফল হবে এই, কালীকিঙ্কর ভাইপোর প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে গোপন কথাটি আমাদের জানাবে।"

"সাবাস কাপ্তেন! সাবাস। এ কৌশল আমাদের কারো মাথায় কিন্তু আসতো না।"

বার্থোলোমিউ গম্ভীরভাবে মাংস চিবুতে লাগলো। অতঃপর পেড্রো বা সহকারীদের কেউই সুবর্ণর ওপর খারাপ ব্যবহার করলো না।

রতনপুর ছাড়বার প্রায় দু মাস পরে বার্থেলোমিউ বন্দী ও লুঠের মালপত্র নিয়ে "বুকানিয়ারে" তার সাগরদ্বীপের কেল্লায় ফিরে এল।

সুবর্ণ সেই ইমারৎ দেখে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, রূপকথার কোন রাক্ষসপুরীতে এসে পড়লো কি? এমন একটা দ্বীপের কথা তো সে আগে কোন দিন কারো মুখে, এমন কি কালীকিঙ্করের মুখেও শোনে নি। এরা সবাই কি বোম্বেটে?

—— - -

অদ্ভুত যত জন্তু-জানোয়ার

কিউই

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আজ তোমাদের বলব একটি মজার পাখীর কথা। তবে পাখী বললেও আসলে কিন্তু সেটা পাখী নয়। কারণ তার ডানা প্রায় নেই। যেটুকু আছে তা দিয়ে আকাশে ওড়া যায় না। তবু ওটা পাখী—ধাবক-পক্ষী গোষ্ঠীর অন্যতম। উট পাখী, এমু, ক্যাসোয়ারীর সগোত্র। বাড়ি এদের খাস্ নিউজিল্যাণ্ড-এ। ভারতে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্য কোথাও এদের দেখতে পাওয়া যায় না।

এই অদ্ভুত পাখীটির নাম হচ্ছে 'আপটারিক্স'। তবে সচরাচর 'কিউই' নামে পরিচিত। অনেকটা বিড়াল ছানার মত 'কি উই' 'কি উই' করে ওরা ডাকে। সেই থেকে ওদের ওই নাম। মাওরীরা ওদের বলে 'লুকানো পাখী'। তারা বিশ্বাস করে যে, কিউই বনদেবতা 'টেন'-এর আদুরে পাখী। তিনিই যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এবার ওর চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি শোন।

উঁচুতে কোন কোন কিউই সাধারণ মুরগীর মত, আবার কোন কোনটা প্রায় ২ ফুট। গড়ন বেশ মোটাসোটা, পা দুটি বেশ ছোট। প্রতি পায়ে ৪টি করে নখওয়ালা আঙ্গুল আছে। আঙ্গুলগুলির তিনটি সামনে, আর পেছনে একটি। সেটি খুব ছোট। পায়ের গড়ন অনেকটা পশুর মত। কিউই-র পা-দুটো ছোট হলেও খুব জোরে সে ছুটতে পারে। শত্রু দেখলেই চকিতে গিয়ে সে গর্তে ঢুকে পড়ে। তা বলে শত্রু যদি তাকে পাকড়াও করে তবে সে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে না। ঠোঁট আর নখ দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করে। বিপদে পড়লে মানুষকেও আঁচড়ে কামড়ে দিতে সে পরোয়া করে না।

কিউই-র ঠোঁটটা বেজায় লম্বা। বোধ হয় কাদা খুঁচিয়ে পোকা ধরবার সুবিধের জন্যই ঠোঁটটা তার এত বড়। তা ছাড়া ঠোঁটের আগাটা সামান্য বাঁকা এবং সেখানে রয়েছে নাকের ফুটো দুটি। এমন বন্দোবস্ত আর কারুর নেই। ঠোঁটের আগায় নাক! শুনলে হাসি পায় না কি?

আর একটি অদ্ভুত জিনিস আছে তার, সে হল তার বিড়ালের মত গোঁফ। ঠোঁটের গোড়ায় আর গোল গোল চোখদুটোর পাশে আছে ঐ গোঁফ। এর সারা গায়ে আছে চুলের মত রেশমী পালক। আর এই পালকের নিচে লুকান আছে ইঞ্চিখানেক লম্বা অকেজো পাখা। এই পাখাদুটোর শেষে রয়েছে হাড়ের মত শক্ত থাবা। এর লেজ বলে কিছু নেই।

কিউই হচ্ছে পেঁচার মত নিশাচর পাখী। গাছের গোড়ায় বা অন্য কোন ফাঁপা জায়গায় গর্ত করে সারাদিন সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে, লুকিয়ে থাকে। তার-পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে আহারের অন্বেষণে পোকা, মাকড়, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি হচ্ছে এদের খাবার। লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাদা মাটি, পচা পাতা ইত্যাদি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোকা ধরে। এই সময় তারা অদ্ভুত একটা শব্দ করে। এই শব্দ লক্ষ্য করে কিউই-শিকারীরা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ওদের ধরে।
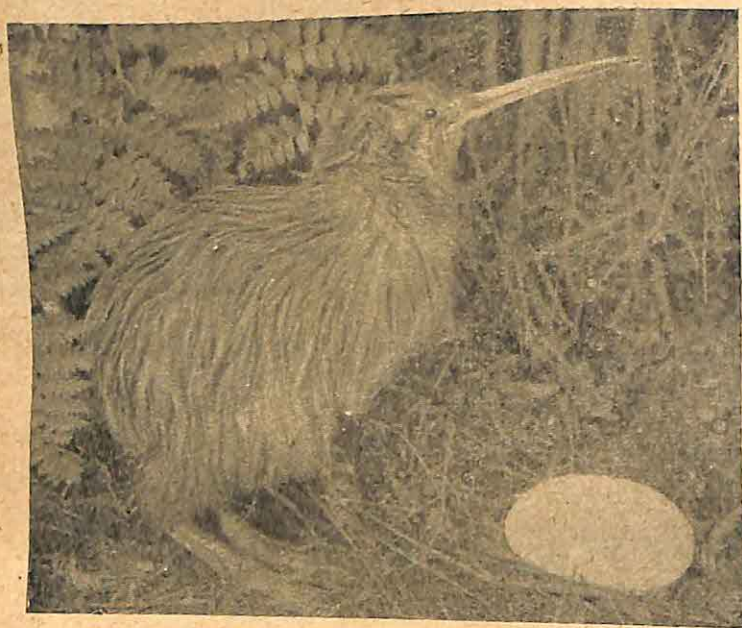
কিউই হচ্ছে ভারী লাজুক আর ভীরু প্রাণী। দিনের বেলায় সে বেরুতে ভয় পায় কিন্তু তবু আজ তারা লোপ পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য দায়ী মানুষের লোভ। কিউই-র মাংস নাকি খুব সুস্বাদু। তা ছাড়া কিউই-এর রেশমের মত লোমের চাহিদা যথেষ্ট। ফলে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ঔপনিবেশিকেরা নির্বিচারে ওদের হত্যা করেছে। তাছাড়া সেখানকার আদিম অধিবাসীরাও লোভে পড়ে এদের মারতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি। তাই আজ খুব কম কিউই দেখা যায়।

কিউইদের দৃষ্টি শক্তি খুব কম। দিনের বেলায় তো একফুট দূরের জিনিসও এরা দেখতে

পায় না, তবে রাতের বেলায় ফিট ছয়েক দূরের জিনিস এরা বেশ দেখতে পায়। দৃষ্টিশক্তি কম হলেও এদের শ্রবণ আর ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।

কিউই-র আর একটি আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে ওর ডিম। যেমনি তার আকার, তেমনি ওজন। মুরগীর ডিমের চেয়ে ওজনে প্রায় আটগুণ বেশী হয় কিউই-র ডিম। কোন কোন ডিম হয় প্রায় এক পাউণ্ডের মানে আধ সেরের মত। ছবিটা দেখলেই আন্দাজ করতে পারবে ডিমের সাইজের।

স্ত্রী কিউই বছরে একটা কি দুটো ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম পাড়ার পর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ওরা। তাই ডিমে আর তা দিতে বসে না। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরে ডিমে তা দেয় পুরুষ-কিউই।

এ পর্যন্ত তিন রকমের কিউইয়ের খবর জানা গেছে। রঙ্ তাদের ভিন্ন, কিন্তু স্বভাবে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

নাগা বিদ্রোহ

প্রদ্যোতকুমার মিত্র

ফুটবলের মাঠে যে যত গোল দিতে পারে, সেই তত বড় বীর। ক্রিকেট খেলায় যে যত রাণ তুলতে পারে, তারই বাহাদুরী তত বেশী। কিন্তু যে যত মানুষের মাথা কাটতে পারে তার সম্মান তত বেশী—একথা বিশ্বাস করা সত্যি শক্ত।

অবিশ্বাস্য হ'লেও কথাটা সত্যি। আর পৃথিবীর যে সব জাতির মধ্যে এই নিয়ম চালু আছে, তাদের অন্যতম হ'ল, ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের বাসিন্দা নাগারা। নাগারা অবশ্য কোন জাতি নয়। এদের বলা হয় উপজাতি। যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়, দাঙ্গা-মারামারি নয়. এমনই সাধারণ শান্ত জীবনেই এদের মধ্যে যে যত বেশী নরমুণ্ড শিকার করতে পারে, নাগা সমাজে তার সম্মান—প্রতিপত্তি হয় সেই অনুপাতে। নাগারা এমনিতে শান্তিপ্রিয় কিন্তু তাদের এই ভয়াবহ স্বভাবের জন্যে সবাই ভয় করে এদের। সবাই ভয় পায় নাগাদের বাসভূমি নাগা-পাহাড়ে ঢুকতে।

আসামের দক্ষিণ-পূব কোণে নাগা পাহাড়। এখানে নাগারা ছাড়াও থাকে আরও দুইটি উপজাতি,—কুকী ও মিকির। নাগাদের ভেতর অনেক রকম ভাষা ও শ্রেণী দেখা যায়। এদের এক শ্রেণীর ভাষা অপর শ্রেণী বুঝতে পারে না। নাগা শব্দের আর একটা মানে হ'ল, উলঙ্গ।

নাগারা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-রাজ হাজার চেষ্টা করেও এদের বশে আনতে পারে নি। এদের এই স্বাধীনতাপ্রীতির সুযোগ নিয়ে আজও যে ভাবে একদল লোক নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এদের কাজে লাগাচ্ছে আর তার ফলে নাগা পাহাড় অঞ্চলে এখন যে ভয়াবহ কাণ্ড চলছে, তার বিবরণ দিনের পর দিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপা হচ্ছে।

ইংরেজরা প্রথম যখন নাগা পাহাড় অধিকার করেছিল, তখনও এই স্বাধীনতাপ্রিয় নরমুণ্ড শিকারী নাগারা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। দীর্ঘকাল ধরে উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষের পর নাগারা নামেমাত্র ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় কিন্তু আসলে তারা নিজ নিজ নেতাদের অধীনেই শাসিত হ'তে থাকে। ইংরেজকেও এই সব নেতাদের মারফৎ নামমাত্র কর আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতে হত। ইংরেজরা নাগা পাহাড়কে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রেখে, মুখ্যতঃ, ওই নাম-মাত্র করটুকু আদায় করার জন্যে, ১৮৬৭সালে নাগা পাহাড়কে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করল এবং এই জেলার জন্যে একজন ডেপুটী কমিশনার নিয়োগ করে।

এই হল নাগা পাহাড় ও তার বাসিন্দাদের পূর্ব্ব ইতিহাস। ১৮৬৭ সালের পর আজ পর্য্যন্ত প্রায় একশ বছর কেটে গেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে নাগা পাহাড়ে। অন্য কোন ভাবে দুর্দ্ধর্ষ নাগাদের জয় করতে না পেরে ইংরেজরা মানবতার নামে নাগা পাহাড় এলাকায় পাঠিয়ে দিল শত শত পাদ্রী,—খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারক। মানবতার কাছে এই সব মাথা-শিকারীদেরও মাথা নিচু। এই সব পাদ্রী সাহেব অন্য দিক থেকে নাগাদের জয় করার জন্যে চালাতে লাগল সুচতুর অভিযান। নাগাদের তারা রোগে ওষুধ দিত, দুর্দ্দিনে সেবা করত, যীশুর বাণী বিতরণ করত আর শেখাত লেখাপড়া।

ক্রমে ক্রমে নাগাদের একটি বৃহৎ অংশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠল। শিক্ষার গুণে তারা নরম হয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে তাদের ভেতর থেকে কমে যেতে লাগল সেই অদম্য নরমুণ্ড শীকারের স্পৃহা। আস্তে আস্তে জগতের অন্যান্য মানুষ তাদের সংস্পর্শে এসে প্রকৃত পরিচয় পেতে লাগল নাগাদের মনের ও আচার ব্যবহারের।

এই ভাবে কাটল ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত। এর আগে, ১৯৩৩ সালেই দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ১৯৪২ সালের ইংরেজরা দস্তুর মত নাকানি-চুবানি খাচ্ছে ইউরোপে। ভারত তখন স্বাধীনতার দাবী আঁকড়ে ধ'রে নাজেহাল করছে ইংরেজদের। '৪২—এর অবিস্মরণীয় আন্দোলন চলছে সারা দেশে, ভারতের মুক্তির জন্যে বিদেশে আজাদ হিন্দ সেনা-বাহিনী গঠন করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এমনি সুযোগে নাগারাও তাদের স্বাধীনতা দাবী করে বসল। এবার কিন্তু তাদের স্বাধীনতার দাবী আগের চেয়ে আলাদা ধরনের। এবার তাদের দাবী সুসংস্কৃত ও নিয়মতান্ত্রিক। তারা গঠন করল, নাগা জাতীয় পরিষদ।

এর কিছু দিন পর—। নেতাজীর দুর্দ্ধর্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজ হাজির হয়েছে ভারতের দ্বার

দেশে। তাঁর উদাত্ত আহ্বান বারে বারে আঘাত করছে প্রতিটি দেশবাসী ও প্রবাসী ভারতীয়ের অন্তর,—"তুম্ ম্যয়কো খুন দেও, হাম তুমকো আজাদী দেউঙ্গে।" তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমিও তোমাকে স্বাধীনতা দেব। তাঁর এই ডাকে কত লোক বৃটিশ সৈন্যের বেড়া ডিঙ্গিয়ে হাজির হল ব্রহ্মদেশে। ব্রহ্ম, জাপান মালয় প্রভৃতি দেশে যে সব প্রবাসী ভারতীয় ছিল তারাও যোগ দিল নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে। হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল বটে আজাদ হিন্দ ফৌজে,
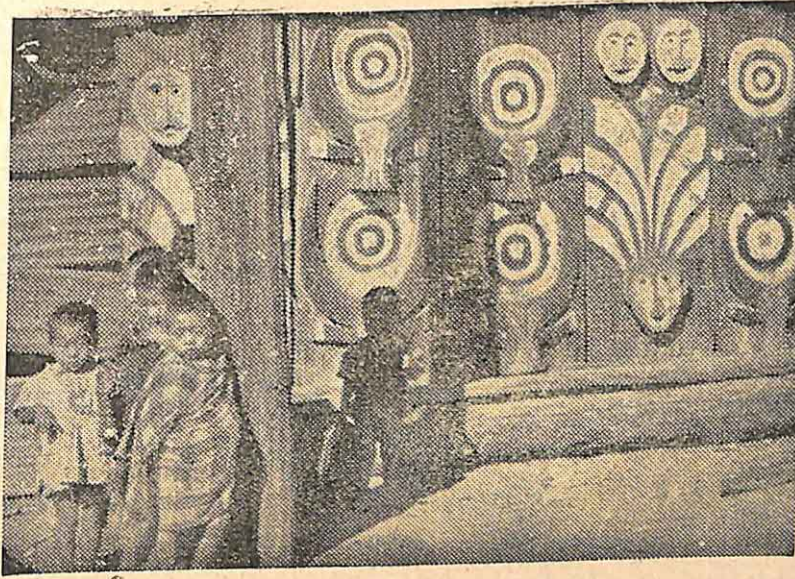
যে-নাগা যত বেশী নরমুণ্ড শিকার করতে পারে, নাগা সমাজে তার প্রতিপত্তি ততই বেশী। তাই, যে-যত নরমুণ্ড শিকার করে, সে ততগুলো কাঠের তৈরী স্মারক মুণ্ড টানিয়ে রাখে নিজের ঘরে। অতিথি-স্বজনেরা এসে এইসব মুণ্ড দেখে তারিফ করে নাগা বীরের। ছবিতে এমনি এক নাগা পরিবার দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে টাঙ্গানো কাঠের নরমুণ্ডমালা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সে হ'ল, ফিজো। পুরো নাম আঙ্গামী জাফু ফিজো।

তখন অবশ্য ফিজোকে কেউ চিনত না। আজ সে ভারতবিখ্যাত লোক। রোজই খবরের কাগজে তার নাম বেরোচ্ছে। সে-ই বর্ত্তমান নাগা বিদ্রোহের অধিনায়ক। তারই নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক নাগা, নাগা-পাহাড় এলাকায় সন্ত্রাসবাদ ও অরণ্যরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। ফিজো আর তার দলবলকে সায়েস্তা করার জন্যে ভারত সরকার ও আসাম সরকারকে যে পরিমাণ সৈন্য, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হ'চ্ছে, তা সাশ্রয় করতে পারলে দেশের যে উন্নতি হ'ত তা অপরিমেয়।

ফিজোর বয়স ছাপ্পান্ন বছর। সে শিক্ষিত। ম্যাট্রিক পাশ অবশ্য সে করতে পারেনি কিন্তু নাগাদের ভেতর ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়তে পারাই যে সাংঘাতিক বিদ্যাবত্তা। পাদ্রীদের কাছেই ফিজোর যা কিছু লেখাপড়া। লেখাপড়া শেষ করে সে তার বাসগ্রাম আঙ্গামী থেকে ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন যায়। ১৯৩৩ সাল থেকে সে সেখানে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর দালালি আরম্ভ করে। সে রেঙ্গুনে থাকার সময়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন তখনও ফিজো রেঙ্গুনে। অন্যান্য ভারতীয়ের মত ফিজোও ভাবের আবেগে যোগ দিল ভারতের মুক্তিফৌজ দলে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বাহিনীটি ভারতের মাটি কোহিমা-ইম্ফল পর্য্যন্ত এসেছিল, শোনা যায় ফিজো নাকি সেই দলে ছিল। এর পর যখন যুদ্ধ থেমে গেল, ফিজো ফিরে এলো দেশে। তারও কিছুদিন পর সারা ভারত স্বাধীনতা পেল ইংরেজের নাগপাশ থেকে।

ফিজো আধুনিক কেতায় দুরন্ত, অত্যন্ত চতুর। দেশে ফিরে সে তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্যে যোগ দিল নাগাদের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাগা জাতীয় পরিষদে। ১৯৫১ সালে ফিজো হয়ে বসল এই নাগা-জাতীয় পরিষদেরই সভাপতি। এই পদ লাভের জন্যে সে চরমবাদী নাগাদের নিজের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগায়। ১৯৪২ সালে যখন প্রথম নাগা জাতীয় পরিষদ সৃষ্টি হয়েছিল তখন এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। ফিজো জাতীয় পরিষদের এই নীতি নস্যাৎ করে দিল। নাগাদের স্বাধীনতার বুলি দিয়ে সে উত্তেজিত করে তুলল—চরমপন্থী নাগাদের। ১৯৫২ সালে সে তার সঙ্গীদের নিয়ে দিল্লী গেল ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর কাছে নাগাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাতে।

ভারত সরকার, ফিজো ও তার দলবলকে বোঝালেন যে, এখন তামাম ভারতবর্ষটাই স্বাধীন, এখন শ্রেণী, বর্ণ, জাতি নির্ব্বিশেষে দেশের সকলেই একে অপরের সুখ—দুঃখ, উন্নতি—সমৃদ্ধির সমান ভাগীদার। সুতরাং আজ সারা দেশই যখন স্বাধীন, তখন নাগাদের জন্যে, স্বাধীন দেশের মধ্যে আর এক স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। ভারত সরকার ফিজো ও তার দলবলকে আরও বোঝালেন যে, তারা যেন নির্ব্বাচন মারফৎ তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেশের শাসন কার্য্যে অন্যান্যদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু এ হ'লেও ফিজোর মতলব হাসিল হয় না। তাই সদলে দেশে ফিরে সে অসহযোগ ঘোষণা করল ভারত সরকারের সঙ্গে। নাগা জাতীয় পরিষদ বয়কট করল বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন।

স্বাধীন ভারতের মধ্যে আর একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্ভট পরিকল্পনার জনক আঙ্গামী জাফু ফিজো। দিল্লী থেকে ফিরে এসে জঙ্গীবাদী করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল নাগা জাতীয়

পরিষদকে। ১৯৫৪ সাল থেকে ফিজো তার মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। ১৯৫৪ সাল থেকে তার এ মতলব প্রকাশ পেলেও নাগা রাজ্যে প্রকৃত বিদ্রোহ দেখা দিল ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে। নরমুণ্ড শিকারী চরমপন্থী নাগাদের বিদ্রোহের কবলে কত নিরীহ লোকের হল প্রাণ হানি, কত গ্রাম হল ভস্মীভূত, কত সম্পদের হল অপচয়। শান্তিরক্ষার জন্য ভারত সরকার তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা সেনা বহর পাঠালেন নাগা পাহাড়ে।

সুখের কথা, সব নাগাই ফিজোর দলের লোক নয়। অধিকাংশই শান্তিপ্রিয়। তারা চায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় নিজেদের সমৃদ্ধি সাধন করতে। এই সব লোক হল ফিজো আর তার দলবলের চক্ষুশূল। তারা এই সব শান্তিপ্রিয় লোকদের নির্ব্বিচারে হত্যা করে, তাদের গ্রাম লুঠ করে, তাদের বাড়ী, ঘর, দোর পুড়িয়ে বশে আনতে চাইল নিজেদের। ভারত সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন ফিজোর মাথার জন্যে। এ ছাড়াও সরকার ফিজোর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দের গ্রেপ্তার করে আটক করে রেখেছেন কারাগারে।

এতেও ফিজো নিরুদ্যম হয়নি। সে সমানেই চালিয়ে যাচ্ছে তার তাণ্ডবলীলা। নাগা জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য তার এইসব হিংসাত্মক কাজ সমর্থন করছিল না বলে কিছুদিন আগে সে অন্যায়ভাবে জাতীয় পরিষদটিকেও ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু যতই অদম্য হোক না কেন ফিজো আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাচ্ছে তার দলবল। তার প্রধান অনুচরেরা এসে এখন আত্মসমর্পণ করছে সরকারের কাছে। তার বিশ্বস্ত অনুচর-বাহিনী ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'চ্ছে দিনে দিনে। চারিদিকে ভারতীয় সৈন্যের বেড়াজালে ফিজো এখন তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বন্য জন্তুর মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে বন হতে বনান্তরে। কিন্তু নিষ্কৃতি তার নাই। ভারতের এক ভূমিখণ্ডে যে অন্যায় অশান্তির আগুন ফিজো জেলেছিল নিজ হাতে, সেই আগুনে তার নিজের পুড়ে মরতেই হবে।

ছাপ্পান্ন বছর বয়সের বিদ্রোহী নায়কের রণক্লান্ত দেহ যেমন ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ছে তেমনি মনোবলও তার ভেঙ্গে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখন অনেক সময়ই নিজের শক্তিতে পাহাড়ী পথে চলতে পারে না সে। সঙ্গীদের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়। ফিজোর মুখখানাও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সে যখন খায় বা কথা বলে তখন তাকে অতি বীভৎস দেখায়। তবু কেন যে এত সব বিদ্রোহী নাগা তার অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিজেদের প্রাণ দিচ্ছে, তার কোন্ গুণের জন্যে বিদ্রোহী নাগারা এইভাবে নিজেদের সব কিছু পণ করেছে তা এক পরম জিজ্ঞাসা। অদূর ভবিষ্যতে নাগা বিদ্রোহ দমনের পর সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে আশা করা যায়।

বুদ্ধ জয়ন্তী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাষাণে চেতনা জাগিছে—হাসিছে—
মহাকাল মুখ টিপি,
প্রাণ লভিয়াছে অশোকের শিলালিপি।
আঁধার ধরণী আলোকে পূর্ণ,
এলো অমিতাভ, মূর্ত্ত কারুণ্য,
হউক বুদ্ধ-পূর্ণিমা চিরজীবী।

আড়াই হাজার বর্ষ ভেদিয়া—
উঠেছে নিরন্তর।
শরেতে বিদ্ধ হংসের সেই স্বর।
ব্যথাতুর বনহংসটি বক্ষে,
ছাড়ায়ে বুদ্ধ ছলছল চক্ষে—
মমতা মূর্ত্তি হল আরো ভাস্বর।

নূতন ধর্ম্ম প্রচারিতে তাঁর
হয় নাই আগমন,
চান অহিংসা—পশুঘাত নিবারণ।
রক্তের তৃষা হবে যে রুদ্ধ,
বসুধা হইবে আবার বিশুদ্ধ,
এসেছে এসেছে অমৃত প্রস্রবণ।

তুচ্ছ মোদের পার্থিব রজ—
পুনঃ হল মধুময়;
মহামানবের মহিমার নাহি ক্ষয়।
সব জীব জাতি হ'ল পরমাত্মীয়,
মৈত্রীতে সব আপন করিয়া নিও,
জীবে শিবে একি ঘনিষ্ঠ পরিচয়!

—

সত্যের সন্ধানে সিদ্ধার্থ

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ -- চারিদিকে যেমন অতুল ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—তেমনি তাঁহার নবীন বয়স -- পরিপূর্ণ দেহকান্তি—যেন কচি মৃণালে ফোটা তাজা শ্বেতপদ্মটি। কিন্তু তাঁহার ক'দিন ধরিয়া আহারে-বিহারে মন নাই, আমোদ-প্রমোদে মন নাই, এমন কি রাজপ্রাসাদে বা বেশি লোকজনের মধ্যেও তাঁহার ভাল লাগে না; একা একা বসিয়া থাকেন, এখানে সেখানে নির্জন প্রদেশে—বসিয়া বসিয়া শুধু ভাবেন। কি ভাবেন? সেই কথাটাই সকলের অত্যন্ত আশ্চর্য লাগিতেছে- রাজার ছেলে বসিয়া বসিয়া কি এত ভাবেন—কেনই বা এত ভাবেন? কি তাঁহার দুঃখ? কিসের তাঁহার অভাব।

মহা ভাবনায় পড়িলেন পিতা শুদ্ধোদনও। কেন ছেলের এত বিরস মন—কিসের জন্য দিনরাত্রি তাহার এত ভাবনা? মন্ত্রীদের ডাকেন, বিজ্ঞ সভাসদ্‌গণকে ডাকেন, আলোচনা করেন, চিন্তা করেন,—কিছুই দিশা করিতে পারেন না। শেষ অবধি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ছেলের জন্য প্রহরী বাড়াইয়া দেন—সকলকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন, রাজকুমারের চোখের সামনে যেন

কখনও এমন জিনিস না আসে, বা তাহার কানে যেন এমন কোনও কথা না আসে যাহাতে ছেলের এতটুকুও মন খারাপ হইতে পারে। আর প্রহরী রাখিলেন রাজপ্রাসাদের চারিদিকে—আর নগরের চারিপাশে—আরও দূরে দূরে সমস্ত জনপদটি ঘিরিয়া—সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দিলেন—ছেলে যেন তাঁহার কোথাও বাহির হইয়া যাইতে না পারে।

শুধু এই প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াই পিতার মন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না,—ছেলের উড়ু উড়ু মনকে ঘরমুখীন্ করিয়া তুলিতে হইবে। রাজবাড়ির চারিপাশে নতুন নতুন বাগান ফলেফুলে ভরিয়া দিলেন,—রোজ রোজ নানা রকম নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—রাজবাড়ির ভেতরেই রোজ নানা রকম নাটক-অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কি করিয়া ছেলের মন ঘরের দিকে বাঁধিবেন সেই চিন্তায় রাজার মুখে আহার নাই; চোখে ঘুম নাই।

কিন্তু সবাই মিলিয়া রাজকুমারের মন যতই ঘরের দিকে—ভোগ-বিলাসের দিকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, রাজকুমারের মন ততই বিরস—ততই সব ব্যাপারে উদাসীন হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সব কিছু এড়াইয়া আরও নির্জনে থাকিবার চেষ্টা করেন—নির্জনে বসিয়া বসিয়া গভীর ভাবনায় মগ্ন হন? কিসের ভাবনা? কিসের দুঃখ?

নিজের ভাবনা তিনি কিছুই ভাবেন না, তাঁহার মন জুড়িয়া বসিয়াছে সব মানুষের ভাবনা—শুধু সব মানুষ কেন—সব প্রাণীর ভাবনা। নিজের তাঁহার কিসের দুঃখ? কিন্তু সব মানুষের দুঃখ যে আসিয়া তাঁহার মন ভরিয়া দিয়াছে; তাইত দিনে রাতে তাঁহার শুধু ভাবনা। যতই ভাবিতেছেন ততই যেন নিজের মনে মনে অনুভব করিতে পারিতেছেন—সংসারে ত কেহই সত্যিকারের সুখী নয়। বাহিরে মানুষের কত ভোগ-বিলাস, কত শ্রী-সম্পদ, কত যশ-মান; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সত্য সত্যই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে কয়জন? মনের মধ্যে সকলেরই অশান্তির আগুন—ভিতরে ভিতরে সবাই যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কেন মানুষের মনের মধ্যে 'এই অশান্তি—এই অনির্বাণ আগুনের জ্বালা? এই জ্বালা দূর করিবার কি কোনও পথ নাই? নিশ্চয়ই আছে,—মানুষের পরম শান্তির জন্য সেই পথকে তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে, ইহাই রাজকুমারের অটুট সঙ্কল্প—এই সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহার ভাবনা; সর্বমানব—সর্বপ্রাণীর জন্য সেই ভাবনা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কি করিয়া আর স্থির হইয়া বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকিবেন? রাজকুমার দিন দিন ভোগ-বাসনায় আরও উদাসীন হইয়া উঠিতে লাগিলেন—ধ্যানে গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বদ্ধ রাজপুরীর মধ্যে তাঁহার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে—রাজপুরীর কোলাহলে তাঁহার মন শ্রান্ত হইয়া উঠে—রাজপুরীর ভোগ-বিলাসে তাঁহার মন বিতৃষ্ণ-বিষাক্ত হইয়া ওঠে। তিনি চান বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিরাট মুক্তি—দেহে মুক্তি—মনে মুক্তি,—আর সেই পরম শান্তির সেই মুক্তির পথ-আবিষ্কার করিয়া তাঁহারই বার্তা ছড়াইতে হইবে তাঁহাকে দেশে দেশে।

একদিন কুমার সিদ্ধার্থের একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। রাজা শুদ্ধোদন ত হাতে স্বর্গ পাইলেন।

ভাবিলেন, এইবারে ছেলের মুখ দেখিয়া হয়ত কুমারের মন ফিরিয়া যাইবে। তিনি তখনই দূতকে ডাকিয়া বলিলেন, কুমারকে এই সংবাদ দিয়া আসিতে। দূতের ত আর আশা-উৎসাহের অন্ত নাই, একে ত রাজপুত্রের আবার পুত্র জন্মিয়াছে তাহারই আনন্দ, তারপরে ত আবার এত বড় শুভ-সংবাদ দান করিলে কুমার সিদ্ধার্থের নিকট হইতে বড় পুরস্কার লাভের আশা। বিবিধ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া দূত গিয়া কুমার সিদ্ধার্থের নিকট নিবেদন করিল ;—'রাজকুমার, আপনার একটি সোনার টুকরো

বুদ্ধগয়া—এই পবিত্র বোধিবৃক্ষের তলে বসিয়া বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন

ছেলে জন্মেছে।' কিন্তু কই, এমনতর একটা আনন্দ-সংবাদ শুনিয়াও পিতার মুখে কোথায় একটু আনন্দের হাসি—কোথায় একটুকু চাঞ্চল্য ? কুমার সিদ্ধার্থ সহসা যেন আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন। নিজের সন্তান জন্মিবার আনন্দে তিনি কি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এতবড় একটা বেদনাময় সত্যকে ভুলিয়া যাইবেন যে জগতের কোনও প্রাণী সত্যকারের সুখী নয়,—খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যাইবে

সকলের বুকে জ্বলিতেছে অশান্তির আগুন। তাঁহাকে ত শুধু নিজের বাপ-মা স্ত্রী-পুত্র লইয়া এইটুকু একটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে সুখের খোঁজ করিলে চলিবে না, জগতের সকল প্রাণী যে ব্যথিতচিত্তে তাঁহাকে বিরাট বিশ্বে ডাক দিয়াছে, সে ডাক যে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন তাঁহার সমস্ত দেহ-মন দিয়া। পুত্র জন্মিয়াছে ত নূতন মায়া-মমতার জাল ফেলিয়া তাঁহাকে ছোট্ট ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য; তিনি তাই দূতকে তখন বলিলেন,—'ছেলে জন্মেছে ব'লে অত আনন্দ করবার কিছুই নেই, ছেলে জন্মেছে না-ত আমার বন্ধন জন্মেছে!'

রাজকুমারের কথা শুনিয়া দূত কেমন ভয় পাইয়া চলিয়া যায়,—একা বসিয়া ভাবিতে থাকেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ, জগতের সকলের ভাবনা আজ যেন কে তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়াছে।

ভাল লাগে না আর রাজপুরী—একা একা নগরের রাজপথে বাহির হইয়া পড়েন রাজকুমার—সন্ধ্যা রাত, রাজপথে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একা একা ঘোরেন রাজকুমার—ঘোরেন আর ভাবেন—কি করিয়া করিবেন সমস্ত মানুষের—সমস্ত প্রাণীর দুঃখ দূর ও কোন্ জ্ঞানের আলোকে দেখাইয়া দিবেন সত্যের পথ—পরম শান্তির পথ।

অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমার সিদ্ধার্থের দেহের রূপ। দীর্ঘ দেহ—উজ্জ্বল শুভ্র—চাঁদের আলোক গায়ে পড়িয়া শুভ্র দেহ হইতে অপরূপ কান্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই রূপ চোখে পড়িল একটি ক্ষত্রিয় কন্যার, নাম তাহার কৃশা গৌতমী। নিজেদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল কন্যাটি—দূর হইতে দেখিতে পাইল সেই অপূর্ব মূর্তি যুবকের অপূর্ব কান্তি। দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল—মুগ্ধ হইয়া আপনা আপনি সে গান ধরিল—

আ মরি, এমন ছেলে—বুক জুড়াল যে মাতার,
এমন যাহার ছেলে বুক জুড়াল সে পিতার।
ধন্যরে সেই নারী—তারে কি বলিব আমি,—
জুড়ায়েছে তার বুক এমন যাহার স্বামী!

রাজকুমার সিদ্ধার্থের কানে সুরের ভিতর দিয়া গানের কথাগুলি গিয়া পৌঁছাইল; তিনি অদূরে রাজপথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া গানের পদগুলি ভাল করিয়া শুনিলেন, শুনিয়া খুশি হইয়া তাঁহার গলার মালাটি মেয়েটিকে উপহার দিয়া আবার একা একা চলিতে লাগিলেন। পথ চলিতেছেন আর সেই গানের পদগুলি তিনি নিজের মনে মনে ফিরাইয়া ফিরাইয়া ভাবিতেছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—মেয়েটি গান করিয়া বলিল, মায়ের হৃদয় জুড়াইয়া যায়, বাবার হৃদয় জুড়াইয়া যায়, স্ত্রীর হৃদয় জুড়াইয়া যায়। সত্যি সত্যি কি করিলে মানুষের হৃদয় জুড়াইয়া যায়? মানুষের হৃদয়ে একটা বিষম জ্বালা জ্বলিতেছে; হৃদয়ের ভিতর হইতে কি নিভিয়া গেলে যথার্থ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া যায়? ভাবিতে ভাবিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে রাগ-দ্বেষ-মোহের আগুন জ্বলিতেছে; আমাদের ভিতরকার সেই সব আগুন নিভিয়া না গেলে হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে

কি করিয়া? রাগ-দ্বেষ-মোহ আমাদের মধ্যে আগুনের মতন জ্বলিতেছে—পরম শান্তি লাভ করিতে হইলে এইগুলিকে একেবারে নিবাইয়া ফেলিতে হইবে; ভিতরের আগুনকে এমনি করিয়া নিবাইয়া ফেলার নামই হইল 'নির্বাণ'। কুমার সিদ্ধার্থ বুঝিতে পারিলেন এইরূপ নির্বাণের পথই হইল পরম শান্তির পথ। তিনি মনে করিলেন, সমস্ত মানুষের হইয়া—শুধু মানুষ কেন—সমস্ত প্রাণীর হইয়া তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে কি করিয়া এই 'নির্বাণে'র পথে অগ্রসর হইতে হয়। তবে আর দেরী নয়—একদিনের জন্যও দেরী নয়—সেই রাত্রেই রাজপুরী ত্যাগ করিয়া—সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া কুমার চলিলেন চরম সত্যের সন্ধানে—নির্বাণের পথের সন্ধানে—প্রাণিমাত্রের সকল দুঃখদুর্দশা দূর করিবার অটুট সঙ্কল্প লইয়া। সেই পথ যেদিন তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই দিন জগতে পরিচিত হইলেন ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়া।

বুদ্ধজয়ন্তী বর্ষে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যায়
বুদ্ধদেব সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু লেখা প্রকাশ করবো।

সভ্য যুগ

কনক চক্রবর্ত্তী

ঝুপ্ ঝুপ্ জল পড়ে
ঘন বরষায়,
ধনী এক স্ত্রীকে নিয়ে
এলো সিনেমায়।
পথ-পাশে ছিল বসে
এক ভিখারিণী,
কোলে লয়ে শীর্ণ শিশু
ম্লান বিষাদিনী।
তিন দিন পেটে তার
জোটে নাই অন্ন,
অনাহারক্লিষ্ট দেহ
ক্ষীণ অবসন্ন।

দূর হ'তে দেখে সেই
ঝক্‌ঝকে গাড়ি,
শিশুটিরে লয়ে কোলে
এলো তাড়াতাড়ি;
বেদনা মাখানো স্বরে
বলে হাত পে'তে,
"বাছারে একটি পয়সা
দেনা মাগো খেতে!"
শুনেও শোনে না তারা
নামে গাড়ি হ'তে,
মিশে গেল সিনেমায়
দর্শকের স্রোতে।

চেয়ে রয় ভিখারিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলি,
আশাহীন বেদনার আঁখি দুটি মেলি।

নানান দেশের মজার খেলা

শ্রীখেলোয়াড়

পতাকা দৌড়

কমপক্ষে ৮ এবং বেশী হলে ৩০ জন পর্য্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলাটি খেলা চলবে।

খেলা আরম্ভ করবার আগে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন 'নেতা' ঠিক করে নেবে। যারা খেলায় যোগ দিয়েছে নেতা তাদের সমান সংখ্যায় দুই দলে ভাগ করে নেবে। যদি মনে করো নেতা ছাড়া ২০ জন খেলোয়াড় থাকে তাহলে ১০ জন করে দুটো দল হবে। তখন নেতা দুই দলের খেলোয়াড়দেরই ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত এক একটা নম্বর এক একজনকে দেবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দলেই ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি নম্বরের এক একজন খেলোয়াড় থাকবে। এইবার নেতা মাঠের মাঝখানে একটা ছোট লাঠি পুঁতে সেই লাঠিটার মাথায় একটী রুমাল বেঁধে দেবে। ঐ

রুমাল বাঁধা লাঠিটাকে পতাকা বলা হবে। নেতা নিজে পতাকার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। পতাকাটির দুই দিকে এবং পতাকাটি থেকে সমান দূরে নেতা এবারে দুটো দলকে দাঁড় করিয়ে দেবে।

খেলা সুরু হলে নেতা প্রথমে 'এক' বলে চীৎকার করবে। নেতা এক বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই দলেরই ১নং যে দুজন খেলোয়াড় আছে তারা পতাকাটি দখল করার জন্য ছুটবে এবং যে দলের খেলোয়াড় আগে এসে ঐ পতাকাটি ছুঁতে পারবে সেই দল এক পয়েণ্ট লাভ করবে।

নেতা এবারে 'দুই' বলে চীৎকার করবে। নেতা দুই বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই দলেরই ২নং খেলোয়াড় দুজন ঠিক আগের মতই পতাকাটি দখল করার জন্য ছুটবে। নেতা ১, ২, ৩ এইভাবে পরপর অথবা উল্টো পাল্টা করে যেমন ৫, ৯, ৩, ৬ ইত্যাদি যখন যে ভাবে খুসী যে কোন নম্বর বলতে পারবে, তবে একই নম্বর দুবার নেতা বলতে পারবে না। এইভাবে ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সব কটি নম্বর বলা হয়ে গেলে যে দল সব থেকে বেশী পয়েণ্ট লাভ করবে সেই দল জয়ী হবে। কোন দল কত পয়েণ্ট পাচ্ছে সেটা নেতা হিসাব রাখবে।

জাপানের ছেলেমেয়েদের কাছে এ খেলাটি অত্যন্ত প্রিয়। 'ক্রাব রেস' ও 'ফ্লাগ রেস' নামে তারা এ খেলাটি খেলে থাকে।
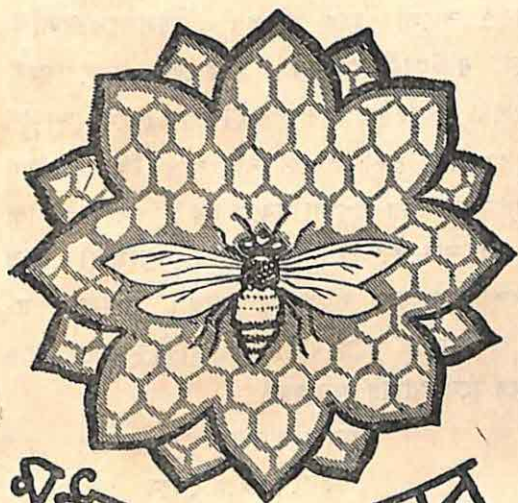
আমার প্রিয় ভাই বোনেরা—

আবার আষাঢ় এসেছে ঘন মেঘ নিয়ে। সারাদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। কখনো ঘন বরিষণ, কখনো লঘু আবার কখনো ইলসেগুড়ি। এই সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলো আবার হঠাৎ এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে মেঘের কোলেই রোদ হেসে উঠলো। সারাদিন ঘরে বসে বসে মেঘ ও রৌদ্রের এই অদ্ভুত খেলা দেখতে দেখতে মন যেন কেমন বিষিয়ে ওঠে। এ সময় করবারই বা আর কি আছে? বাইরে বেরুবার ত আর উপায় নেই। আষাঢ়ের সুদীর্ঘ বেলা এভাবে কাটাব কি করে? এই হচ্ছে কবিতা লেখবার আর সাহিত্য চর্চ্চার সব চেয়ে ভালো সময় আমার মনে হয়। প্রকৃতি এ সময় এক সম্পূর্ণ নতুন বেশ ধরে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। বর্ষার জলে সদ্যস্নাত পৃথিবীকে সত্যি সত্যি অতি সুন্দর দেখায়। আর চারদিকে সবুজের অদ্ভুত সমারোহ। গাছে, লতায়, পাতায়, মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র। মনে হয় বর্ষার জলে সবাই যেন নতুন করে আবার প্রাণ পেয়েছে। কবিতা রচনার, সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে এ এক অপূর্ব্ব পরিবেশ। কেমন তাই নয় কি?

গেলো মাসের সব চেয়ে বড় খবর হলো বুদ্ধ-জয়ন্তী। এবার জ্যৈষ্ঠ মাসে পড়েছিলো বুদ্ধ-পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায়ই বুদ্ধের সার্দ্ধ দ্বিসহস্রতম (আড়াই হাজার) মহাপরিনির্ব্বাণ (দেহত্যাগ)

তথি পূর্ণ হলো। বুদ্ধ মানব জাতির জন্য যে বাণী রেখে গেছেন তা যদি মানুষ প্রাণমন দিয়ে পালন করতে পারে তাহলে মানুষ হিংসা দ্বেষ সব কিছু ভুলে যাবে, আর জাতিপ্রেমের নামে যে যুদ্ধ সুরু হয়ে পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে তা-ও বন্ধ হবে।

তোমরা আমার অনেক ভালোবাসা আর আদর নিও। ইতি— **আসর পরিচালক**

সব্যসাচী কর (গ্রাঃ নঃ ৫৫৫৯)—তোমার আঁকা ছবি 'কি কষ্টের জীবন' আর 'ছোটদের আসর' দেখলাম। আরও গাঢ় কালী যদি ব্যবহার করতে তবে দু'খানা ছবিই ছাপতে পারতাম। শুধু আইডিয়ার দিক থেকেই নয় ছবি হিসেবেও বেশ ভালো হয়েছে তোমার ছবি দুখানা। তবে একটা কথা তোমায় বলা দরকার। তুমি এখন তুলিতে ছবি না এঁকে পেন্‌সিলে স্কেচ করে কলম দিয়ে কালী লাগাবে। তার ফলে, দেখবে তোমার ড্রইং আরও ভালো হয়েছে। পরে তুলির ব্যবহার সুরু কোরো। দেখবে তাতে তোমার ছবি আরও ভালো হয়ে উঠবে। **শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সিংহ (গ্রাঃ নঃ ১৬২০১)**—তোমার লেখা ছোট্ট নাটিকাটি পড়লাম। মেবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে বাংলায় অনেক নাটক লেখা হয়েছে। মেবারের ইতিহাস থেকে তোমার কাহিনী নির্ব্বাচনও ভালো হয়েছে। পিতার অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে না পেরে পিতৃসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবার কাহিনীর যে নাট্যরূপ তুমি দিয়েছো তার প্রশংসা করতে হয়! তোমার ভাষা খারাপ নয়। চর্চ্চা করলে আরও ভালো হবে এবং নাটকের উপযোগী হবে। **শ্যামলী ঘোষ (গ্রাঃ নঃ ১১১৫১)**—তোমার 'বাদল সাঁজে' কবিতাটি আমার ভালো লেগেছে। তোমার শব্দ-চয়ন এবং প্রয়োগ ভালো কিন্তু ছন্দ পতনের দোষ মাঝে মাঝে থেকে যায়। এ দোষটুকু সেরে নিতে পারলে কালে তোমার কবিতা লেখায় হাত ভালো হবে বলে আমার মনে হয়।

বাঁধন হারা মন যে আমার
কোন্ খেলাতে মেতে,
বারে বারে মেঘের মাঝে
চায় সে ছুটে যেতে।

ফিরবে না আর ঘরের কোণে
চলবে ভেসে ভেসে
মেঘের সাথে চলবে ছুটে
আকুল হাসি হেসে।

বেশ্ ভালো। কিন্তু

ঘন কালো মেঘের বুকে
বিদ্যুতেরি রাশি,
অবাক হয়ে দেখবে চেয়ে
রাজার মেয়ের হাসি।

এর ছন্দে একটু ত্রুটী আছে। খুব বেশী নয়। সুতরাং সে দোষ সেরে নেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না। কালে তোমার হাত ভালো হবে। তুমি লিখে যাও।

—অষ্টাবক্র—

এবার ফুটবল মরসুমের সবচেয়ে বড় খবর হল চীনা অলিম্পিক দলের খেলা। অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্য্যায়ে চীন আর ফিলিপাইনের মধ্যে খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়। সেইজন্যেই চীনের অলিম্পিক ফুটবল দল কলকাতায় আসে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখে ফিলিপাইন দল উপস্থিত হতে না পারায় অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ চীনকেই জয়ী সাব্যস্ত করেন। কলকাতায় উপস্থিতির সুযোগে চীন দলের সঙ্গে স্থানীয় লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের যে খেলা হয় তা একাধিক কারণে ক্রীড়ামোদীদের কাছে স্মরণীয়।

চীনাদল এই খেলায় বিজ্ঞানসম্মতপন্থায় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের সাহায্যে লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে। শুধু গোলের সংখ্যাধিক্যই নয়, দলগত সংহতি, সুষ্ঠু আদান প্রদান, সুযোগ সন্ধান ও সাবলীল আক্রমণ রচনায় চীনাদল যে কলাকৌশল দেখিয়েছে তা একান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। জলসিক্ত পিচ্ছিল মাঠে এই ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য অপ্রত্যাশিত এবং সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কলকাতা তথা ভারতের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এর রহস্য অনুসন্ধান করে অবিলম্বে দেশের ক্রীড়ামান উন্নত করবার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আমাদের মত সাধারণ দর্শক চীনাদলের খেলা দেখে এই কথাই ভেবেছে—চীনদলের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে একাগ্র অনুশীলন ও অধ্যবসায়। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই তরুণ এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। ৩৫ মিনিট দুই অর্দ্ধে ৭০ মিনিট খেলাতে চীনের কোন খেলোয়াড়ের মুখে ক্লান্তির ছাপ দেখা যায়নি।

৮-১ গোলে জয়লাভ থেকেই খেলায় চীনা দলের আধিপত্যের কথা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের গোল করার প্রচেষ্টার ফলেই এইরূপ বৃহৎ জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। এই দলের পুরোভাগের প্রায় সকলেই সুদক্ষ খেলোয়াড়। তারমধ্যে রাইট ইন্ ও সেণ্টার ফরোয়ার্ডের খেলা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ফরোয়ার্ডদের সকলেই বেশ বুঝাপড়া সহকারে বল আদান প্রদান করেছেন। এই আদান প্রদানের সময় জলসিক্ত মাঠেও তাদের তীব্র গতিবেগ হ্রাস পায়নি। অবস্থা অনুসারে নিজের মধ্যে স্থান অদল বদল করেও তারা বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সবচেয়ে বড় কথা সুযোগ পেলেই তাঁরা কাছ থেকে বা দূর থেকে গোলে বল মারতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এরই ফলে তাঁরা এতগুলি গোল করতে সমর্থ হন।

অবশ্য পুরোভাগের মত চীনদলের রক্ষণভাগ শক্তিশালী কিনা তা এই খেলাতে ঠিক বোঝা কঠিন। মোহনবাগান দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা বিপক্ষ রক্ষণভাগকে যথারীতি ব্যতিব্যস্ত করতে পারেন নি। চীনদল ইউরোপীয় দলগুলির মত তিন ব্যাক প্রথায় খেললেও পুরোপুরি তা অনুসরণ করেন নি। এর আগে যতগুলি বাইরের দল কলকাতায় খেলে গেছে তার মধ্যে রাশিয়ান দলের খেলার সঙ্গে চীন দলের খেলায় অনেকখানি মিল আছে। ব্যক্তিগত ভাবে রাশিয়ান দলের খেলোয়াড়দের মত কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় না থাকলেও দলগত সংহতিতে চীন দল কোন বিদেশী দলের

তুলনায় হীন নয়। এই দলের গোলরক্ষকের খেলাও অতি উন্নতধরণের। বিশেষ করে তাঁর বল ধরার ও 'ফিষ্ট' করার কৌশল সত্যই অপূর্ব্ব।

বিদেশী দলের সঙ্গে খেলাতে মোহনবাগান অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। এর আগে কোন বিদেশী দলের নিকট মোহনবাগানকে এইরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয় নি। বিদেশাগত কোন দলকেও কলকাতার মাঠে আটটি গোল করতে দেখা যায় নি। খেলাধূলায় নয়াচীনের এই উন্নতি অসাধারণ এই জন্যে যে মাত্র ছয় সাত বছর পুর্ব্বে চীন এই দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুষ্ঠু অনুশীলনের সাহায্যে তারা যে ভাবে নিজেদের গড়ে তুলেছেন তা আমাদের অনুকরণযোগ্য। আমাদের দেশের ক্রীড়া-কর্ত্তৃপক্ষ এ শিক্ষাটা কবে গ্রহণ করবেন জানিনা।

কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা ঃ—দেখতে দেখতে ফুটবল লীগের খেলা বেশ জমে উঠেছে। তবে শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতা মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যেই জোর চলেছে। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল এবার সুরু থেকেই ভাল খেলছে এবং এ পর্য্যন্ত ৮টি খেলায় মাত্র একটি পয়েণ্ট হারিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল সাতটি খেলাতে তিনটি পয়েণ্ট হারালেও শেষ খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং সাতটি খেলাতে চারটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। তবে এবার ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং উভয় দলই নূতন নূতন খেলোয়াড় জোগাড় করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সে অনুপাতে তাদের খেলা গোড়ার দিকে তেমন জমেনি। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলগত বুঝাপড়া উন্নত হচ্ছে বলে মনে হয়। রাজস্থান, রেলওয়ে স্পোর্টস্ ও বি এন আর দলও এবার বেশ শক্তিশালী এবং খেলছেও ভালো। তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত এরিয়ান ও খিদিরপুর দলও লীগে বেশ ভালো খেলছে এবং মাঝে মাঝে বড় বড় দলগুলির উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। নিম্নে লীগ তালিকায় দলগুলির স্থান দেওয়া হল ঃ—

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	৮	৭	১	০	১৭	১	১৫
ইষ্টবেঙ্গল	৭	৪	৩	০	৭	১	১১
রেল স্পোর্টস্	৮	৪	৩	১	৭	৪	১১
মহঃ স্পোর্টিং	৭	৪	২	১	৯	৩	১০
বি-এন আর	৯	৪	২	৩	৬	৭	১০
রাজস্থান	৭	৩	২	২	৭	২	৮
খিদিরপুর	৭	২	৩	২	২	৩	৭
এরিয়ান	৬	২	১	৩	৪	৫	৫
বালী প্রতিভা	৭	১	৩	৩	৩	৮	৫
পুলিস	৮	১	৩	৪	২	৯	৫
কালীঘাট	৮	০	৪	৪	৩	১০	৪
স্পোর্টিং উঃ	৭	০	৪	৩	১	৫	৪
উয়াড়ী	৫	১	১	৩	৬	৯	৩
জর্জ টেলিগ্রাফ	৫	১	০	৪	২	৬	২

—বিশ্বদূত—

রেলের যাত্রী সংখ্যা—ভারত বিভক্ত হয়ে যাবার আগে অর্থাৎ প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে ভারতবর্ষের রেলপথে যাত্রীর সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। আর এখন তা পৌঁচেছে গিয়ে ছত্রিশ লক্ষে। পনেরো বছর আগে রেলের যাত্রীসংখ্যা দৈনিক গড়ে ছিলো দেশের জনসংখ্যার হাজার করা মাত্র চার জন। এই যাত্রী চলাচল বৃদ্ধির ফলে রেলের আয় অনেক বেড়ে গেছে আর যাত্রীদের নানারকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করবার জন্য সরকারও তৎপর হয়ে উঠেছেন।

লগুড়ের আঘাতে সিংহ হত্যা—আফ্রিকায় সিংহের সংখ্যা খুবই বেশী একথা তোমাদের কারোই অজানা নয়। বন থেকে বেরিয়ে সিংহ যখন-তখন গেরস্তবাড়ীর গরু, ঘোড়া, ছাগল চুরি করে নিয়ে যায়। কিছুদিন আগে লুদ্দাজী এলাকায় এই রকম একটি চোর সিংহকে হত্যা করেছেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। তোমরা ভেবোনা যে তিনি বন্দুক, তরবারী, বা বর্শার আঘাতে সিংহ শীকার করেছেন। তিনি সিংহটিকে হত্যা করেছেন একটি বাঁশের লগুড়ের আঘাতে। সিংহটি এক গেরস্তের একটা ছাগল চুরি করে পালাচ্ছিলো। গেরস্ত টের পেয়ে সিংহের পিছু নেয়। তখন সিংহ ছাগলটিকে ছেড়ে দিয়ে গেরস্তকে আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। তার করুণ চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের এক বৃদ্ধা মহিলা ছুটে যান একখানা বাঁশের লগুড় হাতে নিয়ে। তারপর এমনি কষে এক আঘাত ঐ লগুড় দিয়ে সিংহের মাথায় বসিয়ে দেন যে সাথে সাথেই সিংহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বাঘ ও সিংহের সাথে যুদ্ধ করে যাদের বেঁচে থাকতে হয় এমনি সাহস না থাকলে তাদের বেঁচে থাকাই যে দায় হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা—ধীরে ধীরেই পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৬৫ কোটী ২০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেচে বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্ষপঞ্জীর বিবরণী থেকে জানা গেছে।

পাউরুটীর কথা—পাশ্চাত্য দেশে মানুষের প্রধান খাদ্য হলো আটা বা ময়দা থেকে তৈরী পাউরুটী। পাউরুটী দু'রকম ভাবে তৈরী হয় অর্থাৎ ব্রাউন এবং সাদা। ব্রাউন রুটী তৈরী হয় আটা থেকে আর সাদা রুটী ময়দা থেকে তৈরী হয়। তবে লোকের পছন্দ বেশী সাদা রুটী। সাদা রুটী তৈরী করতে ধবধবে মিহি সাদা ময়দা দরকার। এজন্য আটা ব্লিচ করতে হয়। এই ব্লিচ করবার ফলে গমের ভেতর যে ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ এবং রাসায়নিক লবণ থাকে তা নষ্ট হয়ে রুটীর খাদ্যগুণ নষ্ট করে দেয়। কম খাদ্যগুণ বিশিষ্ট রুটী খেয়ে লোকের স্বাস্থ্য যাতে খারাপ না হয়ে পড়ে এজন্য ময়দার সাথে খাদ্যপ্রাণ, প্রোটিন, রাসায়নিক লবণ ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দেবার ব্যবস্থা ঐ সব দেশের সকল রাষ্ট্রেই করা হয়েছে। ঈস্ট, সয়াবীনের ময়দা, মাঠাতোলা দুধের ছানাও মেশাবার ব্যবস্থা কোন কোন রাষ্ট্রে আছে। এ নিয়মটি রুটী প্রস্তুতকারীরা ধর্ম্মের মতই মেনে থাকে। কারণ খাদ্যগুণহীন খাদ্য বিক্রী করে জাতীয় স্বাস্থ্য নষ্ট করবার মত অসৎ প্রবৃত্তি ঐ সব দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে নেই।

ছোটদের যাদুঘর—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছোটদের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে যাদুঘর প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনার কথা সম্প্রতি জানা গেছে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার আড়াই কোটী টাকা ব্যয় করবেন স্থির হয়েছে। পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশেই এ ধরণের যাদুঘর আছে। এরকম যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলে ছোটদের নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাবে।
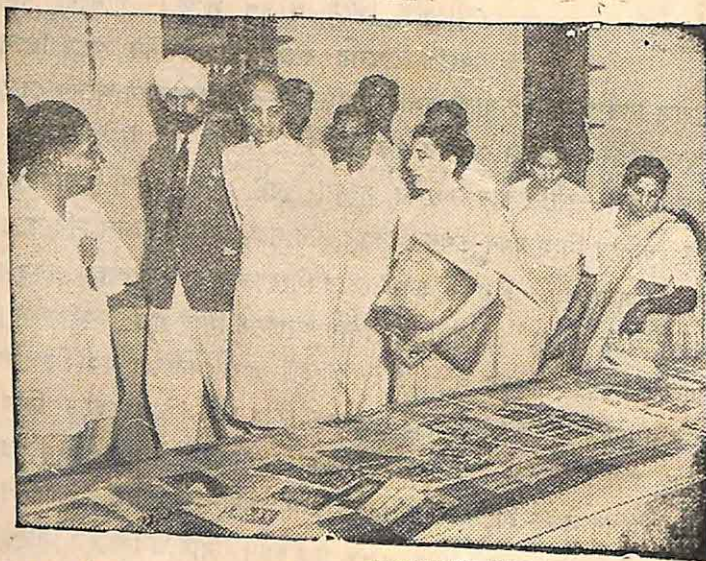
শিশু সাহিত্য প্রদর্শনী—কিছুদিন আগে দিল্লীতে শিশুকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে শিশু সাহিত্যের এক প্রদর্শনী হয়ে গেছে। ভারত সরকারের প্রচার-সচিব ডক্টর বি. ভি. কেশকর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি উদ্বোধনী বক্তৃতায় উন্নত ধরণের শিশু সাহিত্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, জাতি গঠনের কাজে এই শ্রেণীর উন্নত ধরণের সাহিত্য বিশেষ কার্য্যকরী হবে। এই প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বহু বই প্রদর্শিত হয়েছিলো।

অদ্ভুত চিকিৎসা—একটি যুবক একদিন এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন যে, তিনি যখন তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকেন তখনই তাঁর হাঁপানী রোগ আরম্ভ হয়। বাইরে যখন থাকেন তখন ভালোই থাকেন। ডাক্তার তাকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, তাদের বংশে কারো কখনও হাঁপানী রোগ হয় নি। এক তার শ্বাশুড়ীর এই রোগ আছে। ডাক্তার ব্যাপারটি নিয়ে মহাভাবনায় পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর একজন সহকারীকে পাঠালেন রোগীর বাড়ীতে যে ঘরে রোগী শোয় সেই ঘরটি দেখবার জন্য। সহকারী সব দেখে শুনে এসে ডাক্তারকে জানালেন যে রোগীর ঘরে বিছানার দিকে মুখ করে রোগীর শ্বাশুড়ীর বিরাট এক তৈলচিত্র টাঙানো আছে। ডাক্তার তখনই রোগীকে আদেশ করলেন ঐ ছবিখানা সরিয়ে ফেলতে, সাথে সাথেই তার রোগ সেরে গেলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো জার্ম্মানীতে। যিনি চিকিৎসা করেন সেই ডাক্তারের নাম জি. ক্যাস্চ্। তিনি গুইয়েফসওয়াল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ভ্রমণ কাহিনী— তোমরা যে যেখানে গিয়েছো সে জায়গা সম্পর্কেই প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারো। প্রবন্ধের সঙ্গে বয়স যেন উল্লেখ করা থাকে। গ্রাহক নম্বর এবং পুরো ঠিকানাও দেবে। ১ম পুরস্কার পাঁচ টাকা আর ২য় পুরস্কার তিন টাকা মূল্যের বই। বইগুলো আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রকাশিত পুস্তকের ভেতর থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিযোগিরা বেছে নিতে পারবে। ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে প্রবন্ধ শিশুসাথী কার্য্যালয়ে পেঁছা চাই। ফল বেরুবে ভাদ্র মাসে।

বৈশাখ মাসের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

"এ যুগে গ্রাম কি রকম হওয়া উচিত" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছে দীপ্তি রায় (গ্রাঃ নঃ ১৪৯১২) বর্দ্ধমান আর দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে শ্রীশিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১৬৮৬৫) বাঁকুড়া।

নতুন বই

ঘুঙুর পরে নাচে—লিখেছেন শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত আর প্রকাশ করেছেন ৯৩৩১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ থেকে শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর। দাম এক টাকা।

সবে যারা পড়তে সুরু করেছে তাদের জন্য বই লিখে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন কার্ত্তিকবাবু তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখা এই শ্রেণীর বইগুলো ছোটরা যে কত আদর করে, কত মনোযোগের সাথে পড়ে তা আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছি। এ বইয়ের ছড়াগুলোও ছোটদের খুব উপযোগী, এবং ছন্দও বেশ চমৎকার। কোন ছড়াই খুব বড় নয় বলে সহজেই মুখস্থ হয়ে যায়। ছাপা বাঁধাই ভালো।

ব্যান্ ডং ব্যান্ ডং—লিখেছেন শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর আর ৩৯।বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-২৬ থেকে প্রকাশ করেছেন হস্তিকা প্রকাশিকা। দাম দশ আনা।

ছোটদের জন্য ছড়া লিখতে হলে ছন্দের ওপর খুব ভালো অধিকার থাকা প্রয়োজন। এ বইখানার লেখকের এ গুণটি যে বিশেষ ভাবেই আছে তা এ বইখানা পড়লেই বিশেষভাবে বোঝা যায়। তাঁর ছড়াগুলোর কল্পনাও চমৎকার। বইখানা আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। ছবিগুলোও খুব সুন্দর। বইখানা যে ছোটরা আদর করে লুফে নেবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দামও আজকালকার দিন অনুযায়ী সস্তা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সঞ্চয়ন—লিখেছেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র আর প্রকাশ করেছেন ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। দাম তিন টাকা।

তোমাদের সুপরিচিত লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সংগ্রহ। খগেনবাবুর লেখা গল্প তোমরা বেশ আগ্রহের সাথেই যে পড়ে থাকো একথা আমরা ভালো ভাবেই জানি। তাঁর লেখা অনেকগুলো ভালো গল্প এ বইয়ে পাওয়া যাবে। এর কিছু কিছু গল্প মাসিক এবং বার্ষিক শিশুসাথীতেও প্রকাশিত হয়েছিলো। গল্পগুলো তোমাদের আবার পড়ে দেখতে বলি। আবার পড়লেও যে নিশ্চয়ই তোমরা আনন্দ পাবে তাতে সন্দেহমাত্রও নেই। ছাপা বাঁধাই ভালো।

ছুটীর দিনে, চার বন্ধুতে পায়ে হেঁটে চলছিলো ডায়মণ্ডহারবারের পথে। অনেক দূরে এক চৌমাথায় এসে—তারা দেখে পথের নিশানাটি ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে আছে মাটিতে।

এবার কোন পথে যাবো? সবারই মনে জাগে প্রশ্ন! শেষে তাদেরই একজন বুদ্ধি করে পড়ে থাকা সেই খুটিটা এমন ভাবে দাঁড়া করালে, যে বুঝতে আর কারও অসুবিধে হলোনা তাদের গন্তব্যস্থল কোন দিকে। এখন তোমরা বলো কি করে তা সম্ভব হলো?

— শ্রীসমর দে

গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদিগের নাম

বিবাদ	বিধু	বিল্ব	বিড়াল
বিবর	বিপ্র	বিনামা	বিটপী

হীরেন ও খুকু (১৪৭৪৯) ভাগলপুর ; করবী, মীরা, অনুপ প্রভৃতি (১৩৮০২) রামপুরহাট ; রুবি ও ছবি মজুমদার (১৭০৮৭) কলিকাতা ; দীপঙ্কর বসু (১৫০৬৬) কলিকাতা ; উমা মিত্র (৩০৭০) ২৪ পরগণা ; স্নেহাংশু রায়, কলিকাতা ; বিশ্বনাথ ও গীতা চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ; দীলিপ, সুবোধ ও সাধন, কলিকাতা ; মৃণাল, মৃন্ময়, ছায়া প্রভৃতি, গোরক্ষপুর ; শ্যামলী, দীপালী ও কল্যাণী (১২৮৫৯) বর্দ্ধমান ; শুভেন্দু মণ্ডল, কলিকাতা ; অরূপ রায় (১৫২৩১) শান্তি নিকেতন ; শতরূপা ও জ্যোতির্ম্ময় মজুমদার (১৬৫০১) নিউ দিল্লী ; গীতা, মাধব, কেশব প্রভৃতি (৪৯৯ পিঃ) ; ভোলানাথ সরকার (১০৯২০) কলিকাতা ; শ্যামল বাকৃচী (১৫৪৭১) ; অসীম দত্ত, বাঁকুড়া ; জীবন রায় (১৬০০৭) কলিকাতা ; পূর্ণিমা ও বিজয়লক্ষী রায়, হুগলী ; শিশিরকুমার দাস (৫৬৭৬) চন্দননগর ; মুকুল, গণেশ, উমা প্রভৃতি (১৫৭৪৮) খড়্গাপুর ; কুমারী অনিতা চক্রবর্ত্তী (১২০০১) বেনারস ; শিবপ্রসাদ ও সান্ত্বনা সেনগুপ্ত. কলিকাতা ; কুমারী শিপ্রা বসু (১৫২৮৭) কলিকাতা ; হীরেন্দ্র বিষ্ণু, জলপাইগুড়ি ; জয়ন্তী, বাসন্তী, শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য (১৫১৯৩) ; মীরা, চন্দন ও গোড়া, চিত্তরঞ্জন (১২১০৭) ; রূপসী ঘোষাল, কলিকাতা ; সাগরনীল ও শুক্লা বর্ম্মন (১৫২৬১) পাণ্ডু ; রণজিৎ মুখার্জ্জী (১০৭৬৬) ; রজত, রমলা, বাচ্চু প্রভৃতি (১৬৫৫৯) ; নূপুর গাঙ্গুলী (১৩৮৭০) ; শিবু, বাবলু, মীনু প্রভৃতি (১৪৪৭৬) ডায়মণ্ডহারবার ; মমতা, সবিতা, মনা প্রভৃতি, কলিকাতা ; দেবকুমার, জীবন, অসীম প্রভৃতি ঠাকুরনগর ; লিসা মাইতী, তমলুক ; প্রদোষ গুপ্ত (১৬৮৫৪) কলিকাতা ; কল্যাণ, মহাদেব, জীবনকৃষ্ণ প্রভৃতি (১৬৩২৩) মালদহ ; ননীগোপাল বিশ্বাস, মালদহ ; অশোক, মিত্রা, প্রভৃতি (১৪৮৭৭) দার্জ্জিলিং ; নন্দা, শেখর ও ভাস্কর গুপ্ত, হুগলী ; চন্দ্রশেখর সাঁতরা (১৬৭৪৫) চকৃদীঘি ; নিখিলেশ ভট্টাচার্য্য (১৬৮৩৪) কাছাড় ; বন্দনা চাটার্জ্জী (১৭০২৮) কলিকাতা ; সুশান্ত ও সুমন্ত ভট্টাচার্য্য, হালতু, ২৪ পরগণা ; মনোরঞ্জন ও মনীন্দ্র (১৬৮৫৩) নন্দীগ্রাম ; রমেন্দ্র ব্যানার্জ্জী (১৪৭৫২) ডায়মণ্ডহারবার ; পুলিন, গোকুল, লীলা প্রভৃতি (১৬০৯৬) ঠাকুরনগর ; উদয়ন, তপন, ঝুমু (১৬০৬৪) দেওঘর ; বুলবুল দাস (৪৩৮৬) পাটনা ; বেণু, বিশ্বনাথ ও কমল, আত্পুর, ২৪ পরগণা ; মিলন ও সুচেতা (১৫১৪৩) গড় মধুপুর ; সুমিত্রা ও শিশির (১৫০৭) কলিকাতা ; কুমারী গীতানাথ (১৬১৬৫) বেহালা ; তুষার, অরুণ, তিমির প্রভৃতি (বাঘা যতীন কলোনী) ; সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী (১৭২৩৩) ভবানীপুর ; সুনীল দাশগুপ্ত (১৬৫৩২) কলিকাতা ; সুধা, গৌরী, লালু প্রভৃতি (১২২৮) ; অনুভা ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ; রথীন দে, জামসেদপুর ; উল্লাসী, ঘুণ্টি প্রভৃতি, মুক্তাগাছা ; অনুতোষ মুখার্জ্জী (১৪১৫৬) হুগলী ; রুবী, রুনু, বাবুয়া (৫৪২০) কলিকাতা ; দুলাল দত্ত (১৭০৪৫) কলিকাতা ; সুমিত্রা ও জয়ন্ত চাটার্জ্জী, কলিকাতা ; কৃষ্ণা, মাধবী, রত্না রায় (হাজারীবাগ) ; তারা, গীতা প্রভৃতি (২৫৩৪) নবদ্বীপ ; সুব্রত, দীপক, দেবব্রত প্রভৃতি, দমদম ; অনিন্দিতা রায় (১৪৩০৫) ; কলিকাতা ; মীনা, রবি, মঞ্জু প্রভৃতি কলিকাতা ; প্রদীপ মুখার্জ্জী (১৬০১৭) কলিকাতা ; রবি দত্ত (১৭০৩৮) বরাহনগর ; কিশোর সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ মুক্তাগাছা ; সবিতা পাঠক, নাগপুর ; মনোজিৎ আচার্য্যচৌধুরী (১৯৬ পি) মুক্তাগাছা ; সুনীল, প্রতুল, হাসি প্রভৃতি, দমদম ; রূপমঞ্জরী সিংহ (১৫২০৭) কলিকাতা , সৌম্যকান্তি, মনোজ, সুনীল প্রভৃতি (১৪০২৫) মেদিনীপুর ; মিনতি চৌধুরী (১৫৮৪৫) কলিকাতা ; স্বপন সেনগুপ্ত (১৫৮৫৭) ২৪ পরগণা ; দেবযানী সেনগুপ্ত, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ; তৃপ্তি রায় (১৪০৬০) কলিকাতা ; মঞ্জু, জাপি, দীপু প্রভৃতি, দুমকা ; সুভাষ, টুলু ও সন্তু (১৭০৫৪) মেদিনীপুর ; ইন্দুলেখা, রবীন্দ্র, ভারতী প্রভৃতি নাগপুর ; পীযুষ, পার্থ, চন্দ্র প্রভৃতি ; অশোক গুপ্ত, কলিকাতা ;

সুবীর, সুচিত্রা, সমীর প্রভৃতি চন্দননগর ; প্রশান্ত সিংহ (১৪৯২৩) পূর্ণিয়া ; স্বপন, চন্দন, কাঞ্চন নিয়োগী, কলিকাতা ; মঞ্জু জোয়ার্দ্দার (কলিকাতা) ; তরুণ, গোবিন্দ চৌধুরী (১৬১১৪) কলিকাতা ; শ্যামাপদ ব্যানার্জ্জী, হুগলী ; স্বপন, মঞ্জু ও অমু, লিলুয়া ; অজয় দত্ত কলিকাতা ; অশোক কর্ম্মকার (১৬১৩৬) কুচবিহার ; পার্থ দাশগুপ্ত (১৬৫৬০) শিলং ; অমর ঘোষাল, কলিকাতা ; নীলাঞ্জন চৌধুরী (১৭১২১) দ্বারভাঙ্গা ; গৌরী, রুবী, বাচ্চু বড়ুয়া (মালদহ) ; সুনীল আচার্য্য (১৭২২৬) কুচবিহার ; দেবকীনন্দন (১৬১২৬) জামগ্রাম ; গৌরীশঙ্কর, তারা, পরী, সন্তোষ প্রভৃতি (১৬৭৬২) বাঁকুড়া ; রমা, উমা বসু (নেল্লোর) ; অমিয় ও অণু ব্যানার্জ্জী, ধানবাদ ; সমীরণ চৌধুরী (১২৩২৪) কলিকাতা ; আলোক রায় (১৬৫৯৯) সালকিয়া ; রঞ্জিতা ও জয়শ্রী মাইতি, তমলুক ; ফুল্লেন্দু দাস (১৭২১৪) ; শশীশেখর ব্যানার্জ্জী, বর্দ্ধমান ; মৃণাল, অলক (১৫৯৭৭) বর্দ্ধমান ; গোপাল, জয়া প্রভৃতি (১৬৯৭৮) সিঙ্গুর ; শঙ্কর সরকার (১৫৩০১) জলপাইগুড়ি ; ধ্রুবা ও রজত (১৫৮৪৮) কলিকাতা ; মিহির দত্ত (১৫৭৮৬) জলপাইগুড়ি , রুমা ও লীনা চৌধুরী (১৪৭০৩) কলিকাতা ; বিমান ঘোষ, কলিকাতা ; শিকুল ও সুমিত চক্রবর্ত্তী (১৬১০৬) বালীগঞ্জ ; পাপিয়া ব্যানার্জ্জী (১৭২১২) বাঁকুড়া ; আরতি দাস (১৫০৪১) শিলং ; প্রবীর চক্রবর্ত্তী (১৬৯৬৯) কলিকাতা ; ইন্দ্রনীল ও প্রবাল গুপ্ত, কলিকাতা ; মিনতি গুপ্ত (১৬৩৪৮) শিলচর ; নন্দিতা, অমলেন্দু, দীপ্তি প্রভৃতি (১৬১২২) হাজারীবাগ ; হরেন্দ্র, চন্দ্রদেব ও আশীষ (১৫৮৬২) এলাহাবাদ ; অনুরাধা ঠাকুর, কলিকাতা ; সুবীর, সুপ্রিয়, কৃষ্ণা প্রভৃতি (১৬৪৭৩) পাটনা ; দীলিপ, প্রদীপ, দীপারাণী ও আশীষ (৯৫০৮) নয়া দিল্লী ; অভিজিৎ ও অমিতাভ নন্দী (১৫৯৭৪) ; রঞ্জিৎ গাঙ্গুলী, কলিকাতা ; গৌরহরি, রেবা, হুগলী ; নীলা দত্ত (১৩৩১৬)যোরহাট ; সবিতা কুণ্ডু, কলিকাতা ; প্রদীপ, প্রশান্ত, ছবি প্রভৃতি (১৭১২৪) ২৪ পরগণা ; দেবেন্দ্র প্রামাণিক, সারেঙ্গাবাদ ; রাসু, ছবি, রুবি প্রভৃতি (১৭১২৪) ; তপনকুমার ঘোষ (১৬২১৭) বোলপুর ; শান্তনু সিংহ (১৬৭৯৪) কলিকাতা , অমিতাভ সেন (১৬৬৩১) কলিকাতা ; মীনাক্ষী, সমীর, মিহির, প্রবীর (১৬৯৩০) বর্দ্ধমান ; কুমারী বিজয়া চাটার্জ্জী (১৬০৮৮) কলিকাতা ; গৌতম বাক্‌চী (১৫০৭৫) জলপাইগুড়ি ; পার্থ ও সারথি মজুমদার (১৬৬৬১) ধুবড়ি ; সুব্রত বিশ্বাস (১৪৭২৫) কলিকাতা ; জীবন, কুমকুম, বেলা ও বিভূতি, সালকিয়া (হাওড়া) ; বিদ্যুৎকুমার চন্দ্র (১৪৪৩৯) কলিকাতা ; করুণাকমল লাহিড়ী (১৫৯৭১) কলিকাতা ; দেবপ্রসাদ ও অশোক কুণ্ডু (১৭০০৫) কলিকাতা ; অশোক বিশ্বাস (১৬০৬৬) নবদ্বীপ ; কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী, বালীগঞ্জ (কলিকাতা) ; কাঞ্চন শ্যাম, শিলং (আসাম) বিনয়, অশোক, স্বপ্না প্রভৃতি, কলিকাতা ; স্বপ্না মিত্র (১৩,৭৮) কলিকাতা ; রনজিৎ, কৃষ্ণা, বিজয় ও গোপীরঞ্জন, সেওড়াফুলি ; শাশ্বতী চক্রবর্ত্তী (১৩১৭১) বালীগঞ্জ, কলিকাতা । প্রসূন, দীপ্তি ও মালবিকা মুখার্জী (১৬৫১৪) ।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরণ ধর**
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আরো
বই পড়ো
লেখায় ও ছবিতে
আমাদের বইগুলি
এত চমৎকার - যে
পড়তে বসে মনে হবে
সত্যি যেন তোমাদের
কেউ গল্প শোনায়!
ছোটদের বই প্রকাশে
আশুতোষ লাইব্রেরী
কলিকাতা—১২

শিশুসাথী
সম্পাদক
শ্রীহরিশরণ ধর

ঠিক‥ ধরেছি
এ নিশ্চয়ই
কোলে
বিস্কুট
ভিটামিন-সমৃদ্ধ
"কোলে বিস্কুট"
স্বাদে ও গুণে আদর্শস্থানীয়
KOLAY
Kb
BISCUITS
কোলে বিস্কুট কোং লিমিটেড়
৩৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

... বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩৫শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

শিশু সাথী

শ্রাবণ
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

শেষের শুরু...
যখন চুল উঠতে শুরু করে তখন মাথার বালিশেই তার আরম্ভ। একবারও ভাববেন না যে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। এর সূত্রপাত হওয়ামাত্র ভাল করে মাথা ঘষে জবাকুসুম ব্যবহার শুরু করুন। স্নানের আগে অন্ততঃ দশমিনিট মাথায় জবাকুসুম মালিশ করুন। কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই চুল ওঠা বন্ধ হবে কিন্তু নিয়মিত জবাকুসুম ব্যবহার করতে ভুলবেন না।
এখনই সাবধান হউন
জবাকুসুম
কেশশ্রী বৃদ্ধি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে

ডাকুর গল্প
শৈলে চক্রবর্তী
হারু বলেছে ওর নাকি ভয় নেই!

এইখান দিয়েই আসবে হারু!

একটা চোর আসছিল।

এই গলিটায় ঢুকে পড়লেই — বাস.

বাবারে

দশ টাকা পুরস্কার!
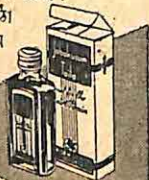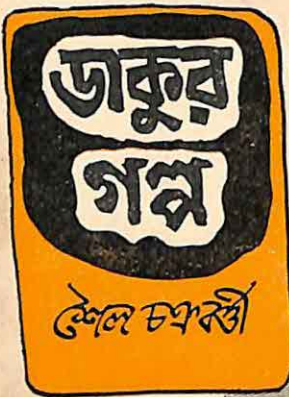
৩৫শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬৩ | ৪র্থ সংখ্যা

শাওন

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দলবেঁধে দেয়া গরজায় ঃ
ঝড়ের ঝাপট দরজায়।
আবছায়া চারিধার,
ঝম্‌ঝম্ বারিধার,
বেঙেরা মেতেছে তরজায়।

কিষাণের হাসি ঢেউ খেলে ঃ
পারুল-চামেলি চোখ মেলে।
খাল-বিল ছাপাছাপি,
মাছেদের লাফালাফি,
ভিজে কা'রা বুঝি ঝাঁপ ঠেলে ?

গগনে দানোর ঘোর ঘটা ঃ
মহেশের লটপট জটা।
চাল ফুঁড়ে জল পড়ে,
তালগাছ খালি নড়ে,
খোকন কেবল ভাবে, কটা ?

ধামার বাজায় পাখোয়াজ ঃ
কালো বুক চিরে ঝলে বাজ।
ভয়ে বুক ধুক-পুক,
কাঁচু-মাচু সোনা মুখ,
মা'র কোলে খুকু চুপ আজ ॥

—

সন্ধান

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সকাল বেলা বাইরের ঘরে বসে কাগজ দেখছি, হঠাৎ রীতিমতো বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

সসম্মানে ইজিচেয়ার থেকে উঠে, তাঁকে বসতে বললাম।

ভদ্রলোক বসলেন, তারপর বললেন, চিনতে পারো বাবা ?

কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হল, তবু ঠিক মনে করতে পারলাম না। সবিনয়ে বললাম, স্মরণ হচ্ছে না ত !

তিনি বললেন, মসলন্দীপুরের গড়াই মশাইকে মনে পড়ে ? আমিই সেই। বিশেষ দরকারে এসেছি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

সওদাগরী অফিসের গরীব কেরাণী—কোন মতে দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতেই প্রাণ বের হয়ে যায় আমার। আমার কাছে দরকারে এসেছেন স্বনামধন্য গড়াই মশাই, দেশে থাকতে কোন দিন যার ধারে কাছে যাবারও সুযোগ হয়নি আমার মতো অভাজনদের !
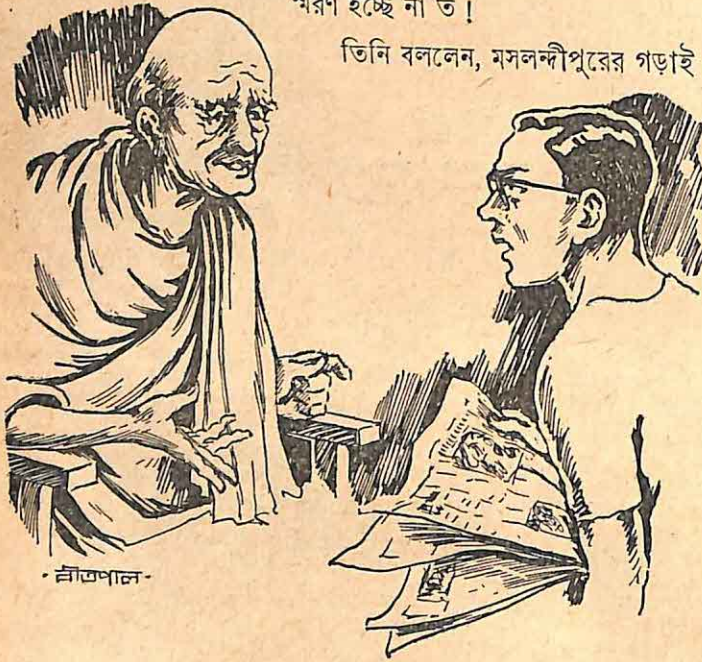
বললাম, অনেক অনুগ্রহ করে এসেছেন—বেলা দশটা বাজে, চানটান করে দুটো কিছু মুখে দিন— তারপর বলবেন। আমার আজ ছুটি আছে।

গড়াই মশাই মনে মনে একটু কি ভাবলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা তাই হবে।

একটু দম নিয়ে বললেন, এত কালই যখন তোমার খেলাম, তখন আর একটা দিন খেলে আর কি দোষ ?

কথাটা যেন কেমন কেমন! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

উপযাচক হয়ে আমার বাড়ী আসার মানেটা এতক্ষণে যেন পরিষ্কার হল।

মনে পড়ল, বলখেলার জন্যে ওঁদের কলম বাগান থেকে একটা কাঁচা বাতাবি লেবু ছেঁড়ার জন্যে একদিন কি নির্য্যাতনই না আমায় ভোগ করতে হয়েছিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই গড়াই মশাই-ই চাকর দিয়ে সারা গায়ে বিছুটি মাখিয়েছিলেন!

মনে পড়ল, হাই জাম্প ও লং জাম্পে প্রথম হলে, সভাপতিরূপে এই গড়াই মশাই-ই একদিন লাল ফিতে বাঁধা রূপার মেডেলটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে, হুড় হুড় করে জল ঢেলে হাত ধুয়েছিলেন—কেন না আমার জামা-কাপড় ছিল অতিশয় নোংরা!

ছুনিয়া কি রাতারাতি বদলে গেল?

* * * *

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসে বসলেন গড়াই মশাই। পিছু পিছু এলাম আমিও। তাঁর দরকারি কথাটাই যে শোনা হয় নি এখনো?

গড়াই মশাই কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন, তোমার বাবা যখন নিরুদ্দেশ হন, তখন তোমার বয়স কত? দশ এগারো হবে বোধ করি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা, কেন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তোমার বাবা, তার কোন হদিশ বের করতে পেরেছো কি এই পঁয়ত্রিশ বছরে?

আজ্ঞে না। বাবা ছিলেন বলরাম ডিহির সিঙ্গী বাবুদের মুহুরী—চোত কিস্তির খাজনা আদায় করতে মহালে গিয়েছিলেন। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা খাজনা আদায়ও করেছিলেন—তারপর সেই যে নিখোঁজ হলেন, আর তাঁর কোন খবর পাওয়া গেল না!

গড়াই মশাই শুধু বললেন, হুঁ।

আমার কথার মুখ খুলে গেল।

বললাম, কেউ বলত, বাবাকে পথে ঠ্যাঙাড়েরা খুন করে টাকা কেড়ে নিয়েছে। কেউ বলত, বাবা ঐ টাকা নিয়ে দেশ-ভূঁই ছেড়ে ভিন্ দেশে পালিয়ে গেছেন। একজন সেতুবন্ধ ঘুরে এসে বলেছিল, বাবা নাকি সেখানে অন্য নাম নিয়ে এক ধনী মহাজন হয়ে বসেছেন—নূতন করে নাকি বিয়েথাওয়া করেছেন, বাড়ী-ঘর করেছেন! উড়োউড়ি কত কথাই বলত লোকে!

গড়াই মশায়ের গলাটা অল্প একটু ঘড় ঘড় করল। তিনি আবার মৃদু একটা হুম শব্দ করলেন।

তারপর বললেন, এর পরই বুঝি বলরাম ডিহি থেকে বাস উঠিয়ে তোমরা মসলন্দীপুর চলে এলে?

আজ্ঞে না। বাবা টাকা নিয়ে ফেরার হলেন, সিঙ্গীবাবুরা তাই ভিটে-মাটি ক্রোক করে

নিলেন। তখন আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতেই মা এলেন মসলন্দীপুরে, এক গরীব মাসী ছিলেন সেখানে।

এই মাসীর নাম ছিল বোধ করি কুসুম, না ? পেল্লাদ মাষ্টারের স্ত্রী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আধপেটা খেয়ে না খেয়ে ছেঁড়া কানি পরে কোন রকমে যে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলাম এর বাড়ী থেকে, তাই আজ আপনাদের আশীর্ব্বাদে ছেলেপুলে নিয়ে দিনটা চলে যাচ্ছে !

অথচ তোমার অগাধ সম্পত্তি অন্য লোক ফাঁকি দিয়ে বরাবর ভোগ করেছে, তুমি তা জানতেই পাওনি !

চমকে উঠে বললাম, সম্পত্তি ? ছোট্ট বেলা থেকে আমি পিতৃহীন—কাঙালের ছেলে। আমার আবার সম্পত্তি কোথায় ?

* * * *

গড়াই মশাই বললেন, বলরাম ডিহির অটল মাইতির ছোট বেলার বন্ধু ছিল পটল। এত ভাব ছিল দুজনে যে সবাই বলত ওরা দুটিতে যেন কানাই বলাই !

ছাত্রবৃত্তি পাশ করে সিঙ্গীবাবুদের কাছারিতে অটল নিল গোমস্তাগিরি—পটল আর কিছু না পেয়ে তাঁতের ধুতি শাড়ী গামছা বেচা সুরু করল রেল বাজারে।

ভাবটা কিন্তু থেকে গেল দুজনের ঠিক আগের মতোই।

ইতিমধ্যে কখন তাদের বিয়েথাওয়া হল, ছেলেপুলে হল, কখন পটল রেল বাজারে ছোটখাটো একখানা দোকান খুলে সেখানেই বাস করতে লাগল, পটলও যাহক একটা বাড়ীঘর করে মোটামুটি গুছিয়ে নিল, তা কেউ খেয়ালই করে নি।

দুই বন্ধুতে খাওয়াদাওয়া, আনাগোনা, আদানপ্রদান সমানেই চলেছে। আগের চেয়ে কমলেও বন্ধ হয়নি কোন দিনই।

এই করতে করতেই বয়স দুজনের পৌঁছে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশের সীমানায়। আসল ঘটনা ঘটল এর পর।

কি ঘটনা আন্দাজ করতে পারো ? গড়াই মশাই বললেন কেমন যেন মুখ করে।

আজ্ঞে না।

অটল গেল কনেডোবায় চোত কিস্তির খাজনা আনতে। কনেডোবায় ছিল সিঙ্গীবাবুদের সদর কাছারি।

মহালে যাবার সময় সে বলল পটলকে, চল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার টাকার গিনি গেঁথে রেখেছেন নায়েব মশায়—সেইটা এনে বাবুদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, অথচ সঙ্গে না দেবে সিপাই, না দেবে বন্দুক।

আঁৎকে উঠে বলল পটল, সে কিরে ? যদি কোন আপদবিপদ হয় !

অটল বলল, আমি তাই কি ঠিক করেছি জানিস ? কনেডোবা থেকে রেল বাজার ত মাইল দেড়েক মাত্তর—বেলাবেলি টাকাটা নিয়েই আমি তোর এখানে এসে উঠব। তারপর রাতটা কাটিয়ে সকাল বেলা দুজনে এক সঙ্গে যাব বলরাম ডিহিতে—কাছারিতে জমা করে দিলেই মিটে গেল হাঙ্গাম। রাত্রে আর জংলা পথে পরের একরাশ টাকা নিয়ে গাঁয়ে ফিরব না।

গাঁয়ে আর তার ফেরা হল না জীবনে।

কেন ?

কেন জিজ্ঞাসা করছ ? বাল্যবন্ধু পটলের হাতেই নিজের জীবন ও পরের ধন খোয়াতে হল তাকে সেই তিরিশে চৈত্রের রাত্রে — পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

তারপর ?

অটলের স্ত্রী-পুত্র ভিক্ষা মেগে খেতে লাগল মসলন্দীপুরে, আর সেই মসলন্দীপুরেই জমিদার হয়ে জাকিয়ে বসল পটল। সবাই জানল, মনিবের টাকা নিয়ে ফেরার হয়েছে অটল, আর সাধুপথে ব্যবসা করে ভাগ্য ফিরিয়েছে পটল। সেই অটল পটল, যাদের লোকে বলত কানাই বলাই! মানুষরা কি বোকা !

* * * *

এই পর্য্যন্ত বলেই গড়াই মশাই উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, বুঝলি কি এই অটল আর পটল কে ?

নীচু গলায় বললাম, আজ্ঞে অটল ত আমার বাবা।

আর পটল তোমাদের বিখ্যাত গড়াই মশাই, যিনি বন্ধুর রক্তে আপন সৌভাগ্যের ইমারত গড়েছিলেন।

বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর হঠাৎ চমকে বললেন, এবার আমি চলি বাবা। সন্ধ্যা হলেই ত আবার সে এসে ধরবে। সারাদিন সে বাতাবি তলায় ঘুমিয়ে থাকে। সূর্য্য ডুবলেই উঠে আসে ?

কে ?

কে আবার ? অটল। দেড় বছর সে আমার পিছু নিয়েছে। সুদে আসলে সব ক্ষতিপূরণ করেছি তার, তবু ত সে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লো না আমার।

বলতে বলতে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি পথে নামলেন। তারপরই জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আমার গড়াই মশাই পাগল হয়ে গেছেন। পরে তার কথাবার্ত্তায় সন্দেহ অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল—এখন আমার আগের ধারণাটাই বদ্ধমূল হল।

কিন্তু এ তিনি কি বলে গেলেন ? পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে একি শুনলাম আজ তাঁর মুখে ? বাবার তাহলে পথে ঠ্যাঙাড়ের হাতে মৃত্যু হয় নি, পরের টাকা নিয়ে তিনি ফেরারও হন নি। তিনি খুন হয়েছেন গড়াই মশাইয়ের হাতে, যাকে তিনি সারা জীবন ভালো বেসেছেন প্রাণের চেয়ে, বিশ্বাস করেছেন একান্ত আপন জন বলে ?

বসে বসে ভাবছি। বুঝি একটু তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ মাসতুতো ভাই মুরলীর গলার আওয়াজে ঘোরটা কেটে গেল।

মুরলী মসলন্দীপুরে মাষ্টারী করে। আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই ছুটিছাটা পেলেই কলকাতায় আসে আমার কাছে।

বললাম, কিরে গাঁয়ের সব খবর ভালো ত ?

মুরলী বলল, আর সব খবর ত ভালো বড়দা। শুধু গড়াই বাড়ীটা গেছে তছনছ হয়ে।

কি রকম ?

গেল তিরিশে চৈত্র গড়াই মশাই তাঁর সত্তর বৎসরের জন্মতিথি করলেন। সেই সময় মেয়ে জামাই, ছেলে বৌ, নাতি-নাতনী যেখানে যে ছিল, সবাইকে আনালেন মসলন্দীপুরে। মহা ধূমধাম হল। ঘটা করে রাত্রে খাওয়া-দাওয়াও হল ঢের। কিন্তু তারপর কি যে হল কেউ জানে না। সকাল বেলা দেখা গেল সবাই মরে পড়ে আছে, আর কলম বাগানের সেই বাতাবি গাছটা মনে আছে ত ? তার ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ঝুলছেন স্বয়ং গড়াই মশাই।

সে কি রে ?

হ্যাঁ বড়দা, পুলিশ বলছে, সবাইকে বিষ দিয়ে খুন করে তিনি নিজে আত্মহত্যা করেছেন। বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিল দিন-রাত্রি টাকা টাকা করে ?

একটু দম নিয়ে মুরলী বলল, আরো মজা কি জান ? সেদিন কাল বোশেখীর ঝড়ে বাতাবি গাছটাও উপড়ে পড়ে গেছে, আর তার তলা থেকে বেরিয়েছে একটি মানুষের কঙ্কাল !

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ-ও কি সত্যি ?

সাহেবের দেশে

(পূর্বানুবৃত্তি)

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

সব সাহেবী খাবারের ফিরিস্তি দিতে হলে দলিল দস্তাবেজ হয়ে দাঁড়াবে। তাই কয়েকটা শুনিয়েই ক্ষান্ত দিতে হবে। হ্যামটা এদেশে খুব চলে। সিদ্ধ করা পাতলা রুটির মত ওই শুয়োরেয় মাংস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বাড়ীতে এসে মোড়ক খুলে বসে খেলেই চলে। ডিম দিয়ে তৈরী হ্যাম-ওমলেট খেতে আরও ভালো লাগে। স্প্যাম কোন বিশেষ বিশেষ জীবের মাংস নয়। অনেক কিছু মিশিয়ে তৈরী করে। কৌটো ভর্তি স্প্যাম পাওয়া যায়। রেস্টুরেণ্টে খেতে বসে চাইলে বেলের মরোব্বার আচারের মত চাকা চাকা কেটে দেয়।

চপ এণ্ড চিপস বলতে কিন্তু আমাদের দেশের মত নানান মসলা পেস্তা বাদাম, আলু-ছোলা মেশান সুস্বাদু চপ ধরে নিও না। এ আসলে ল্যাম্ব চপ। কাঁচা মাংসের দোকানেও ল্যাম্ব চপ পাওয়া যায়—হাড়ের সংগে লাগান এক টুকরো মাংসের নাম চপ। রেস্টুরেণ্টে সেটা ভেজে দেয়। ভাজা মানে কড়ায় চাপিয়ে ছাকা তেলে ভাজবে না। আগুনের তলায় বসিয়ে রাখে, আগুনের ওপরটা চাপা দেয় অন্য প্যান দিয়ে। আরও পাওয়া যায় ল্যাম্ব রোস্ট। রোস্ট শুনে ধারণা করেছিলাম ভেজে এনে দেবে, কিন্তু সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় বলতে পারব না, শ্রেফ সিদ্ধ এনে হাজির করে। এদেশে রোস্ট ল্যাম্বের চেয়ে রোস্ট বিফ লোকে বেশী পছন্দ করে।

আরও দুরকম খাবার খুব চলে তাদের নাম স্টেক এবং পাই। স্টেকটা মাংস ছোট ছোট টুকরো করে সিদ্ধ করা। পাই শুকনো শুকনো। অনেকটা কেকের মত দেখতে, ভেতরে মাংস ওপরে ময়দা, বিস্কুটের মত শক্ত করে সেঁকা। স্টেকপাই নামেও খাবার আছে, বুঝতেই পারছ এ হল দুইয়ের সমন্বয়। বাটিতে তৈরী থাকে। চাইলে ওপরের শক্ত অংশ ছুরি দিয়ে কেটে প্লেটে ঢেলে দেয়। পাই-এর মধ্যে কটেজ পাই এখানকার বিখ্যাত খাবার। মাংস আলুসিদ্ধ ময়দা মিশিয়ে তৈরী করে, ওপরটা ডুমো ডুমো এবং বেশ শক্ত, ভেতরটা নরম ! আর স্পেগাটি প্রথম দিন দেখে ভেবেছিলাম, একি এক দলা নাড়িভুড়ি সিদ্ধ। ময়দা ছাড়াও অনেক কিছু মিশিয়ে স্পেগাটি তৈরী করে। দেখতে অনেকটা শেয়ই-এর মত। তবে একটু মোটা। স্পেগাটি সিদ্ধ একটু নুন আর সস মিশিয়ে তোফা খেয়ে নেয় লোকে।

হ্যাম্বার্গার খেতে অনেকটা আমাদের দেশের চপের মত। মাংসের কিমা দিয়ে তৈরী। অনেক দোকানে ওই চপটা রোল অর্থাৎ ছোট গোল পাউরুটির মধ্যে পুরে দেয়, সংগে দেয় খানিকটা পেঁয়াজ ভাজা। আর আছে সসেজ। গোল গোল লাঠি বিস্কুটের মত দেখতে তবে বিলিতি লাঠি বিস্কুট অর্থাৎ হাড়-বের-করা নয়, বেশ নাদুস নুদুস, এও মাংসের। গরম ভেজে পাতে দিয়ে যায়।

এবার যে খাবারের নাম বলব শুনে নিশ্চয় আশ্চর্য হয়ে যাবে। ভাবতে পার হট ডগ বা স্পটেড ডগ কি ধরণের খাবার হতে পারে ? আমি সত্যি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। যে দেশ শিক্ষায়

দীক্ষায় এত উন্নত, সে দেশের লোক কিনা কুকুরের মাংস খায়। পরে সে ভুল ভাঙল। হট ডগ আর কিছুই নয় সসেজ। বিরাট গ্রিলারে (ইলেকট্রিক হিটার) সসেজ চাপান রয়েছে, ভাজা হচ্ছে। চাইলেই লম্বা রোলের মধ্যে পুরে দেয় তার সংগে দেয় পেঁয়াজ ভাজা। স্পটেড ডগের সংগে কিন্তু মাংসের কোন সম্বন্ধ নেই। এটা মিষ্টি খাবার।

এদেশে গরু ভেড়া শুয়োর সমান মাত্রায় খায়। সাধারণ লোকে গরুর মাংসই বেশী খায়। দামে সামান্য সস্তাই হয়ত এর কারণ। তবে মাংসের রাজা মুরগী। এদেশে ধনীলোক ভিন্ন কেউ মুরগীর মাংস খেতে পায় না। একটা মজার কথা শোন। ধর কোন সাধারণ লোক দু-চারজনকে খেতে বলল এবং ভুরিভোজ করালে মুরগীর কাপ্তাকাবাব খাইয়ে। অতিথিরা কিন্তু তখন সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে এত তোয়াজ করছে কেন, ভেতরে ভেতরে কোন মতলব নেইত।

রেস্টুরেণ্টে ভাত চাইলেও পাওয়া যায়—এখানকার কোন ভারতীয় রেস্টুরেণ্টের কথা বলছি না, খাস বিলিতী দোকানের কথাই বলছি। আসলে সেটা সুইট ডিশের মধ্যে পড়ে। অনেক দোকানে ভাত চাইলে যা দেয় স্রেফ চিনি মেশান দুধভাত। কোন কোন দোকানে হুবহু পায়েস তৈরী করে।

মিষ্টি খাবারের মধ্যে এপলটার্ট খুব চলে। আপেল আর ময়দা দিয়ে অনেকটা কেকের মত তৈরী করে। তার সংগে দেয় কাস্টার্ড—ডিম দুধ ও ময়দা দিয়ে তৈরী— দেখতে ক্ষিরের মত। এছাড়া কাস্টার্ড দেওয়া পিচ, আপ্রিকট, প্লাম বা প্রুণ খেতে বেশ লাগে। অনেকের মেনুতে দেখা যায় ফ্রেশ ফ্রুট—তাই বলে ভেবো না গাছ পাকা আম-জাম কাঁঠাল প্লেট ভর্তি করে হাজির করবে। চিনির রসের মধ্যে এক টুকরো কমলা লেবু, দু'কুচি আনারস, দুটো আঙুর বা এক ফালি পিচ ফল দিয়ে যাবে।

এ ছাড়াও বহু মিষ্টি খাবার আছে যেমন দুধ, ময়দা কিস্‌মিস্‌ দেওয়া সুলতানা পুডিং। তা ছাড়াও অনেক রকম মিষ্টি আছে যেমন ম্যানচেস্টার টার্ট, ফ্রুট পুডিং, ব্রেড পুডিং। এদেশে দই খুব পাওয়া যায়—নাম ইয়াগট। কোনটা সাদা, কোনটায় কলার গন্ধ দেওয়া, কোনটায় অরেঞ্জ, কোনটায় বা মার্লবেরির, তবে চিনি পাতা নয়। বাড়ী এনে চিনি মিশিয়ে খেতে মন্দ লাগে না।

তোমাদের এক গাদা সাহেবী খানার ফিরিস্তি দিলাম। তাই বলে তোমরা যেন বাগবাজারের স্পঞ্জ রসগোল্লা, ভীমনাগের সন্দেশ, জলযোগের দই, ক্ষীরমোহন, রসোমালাই, চন্দ্রপুলি, জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানার কথা আমায় মনে করিয়ে দিয়ো না। হয়ত লেখা শেষ হবার আগেই দেশে গিয়ে হাজির হব।

তবে এক কাজ করতে পার। কালিয়া-পোলাওয়ের দরকার নেই। যখন নিমবেগুন, করলা-কাঁচকলা-সজনের সুকতো, পুঁই-চিংড়ির চচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট, ইলিশমাছের ঝাল, সলুপে দিয়ে কুল জরানো বা আমের ফটিক ঝোল নিয়ে বসবে, আমার নাম করে খাবে। আমি এখানে বসে পেটে হাত বুলোব আর ঢেকুর তুলব।

(শেষ)

সেই ছেলেবেলায়

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স পঁচাত্তর। কলকাতা শহরের তিনি একজন প্রাচীন অধিবাসী। তিনি তোমাদের তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতার অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধে কিছু শোনাবেন। আজ হয়ত সে সব কাহিনী তোমাদের কাছে স্বপ্নের মতই মনে হবে।—সম্পাদক]

রবিবার। স্কুল বন্ধ। কাল রাত্রে শোবার সময় ভেবে রেখেছিলুম, সকালে উঠেই নীলমণিদের বাড়ী যাব। সেখান থেকে দু'জনে টালীগঞ্জে 'রাস' দেখতে যাব।

সুতরাং জামাটা গায়ে দিয়ে বার হচ্চি, ঠিক সেই সময় ঠাকুমা এসে বল্‌লো—"বাবা, বাজার থেকে বেগুন আর মাছটা এনে দিয়ে, তারপর যেখানে হয়, যেয়ো।"—মনে মনে এত রাগ হোল যে, তা আর বলবার নয়। অগত্যা ছুটতে হোল বাজার। বাজারে কিনবো ত শুধু বেগুন আর মাছ। সুতরাং বেশী ঘোরা-ঘুরি আর করলুম না; এ-দোকান সে-দোকান করলুম না। একজনের কাছ থেকে দু'পয়সায় বড় বড় ছ'টা বেগুন কিনলুম, আর একটা মেছুনীর কাছ থেকে দু'আনায় দু'ভাগা পার্শে মাছ কিনে বাড়ী ফিরে এলুম। মাছ দেখে ঠাকুমা আঁৎকে উঠে বল্‌লে—"এই কটা মাছ দু'আনা?" মাছগুলো ছিল—বেশ বড় সাইজের পার্শে। তারি আটটাতে এক-এক ভাগা দিয়ে ছিলো; এক ভাগা এক আনা। আমি দু'ভাগা দু'আনায় নিয়েছিলুম। তাড়াতাড়ির জন্যে আমি দর-দস্তুর করিনি। যা বলে দিলো, তাইতেই নিয়েছিলুম। দর করলে, হয় ত তিন পয়সা কোরে ভাগা সে দিত। সব মাছেরই পেট-ভরা ডিম ছিল।

ঠাকুমার স্বভাব ছিল, গজ-গজ করা। ঐ নিয়ে খানিকক্ষণ বকতে লাগলো—"দু'আনা পয়সায় আন্‌লি কি না—মোটে ষোলটি পার্শে! এর চেয়ে পয়সা চিবিয়ে খেলেই ত হয়!…" ঠাকুমা নিজের মনে বোকে যেতে লাগলো; সে-সব কথায় আর কান না দিয়ে আমি নীলমণিদের বাড়ীর দিকে পাড়ি দিলুম।

তোমরা 'শিশুসাথী'র ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকারা হয় ত চমকে যাচ্চ যে, বড় বড় নধর 'মুক্তকেশী' বেগুন দু'পয়সায় ছ'টা আর দু'আনায় পেট-ভরা ডিম—বা ডিম-ভরা পেট—বড় সাইজের টাট্‌কা পার্শে মাছ ষোলটা—তা'তেও ঠাকুমা অসন্তুষ্ট। এ সব কি আজগুবি কথা! কিন্তু মোটেই আজগুবি নয়; একেবারে খাঁটি সত্য। এ কিন্তু এখনকার কথা নয়; অনেকদিন আগেকার কথা। আমার বয়স তখন ১০।১২ বছর। এখন আমার বয়স ৭৫; সুতরাং ৬০ বছরেরও বেশী কাল আগে।

এই রকমই তখন জিনিস-পত্রের দাম ছিল ; তখনকার কোলকাতা সহরেই এই রকম জিনিষের দাম ছিল ; গ্রামের ত কথাই নেই, সেখানে দাম ছিল আরো কম। যে জঘন্য ভেজাল সর্ষে তেলের এখন ২৵০ সের, তার চেয়ে সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট, কলুর ঘানি থেকে একেবারে খাঁটি তেলের দাম ছিল তখন পাঁচ ছ' আনা সের। খাঁটি মুঙ্গেরী মটকীর প্রথম শ্রেণীর ঘিয়ের দাম ছিল বারো আনা সের। ঠাকুমা রোজ রাত্রে দু'চারখানা লুচি আর আধসেরটাক্ দুধ খেতেন। দুধ বাইরে থেকে কিনতে হোত না ; আমাদের ঘরেই তিনটে গরু ছিল। একটা-না একটা গরুর দুধ বার মাসই পাওয়া যেত। কখনো-কখনো একসঙ্গে দুটো গরুর দুধও হোত। এক-একটা গরু দু'বেলায় দুধ দিত—পাঁচ সের, ছ'সের কোরে। সুতরাং খাঁটি দুধ আমরা খেতে পেতুম খুবই। ঠাকুমার লুচির জন্যে ময়দা আর ঘি রোজ আমাকেই বাজারের রাখাল মুদীর দোকান থেকে কিনে আনতে হোত। এ কাজটা ছিল আমার নিত্য বৈকালিক কাজ। ঠাকুমা রোজ দিতেন চার পয়সা ; তিন পয়সার ঐ মুঙ্গেরী মটকীর ঘি এক ছটাক, আর ময়ুর মার্কা 'রেলির' ময়দা এক পয়সা। এতে ছোট ছোট ফুলকো খাস্তা লুচি হোত নয় খানা। দুই খানা ছিল আমার প্রাপ্য। ঐ প্রাপ্যটুকুর লোভেই আমি, গুলি-মারবেল বা লাট্টু খেলা ফেলে রোজই ছুটতাম—রাখাল মুদীর দোকানে।

ঘি দেবার জন্যে, রাখাল যখন 'মটকী'র সরাখানা তুলতো, তখন চারদিকের সমস্ত স্থানটা একটা সুগন্ধে ভরে যেতো। সেই সোনার বরণ দানাদার ঘি ছিল—বারো আনা সের। এখন বারো টাকাতেও সে-ঘি পাওয়া যাবে না ; এমন কি তার শূন্য জালাটাও বারো টাকাতে মিলবে না। যাক, যা বলছিলুম তাই বলি।

বাজার থেঁকে বেগুন আর মাছ কিনে এনে দিয়ে, নীলমণিদের বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

নীলমণিদের বাড়ী ট্রাম-রাস্তা অর্থাৎ 'রসা-রোড'য়ের ও-পারে। আমাদের বাড়ী এ-পারে, হালদারপাড়া রোডে। ট্রাম রাস্তার ধারে গিয়ে দেখি, সামনেই একখানা ট্রাম গাড়ী 'আউট্ লাইন' —অর্থাৎ লাইনচ্যুত হোয়ে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে লোকের ভীড় জমে গেছে ; গাড়ী থেকে ঘোড়া দুটোকে খুলে, একজন লোক তাদের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। 'ডিপো' কাছেই। 'ডিপো' থেকে দু'-পাঁচজন লোক আসবে। ঘোড়া দুটোকে আবার গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হবে। তাদের পিঠে দু'চার ঘা চাবুক মারা হবে। তবে তারা প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ীখানাকে টেনে আবার লাইনের ওপরে তুলে ফেলবে।

কিন্তু এ কথা পড়েও হয়ত তোমরা আবার চম্‌কে যাচ্চ। ট্রামগাড়ী আবার ঘোড়ায়-টানা কি ; তার আবার 'আউট্-লাইন' হওয়া কি! এসব নিশ্চয়ই আজগুবি কথা। কিন্তু এরও ওপর যদি কিছু বলি? যদি বলি, "রসা-রোড পেরিয়ে নীলমণিদের বাড়ী যাব, কিন্তু মিনিট-দুই এ-পারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল, কারণ ভস্-ভস্ শব্দ কোরে একখানা ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দু'খানা ট্রামগাড়ীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন ; আর ইঞ্জিনের আগে আগে একজন ঘোড়-সওয়ার,

লোক সরাবার উদ্দেশ্যে ছুটছিলো”—তাহোলে নিশ্চয়ই তোমরা চেঁচিয়ে উঠবে—“আজগুবি! আজগুবি! একেবারেই গাঁজা।”

কিন্তু কথাটা মোটেই আজগুবি নয় বা গাঁজাখুরি নয়, একেবারেই সত্যি ; সূর্যদেবের পূর্বদিকে ওঠা যেমন সত্যি, এ-ও তেমনি সত্যি। আমি তাঁবা-তুলসী নিয়ে দিব্বি কোরে বলচি—‘সত্যি—সত্যি—সত্যি!’

এসব ত আর বেশী দিনের কথা নয়। চন্দ্রগুপ্তের আমলও নয়, অশোকের সময়ও নয় বা বক্তিয়ার খিলিজীর রাজত্বের সময়ও নয় ; মাত্র ৬০।৬৫ বছর আগেকার কথা। তখন কুইন ভিক্টোরিয়া আমাদের রাণী। ৬০।৬৫ বছর—মানে, মনে কর, একটা টাকা! বুঝতে পারলে না বোধ হয়। অর্থাৎ একটা টাকাতে ক'টা পয়সা হয়? চৌষট্টিটা ত? পয়সার বদলে বছর মনে কোরে নাও। এক একটা বছর যদি এক একটা দিন ধরা যায়, তাহোলে—মাস দুই আগেকার কথা।

কিন্তু যাই হোক, যা বলচি, তা সত্যি। প্রথম আমলে, কোলকাতার ট্রাম গাড়ী এখন যেমনটা দেখছ, এ রকম ছিল না। খুব হাল্‌কা হাল্‌কা গাড়ী, তাতে একজোড়া কোরে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হোত। এখন যেমন সারা কোলকাতা হাওড়ায় ট্রাম গাড়ীর জাল পাতা, তখন তা ছিল না। তখন মাত্র তিন চারটে লাইনে ঐ ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলতো। কালীঘাট লাইন, শ্যামবাজার লাইন, খিদিরপুর, নিমতলা আর চিৎপুর—ব্যস্‌। এর মধ্যে প্রধান ছিল—কালীঘাট আর শ্যামবাজার লাইন। কালীঘাট লাইনে কালীঘাট থেকে আলুগুদোম যাতায়াত করতো। আলুগুদোম সে সময়ে ট্রামের একটা উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি ছিলো। বর্তমান ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলকেই তখন ‘আলুগুদোম’ বলা হোত। ভবানীপুরে মাঠের গীর্জার দক্ষিণে, সার্কুলার রোড থেকে সুরু কোরে আরো দক্ষিণে এলগিন রোডের জংশন পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটার ওপর ট্রাম কোম্পানীর প্রকাণ্ড ঘোড়ার আড্ডা ছিল। কালীঘাট লাইনে যে-সব ট্রাম যাতায়াত করত, সে-সবের ঘোড়া এইখানেই বদল করা হোত। এই রকম প্রত্যেক লাইনের মাঝামাঝি কোন জায়গায় সেই ট্রামের ঘোড়া বদল হোত। ঘোড়া বদল ছাড়া, প্রত্যেক লাইনে একটা নির্দিষ্টস্থানে ঘোড়াকে জলপান করানোর ব্যবস্থা ছিলো। এখন যেখানে ‘আর্মি-নেভি স্টোর্‌স্‌ বিল্ডিং’য়ে, ‘লয়েডস্‌ ব্যাংক’য়ের শাখা আফিস, ঠিক ওরি সামনে—চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম গায়ে একটা গুম্‌টী ছিল। একজন লোক দু' বালতি জল হাতে নিয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতো। দুটো ঘোড়ার মুখের সামনে তখন ঐ জলভরা বালতি ধরা হোত। হয় ত খেত, হয় ত খেত না। এইরকম ঘোড়াকে জল খাওয়াবার ব্যবস্থা সব লাইনেই ছিল। কিন্তু ঘোড়াকে রেখে ইঞ্জিনের কথাটা বলি।

এখনকার মত ভারি গাড়ী নয়। খুব হাল্‌কা গাড়ী। তার দুদিকেই ওঠা-নামার দরজা। একখানা গাড়ীতে চারটে কোরে কম্‌পার্টমেণ্ট। প্রত্যেকটায় দু' সারি কোরে বেঞ্চি। প্রত্যেক বেঞ্চিতে চার জন লোকের বসবার স্থান ; মোট বত্রিশ জন। কিন্তু পনের-ষোল জনের বেশী আরোহী

বড় একটা কখনই হোত না। এইরকম দু'খানা কোরে গাড়ী, একখানা ইঞ্জিনে টেনে নিয়ে যেত। ইঞ্জিনগুলো দেখতে ছিলো চৌকো প্যাটার্ণের ; আকারে ছোট। কোলকাতায় 'ট্রামের' জন্ম থেকেই, এই ইঞ্জিনে টানা ট্রাম প্রথম দেখা দিল—কালীঘাট লাইনে। অন্যসব লাইনে—ঘোড়া। তখনকার রসা রোড, আজকের রসা রোডের মত দেড়শো ফিট চওড়া ছিল না ; ছিল মাত্র পঞ্চাশ ফিট। কোন জায়গায় আরো কম। অবশ্য লোক-চলাচলও আজকালকার মত এত সাংঘাতিক বেশী ছিল না। তবুও—পাছে কোন পথচারী ইঞ্জিনের তলায় পড়ে, সেইজন্যে, গাড়ীর আগে আগে একজন ঘোড়-সওয়ার অ-দ্রুতবেগে ছুটতো। এই সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু অল্পদিনের ভেতর দু'জন লোক ইঞ্জিন চাপা পড়ে মারা গেল। তখন চারদিকে খুব সোরগোল পড়ে গেল। এখন যেমন দশ-বিশটা লোক মোটর-চাপা, লরি-চাপা পড়লেও বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না, তখনকার দিনে তা ছিল না। একটা লোক এইভাবে মারা পড়লেই, সারা কোলকাতায় হৈ চৈ পড়ে যেত। এ ক্ষেত্রেও তাই হোল। তখন কোম্পানী কালীঘাট লাইনে ঘোড়া দিয়ে, ইঞ্জিনকে পাঠালে……খিদিরপুরের মাঠের লাইনে। ……কিন্তু কোন্ কথা বলতে গিয়ে কোন্ সব এসে পড়লো। এ যেন—'ধান ভান্তে শিবের গীত'! কোথায় নীলমণিকে নিয়ে টালীগঞ্জের 'রাস' দেখতে যাব, তার জায়গায়—বেগুণ, গাছ, ট্রাম, ঘোড়া, ইঞ্জিন—কত কি এসে পড়লো। কিন্তু এর জন্যে দায়ী তোমরা ; দোষ—তোমাদেরই। তোমাদেরই অবিশ্বাসের জন্যে আমায় এই সাত কাণ্ড রামায়ণ গাইতে হোল। যা'ক এবার আর সুরুটা শেষ হোল না। আসচে মাসের অপেক্ষায় থাকো। এবার এই পর্যন্ত।

ঘুম

শ্রীমীরা ভট্টাচার্য্য

এই খেলা খেলছিলো এর মাঝে হায়
ধুলায় লুটিয়ে দেখি খোকন ঘুমায়।
এইতো বাজার থেকে এলো যেই ডিম
নেচে ছড়া কাটছিলো হাট্টিমা টিম।
রোদ্দুরে বড়ি দিতে গেছি যেই ছাতে
চড়াই তাড়িয়ে এলো কাঠি নিয়ে হাতে।
খাবার সময় হলো, নীচে গেছি এই—
দুধ নিয়ে ফিরে দেখি, খোকা জেগে নেই।

রাঙা বল্ হাতে ধরা খেলা ভুলে হায়
ধুলায় লুটিয়ে আহা মানিক ঘুমায়।
এখন বিছানা পেতে দাও দেখি ঘরে,
একটু ঘুমিয়ে নিক্, খাবে তারপরে।
একরাশি ফুল যেন শুয়ে আছে খোকা
ভুলো ভুলো মুখখানা একেবারে বোকা।
টিয়া পুষি বাঘ সব পড়ে আছে পাশে
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সোনা খিল খিল হাসে।

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

১১। পুনর্জীবিত উদ্ভিদ

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা জানি যে সকল প্রাণীর মতই প্রত্যেক উদ্ভিদের জীবন ও মৃত্যু আছে। একবার মৃত্যু হলে আর তাকে পুনরায় বাঁচান যায় না। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, মরে যাওয়ার পরেও তাদের রূপান্তর হয়—এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন সেগুলি আবার নবজীবন প্রাপ্ত হ'ল। আবার কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যেগুলি বহুদিন শুষ্ক অবস্থায় থাকার পরেও জলে ভেজানোর পর নূতনভাবে বাড়তে থাকে। এইগুলিকে শুষ্ক অবস্থায় মৃত মনে হয় বটে কিন্তু তা ঠিক নয়। এই সব উদ্ভিদকে বলা হয় রেসারেক্‌সন্ প্লাণ্ট বা পুনর্জীবিত উদ্ভিদ।

এই রকম একটি উদ্ভিদ হল আনাস্‌টাটিকা। উত্তর আফ্রিকা, আরবদেশে ও সিরিয়ার মরুভূমিতে এই গাছ জন্মে। গাছটি ছয় ইঞ্চির বেশি উঁচু হয় না; গাছের গোড়া থেকে অনেকগুলি ডালপালা বার হয় আর সেগুলি ছত্রাকারে মাটির উপর ছড়ানো থাকে। এর ছোট ছোট ফুল ও ফল হয়, তারপর গাছটি মরে যায়। তখন তার পাতাগুলি ঝরে পড়ে আর ডালপালাগুলি গাছের গোড়ার দিকে বেঁকে আসে আর সমস্ত গাছটি কুঁকড়ে গিয়ে গোলাকার হয়ে যায়। কিছু দিন পরে হাওয়ার জোরে গাছটি শিকড় থেকে উপড়ে আসে আর মাটির উপর গড়াতে গড়াতে বহুদূর চলে যায়। এইভাবে গড়াতে গড়াতে যখনই জলের সংস্পর্শে আসে কিম্বা যদি সামান্য বৃষ্টিপাত হয় তাহলেই সেই গোলাকার গাছের ডালগুলি আবার সোজা হয়ে যায় আর মাটির উপর ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই মনে হয় গাছটি আবার বেঁচে উঠল, কিন্তু আসলে তা নয়। তাছাড়া এই গাছের ফলগুলি ঝরে পড়ে যায় না, শুষ্ক গাছেতেই থেকে যায়; আর গাছের ডালপালাগুলি যখন জলের স্পর্শ পেয়ে সোজা হয়ে যায়, সে সময় ফল থেকে বীজ পড়ে নূতন গাছ হয়। বহুদিন শুষ্ক অবস্থায় থাকলেও আনাসটাটিকার এই গুণ নষ্ট হয় না।

এক জাতীয় ছোট ছোট উদ্ভিদ আছে তার নাম সেলাজিনেলা। সেলাজিনেলা অনেক প্রকারের আছে, আর অনেক দেশেই হয়। ভিজা ও ছায়া ঢাকা জায়গাতেই এ জাতীয় গাছ জন্মায়। সাধারণতঃ এর ডালপালাগুলো মাটির উপর একটির পাশে একটি বিছান থাকে; মনে হয় যেন মাটির উপর একটি ছবি আঁকা রয়েছে। শুকিয়ে গেলে প্রায় সব সেলাজিনেলারই ডালপালাগুলি গুটিয়ে আসে আবার জল পেলেই সেগুলি সম্প্রসারিত হয়ে যায়। মেক্‌সিকো দেশে এক রকম

সেলাজিনেলা পাওয়া যায় তার নাম সেলাজিনেলা লেপিডোফিলা। এর ডালপালাগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট আর শুষ্ক অবস্থায় সেগুলো গুটিয়ে গিয়ে গাছটিকে জটপাকান একটি দড়ির বাণ্ডিলের মত আকৃতি দেয়। এই শুকনা তাল পাকান গাছটিকে যদি জলে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে ডালপালাগুলি আবার সোজা হয়ে গাছটি তার পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়! এই গাছের উপরের দিক শুকিয়ে গেলেও এর কিছু কিছু অংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। মাটি থেকে তুলে শুকিয়ে রেখে দেওয়ার পর আবার ভিজা ছায়া ঢাকা জমির উপর জলে ভিজিয়ে যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলে গাছটি আবার সবুজ হয়ে যায় আর নূতন ভাবে ওর ডালপালা গজাতে থাকে। এইভাবে তিন চারবার পর্য্যন্ত গাছটিকে পুনর্জীবিত করা যায়। তবে প্রত্যেক বারই তার জীবনিশক্তি ক্ষয় হতে থাকে আর বার বার শুকানোর ফলে গাছটিকে শেষ পর্য্যন্ত আর বাঁচান যায় না, যদিও ঐ শুকনো গাছ জলে দিবামাত্র

আনাস্টাটিকা : মৃত ও পুনর্জীবিত

তার ডালপালাগুলি পূর্ব্বের মত সোজা হয়ে যায়, আর গাছটির আকার তাজা গাছের মতই হয়ে যায়। সেলাজিনেলার এই রকম গুণ থাকার জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে এই গাছ থেকে তৈয়ারী ঔষধ সেবন করলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে ও মরণাপন্ন রোগী নবজীবন লাভ করবে। এজন্য টোটকা ঔষধ রূপে এই উদ্ভিদ লোকে ব্যবহার করে।

কতকগুলি ফার্নজাতীয় গাছেরও এই গুণ দেখা যায়। তার মধ্যে পলিপোডিয়াম্ পলিপোডিওইডিস্ নামে ব্রাজিলের একটি ফার্ণ বহুদিন এই রকম শুষ্ক অবস্থায় থাকার পরেও জল পাওয়া মাত্র পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া আরও কতকগুলি আছে যেগুলি আনাস্টাটিকার মত ফুল ফল হওয়ার পর মরে যায় আর কিছু কিছু অংশ গুটিয়ে ছোট হয়ে থাকে। আবার জল পাওয়ার সাথে সাথেই সেই অংশ সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এ জন্য এগুলিকেও রেসারেকশান প্লাণ্টের দলেই ধরা যায়।

একটি জানলার কাহিনী

দেবপ্রসাদ

অনেক কাল আগের কথা। তখন আমি কলেজে পড়ি। আমাদের সামনের বাড়ীটা অনেক-কাল খালি পড়েছিল। দোতালায় দু'খানা ঘর—রাস্তার দিকে।

আমাদের বাড়ীর দোতালায় ঘর ছিল মাত্র একখানা। ও বাড়ীর দোতলার ঘরের ঠিক মুখোমুখি। দু' বাড়ীর মাঝখানে সরু পথ, হাত চার পাঁচেকের বেশী চওড়া হবে না। আমাদের বাড়ী দুটি পেরিয়েই এক বড় লোকের বাড়ীর পিছন দিককার পাঁচিলে গিয়ে গলিটা শেষ হয়েছে। গলিটা যেন আমাদের দুটি বাড়ীর মধ্যে ছোট্ট একটি উঠোন।

আমাদের বাড়ীর দোতলার ঘরটিতে আমি থাকি। নিরিবিলিতে পড়াশুনার সুবিধা হয়। রাস্তার দিকে মস্ত বড় একটি জানলা, ঘষা কাঁচের সার্সি লাগানো।

অনেককাল পড়ে থাকবার পর বাড়ীটায় নতুন ভাড়াটে এলেন। এক বুড়ো ভদ্রলোক নাম ধনঞ্জয়বাবু। আচারে, ব্যবহারে বেশ অমায়িক। প্রথম দিন এসেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। মিনিট কয়েক কথাবার্তার মধ্যেই জানিয়ে দিলেন যে তার বড় ছেলেটি বম্বের কোন একটা অফিসে ভাল মাইনেতে চাকরী করছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথাকার কোন্ এক রাজার বাড়ীতে। দ্বিতীয় মেয়ে গান বাজনা নিয়েই থাকে দিন রাত। বেহালায় চমৎকার হাত।

ছোট ছেলে নিপুর বয়স বছর দশেক মাত্র। একটু দুরন্ত বটে কিন্তু কোন পরীক্ষায় নাকি কখনও সেকেণ্ড হয় নি।

একটু চাপা অহঙ্কার থাকলেও প্রতিবেশী হিসাবে ধনঞ্জয়বাবুকে ভালই মনে হ'ল। দিন কয়েক পরে একদিন কলেজে যাবার সময় ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ে নিরুর বাজনা শুনলাম। সেদিন ধনঞ্জয়বাবুর বাগাড়ম্বর শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিলাম। আজ কিন্তু তার মেয়ের বেহালা শুনে মনে হ'ল, ভদ্রলোক নেহাৎ মিথ্যে বড়াই করেন নি।

আরও দিন দুই পরে, সন্ধ্যার সময় কলেজ থেকে ফিরে দেখি, আমার ঘরের রাস্তার দিকে জানলাটির কাঁচ ভাঙ্গা। ঘরময় কাঁচের টুকরো ছড়ানো। এই জানলাটি আমার বড় সখের। অনেক ঘুরে অত বড় সাইজের ঘষা কাঁচ এনে লাগিয়েছিলাম। বৌদিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে কাঁচটা ভেঙ্গেছে?'

বৌদি বললেন, আমি তো জানিনে। কোন আওয়াজওতো পাই নি। রাস্তা থেকে কোন দুষ্ট লোক-টোক কেউ ঢিল ছুঁড়ে থাকবে হয় ত।

চাকরটিকে প্রশ্ন করা হ'ল। কিন্তু সেও বললে, কিছু জানে না।

পরের দিন আবার বাজার ঘুরে ঐ রকম একটা কাঁচ এনে লাগিয়ে দিলাম। দিন সাতেক পরে, ফের একদিন বিকেলবেলা বাড়ী ফিরে দেখি, আবার কে যেন জানলার কাঁচ ভেঙ্গে দিয়েছে। সেই উপর দিককার বড় কাঁচখানাই। ভীষণ রাগ হ'ল। চাকরটাকে ডেকে ধমকালাম। সে বললে, আমি কিছু জানিনে, দাদাবাবু। মাত্তর মিনিট দশেক আগে আমি এই ঘর পরিষ্কার করে গেছি। তখন তো জানলা ঠিকই ছিল।

বৌদিও শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি তাজ্জব কাণ্ড রে বাবা! আমাদের গলিতে তো কেউ আসে না। ও বাড়ীরই কারুর কাজ। ওদের ছোট ছেলে নিপুটাতো দেখি উঠোনে বসে হরদম ঢিল ছুড়ছে, বল নিয়ে লোফালুফি করছে। তাইতেই নিশ্চয় ভেঙ্গেছে।

রাগে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে গেল। আগের বারেও নিশ্চয়ই এই ছেলেটাই ভেঙ্গেছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ছেলেটা সত্যিই তখনও পেয়ারা গাছে ঢিল ছুঁড়ছে। ঠিক করলুম ধনঞ্জয়-বাবুকে বলা দরকার। গোড়া থেকে সাবধান না করে দিলে, পরে আরও কি ক্ষতি করবে কে জানে!

বিনয় করেই গিয়ে বললাম। কেউ যখন নিজের চোখে দেখেনি তখন খুব জোর করে তো আর বলা চলে না। কথাটা শুনে ধনঞ্জয়বাবু একটু যেন অপ্রসন্নই হলেন। তবে মুখে ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে একটু চঞ্চল, কিন্তু তাই বলে ঢিল মেরে পরের বাড়ীর জানালা ভাঙ্গবে এটা আমার সম্ভব বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'ছোট ছেলে'—সেদিন এ পর্য্যন্তই হয়ে রইলো।

এর পরে বেশ কিছুদিন নিরুপদ্রবে কাটল। মাস দেড়,দুই তো বটেই। তারপরে আবার হঠাৎ একদিন কাঁচখানা ভেঙ্গে গেল। এতদিন যা কিছু ঘটেছে, বলতে গেলে আমার অবর্ত্তমানেই। শেষবারে ঘরে থাকলেও ঘুমিয়েছিলুম। এবারে ব্যাপারটা ঘটল আমার প্রায় চোখের সামনেই। সন্ধ্যার একটু পরেই পলিটিক্সএর একখানা বই নিয়ে এসেছি। পরীক্ষার আর বেশিদিন বাকী নেই, অথচ সামনের বাড়ীতে কিছুদিন যাবত প্রায়ই গানের আসর বসছিল। অসুবিধা হচ্ছিল খুবই, কিন্তু কি আর করা যাবে!

যাই হোক, সেদিন একটু পরেই ধনঞ্জয়বাবুর গলা শুনতে পেলুম!

—'এই যে আসুন খাঁ সাহেব। আপনার ছাত্রী এক্ষুণি আসছে।'

ওস্তাদ এসেছেন। অর্থাৎ পড়ার দফা আজ রফা। এই বাজনা চলবে অন্তত ঘণ্টা দু'তিন ধরে। জানলাটা বন্ধ করে দিলুম, যদি মনটাকে জোর করে বইএর দিকে ফেরাতে পারি। একটু পরেই বাজনা আরম্ভ হ'ল। পড়তে পড়তে কখন যে পড়া ভুলে তন্ময় হয়ে বাজনা শুনতে আরম্ভ করেছি, তার হুঁশ ছিল না। হঠাৎ মনে হ'ল আমার ঠিক সামনেই রিন্ রিন্ করে একটা মৃদু আওয়াজ

আসছে। কোত্থেকে শব্দটা আসছে, বুঝে উঠবার আগেই জানলার অতবড় কাঁচখানা ঝন্ ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ল, টুকরোগুলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেল। ছুটে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলুম। দেখি, ধনঞ্জয়বাবু জানলার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। নীচে কেউ নেই। নিপুটা ধারে কাছে আছে বলে মনে হ'লনা। এবারে আর সন্দেহ রইলনা, এটা কার কাজ! ইচ্ছে হ'ল চেঁচিয়ে বলি, 'এ সবের মানে কি? কি পেয়েছেন আপনি!' কিন্তু বলে তো কোনও লাভ হবে না, তাই চুপ করে গেলুম। দাদা বাড়ী এসে সব শুনে বললেন, 'সোজাসুজি বলে কোনও লাভ হবেনা। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এসব চালাকি আর চলবে না। কিন্তু একটা ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য লাগছে, বুড়ো হঠাৎ এসব করতে গেল কেন?'

এসন্দেহ আমার মনেও জেগেছিল, কিন্তু কোন সদুত্তর বার করতে পারিনি। তবু, বললাম, একবার ওর ছেলের নামে দোষ দেওয়া হয়েছিল, সেই আক্রোশেই হয়ত—কথাটা নিজের কানেই কেমন হাস্যকর শোনাল।

বছর খানেক কাটল এর পরে। মধ্যে আর কোনও গোলযোগ হয়নি। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বছর খানেক ধরে গানবাজনার পাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়বাবু তবলা নিয়ে বসেন। দু'চারজন গাইয়ে-বাজিয়েও আসে, বাস, ওই পর্য্যন্ত!

আমার এক বাল্যবন্ধু, পরেশ, বছর কয়েক আগে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে বেনারস গিয়েছিল। পাশ করে হালে এক বিখ্যাত রেডিয়ো-কোম্পানীর চাকরী নিয়ে কলকাতায় এসেছে। একদিন আমাদের বাড়ী এলো। কথায় কথায় আমার জানলার কাঁচভাঙ্গার রোমাঞ্চকর ইতিহাস তাকে বললাম।

সব শুনে পরেশ বললে, 'তাইতো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার! তোমাদের বুড়ো ধনঞ্জয়বাবুর মাথায় কি ছিট্ আছে নাকি?'

—'না এমনিতে তো লোক ভালই মনে হয়।'

—'তা বটে, যারা নিজেদের একটু অভিজাত শ্রেণীর মনে করে, তারা সচরাচর এসব নোংরা কাজে হাত দেয় না। তবে যদি পাগল হয়, তো আলাদা কথা।' আমি সায় দিয়ে বললাম, সে ঠিক। এমন এক ধরনের পাগল আছে, যারা সব ব্যাপারে ঠিক থাকে, শুধু একটা বিশেষ ব্যাপারেই তাদের পাগলামি প্রকাশ পায়।'—হ্যাঁ তাতো হতেই পারে। ভাল কথা! ঢিলগুলি কত বড় ছিল, কখনও লক্ষ্য করেছিলে?' আমি হেসে বললাম, 'না কারণ একটা ঢিলও ভিতরে পড়েনি।' পরেশ ও বাড়ীতে কে কে থাকে তার খোঁজ নিয়ে বললে, 'ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ে এখন শ্বশুর বাড়ীতে আছে, বললেনা।'

বৌদি কাছেই ছিলেন। আমি উত্তর দেবার আগেই বললেন, 'ছিল, কিন্তু আজই দুপুরে এসেছে। কিছুদিন থাকবে বোধ হয়।'

পরেশ আবার আমাকে প্রশ্ন করল, 'আজকাল আর তোমার কাঁচটাচ ভেঙ্গে ফেলে না তো !'

—'নাঃ, বুড়ো নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে আমরা তার কাণ্ডকারখানা সব ধরে ফেলেছি।'

পরেশ এবার বৌদিকে বললে, 'ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ে তো শুনলাম, চমৎকার বেহালা বাজায়। আমাদের একদিন বাজনা শোনাতে পারেন ?'

—'তা, বোধ হয় শোনানো যাবে। ও নিজের ঘরে বসে বাজাবে আর আপনারা এই ঘরে বসে শুনবেন। তাতে কোনও আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। কবে শুনতে চান বলুন।'

পরেশ একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, সে আপনাকে পরে জানাবো। উনি তো এখন কিছুদিন আছেন এখানে!' বলে' আমার দিকে ফিরল—

'ভাল কথা, আবার যদি কখনও তোমার জানলার কাঁচ ভাঙ্গে তো আমাকে খবর দিয়ো। আশা করি, তোমার সত্যিকারের অপরাধীকে খুঁজে বার করতে পারব।'

আমি বিস্মিত হলাম।

আরও বিশ-পঁচিশ দিন কাটল। এর মধ্যে পরেশ একবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বাড়ী এসেছিল। কিন্তু জানলার প্রসঙ্গ আর ওঠেনি। ও-ও তোলেনি, আমারও মনে ছিলনা। তারপরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আবার সেই অঘটন ঘটল। সন্ধ্যার শো-তে সিনেমায় গিয়েছিলাম। এসে দেখি, ঘরময় কাঁচের ছড়াছড়ি, জানলার সার্সি-ভাঙ্গা! এবারেও ঘরের মধ্যে কোন ঢিল খুঁজে পেলাম না।

পরদিন ভোরবেলাই পরেশকে খবর দিলাম।

সে বলল, 'আজ সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসায় যাব। বৌদিকে বোলো, আজ ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ের বাজনা শোনাতে হবে।'

—আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'তুমি বলেছিলে, এবারে তোমার গোয়েন্দাগিরির খেলা দেখাবে।' গোয়েন্দাগিরি আর কি, 'পরেশ অনেকটা নিস্পৃহভাবেই জবাব দিল, দেখি কতদূর কি হয়। জানলার কাঁচটা কিন্তু আজকেই লাগিয়ে দিয়ো। আমি কাশীতে থাকতে বছর তিন-চার বেহালার চর্চা করেছিলাম। কতখানি হাত পাকিয়েছি, আজ তোমাদের দেখিয়ে দেব।'

সন্ধ্যার একটু পরেই পরেশ এলো তার বেহালার বাক্সটি হাতে নিয়ে। বৌদি নিরুকে ডেকে বাজাবার কথা বললেন।

আমি আর পরেশ বসলাম জানলার পিছনে, বৌদি খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে। বাতি নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। খানিক পরে নিরু বাজাতে শুরু করল। ঘণ্টা খানেক বাজনাটা বাজাল। পরেশ এবার বৌদির কাছে উঠে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'কাল রাতে উনি যে গৎটা বাজিয়েছিলেন সেটা একবার বাজাতে বলুন না!'

বৌদি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কাল রাতে ও বেহালা বাজিয়েছিল, সে খবর আপনি জানলেন কি করে?'

—'সে কথা পরে হবে। এখন বাজাতে বলুন তো।'

বৌদি বলতেই, নিরু আবার বেহালা টেনে নিল। ছড়ির দু'চারটে টান দিতেই মনে হ'ল ঘরের মধ্যে ঝিন্ ঝিন্ করে কি একরকম শব্দ হ'চ্ছে। এমন সময় পরেশ হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে জানলার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো, এবং ব্যাপার কি বুঝবার আগেই জানলার কাঁচখানা আমার সামনে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। বৌদিও চমকে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাতি জেলে পরেশ বলল, 'তোমার অপরাধী কে, এবারে বুঝতে পেরেছ? দোষী হ'ল ওই বেহালাখানা।' বলে, সামনের বাড়ীর

জানলার দিকে দেখিয়ে দিল। নিরুও বোধহয় গোলমাল শুনতে পেয়েছিল। তার বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। উঠে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে বৌদিকে উদ্দেশ করে বললে, কি ব্যাপার!'

পরেশ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বৌদিকে বললে, ওঁকে বলুন, ব্যাপার কিছু নয়।'

নিরুপমা দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে জানলা থেকে সরে গেল।

এবারে বেহালাটি নাবিয়ে রেখে পরেশ বলতে সুরু করল, 'কোন একটা জিনিষকে আঘাত করলে সেটি কাঁপতে থাকে। বাটিটায় টোকা দাও, দেখবে কেমন বাজতে থাকে। বেহালা-এস্‌রাজে কখনও সুর বাঁধতে দেখেছ ? ধ্বনি-তরঙ্গের ধাক্কায় কোন বস্তু কাঁপতে থাকে, তা যদি খুব শক্তিশালী হয়, তাহলে কাঁপতে কাঁপতে বস্তুটি ফেটে চৌচির হয়েও যেতে পারে; অবশ্য যদি সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে এমন বস্তু হয়।'

তোমার জানলার ব্যাপারেও ঠিক এই কাণ্ডই হয়েছে। তুমি যখন কাঁচ ভাঙ্গার গল্প করেছিলে, তখন প্রথমে ভেবেছিলাম, এ মানুষের কাজ। কিন্তু তুমি যখন বললে, একবারও ঢিলটা খুঁজে পাওনি এবং ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ে অদ্ভুত রকম বেহালা বাজাতে পারেন, তখনই বুঝলাম, এ কাজ ওই বেহালার সুরের। আর কারুর নয়। দু'বার তুমি সামনে ছিলে এবং দু'-দু'বারেই বেহালার সুর শুনতে পেয়েছিলে। এই থেকেই আমার সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আরও একটা কারণে আমার এই ধারণা দৃঢ় হয়। ধনঞ্জয়বাবুর মেয়ে প্রায় বছর খানেক এখানে ছিলেন না এবং তোমার জানলার কাঁচও ভাঙ্গেনি। কিন্তু তিনি আসবার পরে কিছুদিনের মধ্যেই আবার পুরানো গোলমাল দেখা দিল।

আমি তবুও মরিয়া হয়ে বললাম, তবে যে দু' দু'বার ধনঞ্জয়বাবুকে জানলায় দেখেছি, সেটা কি কিছু নয়!'

পরেশ হেসে উঠল, 'ওটা কাকতালীয়। কিন্তু সেকথা যাক। এ রকম বাজনা আগে কখনও শুনিনি। বৌদি, ওঁকে আমার অভিনন্দন জানাবেন।'

এলেবেলে

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

এলেবেলে দুধ ভাত।
এক-তিন-পাঁচ-সাত
খুকু পড়ে ধারাপাত,
দাদুমণি ধরে হাত॥

এলেবেলে ডালভাত।
হি-হি হাসে, নেই দাঁত;
খোকা করে উৎপাত
সারাদিন, সারারাত॥

সাগর পাড়ি

রণমুখ

সবুজে নীলে মেশা জল সমুদ্রের। আশে পাশে যেদিকে দুচোখ যায় জল ছাড়া আর কিছু নেই। মাথার উপরে ঘোলাটে আকাশ। শোঁ শোঁ করে বইছে হাওয়া। পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ উঠছে আর পড়ছে—পড়ছে আর উঠছে। ঢেউ-এর মাথায় মাথায় নাচছে ছোট্টো একখানি নৌকো। দাঁড় হাতে দুটি লোক নৌকোর মধ্যে। কিন্তু দাঁড় তাদের বাইতে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে মোচার খোলার মতো নৌকোখানিকে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে এগিয়ে চলেছে ঢেউগুলো। একদিক থেকে আরেক দিকে।

অনেকক্ষণ বাদে হাওয়ার বেগ কমলো। থামলো ঢেউ-এর মাতন - বহুক্ষণ লোফালুফি খেলার পর পরিশ্রান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়লো তারা যেন। শান্ত জলে ভাসতে লাগলো ছোট্টো নৌকোখানি। আরো কিছুক্ষণ পরে, কি আশ্চর্য, দেখতে পাওয়া গেল আস্‌তো বড়ো একখানি জাহাজ। আসছে এই দিকেই। জাহাজ থামলো কিছু দূরে। কিন্তু নৌকো গিয়ে ভিড়লো না তার গায়ে। অবাক-হওয়া যাত্রীর দল সার দিয়ে দাঁড়ালো জাহাজের রেলিঙে।

"জাহাজে উঠে এসো। আমরা তোমাদের পৌঁছে দেবো।" ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন নৌকোর আরোহী দু'জনের উদ্দেশে, মুখে চোঙার মতো একটি যন্ত্র লাগিয়ে।

"ধন্যবাদ। কোনো দরকার নেই। আমরা বেরিয়েছি সমুদ্র যাত্রায়।" জবাব এলো নৌকো থেকে।

"কোথায় যাবে?"

"ইউরোপ।"

জাহাজের যাত্রী আর নাবিকদের অবাক চোখের সামনে দাঁড় বাইতে শুরু করলো নৌকোর লোক দুটি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার রওনা দিলো জাহাজ নিজের গন্তব্য-পথে। নৌকো বেয়ে সমুদ্র যাত্রার অসম্ভব সংকল্পের কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো যাত্রী আর নাবিকের দল। একমত হয়ে সকলে মন্তব্য করলো, নিশ্চয় পাগল। তা না হলে এমন উদ্‌ভট কল্পনা মাথায় আসবে কেন?

কিন্তু, উদ্‌ভট হলে কি হবে এই কল্পনাকে খাঁটি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলো দুটি লোক ১৮৯৬ সালে। সবাই হয়তো ভুলে গিয়েছে তাদের কথা আজকের দিনে। অথচ 'কন-টিকি' অভিযানের

বহুবছর আগে দুঃসাহসী এই লোক দুটি দুস্তর অতলান্তিক সাগর অতিক্রম করে নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্সে গিয়েছিলো একখানি নৌকো বেয়ে।

নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্রান্সের মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরের ৩২৫০ মাইল তরংগ বিক্ষুব্ধ জলরাশির ব্যবধান। নৌকো বেয়ে এই জলরাশি অতিক্রম করার পরিকল্পনা মাথায় আসে ফ্র্যাংক স্যামুয়েলসন আর জর্জ হার্বো নামে দুটি লোকের। দুজনের কারো বয়সই তিরিশের বেশি নয়। এরা নরওয়ের অধিবাসী। জন্মভূমি ছেড়ে এসে বসবাস করে আমেরিকায়। কাজ করে মুক্তো ডুবুরীর। অল্প বয়স থেকে জাহাজে চাকরি করে সামুদ্রিক অভিজ্ঞতায় পাকা হয়ে গিয়েছে।

১৮৯৪ সালের একদিন। স্যামুয়েলসন ডেকে বললো হার্বোকে, নৌকো বেয়ে কেউ যদি সমুদ্র পার হয় তাহলে বেশ দু'পয়সা সে রোজগার করতে পারবে। নৌকোটা দেখবার জন্যেই দর্শনী দেবে লোকে। কিন্তু একজনের পক্ষে একাজ অসম্ভব, দু'জন হলে চেষ্টা করে দেখা যায়। হার্বো রাজি হয়ে গেল তক্ষুণি। নিজেদের মধ্যে হিসেব করে তারা দেখলো প্রতিদিন ৫৪ মাইল করে নৌকো বাইলে ছ'মাসে পৌঁছনো যাবে নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্সে। উত্তর অতলান্তিক জাহাজ-পথ ধরে গেলে কোনোরকম বিপদ-আপদে সাহায্যও পাওয়া যাবে দেশ-বিদেশের বাণিজ্যপোতগুলির কাছে। উদ্যোগ আয়োজনে কোমর বেঁধে লেগে গেল দু'জনে।
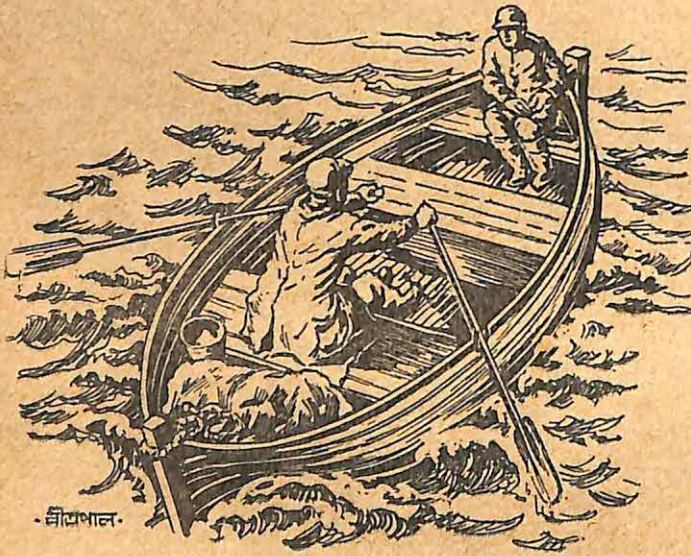
নিউ জার্সীর "পুলিস গেজেট" পত্রিকার প্রকাশক রিচার্ড ফক্স নামে এক ভদ্রলোক রাজি হলেন অর্থ সাহায্য করতে। ছ বছর লাগলো মজবুত করে নৌকোখানি গড়ে তুলতে। অবশেষে ১৮ ফুট দীর্ঘ নৌকোখানি তৈরি শেষ হোলো। নৌকোর দু'প্রান্তে পানীয় জল রাখবার জন্যে নিশ্ছিদ্র জলাধার বসানো হোলো। হালের দিকে ছোট্টো একটি ষ্টোভ লাগানো হোলো এবং তার জন্যে পাঁচ গ্যালন কেরোসিন তেল মজুত রাখা হোলো। দিক নির্ণয়ের যন্ত্র, দূরবীণ, সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠানোর আলো ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে ২৫০টি ডিম, ৫ পাউণ্ড বিস্কুট, ৯ পাউণ্ড কফি আর পর্যাপ্ত

পরিমাণ শুকনো মাংস বোঝাই করা হোলো। এগুলি রাখার জন্যে কয়েকটি জল প্রতিরোধক খুপরি নৌকোর মধ্যে করা হয়েছিলো। নৌকোর নাম দেওয়া হোলো "ফক্স"—রিচার্ড ফক্সের সম্মানে।

৬ই জুন, ১৮৯৬। হাজার দু তিন লোকের উপস্থিতিতে সমুদ্র যাত্রা শুরু করলো স্যামুয়েলসন আর হার্বো। সেদিনের আবহাওয়া ছিলো অতি মনোরম। কিন্তু, উপস্থিত জনসমাগম বিষাদে আচ্ছন্ন। নৌকো বেয়ে অতলান্তিক পাড়ি দেওয়ার সংকল্পকে সকলেই আত্মহত্যার সামিল বলে ধরে নিয়েছিলো। যাইহোক নৌকো চলতে শুরু করতেই টুপি নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানালো সবাই। ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে ঘরে ফিরলো যে যার।

"ফক্স" বন্দর ছাড়িয়ে যেই সমুদ্রে পড়লো অমনি দেখা দিলো অসুবিধা। যতো আস্তেই বাতাস দিক না কেন কেরোসিনের ষ্টোভ আর ধরানো যায় না কিছুতেই। ফলে কাঁচা ডিম আর মাংস খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হোলো। চতুর্থ দিন রাত্তিরে বিরাট এক হাঙর এসে গুঁতো লাগালো নৌকোর নিচে। সৌভাগ্যক্রমে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। তার পরের দু দিন এক মিনিটের জন্যেও তাদের সঙ্গ ছাড়েনি হাঙরটা।

এক সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কগামী কানাডীয় জাহাজ "জেসী"র সঙ্গে দেখা। জাহাজটির কাপ্তেন তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, ওরা তা নেয়নি। সে কাহিনী প্রথমেই বলেছি। পরের দিন পুব দিক থেকে এমন প্রচণ্ড হাওয়া বইতে শুরু করলো যে এগিয়ে যাওয়া দূরের কথা হাওয়ার তোড়ে পেছিয়েই এলো তারা পঁচিশ মাইল। এর দুদিন পরে "বিসমার্ক" নামে একখানি জার্মান জাহাজের দেখা পেলো তারা। স্যামুয়েলসন আর হার্বো মার্কিন জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলো তাদের নৌকোয়। প্রত্যুত্তরে জার্মান জাহাজটিতে তাদের জাতীয় পতাকা ওড়ালো।

"জাহাজডুবি হয়েছে নাকি?" জাহাজের কাপ্তেন জানতে চাইলেন তাদের কাছে।

"না। আমরা চলেছি ইউরোপে।"

"বটে, বটে। তাই নাকি?" জাহাজের কাপ্তেন হতভম্ব।

"ফক্স" যখন পুবদিকে আবার যাত্রা শুরু করলো তখন জাহাজের সমস্ত লোক হর্ষধ্বনি করে বাহবা জানালো।

১লা জুলাই একখানি মাছধরা জাহাজের সাক্ষাৎ পেলো "ফক্স"। এই জাহাজের কাপ্তেন আমন্ত্রণ জানালেন পান-ভোজনের। তিন সপ্তাহ পরে রান্না করা খাবারের আস্বাদ পেলো স্যামুয়েলসন আর হার্বো।

এতদিন সমুদ্রের অবস্থা মোটামুটি শান্ত ছিলো। ৭ই জুলাই থেকে শুরু হোলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পশ্চিমী হাওয়ার দাপটে উথালপাথাল করতে থাকে সমুদ্র। পাহাড় সমান ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধে হাঁপিয়ে ওঠে আরোহীরা। প্রতি মুহূর্তে নৌকোর খোল থেকে জল সেঁচে সেঁচে তাদের

হাত অসাড় হয়ে পড়ে, কিন্তু থামাবার উপায় নেই। এই অবস্থায় প্রচণ্ড এক ঢেউ-এর ধাক্কায় তাদের নৌকো একদিন গেল উল্‌টে। অবশ্য এই রকম দুর্ঘটনার জন্যেও তারা প্রস্তুত ছিলো। নিজেদের কোমরে লাইফ-বেল্ট বেঁধে তার সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে নৌকোতে লাগানো আংটায় দড়ির খুঁট বেঁধে রেখেছিলো। বরফ শীতল জলে বেশ খানিকটা নাকানী-চোবানী খাওয়ার পর বহু কষ্টে সিধে করলো নৌকো। কিন্তু তাদের খাবারদাবারের অধিকাংশই ভেসে গেল জলে।

দিন দুই পর আবার পরিষ্কার হোলো আকাশ—শান্ত হোলো সমুদ্র। উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভরে গেল দিকদিগন্ত। স্যামুয়েলসন আর হার্বোর কষ্ট কিন্তু শেষ হোলো না। বাতাস, রোদ্দুর আর লোনা জলের প্রতিক্রিয়ায় হাতের চামড়ার উপর ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেল। তার উপর ক্যাম্বিসের জামার ঘস্‌টানি লেগে আরো যন্ত্রণা বাড়লো। আগে যাওয়ার পথে কোনো জাহাজ দেখা দিলে তারা হাসি ঠাট্টার খোরাক পেতো। এখন যে কোনো একখানা জাহাজের দেখা পাওয়ার জন্যে তারা রীতিমতো প্রার্থনা শুরু করে দিলো। প্রায় জীবনমরণ সমস্যার ব্যাপার। কোনোরকমে কাটালো আরো কয়েকদিন।

১৭ই জুলাই একখানি জাহাজ তাদের দৃষ্টিপথে এলো। অনেক চেষ্টার পর জাহাজখানির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তারা। জাহাজখানি নরওয়ের—বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যাচ্ছিলো কানাডায়। দুঃসাহসী স্যামুয়েলসন আর হার্বো খুব খুশি হোলো দেশের লোকের দেখা পেয়ে। জাহাজের লোকেরাও অবাক তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনে। পরম আনন্দের মধ্যে পান ভোজন হোলো সেদিন সকলের! বিদায় দেওয়ার আগে "ফক্স"-এর জলাধার পরিষ্কার পানীয় জলে ভরে দিলো জাহাজের নাবিকেরা, সেই সঙ্গে শুকনো খাবারদাবারও অনেক দিয়ে দিলো। তখনো অর্ধেক পথ বাকি আছে ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছতে।

নিউইয়র্ক ছাড়ার ঠিক ৫৫ দিন পরে ডাঙা চোখে পড়লো স্যামুয়েলসন আর হার্বোর। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ। সেণ্ট মেরীর মাটিতে পা দিলো তারা ১লা আগষ্ট তারিখে। এখানে একদিন বিশ্রাম করবার পর ২৫০ মাইল দূরে ফ্রান্সের লে হেবার-এর উদ্দেশে রওনা দিলো তারা। পৌঁছলো ৭ই আগষ্ট তারিখে। হাজার হাজার লোকের আনন্দধ্বনির মাঝে তাদের সমুদ্রযাত্রা শেষ হোলো। কিন্তু তাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। অতোদিন বসে থাকার ফলে পা-এর উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো তাদের মুশকিল হোলো। সব থেকে দুঃখের আশাভঙ্গের কারণ হোলো "ফক্স"-এর প্রদর্শনী। লে হেবার, প্যারিস আর লণ্ডনে প্রদর্শনী হোলো, লোকও হোলো কিছু কিছু দেখবার জন্যে তবে দর্শনী যা পাওয়া গেল তা দিয়ে কোনো রকমে দৈনন্দিন খরচ চললো। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার আশা তাদের পূর্ণ হোলো না।

স্যামুয়েলসন আর হার্বো এরপর গেল নিজেদের জন্মভূমি নরওয়েতে। এখানে আরো হতাশ হতে হোলো তাদের। যেহেতু তারা মার্কিন জাতীয় পতাকা নিয়ে এই অভিযান চালিয়েছে সেইজন্যে

নরওয়ের সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে তাদের নিন্দা করলো। দেশবাসীর কাছে ধিক্কৃত হয়ে মন ভেঙে গেল তাদের। যাইহোক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে বছরখানেক পর আবার তারা ফিরে এলো আমেরিকায়। সঙ্গে নিয়ে এলো তাদের নৌকো "ফক্স"। কিন্তু এবারে সমুদ্র অতিক্রম করলো তারা জাহাজে চেপে। আমেরিকার নানা জায়গায় নৌকোটির প্রদর্শনী হোলো, কিন্তু উপার্জন বিশেষ কিছু হোলো না। ভাঙা স্বাস্থ্য আর ক্ষুণ্ণ মন নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেল তারা। কিছুকাল পরে জনসাধারণের মন থেকে প্রায় মুছেই গেল অতলান্তিক অতিক্রমকারী দুঃসাহসিক লোক দুটির কথা।

দশ বছর আগে নরওয়ের একটি দুঃস্থ আশ্রমে ফ্রাংক স্যামুয়েলসনের মৃত্যু হয়। জর্জ হার্বোর কি হোলো না হোলো তা আজো জানে না কেউ।

ঘুমের কথা

প্রীতীশ দাস

তোমরা অনেকে রিপভ্যান্ উইংকল্এর গল্প পড়েছ। ভদ্রলোক এক ঘুমে বিশ বছর কাবার করে দিয়েছিলেন। বুঝে দেখ, কি সাংঘাতিক ঘুম, রামায়ণের সেই কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা ত সকলেই জানো।

যাক এখন দেখা যাক ; লোক ঘুমোয় কেন ? নেথেনিয়েল ক্লিটমেন নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলেন যে "ঘুম শারীরিক দুর্বলতার ফল।" ঘুম ছাড়া শুধু মানুষ কেন জন্তু জানোয়াররাও বাঁচতে পারে না। না খেয়ে লোক ছ' সপ্তাহ বাঁচতে পারে কিন্তু না ঘুমিয়ে দশদিনও পারবে না।

ঘুম সকলের সমান হয় না। তোমরা কেউ কেউ চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। আমি কিন্তু খুব ঘুমকাতুরে। ভালো করে না ঘুমোলো সমস্ত দিনই আমার মাটি হয়ে যায়। পণ্ডিতদের মতে সাধারণতঃ পনেরো বৎসর থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক লোকের দৈনিক আট ঘণ্টা ঘুমোনো দরকার। ছোট ছেলেরা সাধারণতঃ বেশী ঘুমোয়! নীচে কত বৎসরের মানুষ কত ঘণ্টা ঘুমোয় তার তালিকা দিলুম—

বৎসর	৬	ঘুম	১১$\frac{১}{৪}$	ঘণ্টা
,,	১০	,,	১০	,,
,,	১৫	,,	৯	,,
,,	২০	,,	৮$\frac{১}{৪}$	,,
"	২৫	,,	৮	,,
,,	৬০	,,	৭	,,

কিন্তু এ তালিকা সব সময় যে ঠিক হবে তার কোনো মানে নেই। অনেক বুড়ো লোক সাত ঘণ্টার থেকে বেশি ঘুমোন। তোমাদের অনেকের আবার বেশি রাত করে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে। কারুর আবার আটটা বাজতে না বাজতেই ঘুম এসে যায়। তাড়াতাড়ি বা দেরী করে ঘুমোনো শরীরের তাপের উপর নির্ভর করে। আমাদের শরীরের তাপ চব্বিশ ঘণ্টা উঠানামা করছে। তাপ বাড়লে ঘুম জেগে থাকে কিন্তু কমে গেলে আবার ঘুম এসে তাড়া করে। পরীক্ষার আগে অনেককে বলতে শুনি ঘুমকে নিয়ে আর পারা যায় না ছাই। খেয়েদেয়ে বই নিয়ে বসলুম অমনি ঘুম, ভাবি সকালে উঠে পড়বো তাও উঠতে উঠতে আটটা। ঘুম তাড়ানোর জন্যে কেউ কেউ নাকে নস্যি গুঁজে দেয়। কেউ কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দেয়। এতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু যারা বেশি কফি বা চা খায় তাদের কিন্তু কোন ফল হবে না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে রাত আটটার সময় কফি খেলে রাত তিনটে পর্য্যন্ত ভালোভাবে জাগা যায়।

তোমাদের হয়তো ঘুমের জ্বালায় পড়াশুনো হয় না অনেক বয়স্ক লোকের কিন্তু উল্টো। তাঁদের রাতের বেলায় ঘুমই আসেনা, তাই অনেকে নানারকম ঔষধপত্তর ব্যবহার করেন। এতে ঘুম আসে বটে কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়। সে জন্যে বলে রাখছি তোমাদের যদি কারুর রাতে ঘুম আসে পিলটিল খেতে যেও না কিন্তু বিপদে পড়বে।

ঘুমোলেও কি আর শান্তি আছে। নানা ধরণের স্বপ্ন দলে দলে আসতে থাকে, এতেও ঘুমের ব্যাঘাত হয়, অনেকের আবার ঘুমের ঘোরে চেঁচানোর অভ্যেস আছে। পাশে যে লোক ঘুমোলো সে বেচারার ত দফারফা। তখন বুদ্ধি করে কম্বলের কোণ ধরে ধীরে ধীরে টান দিলে আপনিতেই চেঁচানো বন্ধ হয়ে যাবে। আচমকা ধাক্কা দিওনা কিন্তু। নানারকম বিপদ ঘটে যেতে পারে।

কারুর আবার ঘুমোলে বিচিত্র স্বরে নাক ডাকে, অনেকের নাক ডাকার শব্দ বাঘের ডাককেও হার মানায়, আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক ছিলেন তার নাক ডাকার শব্দকে চোর নাকি বন্দুকের শব্দ ভেবে পালিয়েছিল। নাক ডাকা গভীর ঘুমের লক্ষণ, এটাকে পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করা যায় না। আজকাল অপারেশেন করে নাক ডাকা বন্ধ করার চেষ্টা চলছে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করার উপায় বের হয়নি।

এতক্ষণ ঘুমের কথা বলতে বলতে আমারই ঘুম পেয়ে গেল। জানই ত আমি ঘুম-কাতুরে, ঘুম পেলে কিছুতেই সামলাতে পারি না। তাই বিদায় নিচ্ছি।

দেবু

ভাস্কর

আমি ভাত খাব।

না, বাবা, আজকের দিনটা একটু কষ্ট করে থাক।

না, আমি ভাত খাব।

এই দশ দিন পরে জ্বরটা কেবল ছাড়ল। একটা দিন না দেখে ভাত খেতে নেই।

তাহলে কি খাব?

আজও দুধসাবুই খাও।

না, আমি শুধু সাবু খাব না।

আচ্ছা, একটা কমলালেবুও খেও।

আর কি দেবে?

আর? আচ্ছা একটা আপেল খেও।

ঠিক দেবে তো, আপেল আর লেবু?

ঠিক না তো কি, অমনি বলছি?

আচ্ছা, তাহলে আমি আজ দুধসাবু খেয়েই থাকব।

কথা হইতেছে মাতা-পুত্রে।

হরিশ কলিকাতায় চাকরি করিত। প্রায় বৎসরখানেক হইল সে এমন এক জায়গায় বদলি হইয়াছে, যেখানে ভাল ইস্কুল নাই। তাই সে তাহার স্ত্রী মলিনা, দশ বছরের পুত্র দেবেশ এবং সাত বছরের কন্যা মীরাকে কলিকাতার বাসাতেই রাখিয়া গিয়াছে। একটি ছোট দোতলা বাড়ীর একতলায় তাহারা থাকে। মাসে মাসে হরিশ যে টাকা পাঠায়, তাহা দিয়া অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করে। ছেলে ও মেয়ে পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে আহারাদি পায় না। অসুখ বিসুখে ভাল চিকিৎসা হয় না। কয়জনেরই বা হয়?

দেবু পড়াশুনায় ভাল হইয়াছে। সে-ই বাজার করে রোজ ছোট একটি চটের থলে হাতে করিয়া। মলিনা যেমনটি বলিয়া দেন, যাহা যাহা কিনিতে বলেন, বুঝিয়াসুঝিয়া কিনিয়া আনে দেবু, কখনও বাজে খরচ করে না। মা যে ফর্দ করিয়া দেন, যে দাম ঠিক করিয়া দেন, তাহারই মধ্যে সে বাজার করিয়া আনে।

দেবু যখন জ্বরে পড়িল, মলিনা বিপদে পড়িলেন। একদিকে রোগীর চিকিৎসার ভাবনা,

আর একদিকে বাহিরের কাজকর্মের জন্য লোকের অভাব। যত অল্পই হউক, কিছু কিছু দৈনিক বাজার না করিলে কোন গৃহস্থেরই চলে না। কয়েকদিন দোতলার গৃহিণীকে বলিয়াকহিয়া কিছু কিছু জিনিষ আনাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যহ এরূপ সাহায্য লওয়া যায় না। তাছাড়া, দোতলার উহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। প্রত্যহ নিজের দৈন্যের প্রমাণ পরের কাছে দিতে বড়ই বাধে। দারিদ্র্য একটা ভয়ানক লজ্জাকর ব্যাপার। ইহাতে আহার-বিহার-পরিচ্ছদের অভাবে যে বিবিধ শারীরিক কষ্ট হয়, অন্যের কাছে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশে তদপেক্ষা সহস্রগুণ লজ্জা ও কষ্ট হয়। সেইজন্যই দরিদ্রেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বা ধনীর সাদর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হয়, গৃহিণীরা হাতের চুড়ি বন্ধক দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনের উপহার পাঠাইতে বাধ্য হন। এই লজ্জার জন্যই এক একটি পরিবার রোগে ও অনাহারে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তথাপি কাহারও কাছে ভিক্ষার হাত পাতিতে পারে না।

দেবু জ্বরে পড়িবার কয়েকদিন পর হইতে মলিনা নিজেই একটি থলে হাতে করিয়া সন্ধ্যার সময় কিছু কিছু বাজার করিয়া আনিয়াছেন। দেবুর ইহা ভাল লাগে নাই। সে বার বার বলিয়াছে, মা, তুমি বাজারে যেও না। মা বলিয়াছেন, তুমি সেরে ওঠ, তাহলে আর আমাকে যেতে হবে না।

মূল্যবান ঔষধ ব্যবহার ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাড়ার একজন নূতন চিকিৎসককে বলিয়া কহিয়া যথাসম্ভব অল্প ব্যয়েই চিকিৎসা হইয়াছে। খরচ কম হইলেও একেবারে বিনা খরচে চিকিৎসা হয় নাই। তথাপি এতদিনের চেষ্টার পর যে জ্বর সত্য সত্যই ছাড়িয়াছে, ইহাই সান্ত্বনা। বাঁকিয়া বসিলে এই জ্বরই আরো কত কষ্ট দিত কে জানে!

দেবু ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় ঘুর ঘুর করিতেছে। মলিনা মানা করিতেছেন, তবু শোনে না। কেবলই বলে, আমার অসুখ সেরে গেছে। আমি ভাত খাব।

বলিয়া কহিয়া এবং আপেল ও কমলালেবুর প্রতিশ্রুতি দিয়া মলিনা তাহাকে শান্ত করিয়াছে। একটু বেলা হইতেই মলিনা ভাবিয়াচিন্তিয়া কিছু পয়সা লইয়া একটি থলি হাতে করিয়া বাজারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে দেবু আসিয়া বলিল, তুমি আর বাজারে যেতে পারবে না।

মলিনা বলিলেন, কে যাবে তবে?

কেন, আমি যাব।

তা কি হয়? ওই দুর্ব্বল শরীরে আজই এত হাঁটাহাঁটি করলে জ্বর বেড়ে যাবে যে!

না। আমার আর কিছু হবে না। আমার অসুখ সেরে গেছে।

কি পাগল! তুমি চুপ করে শোও গে তো। আমি এখুনি আসছি।

মা!

কি?

তুমি এখন যেও না। আমি যাচ্ছি। দেখো, আমার কিচ্ছু হবে না।

এই কথা বলিয়া সে মায়ের হাত হইতে থলিটি লইয়া বলিল, দাও পয়সা। কি কি আনতে হবে বলে দাও।

মলিনা অগত্যা সম্মত হইলেন। মাছ তরকারী সম্বন্ধে মোটামুটি বলিয়া দিলেন। একটি কমলালেবু ও একটি আপেলের দামও দিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, বেশি জিনিষ কিছু কিনো না যেন, তাহলে পয়সায় কুলোবে না।

একথা দেবু বরাবরই শুনিয়া আসিয়াছে। নূতন কথা নয়। সেও এই বয়সে বেশ হিসাবী হইয়া উঠিয়াছে। থলে ও পয়সা লইয়া দেবু বাজারে চলিল। বাজার কাছেই।

কিছুক্ষণ পরেই দেবু ফিরিয়া আসিল। থলিয়াটা এবং মাছের পুঁটুলিটা বারান্দায় নামাইয়া রাখিল। মলিনা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। বলিলেন, চুপ করে খানিকক্ষণ শুয়ে থাক। এই চাদরটা গায়ে দাও। এখন আর নড়াচড়া করো না কিন্তু। আমি যাচ্ছি, আপেলটা কেটে নিয়ে আসছি। তারপরে দুধসাবু করে দেব।

মা!

কি?

লেবু আর আপেল আনা হয় নি।

কেন?

আজ জিনিষপত্রের ভীষণ দাম। আমি অসুখের আগে যে দাম দেখেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি! পয়সা সব ফুরিয়ে গেল।

আজ মাছ না আনলেই হ'ত। তুমি তো খাবেই না। আমি আর মীরা না হয় নিরামিষই খেতুম। এই রোগা শরীর নিয়ে নিজে গেলি বাজারে, আর নিজের জিনিষটাই কেনা হ'ল না ?

বোনটি যে মাছ না হ'লে খেতেই পারে না। তুমিও তো পার না।

না, তোমায় বলেছি, আমি মাছ **না** হ'লে খেতে পারি নে।

বলবে কেন ? আমি জানিনে বুঝি। লেবু আর আপেল না খেলে আমার কিছু হবে না। আমি কি রোজ ওসব খাই ?

মলিনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেই তিনি তাহা সংবরণ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং বাক্স হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া লইয়া দোতলার সিঁড়ির নিচে পা বাড়াইলেন।

সবাই শিশুসাথী ভালোবাসে। ফটো ঃ মণ্টু বাগ্‌চী

শ্রীখেলোয়াড়

সন্ন্যাসীর মন্ত্র

যত খুশি খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলাটি খেলা চলবে।

খেলা সুরু করবার আগে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন 'সন্ন্যাসী' ঠিক করে নেবে। সন্ন্যাসী ছাড়া বাকী সব খেলোয়াড়েরা সমান সংখ্যায় দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দলের একজন করে 'নেতা' থাকবে। মাঠের দুদিকে দু দলের খেলোয়াড়েরা বসে থাকবে এবং দু দলের মাঝামাঝি কোন জায়গায় যে সন্ন্যাসী হবে সে বসে থাকবে।

খেলা সুরু হলে যে কোন দল থেকে একজন খেলোয়াড় সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সন্ন্যাসীর কানে কানে বিপক্ষ দলের যে কোন একজন খেলোয়াড়ের নাম বলে আসবে। প্রথম দলের খেলোয়াড়টি তার ঘরে ফিরে গেলে দ্বিতীয় দলের একজন খেলোয়াড় ঠিক একই ভাবে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে

সন্ন্যাসীর কানে কানে বিপক্ষ দলের যে কোন একজন খেলোয়াড়ের নাম বলে আসবে। এই ভাবে এ দল থেকে একজন এবং অন্যদল থেকে একজন পর পর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম বলে যাবে। যদি কোন দলের কোন খেলোয়াড় বিপক্ষদলের যে খেলোয়াড়ের নাম বলে এসেছে সেই খেলোয়াড় সেই বারে যদি সন্ন্যাসীর কাছে নাম বলতে আসে তাহলে সে 'মর' হয়ে যাবে এবং সন্ন্যাসীর কাছে চুপ করে বসে থাকবে অর্থাৎ মনে কর প্রথম দল থেকে একজন খেলোয়াড় এসে সন্ন্যাসীর কানে কানে 'পুষ্পল' নামে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়ের নাম বলে গেলো। ঐ খেলোয়াড় সন্ন্যাসীর কাছে পুষ্পল নামটি বলে ঘরে ফিরে যাবার পর বিপক্ষ দল থেকে 'পুষ্পল' নামের খেলোয়াড়টি

যদি সন্ন্যাসীর কাছে নাম বলতে আসে তাহলে 'পুষ্পল' নামে খেলোয়াড়টি 'মর' হয়ে যাবে এবং সন্ন্যাসীর কাছে চুপ করে বসে থাকবে। এইভাবে যে কোন এক দলের সকল খেলোয়াড়েরা 'মর' হয়ে গেলে বিপক্ষ দল জয়ী হবে। কোন্ দল থেকে কোন্ খেলোয়াড় কোন্‌বারে নাম বলতে যাবে সেটা সে দলের নেতা প্রত্যেকবার ঠিক করে দেবে।

ফিলিপাইন দ্বীপের ছেলেমেয়েদের কাছে এই খেলাটি অত্যন্ত প্রিয়। 'বুলন্স পেয়ার' নামে এ খেলাটি তারা খেলে থাকে। আমাদের দেশেও বহুদিন থেকেই এ খেলাটির প্রচলন আছে।

তেপান্তর

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গাছপালা মাথা নাড়ে,
বাতাসেরা দুর্বার
দৌড়ায়,
মরাপাতা ঝরে যায়,
চারিধার
নিঃঝুম,
বুড়ো চিল অশথের
ডালটায়
বসে বসে কাঁদে শুধু:
চিল্…চিল্…চিল্‌লী!
জনহীন মাঠ ধূ ধূ—
বোম্বাই দিল্লী
বহুদূরে ফেলে চলি
মোরা সাথী চারজন:
তুই, আমি, নিধু আর
ও-পাড়ার হারাধন।
এ-চলার শেষ নেই,
পথে নির্দেশ নেই,
সূর্যের রাঙা চোখে
আগুনের বন্যা:
তেষ্টায় বুক ফাটে,
শুকনো দীঘির ঘাটে
নেই কোনও রাজপুরী
নেই রাজকন্যা!
হুৎ-হুৎ-হুৎ-তুম্…
হাঁউ-মাউ-হাল্-লুম্…
কারা ডাকে ওই দূরে?
কিছু দেখা যায় না।
এ-আবার কোন্ দেশী
দত্যির বায়না?
বড় ভয় লাগে ভাই,
পালাবার পথ চাই—
ঘন মিশকালো মেয়ে
ঢেকে গেছে বিশ্ব:
শোঁ শোঁ রবে বাঘ ছোটে,
ছোটে হাওয়া-হায়না…
উহু দিদি, খাট থেকে
পড়ে গেছি…আয় না!

বাঁদর আর কাঁকড়া

(জাপানী রূপকথা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক বাঁদর আর এক কাঁকড়া। কাঁকড়া গাঁয়ের এক গেরস্ত-বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছে বড় একখানা পিঠে,—বাঁদর চুরি করে এনেছে একটা ফলের আঁঠি। চুরি করে দুজনেই এসেছে গাঁয়ের পাশে এক পাহাড়ে। এখানে দুজনে দেখা।

বাঁদর দেখে, সর্ব্বনাশ,—সে তো ফল আনেনি; এনেছে ফলের আঁঠি। কাঁকড়া এনেছে পিঠে। পিঠে দেখে বাঁদরের জিভ লকলকিয়ে উঠলো!

বাঁদর বললে কাঁকড়াকে—এসো, দুজনের জিনিষ বদল করি—তাহলে চুরির দোষ কেটে যাবে—খাবার হজম হবে!

কাঁকড়া বললো,—বেশ!

বদলানো হলো! বাঁদর পিঠে নিয়ে মনের আনন্দে খেতে লাগলো—আর কাঁকড়া চুষতে লাগলো ফলের আঁঠি! আঁঠিতে জুৎ পাবে কেন? কাঁকড়া বুঝলো, বাঁদর তাকে ঠকিয়েছে! কাঁকড়া মাটী খুঁড়ে মাটীতে পুঁতে দিলো আঁঠিটা।

পুঁততে না পুঁততেই সেখানে গজিয়ে উঠলো এক ঝাঁকড়া গাছ—আর সে গাছের ডালে-ডালে থোলো-থোলো পাকা ফল।

কাঁকড়া গাছে উঠতে পারে না—কি করে ফল পাড়ে? সে বাঁদরকে বললে—তুমি তো গাছে উঠতে পারো—ওঠো, ফল খাও যত খুশী—আর আমাকেও গোটা কতক ফল পেড়ে দাও।

বাঁদর বললে—তা বেশ, আমি এখনি গাছে উঠে পাকা ফল পেড়ে দিচ্ছি!

বাঁদর উঠলো গাছে—উঠে পাকা পাকা ফল নিজে খাচ্ছে, আর খেয়ে আঁঠিগুলো ফেলে দিচ্ছে নীচে, বলছে—খাও ভাই।

বাঁদর কথা বলছে আর আঁঠি ফেলছে নীচে। একটা আঁঠি পড়লো কাঁকড়ার দাড়ায়। তার দাড়া গেলো ভেঙ্গে। একটা আঁঠি পড়লো পিঠে। পিঠের খোলার খানিকটা গেল ফেটে। ভয়ে কাঁকড়া গিয়ে একটা গর্তে ঢুকলো প্রাণ বাঁচাতে! আর বাঁদর ওদিকে পেট ভরে ফল খেতে লাগলো।

গর্তে ঢুকে কাঁকড়া রাগে ফুলছে, আর ভাবছে—এত বড় বদমায়েস। এমন বেইমান!—ওকে শায়েস্তা করতে হবে। দেখবো, ও কতবড় বাঁদর!

কাঁকড়া গিয়ে তার দলের কাঁকড়াদের এ খবর জানালো। শুনে কাঁকড়ারা দাড়া উঁচিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো—এখনি ওকে মজা দেখাবো—চলো সকলে।

দলে দলে কাঁকড়া এসে জমলো বাঁদরের বাসার কাছে। বাঁদরও দলে জানালো খবর। খবর পেয়ে বাঁদররা এসে সেখানে জড়ো হ'লো। তখন লেগে গেল দু'দলে যুদ্ধ!

কিন্তু কাঁকড়ারা পারবে কেন বাঁদরদের সঙ্গে! বাঁদররা আছে গাছে। কাছে পেলে তবে তো কাঁকড়ারা দেবে দাড়ার চিমটী। ওদিকে গাছ থেকে বাঁদররা ইটপাটকেল ছুঁড়চে, গাছের ডাল ভেঙ্গে

ছুঁড়ছে। কাঁকড়াদের কারো দাড়া ভাঙ্গছে, কারো মাথা ফেটে যাচ্ছে। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে কাঁকড়ারা পালিয়ে গর্ত্তে গিয়ে ঢুকলো!

গর্ত্তে ঢুকলেও তাদের রাগ গেল না! বসে বসে পরামর্শ চললো—এখন থেকে বাঁদরদের নাগালে পেলে আর ছাড়া নয়। এয়সা দাড়ার চিমটী দেবে যে প্রাণ না নিয়ে ছাড়বে না।

এর পরে কোথায় কোন্ বাঁদর ডালে বসে ল্যাজ ঝুলিয়ে গাছের ফল খাচ্ছে, কাঁকড়া চুপি চুপি এসে তার ল্যাজে দেয় কামড়। কোথায় কোন্ নদীর ধারে বাঁদর ওৎ পেতে বসে আছে মাছ ধরে খাবে—গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে দাড়া উচিয়ে এসে কাঁকড়া দিলে তাকে মরণ কামড়।

এমন করে বাঁচা যায় না। বাঁদররা তখন সভা বসালো। সভায় ঠিক হলো,—আপোষ করা দরকার।

কাঁকড়াদের জানানো হলো—আর ঝগড়াঝাঁটি নয়।

কাঁকড়ারা বললে—রাজী—তবে বাঁদরদের সর্দ্দার আসুক কথা কইতে।

বাঁদররা এতে রাজী হলো।

কাঁকড়ারা এর মধ্যে করলো কি, একটা লোহার ডাঁট, একটা বোলতা আর একটা ডিম এনে রেখেছে তাদের গর্ত্তে। এখানেই আসবে বাঁদরদের সর্দ্দার।

গর্ত্তের ভিতর ভয়ানক ঠাণ্ডা। গর্ত্তের মধ্যে কাঁকড়াদের সর্দ্দার রেখেছে একটা নিবন্ত উনুন। উনুনের পাশে ছাইগাদায় আছে ডিমটা।

বাঁদরদের সর্দ্দার এসে সেই নিবন্ত উনুনে দিয়েছে আগুন।

উনুনের মধ্যে ছিল ডিম। ব্যস্, গরম লেগে ডিম ফেটে সর্দ্দারের কপালে গরম-ডিমের চোটানি লেগে এত বড় ফোস্কা! একধারে ছিল বালতি ভরা জল। কপালে পিঠে লাগাবে বলে সর্দ্দার যেমন জলে হাত ডুবিয়েছে, অমনি বালতির গায়ে বসেছিল বোলতা, উড়ে এসে দিলো সর্দ্দারের নাকে হুল ফুটিয়ে। নাকের জ্বালায় সর্দ্দার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সাথে সাথে লোহার ডাঁট পড়লো সর্দ্দারের পিঠে, সর্দ্দার উঠতে পারে না। কাঁকড়ারা তখন দলে দলে এসে সর্দ্দারের গায়ে দাড়ার চিমটী!

জ্বালার চোটে সর্দ্দার হাত জোড় করে বললে—মাপ করো ভাই।

কাঁকড়ারা বললে — সেই বেইমান বাঁদরটাকে হাজির করে দাও।

সর্দ্দার বললে—তাকে পেলে আপোষ করবে তো!

কাঁকড়ারা বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়। লিখে দাও পরোয়ানা। যতক্ষণ সে না আসছে তোমাকে এখানে আটক থাকতে হবে।

সর্দ্দার দিলে পরোয়ানা লিখে সই করে—তার জোরে সেই বাঁদরকে আনা হলো। সে এলে তার মাথায় লোহার ডাট দিয়ে মারলো জোরে ঘা। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু!

তখন আপোষ হলো,—বাঁদররা আর কখনো লাগবে না কাঁকড়াদের সঙ্গে। সর্দ্দার খালাস পেয়ে চলে গেল।

কৃত্রিম রঙ তৈরীর কথা

অরুণ মুখোপাধ্যায়

আগে একবার রঙ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেবল প্রকৃতিজাত মৌলিক রঙএর কথাই তোমাদের জানিয়েছি। অর্থাৎ সেবারে রঙ তৈরীর কথায় মূলে কেবল ছিল প্রকৃতির কাছ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া বিভিন্ন উপাদান এর কথা।

আজ তোমাদের বলবো, বিজ্ঞান কি ভাবে ধীরে ধীরে এই রঙ তৈরীর ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। যদিও রঙ তৈরীর ব্যাপারে প্রাকৃতিক উপাদান অপরিহার্য্য, তবে আজকের দিনে প্রকৃতিজাত মৌলিক রঙ-এর ব্যবহার এক রকম নেই বললেই চলে, চাহিদার প্রায় সবটুকুই মেটানো হয় কৃত্রিম রঙ দিয়ে। এই রঙ প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া রঙ-এর চেয়ে ভালো। এর বৈচিত্র্য এবং উৎপাদন সম্ভব হয় মৌলিক রঙ-এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে। উনিশশো শতকের মাঝামাঝি অবধি এই প্রকৃতিজাত মৌলিক রঙ-এর শিল্প টিকেছিল। তারপর বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাওয়া গেল ১৮৫৬ সালে। এর বহু আগেও অবশ্য পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম রঙ গবেষণাগারে তৈরী করেছিলেন উল্ফ নামে এক বৈজ্ঞানিক। ১৭৭১ সালে নীল রঙ থেকে 'পিক্‌রিক্ অ্যাসিড' নামে এক রঞ্জক তৈরী করেছিলেন তিনি। তারপর ১৮৩৪ সালে রুঙ্গে 'আউরিন' তৈরী করেছিলেন গবেষণাগারে। কিন্তু সেগুলি তৈরী করার খরচ খুব বেশি পড়ত তখন, তাই সেগুলো জনপ্রিয় বড় একটা হয়ও নি। তবে গবেষণা চলেছিল, এবং সেই গবেষণার সর্ব্বপ্রথম সার্থক রূপ দিয়েছিলেন উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন। সেটাই ছিল ১৮৫৬ সাল।

পার্কিনই সর্ব্বপ্রথম মভ নামে এক কৃত্রিম রঙ বাজারে চালু করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই সুরু হ'ল বৈজ্ঞানিকদের অদম্য প্রচেষ্টা, আর নতুন নতুন আবিষ্কার। একে একে রঞ্জক শিল্পের ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলে প্রকৃতিজাত মৌলিক রঙকে হটিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগারে তৈরী কৃত্রিম রঙ পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে দিতে লাগলো। সেই বছরেই ন্যাটান্‌সন নামে অপর এক গবেষক বিখ্যাত 'ম্যাজেণ্টা' রঙ তৈরী করলেন। তারপরেই জিরার্ড ডি লেয়ার আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম নীল রঙ 'রোজানিলিন ব্লু' (১৮৬০)। তার পরের বছর লথ 'মিথাইল ভায়লেট' নামে বেগুনি রঙ বার করলেন, লাইটফুট তুলোর আঁশ থেকে করলেন 'অ্যানিলিন ব্ল্যাক' নামে কালো রঙ (১৮৬২); ও চেরপিন করলেন 'অ্যাল্‌ডিহাইড গ্রীন' নামে কৃত্রিম সবুজ রঙ (১৮৬২)। তার পরেই একে একে মার্টিয়াস বার করলেন মার্টিয়াস ইয়োলো নামে হলুদে রঙ (১৮৬৪) ও 'বিসমার্ক ব্রাউন' নামে বাদামী রঙ (১৮৬৩)। তারপর ১৮৬৭ সালে হফম্যান নামে খ্যাতনামা জার্মান বৈজ্ঞানিক বাজারে চালু করলেন 'হাফম্যান ভায়লেট' নামে কৃত্রিম বেগুনি রঙ। তার পরের বছরেই ক্লাভেল বার করলেন 'ম্যাগডোলা রেড'

নামে টকটকে লাল রঙ (১৬৬৮) ও 'প্যালেটিন অরেঞ্জ' নামে কমলা রঙ (১৮৬৯)। তার আগে ১৮৬৬ সালে কিসার 'আয়ডিন গ্রীন' নামে সবুজ রঙ বার করেছিলেন।

এরপর রঞ্জকশিল্পের মোড় ঘুরে গেলো। রঙ তৈরীর বিভিন্ন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'ল। নতুনভাবে উইসচীন বার করলেন 'মিথাইল গ্রীন' (১৮৭৩), নীয়েট্‌স্‌কি করলেন 'বেব্রিস্ স্কার্লেট' (১৮৭৯) ও ক্যারো করলেন 'ন্যাপথল ইয়োলো' (১৮৭৯)।

এরপর আঠারশো তিরাশি সালে বিষাক্ত পদার্থ ফরম্যাল্‌ডিহাইড থেকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রঙ তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'ল। ১৯০৯ সালে বেরুলো 'হাইড্রেন ব্লু' নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাকা নীল রঙ।

এমনি আর কত নাম করি! এই কৃত্রিম রঞ্জকের জন্মের পর এখনো একশো বছরও পার হয়নি, অথচ হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকের অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ এই শিল্প যে কী অদ্ভুতভাবে উন্নতি করেছে, তা আমরা ভাবতেও পারি না। তোমরা হয়তো অনেকেই শুনেছো একদা আমাদের বাঙলাদেশে বিলিতি সাহেবরা উর্ব্বর জমি থেকে ধানের চাষ উঠিয়ে একদিন কিভাবে নীলের চাষ করে গেছে। তখনো কিন্তু কৃত্রিম রঙ-এর জন্ম হয় নি। সে রঙ ছিল গাছের শেকড় গরম জলে ফুটিয়ে তার কাথ থেকে তৈরী করা মৌলিক রঙ। ঐ ধরণের কৃত্রিম রঙ তৈরী করার জন্যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা চলেছিল বছরের পর বছর! তারপর ১৮৯৭ সালে ভন্ বেয়ার নামক এক গবেষকের সাত বছর ক্রমাগত ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে ও দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিনকোটী টাকা খরচের পর এই রঙ গবেষণাগারে প্রথম তৈরী হ'ল। ভেবে দেখো, একটা আবিষ্কারের পেছনে কতো শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়।

রঙ বা রঞ্জকের উন্নতির বিষয়ে বলতে গিয়ে একটা কথা তোমাদের না জানিয়ে পারছি না। সেটি হ'ল আল্‌কাতরার কথা। এই আল্‌কাতরার বিষয়ে পরে তোমাদের বিস্তৃতভাবে বলবার ইচ্ছে আছে। এখন এটুকুই কেবল জেনে রাখো যে, কৃত্রিম রঞ্জক তৈরী করার প্রথম ও প্রধান উপাদান হ'ল এই আল্‌কাতরা। শুন্‌লে তোমাদের অবাক লাগবে যে, ঐ বিদ্‌ঘুটে কালো রঙ থেকেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় লাল, নীল, সবুজ, হলদে, এমনি সব নানা রকমের রঙ তৈরী হয়। প্রক্রিয়ার ভেতরে আর যা কিছুই থাকুক না কেন, আসল ব্যাপারটা কি জানো? সাধারণ জলকে ফোটালে যেমনি বাষ্প বেরোয়, আল্‌কাতরাকে ফোটালেও তেমনি বাষ্প বেরোয়। কিন্তু সেই বাষ্পকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঠাণ্ডা করলেই বেরোয় নানারকমের ধবধবে সাদা পদার্থ—বেন্‌জিন, টলুইন, ন্যাপথালিন, অ্যান্‌থ্র্যাসিন ইত্যাদি তাদের নাম। পার্কিন সাহেব যে সর্ব্বপ্রথম রঞ্জক আবিষ্কার করেছিলেন —তা এদের মধ্যে থেকেই। অতএব রঙ তৈরীর কথা জানবার ও জানাবার মূলে রয়েছে ঐ কালো বিশ্রী আল্‌কাতরার অবদান। নয় কি?

কৃত্রিম রঞ্জকের শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ নির্ভর করে বিভিন্ন পদার্থের ওপর তার স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে। অর্থাৎ সাধারণতঃ দু রকমের পদার্থের ওপরে রঙ করা হয়, যেমন—

(১) পশু জাতীয়—অর্থাৎ পশম, রেশম, পশুলোম, চুল ও পশুর চামড়া জাতীয়।

(২) বন জাতীয়—অর্থাৎ তুলো, লিনেন, কাষ্ঠ-মণ্ড বা কাগজ, পাট বা কৃত্রিম রেশম জাতীয়।

আশ্চর্য্যের কথা, কোন একটি রঙ রেশম জাতীয় কাপড়ে যেমনি পাশাপাশিভাবে লাগে, পশমে বা তুলোর স্থতোয় হয়তো তেমনিভাবে বসেই না। এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করে রঞ্জককে সাধারণতঃ আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে! যেমন—

১। অ্যাসিড ডাই ২। বেসিক ডাই ৩। ডিরেক্ট কটন্ ডাই ৪। মরুড্যাণ্ট ডাই
৫। ভ্যাট্ ডাই ৬। ইন্‌গ্রেন ডাই ৭। সালফার ডাই ৮। পিগমেণ্ট।

যে সব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে রঙকে পাকা করা হয়, তাদের ইংরেজী সাধারণ নাম হ'ল 'মর্‌ড্যাণ্ট।' বিভিন্ন জাতীয় রঙ-এর জন্যে নানা রকমের মরড্যাণ্ট ব্যবহৃত হয়। এর ফলে একই রঙ থেকে নানা রকমের আভা বেরোয়। তা ছাড়া তুলো পশম বা রেশম জাতীয় সব রকম কাপড়েই মরডাণ্ট-এর সাহায্যে রঙ করলে রঙ পাকা হয় ও তার ঔজ্জ্বল্য অনেকদিন থাকে। মোটকথা রঙ-এর উৎকর্ষ বাড়িয়ে দেয় ঐ মরড্যাণ্ট। 'মরড্যাণ্ট'—এই শক্ত কথাটা মোটেই ভালো লাগছে না বোধ হয় তোমাদের। এবারে বলি, আসলে কাদের এই নাম। যেমন, সবচেয়ে সস্তা ও সাধারণ মরডাণ্ট হ'ল লবণ ও ফটকিরি। হিরাকস্ এবং রাং জাতীয় পদার্থও উৎকৃষ্ট মরডাণ্ট হিসেবে কোনো কোনো পদার্থে কাজে লাগে। শেষের দুটি মরডাণ্টের কথা না শুনলেও প্রথম দুটির ব্যবহার কাপড় রঙীন করার ব্যাপারে কাজে লাগে। সরস্বতী পুজোর আগে যখন বাড়ির বড়রা বাসন্তী রঙ-এ তোমাদের জামা কাপড় ছোপানোর জন্যে শিউলি ফুলের বোঁটা কিংবা রঞ্জক সাবান জলে দিয়ে ফোটান—তোমরা সকলেই নিশ্চয় সে সময়ে গরম জলে নুন দিতে দেখেছো। এখন বুঝলে বোধ হয়—ঐ নুন তখন রঞ্জকের মরডাণ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তোমাদের জামা কাপড়ের রঙ পাকা করে।

মোট কথা, রঞ্জকের উৎকর্ষ বা ভালমন্দ নির্ভর করে তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর। যেমন,

(১) বর্ণের ঔজ্জ্বল্য—অর্থাৎ স্থতি শিল্প বা পশমে কিংবা কাগজে বা চামড়ায় রঙ বহুদিন অবধি উজ্জ্বল হয়ে লেগে থাকার ওপরেই তার উৎকর্ষ।

(২) জলে দ্রাবতা—অর্থাৎ জলে বা তরল পদার্থে যে রঙ গোলে না—তা বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না। আর,

(৩) রঙ-এর স্থায়িত্ব—অর্থাৎ ভালো রঞ্জক তাকেই বলা হবে, যে রঞ্জক দিয়ে রঙ করলে রঙ থাকে স্থায়ী ভাবে। আর, রঞ্জকের এই তিনটি গুণই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী খাঁটি কৃত্রিম রঙ-এর মধ্যে বর্ত্তমান।

এমনি করে হাজার হাজার বিজ্ঞান-কর্ম্মীর বছরের পর বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ কৃত্রিম রঞ্জকশিল্প অভাবনীয় উন্নতি করতে পেরেছে। তবু আজও গবেষকদের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। ভবিষ্যতেও এই শিল্পের আরো উন্নতি মনের মণিকোঠায় আশার আলো ফুটিয়ে তোলে।

তথাগতের করুণা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

—এক—

মহামারী।

বৈশালী নগরে ভীষণ মহামারী! মহাকালের চলিয়াছে তাণ্ডবলীলা। ঘরে ঘরে হাহাকার। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা, যত্ন ব্যর্থ করিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসী প্রতিদিন প্রাণ দিতেছে। দিবারাত্র পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের করুণ ক্রন্দন নগরের আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কে দিবে কাকে সান্ত্বনা! এমন নগরবাসী নাই, যার ঘরে মৃত্যুর তুহিন-শীতল স্পর্শ পড়ে নাই।

মৃত্যুর করাল কবল হইতে অধিবাসীদের রক্ষার কোন উপায় নাই! কেন এই নগরের উপর বিধাতার এমন দারুণ অভিশাপ পড়িল কে বলিতে পারে!

সাধু সন্ন্যাসী যাহাকে দেখে নগরের অধিবাসীরা, তাহাদের পায়েই লুটাইয়া পড়ে, বলে করুণ কণ্ঠে—আমাদের বাঁচান, নগরের প্রতি যে রোষ ও অভিশাপ পড়িয়াছে, আপনারা পূজা-অর্চ্চনা, হোম, যাগযজ্ঞ করে তাহা দূর করুন।

কিন্তু হায়! কেহই পারে না নগরে শান্তি আনিয়া দিতে। শ্মশানে দিবারাত্রি জ্বলে চিতার আগুন। চিতা-ধূমে আচ্ছন্ন বৈশালীর আকাশ!

নগরবাসীরা নানা বিভিন্ন স্থানের সাধুদের শরণাগত হয়। নীরোগ হউক নগরী ও শান্তি কামনা করে সাধুরা বলেন অসম্ভব! সাধ্যাতীত আমাদের!

বিশালপুরী বৈশালী। লিচ্ছবি রাজাদের রাজধানী। এক সময়ে ছিল শক্তিশালী বৈজ্জীসঙ্ঘের শাসনকেন্দ্র। ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বৈশালী। বৌদ্ধ ও জৈনদের এই নগরের সঙ্গে কত শত শত বৎসরের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সেকালে বেসালিয়ে বা বৈশালিক নামে পরিচিত ছিলেন মহাবীর স্বামী।

লিচ্ছবিরা ছিলেন আর্য্য ক্ষত্রিয়বর্ণ। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। লিচ্ছবি জাতির বা গোষ্ঠি নাম। এ শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা তোমাদের বলিব না—সে অনেক কথা। তবে একটা কথা মনে রাখা ভাল, গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গে লিচ্ছবিদের ছিল নিকট সম্বন্ধ। লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমার দেবীর পরিণয় হইয়াছিল গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত। গুপ্তবংশের তালিকা-যুক্ত শিলালেখ

মাত্রেই বিখ্যাত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। সেকালে লিচ্ছবিরা ছিল অতি পরাক্রান্ত জাতি।

বুদ্ধদেবের সময় বৈশালী ছিল এক বৃহৎ নগরী। সত্য বলিতে কি, সেকালে এই নগরীর বিশালতার জন্যই ইহার নাম হইয়াছিল বৈশালী। রামায়ণেও এই নগরীকে বলা হইয়াছে—বিশালাং নগরীং রম্যাম্ দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদাঃ অর্থাৎ বিশালনগরী উত্তমাপুরী স্বর্গোপমা! কাজেই বৈশালী যে খুবই প্রাচীন নগরী তাহা জানিতে পারিলে। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চুয়াং লিখিয়াছেন ঃ প্রাচীন বৈশালী নগরী ৬০।৭০ লী বিস্তৃত এবং নগরের প্রাচীর বেষ্টিত অংশের পরিধি ছিল ৪।৫ লী। ইউয়ান-চুয়াং এ নগরের নাম দিয়াছিলেন 'প্রাসাদনগরী।'

ভগবান বুদ্ধদেবের সময় বৈশালী নগরীকে বেষ্টন করিয়া পর পর ছিল তিনটি প্রাচীর। প্রাচীরের প্রতিটি তোরণ ছিল গোপুরযুক্ত, তার ভিতরে ছিল বাসভবন। অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য ছিল এই নগরবাসীর। প্রাচীরে বেষ্টিত তিনটি ভাগের কোনটিতে ছিল সোণার চূড়াওয়ালা হাজার ঘর, কোনটিতে ছিল রূপার চূড়াওয়ালা চৌদ্দ হাজার ঘর, কোনটিতে ছিল একুশ হাজার তামার চূড়াযুক্ত ঘর-বাড়ী। পদমর্য্যাদা অনুসারে এই সকল গৃহে বাস করিত ধনী, মধ্যবিত্ত ও দুঃস্থ লোকেরা, এত বড় নগরীতে যে কত লক্ষ লোক বাস করিত তাহা ভাবিয়া দেখ। এমন যে বৃহৎ ও সুন্দর বিশাল নগরী সেখানে দেখা দিল মহামারী! প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছিল। দিকে দিকে হাহাকার! করুণ ক্রন্দন, এক শোকপূর্ণ মহাশশ্মানে পরিণত হইয়াছিল বৈশালী নগরী।

—দুই—

নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষেরা লিচ্ছবিরাজ তোমরের কাছে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মহারাজ! নগরবাসীদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। যাহারা মৃত্যুর কোলে চিরদিনের জন্য চলে গেছে তাহারা আর ফিরিবে না। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি, তাহাদের রক্ষা করুন।

নির্ব্বাক তোমররাজ!

নগরবাসীরা বলেন—আপনি পথ নির্দ্দেশ করুন, বলুন কি উপায়!

হতাশ মনে তোমররাজ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন কি করি! প্রাজ্ঞ আপনি! কি করতে পারি আমি। রাজবৈদ্য, নগরের ভিক্ষুগণ, সাধু সন্ন্যাসী কেহইত কিছু করতে পারেন নাই! আমি আর কি করবো! রাজার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুর বন্যা বহিল! নিরুপায় নৃপতি!

বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন—মহারাজ! শুনেছি রাজগৃহে ভগবান্ তথাগত রয়েছেন, পরম কারুণিক

তিনি, আমার মনে হয় তাঁর শরণাগত হলে নগরীর এই মহামারী দূর হবে! আপনি রাজগৃহে গিয়ে নৃপতি বিম্বিসারের অনুমতি নিয়ে এ নগরে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করুন, আমি বলতে পারি তাঁর শুভাগমনে দূর হবে শোক-দুঃখ অবসাদ। দূর হবে মহামারী!

তোমররাজ সম্মত হইলেন এ প্রস্তাবে। সদলবলে চলিলেন রাজগৃহে। মহারাজ বিম্বিসার তোমররাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বলিলেন—আপনি আপনার রাজধানীতে ভগবান তথাগতকে নিতে পারেন, তবে এক কথা, রাজ্য সীমানা পর্য্যন্ত তাঁকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করে নিতে হবে। আমিও নিজ রাজ্যের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত হব তথাগতের অনুগামী।

রাজা-তোমর ও লিচ্ছবিগণ মহারাজা বিম্বিসারের এই সৎ ও সুন্দর প্রস্তাবে রাজী হইলেন। তারপর লিচ্ছবিরাজ ও তাঁহার সহচরগণ নৃপতি বিম্বিসারের সহিত বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া নৃপতি বিম্বিসার লিচ্ছবিগণের রাজধানী বৈশালী নগরের মহামারীর কথা বলিলেন, বলিলেন মহামারীর প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, আপনাকে বৈশালী নগরে একবার পদার্পণ করতে হবে. সেজন্য এসেছেন রাজা ও লিচ্ছবিরা—আপনি কৃপা করুন ভগবান!

লিচ্ছবিরাজ ও লিচ্ছবি প্রধানেরা প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—ভগবান্! আপনি মহামারীর প্রকোপ হতে আমাদের উদ্ধার করুন।

নীরবে শুনিলেন সকলের আবেদন। তারপর প্রসন্ন হাস্যে, মধুর কণ্ঠে—তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানাইলেন।

শত শত কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল আনন্দ কলধ্বনি।

—তিন—

চলিলেন তথাগত বৈশালীর দিকে।

মগধরাজ বিম্বিসার—লিচ্ছবিদের তাঁহার রাজশক্তির ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাব দেখাইবার জন্য এই সুযোগে রাজগৃহ হইতে তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমুদয় পথ করিলেন পরিষ্কৃত, সমতল। পথের দুই পাশে রোপণ করিলেন শোভন কদলী তরু, পুষ্পিত লতা পল্লবে, বিবিধ পতাকায় করিলেন সজ্জিত! মাল্য ও বিবিধ পতাকায় রাজপথের হইল অপূর্ব্ব শোভা। বহুমূল্য কারুকার্য্যশোভিত বস্ত্র দিয়া করিলেন পথ আচ্ছাদিত। পথ করা হইয়াছিল সুরভিজলসিঞ্চিত ও পুষ্পে পুষ্পে শোভিত। দুই দিকে সুগন্ধি ধূপধূনা ও অগুরুর গন্ধে সুরভিত ও প্রমোদিত করিতেছিল রাজপথ।

বুদ্ধদেব সেই পথে—সৌম্য শান্ত জ্যোতির্ম্ময়; বদনমণ্ডল হাস্যবিভাসিত, করুণাঘন নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। নৃপতি বিম্বিসার ও বৈশালীরাজ তথাগতের অনুগমন করিতেছিলেন করযোড়ে তাঁহার মহিমাবাণী গান করিতে করিতে। আনন্দের ধারা বহিতেছিল চারিদিকে।

এদিকে বৈশালী রাজধানীর বাহিরে সেই গঙ্গাতীর হইতে রাজধানীর প্রবেশ-তোরণ পথ পর্য্যন্ত বাহিরে ও ভিতরে লিচ্ছবিরা অপূর্ব্ব শোভন রূপে সাজাইয়াছিল। তাহাদের নগরীর তোরণ, রাজপথ, অলিন্দ, গৃহচূড়, মন্দিরচূড়—আম্র পল্লবে পল্লবে—দেবদারু পত্রে—কদলী বৃক্ষ ও পবিত্র সলিলপূর্ণ কুম্ভে—নগরী মৃত্যুর প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকার মধ্যেও ধরিল অপূর্ব্ব সাজ।

নগরের চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—ওঁ স্বস্তি—বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈ [ক] গাত্রং ধর্ম্মাস্য সৌ—বিজয়তে জগদেক—দীঘঃ।

করুণার একমাত্র আধার, বন্দনাই সেই ভগবান্ জিন (বুদ্ধদেব) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তাঁহার ধর্ম্ম (উভয়েই) বিজয়লাভ করুন।

—বৈশালিক লিচ্ছবিদের স্বাগতবাণী তথাগতের প্রাণে আনন্দ দিল। লাল, নীল, হরিৎ, হরিদ্রা, নির্ম্মল ও রক্তবর্ণের উজ্জ্বল পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া তথাগতকে অভ্যর্থনা করিতে নগরবাসীরা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তথাগত সঙ্গের ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখ দেখ ভিক্ষুগণ, সম্পদে ও ঐশ্বর্য্যে দেবতাদের সমতুল্য লিচ্ছবিদের দেখে সার্থক কর তোমাদের চক্ষু। দেখ তাদের নগর সজ্জা, চেয়ে দেখ তাহাদের হস্তী, সুবর্ণ ছত্র, সুবর্ণ দোলা, স্বর্ণ নির্ম্মিত রথযাত্রা দেখ। দেখ, লাক্ষা রঞ্জিত রক্তবস্ত্র পরিধান করে নগরের যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সকলে কেমন ধীরে ধীরে মনোহর গতিতে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে।

মগধ রাজ্য হইতেও অতি সুন্দর নয়ন-রঞ্জন ভাবে বৈশালীনগর সজ্জিত করা হইয়াছিল।

ভগবান তথাগতের ও ভিক্ষুগণের বাস করিবার জন্য তাহারা অতিশয় মনোযোগী হইয়াছিলেন।

—চার—

বুদ্ধদেব গঙ্গানদী পার হইয়া যেমন উত্তর তীরে লিচ্ছবি রাজ্যে প্রবেশ করিলেন—সেই মুহূর্ত্তে নির্ম্মল নীল আকাশে সূর্য্যদেব প্রসন্ন কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে চন্দনগন্ধ সুরভিত সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বনে বনে ফুটিয়া উঠিল শত শত প্রফুল্ল সুরভি পুষ্পরাজি, নিবিয়া গেল শ্মশানের চিতার আগুন! —সেই শুভ মুহূর্ত্তে রাজ্য হইতে দূর হইল

মহামারী। দুর্ব্বল শক্তি হইল সবল, নষ্টস্বাস্থ্য ব্যক্তি ফিরিয়া পাইল তাহার স্বাস্থ্য। রুগ্ন যে হইল নীরোগ!

জয় জয় রবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবকে নগরের মধ্যে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুদের শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত অতি সুন্দর সুসজ্জিত পান্থশালা স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তথাগত স্বস্ত্যয়নগাথা রতন সূত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নগরে ফিরিয়া আসিল শান্তি! মহাকাল তাহার ধ্বংসের মূর্ত্তি সম্বরণ করিলেন! তথাগত সকলকে তাঁহার মঙ্গল হস্ত স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাজিয়া উঠিল মঙ্গল-শঙ্খ। শোক দুঃখ দহন দূর হইল।

লিচ্ছবিগণের ইচ্ছা ছিল ভগবান তথাগতকে তাঁহারা বৈশালীনগরেই রাখেন—কিন্তু তথাগত নগরের উত্তর ভাগে অবস্থিত মহাবনে গমন করিলেন। তাঁহার আদেশে লিচ্ছবিরা সেখানে 'কূটাগারশালা' নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুগণ সেখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

ভগবান্ তথাগতের অসীম করুণা প্রভাবেই বৈশালী নগরের দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রেতভীতি দূর হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব লিচ্ছবিদের ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদের নিকলঙ্ক চরিত্রের জন্য মুগ্ধ ছিলেন। বৈশালীনগরীর জন্যও তাঁহার প্রীতি ছিল। এই দেশের লোকেরা বহুবার নত মস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে।

পরিনির্ব্বাণের সময় আগতপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি শেষ দেখা দেখিবার জন্য এই নগরে উপস্থিত হন। লিচ্ছবিরা সর্ব্বদা তথাগতকে পূজা ও অর্চ্চনা করিয়া সম্মান দেখাইয়াছে। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রন্ত হইতে জানিতে পারা যায়—'ভগবান যখন বৈশালীর ভিতর দিয়া গমন করিতে করিতে ভিক্ষা কর্ম্ম শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন হস্তীর ন্যায় বারবার পশ্চাদবলোকন করিতেছিলেন। এবং আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে আনন্দ, তথাগত এই শেষবার বৈশালীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

* ১। Dialogues of the Buddha Pt. II P. 131 f. ২। লিচ্ছবি জাতি—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা—৩৪—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাদা পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পল্লীগ্রামের কাদা পথে—
যান-বাহন এক গরুর গাড়ী,—
কষ্টে চলে কোন মতে।
ক্ষেতগুলি সব সবুজ ঘন,
দেখিনে রঙ অন্য কোনো,
পাশেই দীঘি পুকুর ভরা—
পদ্ম কুমুদ কহ্লারেতে।

লোকের মুখে শুনেছি হায়—
ভাল ভাল উড়ো জাহাজ
হাজার মাইল ঘণ্টাতে যায়।
হেথায় গাড়ী কাদায় জলে
প্রহরে এক মাইল চলে,
চল্‌ছে কিম্বা দাঁড়িয়ে আছে—
একেবারে বোঝাই যে দায়।

হলে এটা মরু প্রদেশ—
বল্গা হরিণ স্লেজ গাড়ীতে
যাওয়া যেত আরামে বেশ।
অনুর্ব্বর সে তুষার সাদা
উর্ব্বর এই মোদের কাদা
এতেই মহালক্ষী ফেরেন
তাঁহার তাতে হয়না তো ক্লেশ।

ঘণ্টা বাঁধা বলদ গলে—
চল্‌ছে গাড়ী ক্রমে ক্রমে
সকল মাটি মাড়িয়ে চলে।
পথে নুয়ে পড়ছে বাঁশ,
গাড়ী চলে কাটিয়ে সে পাশ,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
জল-তরঙ্গ জলে স্থলে।

উঠছে ধোঁয়া বাড়ী বাড়ী
খিড়কিতে হাঁস ডুব দিতেছে
স্ফূর্ত্তি তাদের বলিহারি।
ফুল ফুটেছে কদম গাছে,
বিশাল বকুল দাঁড়িয়ে আছে,
বাবুই পাখী তালের পাতায়
বুন্‌ছে বাসা তাড়াতাড়ি।

বুঝতে পারি নিজেই নিজে
এম্‌নি পথে পাই বুকেতে
দেশের প্রাণের স্পন্দনই যে।
কেউ বলেনা, 'কে তুমি হে?'
সবাই ডাকে সবার গেহে,
এত আদর আত্মীয়তায়,
শুষ্ক আঁখি যায় যে ভিজে।

বিদেশী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াও যিনি মাতৃভাষায় কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই তিনি মহাভ্রান্ত। আমি যদি প্রাণ ভরিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি, আমি রাশিয়ার রাজমুকুটও চাহি না।—**মাইকেল মধুসূদন দত্ত**

সাগর-দ্বীপের কেল্লা

নির্ম্মল চৌধুরী

জাহাজ থেকে নেমে অল্পকালের মধ্যেই সে বুঝতে পারলে, সেটা বোম্বেটেদের আড্ডা—বোম্বেটে সম্রাট বার্থেলোমিউর রাজধানী। এই রাজধানী থেকে তার মুক্তি নেই।

জাহাজ বন্দরে ঢুকতেই কেল্লার ওপর থেকে তোপধ্বনি হলো। কেল্লার ওপর বার্থেলোমিউর নিশান উড়তে লাগলো।

বার্থেলোমিউ জাহাজ থেকে নেমেই আমাদের পূর্বপরিচিত সেই হল ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই বললে, "কালীকিঙ্কর"।

একটু পরেই পাহারাদার শৃঙ্খল ও বেড়ি পরানো কালীকিঙ্করকে তার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কালীকিঙ্কর বার্থেলোমিউর পাশে তাকিয়েই এমন অবাক হয়ে গেলেন যে একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে বার হলো না। সুবর্ণও তাঁকে সেখানে সেই অবস্থায় দেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কালীকিঙ্কর অনুমানে বুঝলেন, বোম্বেটেরা রতনপুর লুঠ করেছে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা সুবর্ণকে বন্দী করে এনেছে। কিন্তু ওর হাতে-পায়ে শৃঙ্খল বা বেড়ি নেই কেন ?

আর সুবর্ণ বুঝলে, যে কোন করণেই হোক, তার কাকা বোম্বেটেদের বন্দী। কিন্তু তাঁর সাধের "শঙ্খচূরের" কি হয়েছে ?

বার্থেলোমিউ বললে, "কালীকিঙ্কর! তুমি এই ছোকরাকে চেন ?"

কালীকিঙ্কর বললেন, "পরিহাসের প্রয়োজন নেই। যা বলবার সোজাসুজি বল।"

"তাই হবে। এবার বল দেখি সে গুপ্তধন কোথায় ?"

এবার কালীকিঙ্কর বুঝলেন, সুবর্ণকে সেখানে আনার উদ্দেশ্য কি, বললেন, "এ প্রশ্নের উত্তর তো সেদিন দিয়েছি।"

"কি ?"

"প্রাণ গেলেও বলবো না।"

"কার প্রাণ—তোমার না তোমার ভাইপোর ?"

কালীকিঙ্কর বললেন, "আমার ভাইপোর প্রাণ তো আমার হাতে নেই।"

"আছে—আছে। তুমি না বললে একে তিল তিল করে তোমার চোখের সামনে শেষ করবো।"

"বললেও ওকে মুক্তি দেবে না।"

বার্থেলোমিউ বুঝলে কালীকিঙ্কর কেবল নির্ভীক নন, বুদ্ধিমানও। কিন্তু ওকে পরাস্ত করতেই হবে ; বললে, "দেখ কালীকিঙ্কর ! আমার লোকজন আছে, জাহাজ আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে। মালয়ের ভীষণ অরণ্যে গিয়ে সে ধন উদ্ধার করা আমার পক্ষেই সম্ভব, তোমার পক্ষে নয়। কারণ তোমার এখন কিছুই নেই। আর যদি বা তা উদ্ধার করতে পারো তা আনবে কি করে ? সমুদ্রের চারধারে বোম্বেটে। আমিও তা লুঠ করতে পারি, অন্যেও পারে। তোমার সাধ্য হবে না তা দেশে নিয়ে যাও। আমাকে তার সন্ধান দিলে আমারই সঙ্গে তুমিও সেখানে যাবে। সে ধন উদ্ধার করতে পারলে, অর্ধেক ভাগ তোমার। আমি তাই দিয়ে একটা ছোটখাটো রাজ্য গড়বো, তুমিও দেশে গিয়ে রাজার মতো থাকবে। তখন তোমায় আমায় মিতালী হবে। জলেস্থলে কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। একমাস সময় দিলাম, ভেবে দেখ। আজ থেকে তোমার ইচ্ছামতো চলে ফিরে বেড়াবে। পাহারাদার পায়ের বেড়ি খোল !"

কালীকিঙ্কর বার্থেলোমিউর কথা ও আচরণে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। এ যা বলছে, তা কি শেষ অবধি সত্যি হবে ?

সুবর্ণ তো বার্থেলোমিউর কথা শুনে সরল মনে সব বিশ্বাস করলে। কালীকিঙ্কর কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারলেন না, আবার উড়িয়েও দিতে পারলেন না, চিন্তাকুল চিত্তে সুবর্ণর সঙ্গে চলে গেলেন।

—সাত—

তারপর—

কালীকিঙ্কর ইচ্ছামতো চলাফেরা করেন। সুবর্ণও তাঁর মতো মুক্ত। কিন্তু তাঁরা স্বাধীন ন'ন, ইচ্ছা করলেও সে দ্বীপ থেকে কোথাও তারা যেতে পারতেন না। কারণ, বার্থেলোমিউ তাঁদের দ্বীপের বাইরে যাবার অনুমতি দেয় নি। যদি দিত তাহলেও তাঁর সেই অকূল সমুদ্র পার হয়ে যাবার সুযোগ ছিল না।

তখনকার দিনে দাসব্যবসায় ছিল খুব লাভের। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার কতকগুলি জাতির লোক এই জঘন্য ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করতো। অনেকে ক্রীতদাস-দাসী রাখতো। তাদের স্বাধীনতা ছিল না, জীবন ছিল বড় দুঃখময়।

বোম্বেটেরাও যে নানা দেশ থেকে নানা রকমের মানুষ ধরে এনে দাসের হাটে বেচতো, নিজেরাও রাখতো একথা আগেই বলেছি। দাসরা প্রভুর ঘর-সংসারের কাজ, ক্ষেত-খামারের কাজ ও আরও নানা রকম কাজ করে দিত। তাদের মধ্যে অনেক সময়ে প্রভুর চেয়ে শতগুণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও থাকতেন।

বার্থেলোমিউরও অনেক দাস ছিল। তারা শস্যক্ষেত্রে ও বাড়ি-ঘর তৈরির কাজে, জাহাজ ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির কাজে কঠোর পরিশ্রম করতো। বিনিময়ে খেতে পেত সামান্য খাদ্য, পরতে পেত সামান্য বস্ত্র, শুতে পেত খড়ের আটি। তাদের কাজে একটু শৈথিল্য হলেই পিঠে পড়তো চাবুক ; কেউ অবাধ্য হলে তাকে দেওয়ালে জীবন্ত গেঁথে ফেলা হতো, কখন কখন ফেলে দেওয়া হতো হাঙরের মুখে।

বার্থেলোমিউ দাসদের কাজ-কর্মের তদারক করতো, গঞ্জালেস নামে এক খোঁড়া পর্তুগীজ সে ছিল বার্থেলোমিউর জাতীয় ভাই। নেশায় উন্মত্ত অবস্থায় একদিন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তার বাঁ পাখানি জখম হয়। তারপর থেকে সে আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো না ; আর তারপর থেকেই সে হয়ে ওঠে আরও নিষ্ঠুর। তার নিষ্ঠুরতার তুলনা ছিল না। তাকে দেখলেই দাসদের বুক কাঁপতো। তবুও তারা ভাবতো, কি উপায়ে ওই রাক্ষসটার হাত থেকে বাঁচা যায়।

একদিন সুবর্ণ এল বার্থেলোমিউর জাহাজ তৈরির কারখানা দেখতে। কারখানাটি ছোট নয়।

কারখানায় বহু দাস কোমরে কৌপীন জড়িয়ে একমনে কাজ করছে। কাঠ চেরাইয়ের, হাতুড়ি পেটার, কাঠ সরানোর এবং পালিশ করার শব্দ ও কাঠের গন্ধে কারখানা ভরপুর। কোথাও রয়েছে মোটা মোটা তক্তা সাজানো, কোথাও রয়েছে মোটা মোটা গুঁড়ি। কোথাও মাস্তুল ও দাঁড় তৈরি হচ্ছে ; কোথাও আগুনে সেঁকে তক্তাকে করা হচ্ছে বাঁকা। একখানা জাহাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় সমুদ্রের ধারে বালির ওপর কাঠের পাটাতনে চারদিকে কাঠের খোঁটার ঠেকা দিয়ে দাঁড় করান আছে। দাস-শ্রমিকরা নানা দেশের লোক। তাদের মধ্যে অনেক বাঙালিও আছে। তারা কৌতূহলভরা চোখে সুবর্ণকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিল।

গঞ্জালেস একদল দাস-শ্রমিককে হুকুম দিল কয়েকখানি তক্তা আনতে।

তক্তাগুলো আনতে আনতে তাদের একজন পায়ে কিসের বাধা পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে তক্তাগুলো সামলানো গেল না, বাহকদের হাত থেকে মাটিতে পড়লো। অমনি গঞ্জালেস চাবুক হাতে খোঁড়া বাঘের মতো তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁক দিল, তারপরই তাদের পিঠে পড়তে লাগলো চাবুক আর সেই সঙ্গে গালাগাল।

চাবুকের আঘাতে আঘাতে হতভাগ্যদের পিঠের চামড়া ফেটে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বার হতে

লাগলো। আহতগণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলো। তবুও সেই রাক্ষসটা নিরস্ত হলো না, হতভাগ্যদের সমানে মারতে লাগলো।

সুবর্ণ আর সইতে পারলে না। সে ছুটে গিয়ে গঞ্জালেসের হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিলে।

গঞ্জালেস এজন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েই সুবর্ণর হাতে চাবুক দেখেই তাকে একটা কঠিন গালাগাল দিয়েই সুবর্ণকে লাথি মারলে। সুবর্ণ কৌশলে সে আঘাত এড়িয়ে তার গালে মারলে চড়। অমনি দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি মল্লযুদ্ধ শুরু হল। কিছুক্ষণ কেউ কারো সঙ্গে পারে না, যেন দুই বাঘের লড়াই।

দাসের দল অবাক। তারা এমন ঘটনা এর আগে কখন দেখেনি। গঞ্জালেসের গায়ে হাত তোলার কল্পনাও তারা করতে পারে না। তাদের মধ্যে সাহস, শক্তি, অন্যায়ের বিরোধিতা করা প্রভৃতি মানবিক সদ্‌গুণ শুকিয়ে গেছে। তারা যেন কলের পুতুল। সেই রকম ভাবে দাঁড়িয়েই তারা এই অসম দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখতে লাগলো। অসম এইজন্যে যে খোঁড়া গঞ্জালেস একটা পূর্ণ বয়স্ক ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী ; কিশোর সুবর্ণ আদৌ তার সমকক্ষ নয়। কিন্তু সাহসে সে গঞ্জালেসের অনেক ওপরের শ্রেণীর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গঞ্জালেস সুবর্ণকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসে কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিলে। দাসেরা বুঝলে, সুবর্ণর জীবন শেষ।

এমন সময়ে গঞ্জালেসের হাত থেকে কে যেন পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বললে, "থামো, উঠে দাঁড়াও।"

[চলবে]
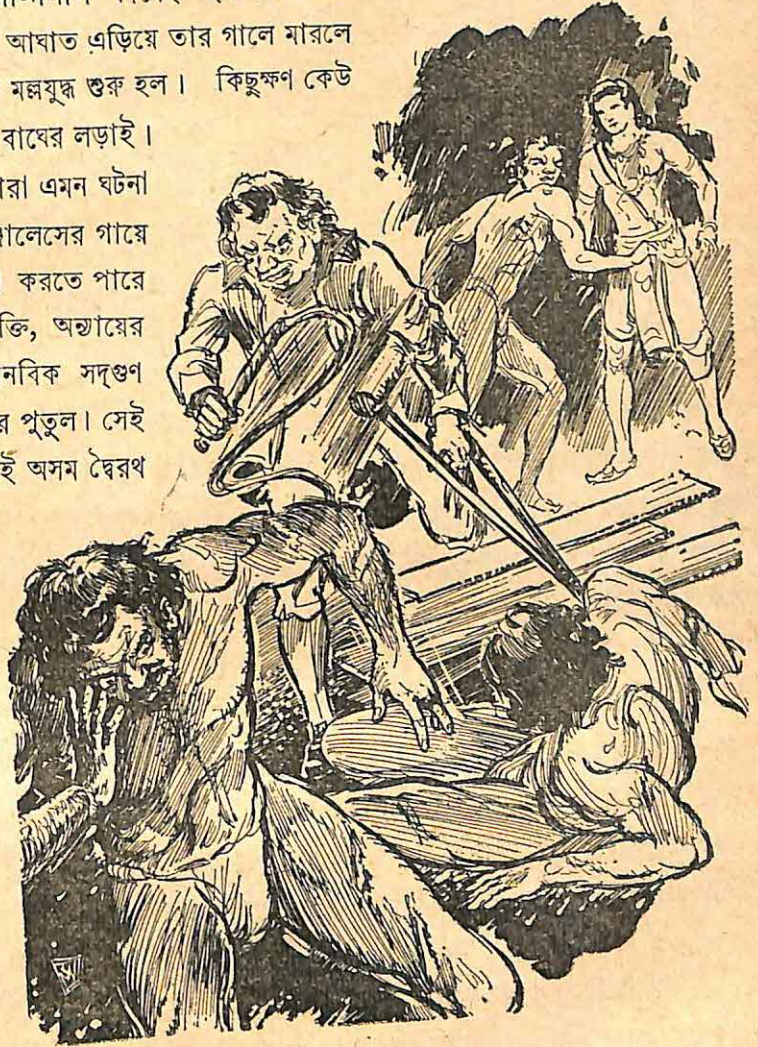
রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

রেডক্রশের জন্মদাতা

১৮৯০ সাল। সুইজারল্যাণ্ডের একটি ছোটো গ্রাম হাদেন-এ শিক্ষকতা করেন উইলিয়ম সোন্দারেগার নামে এক তরুণ শিক্ষাব্রতী। কথা ও কাহিনী, হাসি ও গানের মধ্য দিয়ে কচি কচি শিশুদের মনের ভিতরকার সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলেন তিনি। তারা অসংকোচে সব কিছু মনের কথা প্রকাশ করে তাঁর কাছে। তাদেরই কাছে তিনি একদিন এক অদ্ভূত বৃদ্ধের কথা শুনলেন। পক্ককেশ এই বৃদ্ধের ঠিক বয়স কেউ জানে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি খেলার সাথী। অনেক গল্প বলেন মজার মজার। সব শুনে কৌতূহল বাড়লো উইলিয়মের। একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজের বাড়িতে। কিছুক্ষণের আলাপেই সুদৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো দু'জনের মধ্যে। সেইদিনই বৃদ্ধ তাঁর জীবন কাহিনী শোনালেন। সে কাহিনী রূপ-কথারই মতো।

বৃদ্ধের নাম হেনরী ডুনান্ট। সুইজারল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। জেনিভা শহরের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সুনামের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিখ্যাত একটি সুইস ব্যাঙ্কে দায়িত্বশীল পদে তিনি নিযুক্ত হন। এই কাজে তাঁর খ্যাতি দিন দিনই বাড়তে থাকে। ফরাসী আলজিরিয়াতে কতকগুলি ময়দার কল বসানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্যে তাঁকে একবার ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক লুই (তৃতীয়) নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ প্রার্থী হতে হোলো। তখন ১৮৫৯ সাল। নেপোলিয়ন ইতালির সলফেরিনো নামে এক জায়গায় ফরাসী সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করছেন। ইতালির লম্বার্দি রণপ্রান্তরে তখন রক্তবন্যা বইছে।

একপক্ষে ইতালিকে অস্ট্রিয়ার শাসনমুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সংকল্প দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল, অপরপক্ষে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফ। নেপোলিয়ন ছিলেন ইমানুয়েলের পক্ষে।

এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভয়াবহতা বিচলিত করলো ডুনান্টকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অদূরে কাস্তিলিয়োনে নামে একটি ছোটো শহরে স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় তিনি এক শুশ্রূষাকেন্দ্র খুললেন। এখানে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষেরই আহত সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোলো। প্রায় একমাস ধরে অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করলেন। তারপর ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ ও সেবাব্রতীরা আসতে আরম্ভ করলে ফিরে গেলেন জেনিভায়। কিন্তু যে জন্যে তিনি নেপোলিয়নের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন সে কাজ রইলো অসমাপ্ত। কিছুকাল পরেই তিনি একটি পুস্তিকায় যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে প্রচার করলেন জনসমাজে। সেই সঙ্গে দেশে দেশে বেসরকারী স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে এক প্রস্তাবও পেশ করলেন।

১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি জেনিভায় মিলিত হলেন ডুনান্টের আমন্ত্রণে। আন্তর্জাতিক একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্পর্কে যে আদর্শ এই সম্মেলনে গ্রহণ করা হয় তারই ভিত্তিতে বর্তমান আন্তর্জাতিক রেডক্রশ প্রতিষ্ঠিত। এই সম্মেলনের দশমাস পরেই সরকারীভাবে বারোটি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং পাকাপাকি ভাবে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রেডক্রশের প্রতিষ্ঠাতা ডুনান্টের অবস্থা এর পর থেকে ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। তাঁর ব্যবসা ফেল পড়ে এবং ১৮৬৭ সালে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। অবশেষে প্যারিসের এক বস্তীতে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। এরপর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর নাম শোনা যেতো বটে কিন্তু জগতের লোক বোধহয় ক্রমশ ভুলেই যাচ্ছিলো তাঁর কথা। এবং ঐ রকম অবজ্ঞাত অবস্থাতেই হয়তো তাঁর জীবন শেষ হোতো যদি না হাদেন-এর গ্রাম্য শিক্ষক উইলিয়মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোতো।

সেই সময় রোমে রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছিলো। ডুনান্টকে না জানিয়েই একটি লিপি পাঠালেন ঐ সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে। তাতে লেখা: "রেডক্রশের প্রতিষ্ঠাতা এখনো জীবিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত।" সারা ইউরোপের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোলো এই সংবাদ। আবার পৃথিবীর লোক শুনলো রেডক্রশ প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা হেনরী ডুনান্টের নাম। দেশবিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য আসতে লাগলো তাঁর কাছে। বিভিন্ন দেশ তাঁকে সম্মান-পদকে ভূষিত করলো এবং পরিশেষে ১৯০১ সালে প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হোলো তাঁর নাম। এরপর আরো ন' বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৯১০ সালে ৮২ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। রুড়কি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তখন ভয়ানক খাতির, এখনকার মতো তখন সেটা সঙ্কুচিত হয়ে একটা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান হয়ে যায় নি। যারা ওই কলেজ থেকে পাশ করে বেরোত তাদের প্রথম ছ'জন না চাইতেই মোটা মাইনের সরকারী চাকরী পেত। যারা প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান নিতে পারত না সে সকল ছাত্রদেরও কলেজের নামডাকের জন্য একদিনও বসে থাকতে হোত না, কোথাও না কোথাও তাদের কাজ জুটেই যেত।

হিরণ বসু এই কলেজেরই ছাত্র। শেষ পরীক্ষা দেবার পর তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তার হাতে অনেকগুলো টাকা জমে গেছে। দাদার দেওয়া টাকা সব খরচ হয় নি, তার ওপর মোটা জলপানির টাকাতে ত হাত দেবার কোন অবসর মেলেনি। হিরণ ভাবলে কি হবে সকাল সকাল বাড়ী গিয়ে। তার চেয়ে একটু আরাম করে দেশ-ভ্রমণ করে নেওয়া যাক; তিনটি বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সে করেছে এখন আরাম করবার নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে, বিশেষ করে যখন নিজের টাকাতেই আরাম করা যায়, ভাইদের কাছে তার জন্য হাত পাততে হয় না। কলেজের সকল ছেলেই তখন বাড়ীমুখো তল্পিতল্পা বাঁধতে ব্যস্ত। হিরণও জিনিষপত্র গোছগাছ করে তৈরী হল, বন্ধুদের মধ্যে খোঁজ করে দেখলে সঙ্গী পাওয়া যায় কি না! কিন্তু কেউ ওর সঙ্গী হতে রাজী হল না।

হিরণের সঙ্কল্প ছিল কাশ্মীর যাবে। ওর পাশের ঘরে থাকতো সর্দার বলবন্ত সিং, তার সঙ্গে

হিরণের খুব বন্ধুত্ব। সে বল্লে—তোকে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব, তারপর তুই একা টো-টো করে ঘুরে বেড়া। বলবন্তের বাড়ী শিয়ালকোটে। হিরণ তার বাড়ীতে দিন দুই কাটিয়ে জম্মু-বানিহালের পথ দিয়ে কাশ্মীর চলে গেলো। বাড়ীতে সে লিখে দিয়েছিল একটু বেড়াতে যাচ্ছি, নিয়মিত সংবাদ না পেলে কেউ যেন উতলা হয়ো না।

মাস তিনেক ধরে অনেক জায়গা ঘুরে অমরনাথের দুর্গম মন্দিরে বেড়িয়ে হিরণ আবার শিয়ালকোটে ফিরল। বলবন্ত ওকে পরীক্ষার সংবাদ দিলে, সে পঞ্চম স্থান অধিকার করে সরকারী চাকরী পেয়েছে। কিন্তু হিরণ হয়েছে সপ্তম, একটুখানির জন্য তার সব গোলমাল হয়ে গেছে। হিরণের ইচ্ছা ছিল ফেরবার পথে লাহোর, অমৃতসর দেখে যাবে, কিন্তু পরীক্ষার সংবাদ পাবার পর আর কিছু তার ভাল লাগল না, সে সোজা বাড়ীমুখো রওনা হল।

লাহোরে এসে কলকাতাগামী গাড়ী ধরতে হবে। হিরণ যখন লাহোর পৌঁছল তার পাঁচ ঘণ্টা পরে কলকাতার গাড়ী ছাড়বে। কাজেই একটা গাড়ী নিয়ে সে শহরে গেল, একটা হোটেলে কিছু খেয়ে, কিছু জিনিষপত্র কিনতে দোকানে দোকানে ঘুরতে লাগল। একটা দোকানে হাভানা চুরুটের ওপর হিরণের নজর পড়ল। কিছু না ভেবেই সে এক বাক্স চুরুট কিনে ফেল্লে, যদিও তার চুরুট খাবার অভ্যাস ছিল না। মনে হল একটু চাল করেই নেওয়া যাক; রেলের ফার্ষ্ট ক্লাশ টিকিট শিয়ালকোট থেকেই কেনা হয়েছিল, তার সঙ্গে হাভানা নেহাৎ বেমানান হবে না।

যে কালের কথা বলছি, সে-কালে ট্যাকে পয়সা থাকলেই লোকে ফার্ষ্ট ক্লাস রেলটিকিট কিনত না। মর্য্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়েরা ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতে ভয় করত কারণ প্রায়ই অসহিষ্ণু ইংরাজ যাত্রী, বিশেষ করে ফৌজী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেশী যাত্রীর ঠোকাঠুকি লেগে যেত। হিরণের কিন্তু প্রথমে সে কথা একবারও মনে হয় নি। সে যথাকালে ষ্টেশনে এসে নিজের রিজার্ভ করা বার্থে বসল। তার ধুতি পাঞ্জাবী-পরা বাঙালী বেশ, পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার। কৌতূহলী হয়ে সে অন্য বার্থটার কার্ড দেখলে, তখনো সে যাত্রীটির আগমন হয় নি। কার্ডে লেখা কেরী এন নিউসেল; তখন হিরণের গাড়ীতে ঠোকাঠুকির কথা মনে হ'ল। সে নিজের মনে মনে বল্লে—যাক বাঁচা গেল, লোকটা বোধহয় আমেরিকান, রাত্রে তাহলে আর হাতাহাতি করতে হবে না।

খানিক পরে এক বিপুলকায় সাহেব অনেক জিনিষপত্র নিয়ে এসে নিজের স্থান অধিকার করলে। তার মুসলমান বেহারা জিনিষপত্র গুছিয়ে বিছানা পেতে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। গাড়ী ছাড়ল ও ঘণ্টাখানেক পরে অমৃতসরে এসে দাঁড়াল। হিরণ গাড়ীতেই রাত্রির ভোজনের ব্যবস্থা করে মনে মনে ভাবতে লাগলো যে এত কাছে এসেও অমৃতসহরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির দেখা হল না। তখন অমৃতসরে সাহেবদের ডিনার হ'ত, অন্য যাত্রীটি নেমে গিছল। হিরণ খেয়েদেয়ে গদি আঁটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে আবোল তাবোল কথা ভাবছে এমন সময়ে তার যাত্রাসঙ্গীটি সিগার মুখে দিয়ে গাড়ীতে এসে ঢুকল।

সাহেবকে সিগার খেতে দেখে হিরণের নিজের সিগারের কথা মনে পড়ে গেল। সে সিগারের বাক্স বার করলো গাড়ী তখন চলছে। হিরণ ও বিদ্যায় আনাড়ি, সিগার আর ধরাতে পারে না, একটি করে দেশলাই জ্বালে, আর বিপুল হাওয়ায় সেটা তৎক্ষণাৎ নিভে যায়। যা হোক বহু ক্লেশে সিগার ধরানো গেল। হিরণ সন্তর্পণে তাতে টান দিতেই খকখক করে কেসে উঠল। কিন্তু হাভানার সুরভিতে কামরা ভরে গেল। হিরণ জানত যে সিগারের ধোঁওয়া পেটে গেলে খুব সম্ভবতঃ তার অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে আসবে। সে গদিয়ান হয়ে বসে এমন ভাবে সিগার টানতে লাগল যাতে ধোঁয়া গলায় না যায়। সিগার টানে আর ধোঁয়া ছাড়ে, টান একটু জোরে হলেই হিরণ কেসে ওঠে—খক্ খক্।

ওর কাণ্ড-দেখে যে সাহেবটি মৃদু মৃদু হাসছিল তা হিরণ লক্ষ্য করেনি। একে ত প্রথম অপকর্ম্ম করার লজ্জা, তার ওপর সিগারটাকে আয়ত্ত করতে সে তখন তন্ময়। এক সময়ে সে সহযাত্রীর দিকে চেয়ে ফেল্লে। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই সাহেবটি হেসে উঠল। সে বল্লে—Say young fellow, এই বুঝি তোমার প্রথম সিগার খাওয়া? তা আরম্ভ করেছ ভাল, হাভানা দিয়ে।

হিরণের সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রাত্রি না হ'লে তার মুখের লালিমা ধরা পড়ত। সাহেবের চুরুট শেষ হয়ে গিয়েছিল। দু' একটা কথার পর হিরণ নিজের সিগারের বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিলে। তারপর দু জনের ভাব হয়ে গেল।

পরদিন শাহারাণপুরের কাছে দু'জনেরই ঘুম ভাঙল। সাহেব ওকে প্রাতরাশ খাওয়ালে আর ওর কাছে উঠে এসে নানা গল্প করতে করতে হিরণের সব খোঁজ নিলে। সে যে সদ্য পাশকরা এঞ্জিনীয়র এ কথা শুনেই সাহেব ওর বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল। হিরণকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি এখন কি করবে? হাভানা খেতে গেলে ত অল্প মাইনের চাকরী করা চলবে না?

হিরণ বল্লে—জানিনে এখন কি করব! কলকাতায় ফিরে গিয়ে চাকরীর সন্ধান করব, অদৃষ্টে যা জোটে।

সাহেব আবার বল্লে—Say, কখনো শীকার টিকার করেছ, বন্দুক চালাতে পার?

—পারি সাহেব। আমার বাবার খুব শীকারের ঝোঁক ছিল, দাদাদেরও আছে। আমারও হাতেখড়ি হয়ে গেছে। গত বছর ছুটির সময়ে কারো সাহায্য না নিয়ে আমি ভেলওয়ারা জঙ্গলে একট ভাল্লুক মেরেছিলাম।

—So? খুব ইণ্টারেষ্টিং। ধর, আমি যদি তোমাকে কোন চাকরী দি, করবে? কি চাকরী বলি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার নাম নিউসেল। শীকার আর নৃতত্ত্বের দিকে আমার খুব ঝোঁক আছে। আমি এসেছি আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে অসভ্য জাতির বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করতে। এখন বর্ষাকাল, শরৎকাল পড়লেই আমি ওদিকে যাবো। আমার একজন লোকের দরকার আছে যে জরিপ টরিপ করতে পারে, এবং আমার দরকার মত অন্য কাজও করতে পারে।

তোমার ইচ্ছা হয় তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারো। হাভানা খাবার মত মাইনে দেব, এবং তোমার কিছু টাকার জীবনবীমাও করিয়ে দেব। তার আগে তোমাকে অবশ্য একটু পরীক্ষা করে দেখব। মনে হয় তাতে তুমি উৎরে যাবে। কাজটায় কিন্তু দায়িত্ব আছে।

যাকে বলে সুযোগ দেখে লাফিয়ে পড়া। হিরণ উৎসাহিত হয়ে উঠে বল্লে—এখনি আমি তোমার সঙ্গ নিতে রাজি, মিষ্টার নিউসেল।

সাহেব মুচকি হেসে বলে—গো স্লো, বয়। কলকাতায় এসে আমার হোটেলে দেখা কোরো।
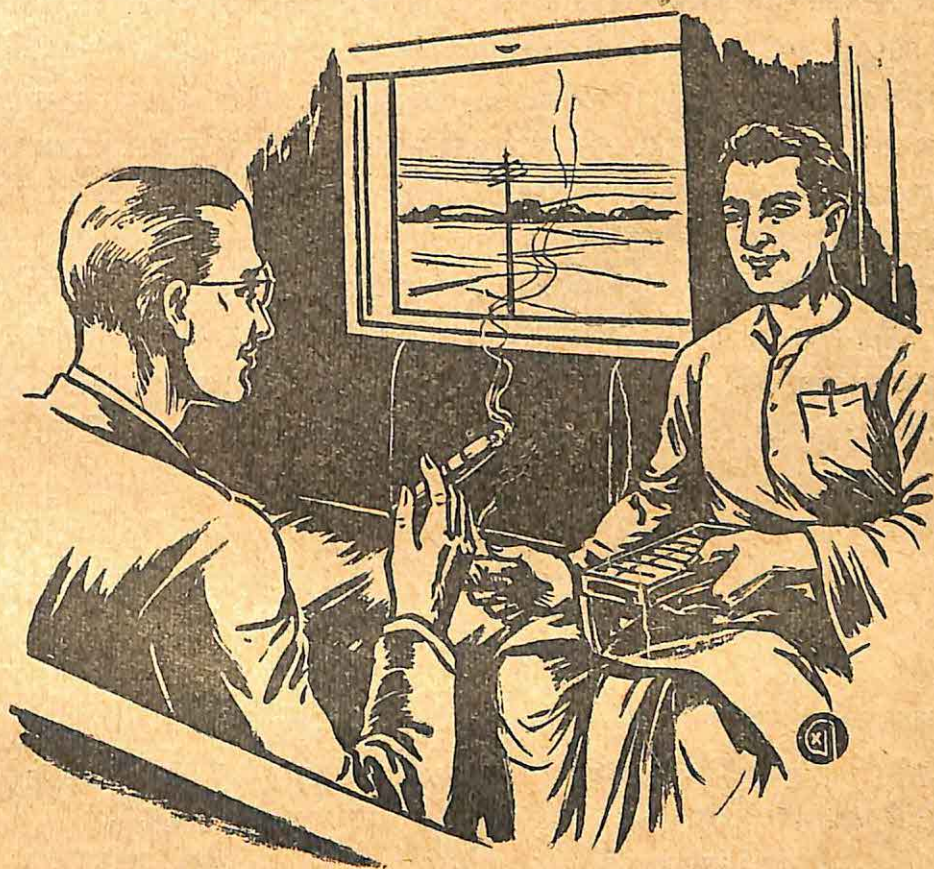
আমি এখন লক্ষ্ণৌ যাব, তারপর বেনারস। কলকাতায় পৌঁছে তোমাকে চিঠি দেব। তোমার ঠিকানা দাও।

গাড়ী বেরেলি পৌঁছতেই নিউসেলের চেয়েও আরো দীর্ঘাকৃতি এক সাহেব এসে দর্শন দিলেন। নিউসেল তাকে দেখে বলে উঠল—হ্যালো, মেরিল! এ সাহেবটির এক চোখে চশমা, গোঁফের প্রান্ত ঠোঁট দিয়ে চাপা, ইস্পাত-নীল চোখ। হাত দুটো বাঘের থাবার মত। লোকটি যেই হোক,

হিরণের দিকে সে আড়চোখে ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে দেখলে। তার জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা হ'লে নিউসেল অন্যান্য কথার পর বল্লে—এ ছেলেটিকে চিনে রাখ। ভাবছি আমাদের অভিযানে ওকে নেব। হিরণের সঙ্গে নিজের বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লে—এর নাম লর্ড মেরিল। আমার অভিযানের সঙ্গী এবং খুব বড় শিকারী।

হিরণ নবাগতের বন্দুকের বাক্সের সংখ্যা দেখেই সে কথা বুঝেছিল। মেরিল সাহেবের হাতে হাত দিতে হিরণের মনে হল তার হাতটা থেঁৎলে গেছে। মেরিল ওর সঙ্গে কোন কথা কইলে না। নিজের স্থানে বসে মাঝে মাঝে আড়চোখে হিরণের দীর্ঘায়তন পেশীবহুল দেহের দিকে দেখতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল—What are you? হিরণ জবাব দিলে—এঞ্জিনীয়র।

আমি তা জিজ্ঞাসা করিনি। What is your sport? হিরণ এবার হাসিমুখে বল্লে—তোমরা এ দেশে যা খেলা এনেছ সবই খেলি, তার ওপর আমার কুস্তি লড়তে খুব ভাল লাগে।

হিরণের মনে হল ওর উত্তর শুনে মেরিল খুশি হল। সে ত জানত না যে এই দুর্দান্ত ইংরেজগুলো যখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করে লেখাপড়ার পরিচয় চায় না, চায় পুরুষালির পরিচয়।

দুপুরবেলা গাড়ী লক্ষ্ণৌ শহরে এলো। দুজন সাহেবই নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে নেমে গেল। মেরিল কোন কথা না বলে হিরণের হাতে বিষম এক ঝাঁকানি দিয়ে বিদায় জ্ঞাপন করলে। নিউসেল ওকে বল্লে—তুমি আমার সঙ্গে দেখা করছ তাহলে? ইতিমধ্যে বিশ্রাম করে নাও আর ভাল করে হাভানা টানতে শেখ। বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

[চল্‌বে]

খোকার সাধ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

এবার আমি চল্‌ব উড়ে
সাত সাগরের পারে।
চুপ টি করে থাকব না আর
মায়ের আঁচল ধরে।

মানুষ কেমন আছে কোথায়,
কেমন তাদের দেশ,
কোন ভাষাতে বল্‌ছে কথা,
কেমন তাদের বেশ।

ঘরের কোণে রইব না মা
তোমার আঁচল ধরে।
"যাস্‌নে খোকা" বলেও যদি
তোমার নয়ন ঝরে।

স্থাপত্যের কথা

কাফী খাঁ

অনেক বছর আগে আমি শিশুসাথীর পাঠক-পাঠিকাদের বাঙ্গলার মন্দির ও ভারতীয় স্থাপত্যের কথা বলেছিলাম। তা বোধহয় তোমাদের অনেকেরই মনে আছে। এবার আমি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থাপত্যের কথা বলছি। এগুলোকে ইতিহাস হিসাবে বলে যাচ্ছি। তাহলেই তোমাদের বিষয়গুলো বুঝবার সুবিধা হবে।

ইতিহাস হিসাবে প্রথমেই বলতে হয় মিশরের স্থাপত্যের কথা, কারণ ওটাই পৃথিবীর সব
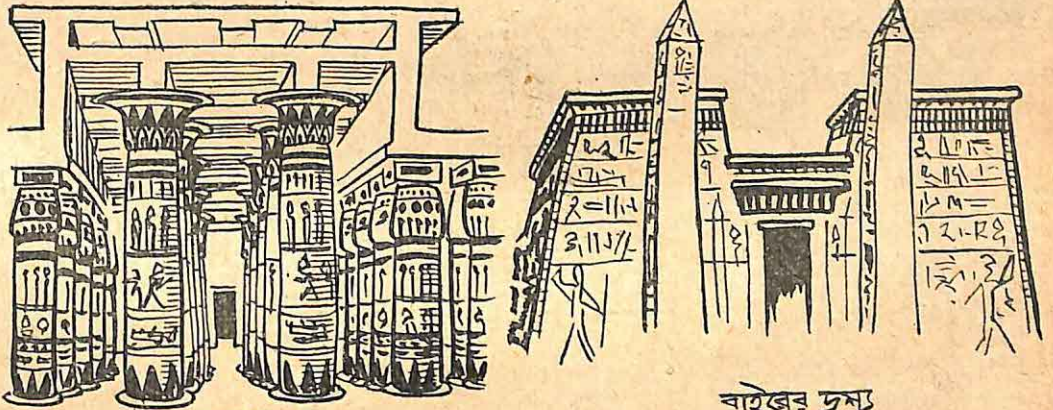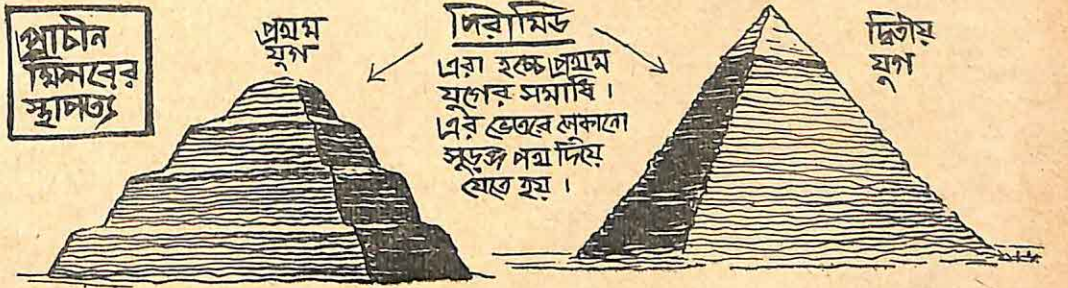
চাইতে পুরানো দেশ কিনা, তাই! আমি এখানে চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া বা প্রাচীন আমেরিকানদের স্থাপত্যের কথা বলব না।

মিশরের স্থাপত্যের বড় নমুনা হল পিরামিড ও তার পরবর্ত্তী যুগের মিশরীয় মন্দিরগুলোর স্থাপত্য। মিশরের স্থাপত্যের একটা মজা এই যে এদের দেয়ালগুলোর বাইরের দিকটা ভেতরের দিকে চেপে উঁচুতে চলে গেছে, যেন কোনো রকমে দালানটা ছাদের চাপে বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়ে না যায়।

ছবিগুলোকে দেখলেই সব বুঝতে পারবে। তখনকার দিনের রাজমিস্ত্রীদের তো আর এখনকার দিনের মত অত ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি ছিল না, তাই সোজাভাবে তারা জিনিষটাকে বুঝে নিয়েছিল।

মিশরের স্থাপত্যের কথা তো শুনলে। এবার ইতিহাস হিসাবে তারপরের যুগের কথা হচ্চে ব্যাবিলনীয় ও আসীরীয় বা অসুরের দেশের স্থাপত্যের কথা। এদের রাজধানী ছিল ব্যাবিলন ও নিনেভে। জায়গাগুলো কোথায় জানো? এটা হচ্ছে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর দেশ যেটা
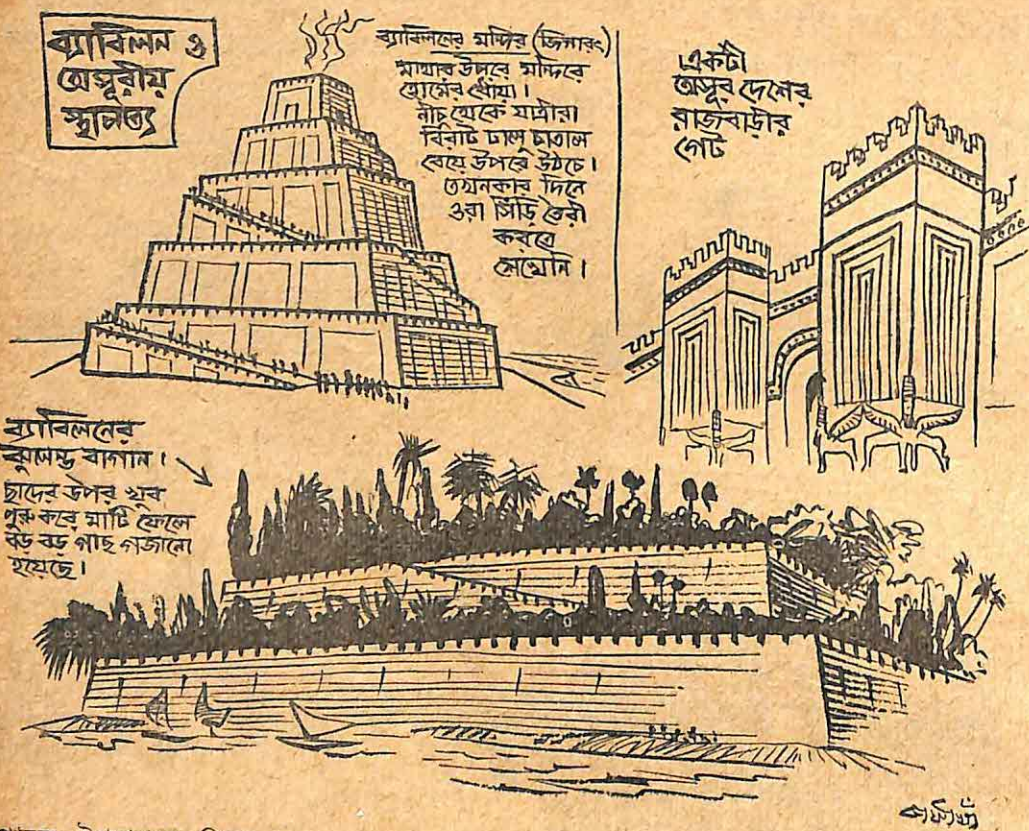
পারস্য উপসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখনকার ইরাক রাজ্য আর কি। সেই প্রাচীন যুগে এটা ছিল অতিশয় উর্ব্বর ও জলো জায়গা। তখন মাঝে মাঝে আবার বন্যাও হত। তাই ব্যাবিলনের মাটিতে তাদের সৌধ-মন্দির ও রাজবাড়ীগুলোকে একটু উঁচু ভিত করে বানাতে হত। সেখানকার মন্দিরগুলোও ছিল অনেকটা প্রথম যুগের পিরামিডের ধরণে। দেখতে চাতালের পর চাতাল উপরে উঠে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

প্রথম যুগে ব্যাবিলনে রোদে শুকনো ইট দিয়ে এই সব বাড়ী তৈরী হত। আর বাইরের দিকটাতে আগুনে পোড়ানো ইট ব্যবহার হত যেন জলে গলে না যায়। এর পরের যুগে আসীরিয়াতে ইটের

বদলে পাথর ব্যবহার হতো। অসুরের দেশটা ছিল পাহাড়ে শুকনো যায়গায়, তাই। এখানে দেয়ালে আবার এনামেল করা টালি দিয়ে জীব-জন্তর মূর্ত্তিও তৈরী করতো।

এর পরেই সব চাইতে নামকরা স্থাপত্যের নমুনা হচ্ছে প্রাচীন গ্রীসের মন্দির, সঙ্গীত ও সভা-সমিতির বাড়ীগুলি। গ্রীসের এই স্থাপত্য তার অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য ইউরোপের লোকেদের
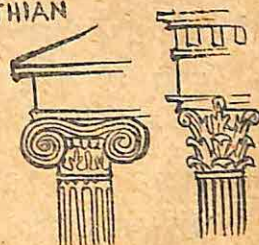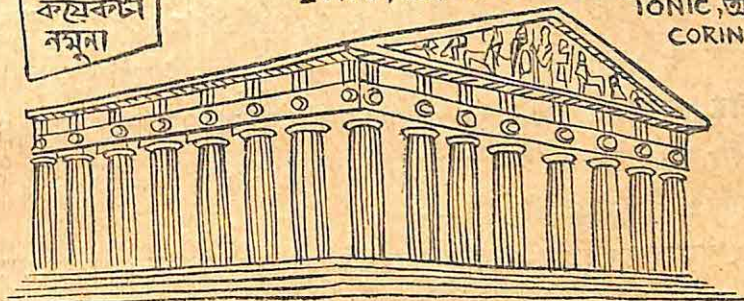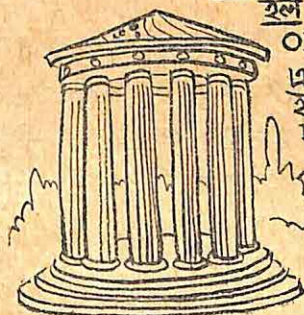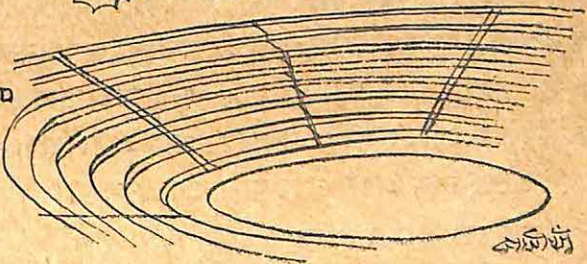
মনে এত গভীর শ্রদ্ধা এনে দিয়েছিল যে, তারা সারা পৃথিবীময় তাদের নিজেদের স্থাপত্যের মধ্যে গ্রীক স্থাপত্যের নমুনাগুলো ব্যবহার করে এসেছে। সঙ্গেকার ছবিগুলো দেখলেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থামগুলো, সেনেট হাউসের বাড়ীটা, টাউন হলের থামগুলো সিঁড়ি দেওয়া সম্মুখ দিকটা, কলকাতা মেডিকেল কলেজের থামগুলো সিঁড়িওয়ালাদিকটা, কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে থামওলা গির্জ্জা ইত্যাদি আরো অনেক বাড়ী যেগুলো কলকাতায় ছড়িয়ে আছে এরা হচ্ছে গ্রীক-মন্দির স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। (ক্রমশঃ)
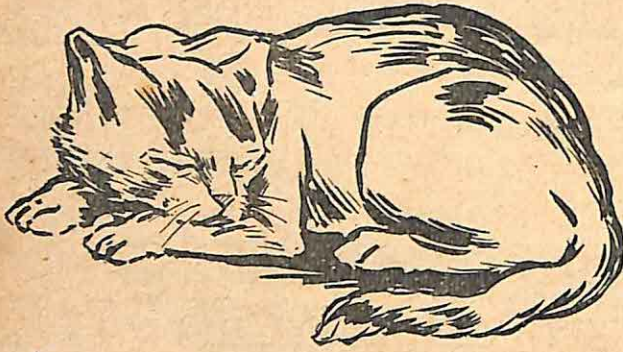
জন্তু-জানোয়ারও স্বপ্ন দেখে কি ?

ঘুমের ঘোরে তোমরা কত মজার মজার স্বপ্ন দেখো। কখনো হয়ত পরীদের মত আকাশে উড়ছো, কখনও হয়ত মৎস্যকন্যার মত সাগরে সাঁতার কাটছো আবার কখনো হয়ত বা তেনসিং শেরপার মত হিমালয়ের চূড়ায় উঠছো।

মানুষ স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তোমাদের বাড়ীর ঐ পোষা বেড়ালটা, বা বাঘা কুকুরটা বা বুধী গাইটা কখনো স্বপ্নে দেখে কি ? তোমরা হয়ত একথাটা অনেকবার ভেবেছও, কিন্তু এর ঠিক সমাধানটা হয়ত করতে পারোনি।

শুনে রাখো ওরাও তোমাদের মত স্বপ্ন দেখে। তবে তোমরা যেমন অনেক রকম স্বপ্ন দেখো ওরা তত বেশী রকম স্বপ্ন দেখে না। ওদের কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে, ওদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে যতটুকু ব্যাপারের সম্পর্ক ওদের স্বপ্নও ততটুকু ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ।

গভীর নিদ্রামগ্ন বিড়ালকে কখনো লক্ষ্য করে দেখেছো কি ? দেখবে ঐ অবস্থায়ই তার লেজটা নড়ে উঠছে, একটু ঘড়ঘড় আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। সামনের পা দুখানাও একটু নড়ছে। মনে হচ্ছে সে যেন দৌড়াতে চেষ্টা করছে। এ-ও হতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখছে যেন সে তার চিরদিনের শত্রু ইঁদুরের পেছনে ছুটে চলেছে। জাগ্রত অবস্থায় যেসব ভাব ওদের মধ্যে দেখা যায়, ঘুমন্ত অবস্থায়ও সেই রকম ভাবই ওদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

কুকুরেরা বোধ হয় বিড়ালের চেয়েও বেশী স্বপ্ন দেখে। ওদেরও গভীর ঘুমের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখো। ওরাও ঐ বিড়ালের মতই লেজ নাড়ছে, মৃদু ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করছে, পা নাড়ছে। মনে হয় সে যেন দ্রুত ছুটে চলেছে। কার পেছনে, বুঝলে ত ! ওর প্রধান শত্রু ঐ বিড়ালের পেছনে।
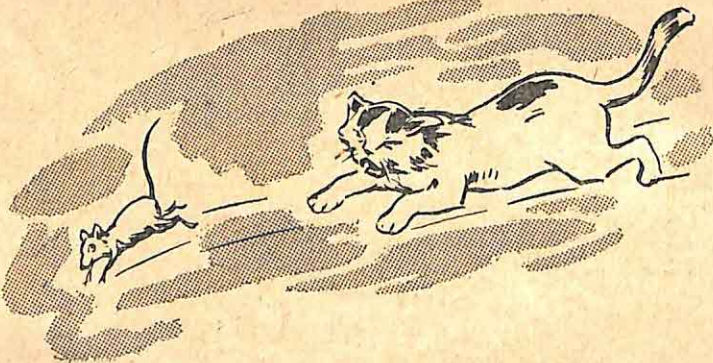
অদ্ভুত যত জন্তু-জানোয়ার

আর্কেওপটারিক্স

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

প্রায় একশ' বছর আগের কথা।

ব্যাভেরিয়ার কোন স্থানে একবার চুনাপাথরের বেশ বড় একটা পাটা পাওয়া যায়। খুবই সাধারণ জিনিস। এর জন্য কারো কোন আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চুনাপাথরের পাটাটির একটু বিশেষত্ব ছিল। তার গায়ে ছিল একটা অদ্ভুত ধরণের জীবের ছাপ। তাই সেই পাটাটি বিশেষ ভাবে সাড়া জাগায় লোকের মনে, বিশেষ করে প্রত্নজীববিদ্যাবিশারদদের অর্থাৎ প্রাচীন কালের পশু-পাখীদের নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতেন তাঁদের মনে। তাঁরা সকলেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন সেই পাথর খণ্ডটির উপর। কোন্ জীবের ছাপ এটা, কি করেই বা সেই জীবটি ফসিল হল অর্থাৎ শিলায় পরিণত হয়ে পাথর খণ্ডের গায়ে চিরকালের জন্য আটকে গেল, তা নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠলেন তাঁরা।

বহু ভাবে পরীক্ষা ইত্যাদির পর তাঁরা ঠিক করলেন যে, চুনাপাথরের পাটার উপর যে জানোয়ারটির দেহ শিলীভূত অবস্থায় অর্থাৎ শিলায় পরিণত অবস্থায় পাওয়া গেছে তা একটি সরীসৃপ-পক্ষীর দেহাবশেষ। তাঁরা এই অদ্ভুত বস্তুটির নাম দেন 'আর্কেওপটারিক্স'। তাঁরা বলেন এই অদ্ভুত জীবটি হচ্ছে বর্তমান পক্ষীকুলের যথার্থ পুর্বপুরুষ—অর্থাৎ 'আর্কেওপটারিক্স'-এর বংশধর হচ্ছে আমরা এখন যে সব পাখী দেখি তারা। কি করে তার পরিবর্তন হল তা হচ্ছে বিবর্তনবাদের কথা। তা নিয়ে আলোচনায় না যেয়ে আমি ঐ কৌতূহলোদ্দীপক জীবটির সামান্য পরিচয় দিচ্ছি।

'আর্কেওপটারিক্স'কে সরীসৃপ-পক্ষী বলায় তোমরা যে খুব অবাক হয়েছ তাতে সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ আমার কথা শুনে নিশ্চয় হাসছ। কিন্তু সত্যি বলছি, ওটা হচ্ছে বুকে হাঁটা জীব আর পাখীর মিশ্রণ। এদের দেহে যেমন পাখীর মত পালক আছে, তেমনি আছে সরীসৃপের মত লেজ। তোমরা হয়ত বলবে, সব পাখীরই তো লেজ আছে, তার বেলায় আর নতুনত্ব কোথায়? নতুনত্ব আছে বই কি! এখন তোমরা পাখীর যে লেজ দেখ ('আর্কেওপটারিক্স' বর্তমান পাখীদের পূর্বপুরুষ বলে তার লেজেরও খানিকটা সে পেয়েছে, তবে সবটা নয়) তার গড়ন সম্পূর্ণ আলাদা। এখনকার পাখীর লেজ ছোট আর তাতে হাড়ের সংখ্যা কম, কিন্তু আর্কেওপটা-রিক্সের লেজ ছিল তার দেহের চাইতেও বড়। সেই লেজ-এ কম করেও কুড়িটি পৃথক, বেশ লম্বা হাড় ছিল, অনেকটা টিকটিকি ইত্যাদির মত। এই লেজও তার দেহের অন্য অংশের মত পালক দিয়ে বেশ সুন্দর ভাবে ঢাকা থাকত। সে যখন উড়বার জন্য পাখা মেলত তখন পাখার মত লেজের পালকও ছড়িয়ে পড়ত। তখন তাকে কেমন দেখা যায় তার একটা কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হল। তা দেখে পাখী-টার চেহারা সম্বন্ধে তোমরা কিছু আঁচ করতে পারবে।

আর্কেওপটারিক্সের আর একটি শিলীভূত দেহের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। এ দুটিকে মিলিয়ে পাখীটির এই কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে।

আর্কেওপটারিক্সের আকৃতি অনেকটা একটা ছোট কাকের মত। এর মাথার খুলিটা, বিশেষ করে মাথার খুলির সামনের দিকটা সরীসৃপের মাথার মত। অন্যান্য পাখীর মত এর কোন ঠোঁট ছিল না, কিন্তু মুখের ভেতর দাঁত ছিল—উপরের সারিতে ১৩টি আর নীচের সারিতে ৩টি। সব কয়টিই পৃথক পৃথক গর্তে বসান।

আর্কেওপটারিক্স পাখী উড়তে পারে বলেছি, কিন্তু এখন যেমন পাখীরা মুক্ত আকাশের তলে বাধাহীন ভাবে উড়ে বেড়ায় তখন সে তা পারত না—এত ওড়ার ক্ষমতা তার ছিল না। তার বুকের আর পায়ের গড়ন দেখে বিশেষজ্ঞগণ এ কথা নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আকাশে ওড়ার জন্য বুকের মাংসপেশী যেমন শক্ত আর মজবুত হওয়া দরকার এর মাংসপেশী তেমন নয়। তাছাড়া, ওর বুকে মাংসের পরিমাণও খুবই কম। ওরা সাধারণতঃ গাছের ডালের উপর বসত। দরকার মত এ ডাল থেকে ও ডালে, এ গাছ থেকে ও গাছে, তাও খুব দূরের গাছে নয়, উড়ে যেত। ওর পা দেখলেই বোঝা যায় তা ডাল আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত ছিল। তা ছাড়া অনেকের ধারণা পাখীটি মাটিতেও হেঁটে বেড়াতে পারত।

আর্কেওপটারিক্স কত ধরণের ছিল এবং তারা কি খেত তা জোর করে কেউ বলতে পারে নি। যাক, এই পাখীটি নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই অদ্ভুত পাখীটি সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য জানা যাবে।

শ্রাবণের কান্না

শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত

জানো কিগো শ্রাবণের কেন এতো কান্না,
সারাদিন বসে তিনি ছুটি কেন পান না?
এতো জল কেন চোখে, কী এমন দুঃখ্য,
ছেলেটা কি ব'কে গেছে—একেবারে মুখ্য?
স্বামী কি বকেছে খুব, তাই ঘরে যান না,
বলো তো এমন কেন শ্রাবণের কান্না!

সারাদিন কেন দেয় আকাশেতে ধর্না,
কেন মিশে হয় বলো 'তরলিত ঝর্ণা';
নাকি-সুরে গান কেন, কেন এতো কান্না,
শ্বাশুড়ী দেয়নি খেতে—হয়নি কি রান্না?

কেন চোখ ছলোছল,—অশ্রুতে পান্না;
মেঘদূত বুঝি আর অলকাতে যান না:
তাই বুঝি এই শোক, হে-শ্রাবণ আর-না;
কেন শ্রাবণের বুকে এতো জল: কান্না!!

চার মূর্ত্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—হাবুল সেনের মৃতদেহ—

আমি আর ক্যাবলা টপাটপ নিচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি—কোথাও কিছু নেই! টেনিদা নয়—গজেশ্বর নয়—স্বামী ঘুটঘুটানন্দের ছেঁড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়!

ব্যাপার কী! ঘচাংফুর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি?

ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুণি পড়ল রে! গেল কোথায়?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়া বিছেটাকে খুঁজছিলুম! সেটা আশে-পাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিনা কে জানে! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুণ্ডা গজেশ্বর কোনোমতে সামলেছে—কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙ্গার কালাজ্বর মার্কা প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি!

ক্যাবলা আমার কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বললে, এই—টেনিদা গেল কোথায়?

—আমি কেমন করে জানব?

ক্যাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজ্জব কি বাত! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি ?

কিন্তু পটলডাঙ্গার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লিডার—এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র! তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার: ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শিগগির। ভীষণ ব্যাপার!

যাব কোথায় ? কোন্‌খান থেকে ডাকছে ? এ যে সত্যিই ভূতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি! আমার মাথার চুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বললে, টেনিদা, তুমি কোথায় ? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না!

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর: আমি একতলায়।

—একতলা মানে ?

টেনিদা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কাণা নাকি? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিস নে?

আরে—তাইতো! এদিকে পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে! কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে। যাকে বলে রহস্যের খাসমহল!

টেনিদা বললে, মই বেয়ে নেমে আয়! এখানে ভয়াবহ কাণ্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার!

—অ্যাঁ!

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি। সত্যিই তো—একতলাই বটে! যেখানে নামলাম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো। কোত্থেকে আলো আসছে জানি না—কিন্তু ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। তার একদিকে একটা ইটের উনুন—গোটা দুত্তিন ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোণায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে—

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ।

ক্যাবলা বললে, হাবুল।

আমি বললাম, অমন করে পড়ে আছে কেন ?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল: নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে!

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল: ভয়ে আমি একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি। আমার হাত পা একটু একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমার পিঠের ওপর যেন শক্ত খোলা তৈরী হচ্ছে একটা। আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব!

আমি কোনোমতে বলতে পারলাম: ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ!

কথা নেই—বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল!

—ওরে হাবলা রে, একি হলরে! তুই হঠাৎ খামোকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে! ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে! ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলী আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে!

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ! আগে ছাখো—জিন্দা আছে কি মুর্দা হয়ে গেচে।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল। হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুট করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াত। সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায় হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললাম। আমার আবার কী-যে বিচ্ছিরি স্বভাব—কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি-টর্দি হয়ে যায়!

বার তিনেক নাক টেনে আমি বললাম, আলবাৎ মরে গেছে। নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল! আর কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

—বাপরে—ভূত হয়েছে।—বলেই আমি একটা লাফ মারলাম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা লাগল আমার মাথায়। কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে!—নাক গেল—নাক গেল বলে' টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস্ করে মেজেতে বসে পড়লাম আমি।

আর তক্ষুণি, দিব্বি ভালো মানুষের মত গলায় হাবুল বললে, এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়া খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইর‍্যা!

তখন আমার খট্‌কা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলে—এতো বেশ ঝর্‌ঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে! আর পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা।

শুনে, টেনিদা খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে উঠল।

—আহা-হা—কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যেন নবাবী চালে ঘুমুচ্ছেন! ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি—হতচ্ছাড়ার আক্কেলটা ছাখো একবার।

হাবুল আয়েস করে একটা হাই তুলে বললে, এক হাঁড়ি রসগোল্লা সাইট্যা বড় জব্বর ঘুমখান আসছিল! তা গজা দা কই? স্বামীজী কই গেলেন!

টেনিদা বললে, ঈস্ - বেজায় যে খাতির দেখছি! স্বামীজী—গজা দা।

হাবুল বললে, খাতির হইবো না ক্যান? কাইল বিকালে আসছি—সেই থিক্যা সমানে খাইত্যাছি। কী আদরযত্ন করছে—মনে হইল য্যান্ ঠিক মামাবাড়ী আসছি! তা তারা গেল কই?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব? তা তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি? এখানে এলিই বা কী করে?

—ক্যান্ আসুম না? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যামোন সুযোগটা ছাড়ুম ক্যান? এইখানে চইল্যা আসছি। স্বামীজী—গজা দা—আমারে যে কত যত্ন করছে—কী কমু!

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হু, কী আর করা। এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি।

ক্যাবলা বললে, এসব কথা এখন থাক। এই গর্তের মধ্যে ওরা ক'জন থাকত রে?

—জন চাইরেক হইবো।

—কী করত?

—কেমনে জানুম? একটা ছোট কলের মতো আছিল—সেইটা দিয়া খুটুর খুটুর কইরা কী য্যান্ ছাপাইত! সেই কলটাও তো দেখতে আছিনা! চইল্যা গেল নাকি? আহা-হা—বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে!—হাবুলের বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস বেরুল একটা।

—রাখ তোর খাওয়া।—টেনিদা বললে, চল্—এবার বেরুনো যাক এখান থেকে। আমরা সময় মতো এসে পড়েছিলুম—নইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত!

আমি বললাম, উঁহু, মোটা করে শেষে কাট্‌লেট্ ভেজে খেত।

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর্। হাঁ রে হাবুল—ওরা কী ছাপত রে?

—ক্যামন কইরা কই? ছবির মতো কী সব ছাপাইত।

—ছবির মতো কী সব!—ক্যবলা নাক চুলকোতে লাগল: পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি! বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত! জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর! শেঠ ঢুণ্ডুরাম!

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ ঢুণ্ডুরাম! হাবুলকে পাওয়া গেছে—আপদ মিটে গেছে। ওটা তো নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে—কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচোর দল সংকীর্তন গাইছে! চল্—বেরোই এখান থেকে—

আমি বললুম, আবার ওই মই বেয়ে?

হাবুল বললে, মই ক্যান্? এইখান দিয়াই তো যাওনের রাস্তা আছে।

—কোন্‌দিকে রাস্তা?

—ওই তো সামনেই।

হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হল ঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি: বাঃ! একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা খোলা মুখ! আর কাছেই সেই নদীটা—সেই শালবন।

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান্? অমন আরামের খাওন-দাওন! ভাবছিলাম—দুই চাইরটা দিন স্বাস্থ্যটারে একটু ভালো কইর‍্যা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইর‍্যা! হতচ্ছাড়া—পেটুকদাস! তোকে যদি গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তা হলেই উচিত শিক্ষা হত তোর।

কিন্তু বলতে বলতেই—

হঠাৎ মোটরের গর্জন।

মোটর। মোটর আবার কোত্থেকে। আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম?

হ্যাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোটরটা। কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশঃ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিশিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালো।

আর, আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন এক মুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক খাওয়া লাল্‌চে পাকা দাড়ি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি কি!

[ক্রমশঃ]

খোকার সংসারী

খোকাও তার মায়ের মত চা তৈরী করতে ভালবাসে।

ফটো : আরতি দাস (গ্রাঃ নং ৩৯১০)

শিশুসাথীর বৈঠক

বিশ্বশ্রীমনতোষ রায়

সুপ্রিয় ভাই-বোন সব,

কি খবর? তোমরা সব ভাল আছো তো? আবার আমরা আমাদের বৈঠকে মিলিত হচ্ছি—খুব আনন্দ হচ্ছে না কি? দেখো স্নেহ ভালবাসায় কি সুন্দর কাজ হয়,—মান অভিমান সব কিছুই হার মেনে যায় ওর কাছে। তোমরা মনে মনে হয়তো কত অভিমান করে বসেছিলে। আজ আর নিশ্চয়ই কোন অভিমান নেই, কি বল? তোমরা আমার কত আদরের কত প্রিয়! তোমাদের ভালো ভাবে গড়তে চাই। তার জন্য সব চাইতে কোন্ জিনিষের বেশী দরকার বলতো? "সহযোগিতা,"—চিরদিন নিশ্চয়ই তা পাবো, সত্য নয় কি?

মন দিয়ে তোমরা পূর্ব্বাপর সব ব্যায়ামগুলি অভ্যেস কচ্ছো তো? তোমরা তোমাদের কুশলবার্ত্তা সহ আমায় যেন পত্র দিতে ভুলে যেওনা।

এবার তোমাদের কয়েকটা চিঠির জবাব দেই—মন দিয়ে প্রত্যেকটি কথা সভ্যসভ্যারা মিলে পড়বে এবং আলোচনা করবে এ বিষয়ে—তবেই আবার নতুন প্রশ্ন তোমাদের কচি মনে জন্ম নেবে।

হরিহর রায় (বেলুড়) প্রঃ—ঘাম বেশী পড়াটা ভাল না, ঘাম একদম না হওয়াটা ভাল?

উঃ—ঘাম হওয়া ভাল তবে বেশী হওয়া ভাল নয়—আর তার চাইতেও খারাপ যদি ঘাম একদম না হয়।

কারণ কি জান? ঘামটা হল শরীরের ভেতরের দূষিত পদার্থ,—কিন্তু যখন মাত্রার চাইতে বেশী ঘাম ঝরতে থাকে তখন তা রক্তের মধ্যে যে জলীয় পদার্থ থাকে, যা রক্তকে সচল রাখতে সাহায্য করে—তা বেরিয়ে আসে। এতে রক্তটা চলাচলে বেশ অসুবিধা হয় এবং শরীর ক্রমশ দুর্ব্বল হয়ে আসে আর রোগের জীবাণুও পেয়ে বসে শরীরটাকে নষ্ট করার জন্য। বুঝলে?

মণিকা গুহ (বালিগঞ্জ)। প্রঃ—আগে ছিলনা—ব্যায়াম অভ্যাসের পর থেকে কেমন যে সর্দির একটা ধাঁচ্ বোধ কচ্ছি—ঘাম গায়ে বসে গেলে কি অমন হয়? বেশ ঘাম হয়।

উঃ—ওটাই ঠিক্। ঘাম তোয়ালে দিয়ে মুছে নেবে। গায়ের ঘাম গা'য়ে বসে গেলে সর্দি কাশি হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য্য নয়—হবেই। ব্যায়ামের পরে পাখা খুলে দিলে—কিংবা ঠাণ্ডা জল খেলেও অমন হতে পারে; নিজেও অমন করবে না আর কোন বন্ধুকেও করতে দিওনা।

মহেশ কাহার (দিনহাটা) প্র ঃ—আমাদের দেশে আপনার দলের ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখে ছোট্ট একটা কৌতূহল হল, বলছি,—অপরাধ হলে মাপ কোরবেন। কষ্ট করে যাতায়াত করে, ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখিয়ে আপনাদের লাভ কি? আপনারা কি শুধু এই করেন? চাকরী-বাকৃরী কিছু করেন না?

উঃ—তুমি ছোট্ট শিশু হলেও এই কৌতূহলের পেছনে একটু সুন্দর মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে আছে,—কৌতূহলে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দু'ই বাড়ে। অপরাধ তোমার মোটেই হয় নাই! শোন,—আমার দলের ছেলেমেয়েরা সবাই চাকরী করে, রোজগারও করে। Show দেখিয়ে রোজগার করেনা। আমিও চাকরী করি, ব্যায়াম শেখাবার চাকরী। ব্যায়াম শিক্ষায় বা শরীর রক্ষায় আমাদের দেশ ও জন বড় দুর্ব্বল, দেশ-জন কিছু শিখুক। নীরোগ দেহে বেশী দিন বেঁচে থাকুক আমাদের অনুকরণ করুক এই লাভ। তাছাড়া দূর দেশে যত ঘুরতে পারা যায় মানুষ ততই নানা বিষয় শিখতে পারে,—আমিও আমার অপূর্ণ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের ভাণ্ডারের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে যাই, কি কথাটা তোমার মন মত হয়েছে? সত্যি এ ছাড়া আর কোন লাভ হয় না বড় বেশী। একটি বছরে আমরা কত দেশ যে ঘুরি তার ফিরিস্তি ।দতে গেলে অন্য কথা লেখার আর যায়গাই থাকবে না।

মাধুরী বসু (ময়ূরভঞ্জ)। প্রঃ—গায়ের রং ফর্সা কি ব্যায়াম দিয়ে করে দিতে পারেন?

উঃ—না, পারিনা। তা হলে আমি নিজে অনেক আগেই ফর্সা হয়ে যেতাম।

—অষ্টাবক্র—

কলকাতার ফুটবল লীগের খেলার প্রথমার্দ্ধ পার হয়ে দ্বিতীয়ার্দ্ধও খানিকটা এগিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা জমেও উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে জমেছে বিদ্বেষ আর গ্লানির আবহাওয়া। খেলোয়াড়ী মনোভাব বলে যে কথাটার জন্যে ক্রীড়াজগতের লোকেরা গর্ব্ব অনুভব করে তা যেন উধাও হয়েছে কলকাতার ময়দান থেকে। খেলায় হারজিত আছে, তা নিয়ে উত্তেজনা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ খেলা চলে। খেলা শেষ হলে প্রতিদ্বন্দী দলের খেলোয়াড়েরা পরস্পর প্রীতি বিনিময় করে, খেলার সময়কার উত্তেজনা ভুলে যায়, ফিরে আসে স্বাভাবিক মানুষের সহজ ভালবাসা। এই জন্যেই খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বিনিময় হয়, এক দেশের খেলোয়াড়েরা যায় অপর দেশে বন্ধুত্বের আবহাওয়া ও সম্প্রীতির বন্ধন রচনা করতে। কলকাতার মাঠে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়, এবং তাদের সমর্থকরা এ বছর যেন এই কথাগুলো ভুলে গিয়েছে। আজকাল প্রায় প্রতি খেলাতেই গোলমাল হচ্ছে,

খেলা পরিচালক (রেফারী) সমর্থকদের হাতে, এমন কি কোন কোন খেলোয়াড়ের হাতেও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। দলীয় মনোভাব আজ যেন সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে দূষিত ক্ষত সৃষ্টি করছে। বৃটিশ আমলে এবং তারপর মুসলিম লীগের আমলে কলকাতায় খেলার মাঠে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আগুনে বাংলা দেশের ক্রীড়াক্ষেত্র জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত আবার কি সেই আগুন জ্বালিয়ে আমরা নিজেরাই দগ্ধ হব ? এত বড় নির্ব্বুদ্ধিতা ক্রীড়ারসিক জনসমাজ আর কখনই প্রশ্রয় দেবেন না। খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে সমস্ত জিনিষ তাঁদের দেখতে হবে। খেলা পরিচালনায় ভুল ত্রুটি কিংবা ব্যবস্থাপনার গলদ দূর করতে হলে গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। মহান উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হলে গলদ নিশ্চয়ই দূর হবে। তাই বলে এক নোংরামি দূর করতে গিয়ে আরও এক বড় নোংরামি সৃষ্টি করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

এখন খেলার কথায় ফিরে আসা যাক। লীগ প্রতিযোগিতা এখন বেশ ভালই জমবে। কারণ লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে কলকাতার তিনটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দলকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত মোহনবাগান ১৮টি খেলায় ৩০ পয়েণ্ট, ইষ্টবেঙ্গল ১৭টি খেলায় ২৭ পয়েণ্ট আর মহমেডান স্পোর্টিং ১৮টি খেলায় ২৬ পয়েণ্ট পেয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইষ্টবেঙ্গল এবার প্রায় মোহনবাগানকে ধরে ফেলেছে। ১৭টি খেলায় তারা ২৭ পয়েণ্ট পেয়েছে এবং আর একটা খেলায় জিতলে মোহনবাগানের সমান সংখ্যক খেলায় তারা মাত্র এক পয়েণ্টের ব্যবধানে থাকবে। মহমেডান স্পোর্টিং অপ্রত্যাশিত ভাবে পর পর দুটো পয়েণ্ট হারিয়ে চার পয়েণ্ট পেছনে পড়ে গেল।

কলকাতার রেল দল দুটি এবার বেশ ভাল খেলছে এবং তারাই যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চমস্থান (৮ই জুলাই পর্য্যন্ত) অধিকার করেছে। তারপরই নাম করতে হয় তরুণ খেলোয়াড়পুষ্ট এরিয়ান্স দলের। এই দলটির তারুণ্যদীপ্ত খেলা সকলেরই প্রীতিপদ এবং খুব হাঁকডাক না করেও দলটি তালিকায় বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। রাজস্থান দলে নামকরা খেলোয়াড়দের সমাবেশ ঘটলেও এবং মাঝে মাঝে নাম করবার মত খেললেও দলগত সংহতির অভাবে তেমন সুবিধে করতে পারছে না।

এ বছর প্রাচীন কালীঘাট দলটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। লীগ তালিকায় দলটি সকলের নিম্নস্থানে আছে। ১৬টি খেলার মধ্যে একটিতেও তারা জিততে পারেনি। মাত্র ৬টি খেলায় ড্র করে ৬ পয়েণ্ট অর্জ্জন করেছে।

কলকাতায় অলিম্পিক চীনা ফুটবল দল—অলিম্পিক চীনা ফুটবল দল কলকাতায় এসে প্রথম খেলায় মোহনবাগান দলকে শোচনীয় ভাবে ৮-১ গোলে পরাজিত করায় ভারতীয় ফুটবল মহলে চীনা দলের শক্তি সম্পর্কে এক বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কারণ এর আগে মোহনবাগান কোন বিদেশী দলের কাছে এমন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় নি। কিন্তু এর পরের দুটি খেলাতে চীনা

দলের খেলায় এত জৌলুস দেখা যায় নি। দ্বিতীয় খেলায় চীনা দল মহমেডান স্পোর্টিং দলকে মাত্র ৩-১ গোলে পরাজিত করে এবং এই খেলায় তাদের প্রথম দিনের মত দাপট দেখা যায় নি। বরং মহমেডান স্পোর্টিং দলকেই অনেক সময় প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা গেছে।

চীনা দল কলকাতায় তৃতীয় ম্যাচ খেলে আই-এফ-এ দলের সঙ্গে। এই খেলাতে চীনা দলের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে। আই-এফ-এ দল চীনা দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয়। আই-এফ-এ দলের এই দিনের খেলা দেখে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের চোখ জুড়িয়ে যায়। অনেক দিন আই-এফ-এর নির্ব্বাচিত কোন ফুটবল টিমকে এত ভাল খেলতে দেখা যায় নি। এর কারণ আই-এফ-এ এবার সত্য সত্যই নিরপেক্ষ ভাবে একটি প্রকৃত শক্তিশালী দল গঠন করতে পেরেছিল। তরুণ খেলোয়াড়-পুষ্ট এই দলটি ভাল আদান-প্রদান ও আক্রমণ রচনার ক্ষিপ্রতা চীনা দলকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। আই-এফ-এ দলের পক্ষে গোল করেন মুসা, কিট্টু আর প্রদীপ ব্যানার্জ্জি।

—বিশ্বদূত—

অনেকটা গল্পেরই মত—ছোট্ট ছেলে। বছরখানেক বয়েস। বাড়ীর পাশে খেলবার সময় সে একটা সাপ দেখতে পায়। কৌতূহলবশে সে সাপটিকে ধরে ফেলে। তারপর সাপের মাথার দিকটা তার গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সাপটাকে গিলতে সুরু করে। কিন্তু অর্দ্ধেকটা গিলবার পর আর বাকী অংশটা ওর গলার ভেতরে ঢুকতে চায় না। তখন ছেলেটি খুব বিপদে পড়ে। ভেতরেও যায় না বারও হয় না। ছেলেটির চীৎকারে অনেক লোক এসে সেখানে জোটে। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তার মরা অবস্থায় সাপটিকে গলার ভেতর থেকে বার করেন। ছেলেটি সুস্থই আছে। ঘটনাটি ঘটেছিলো হাজারিবাগ জেলার পদ্মার নামে এক গাঁয়ে অল্প কিছুদিন আগে।

বালকের সৎসাহস—বাঁকুড়া জেলার পিয়ারডোবা স্টেশনের কাছে শিরোমণিপুর উদ্বাস্তু কলোনীতে হরিপদ মণ্ডল নামে একটি ছোট ছেলে তার মায়ের সাথে থাকে। একটি লোক শত্রুতা করে হরিপদকে মেরে ফেলবার জন্য কলোনী থেকে দূরে এক নির্জ্জন জায়গায় এক কূয়োর ভেতর ফেলে দেয়। প্রায় দু'দিন পরে একটি মেয়ে সেখান দিয়ে যাবার সময় শুনতে পায় যে কূয়োর ভেতর থেকে কে যেন জল চাইছে। কূয়োর কাছে গিয়ে সে দেখতে পায় ছোট একটি ছেলে কূয়োর ভেতর

পড়ে রয়েছে আর একটি গোখরো সাপ তার মাথার ওপরে ফণা ধরে আছে। মেয়েটির হৈ চৈতে বহুলোক এসে সেখানে জমা হয়। কিন্তু কেউই কুয়োর ভেতর নাম্‌তে সাহস পায় না। তখন অজিতকুমার দে নামে এগারো বছরের একটি ছেলে কুয়োর ভেতর নামতে রাজী হয়। তাকে ঝুড়িতে বসিয়ে কুয়োর ভেতর নামিয়ে দেওয়া হয়। সাপটি ভয়ে পালিয়ে যায়। অজিত ছেলেটিকে ঝুড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজে পরে উঠে আসে।

সরল পথ ও বাঁকা পথ—সরল রেখা ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেলেই যে সব সময় দূরত্ব কম হয় তা নয়। এজন্যই অনেক সময় নাবিকেরা সমুদ্র-পথে চলতে গিয়ে পথের দূরত্ব কমাবার জন্য বাঁকা পথ ধরে চলে। তাতে সময় অনেক কম লাগে।

হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা—অ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলো দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা হয়েছে। তার ফল খুবই বিষময় হয়েছে। এই ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে, এশিয়ার কতকগুলো দেশে মানুষ থেকে সুরু করে নানা শ্রেণীর প্রাণী ও প্রাকৃতিক বস্তুর উপর তেজক্রিয়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়ঙ্কর। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অতি বৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি প্রভৃতি এই তেজস্ক্রিয়তারই ফল বলে বিজ্ঞানীরা বলেন। কলকাতা শহরে বৃষ্টির জলে পর্য্যন্ত হাইড্রোজেন বোমার পরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। কলকাতার চতুর্দ্দিকস্থ জমিতে যে সব শাকসব্জী জন্মায় তাতেও তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে। অবিলম্বে এ ধরণের মারাত্মক পরীক্ষা বন্ধ না করলে তার ফল অত্যন্ত বিষময় হবে।
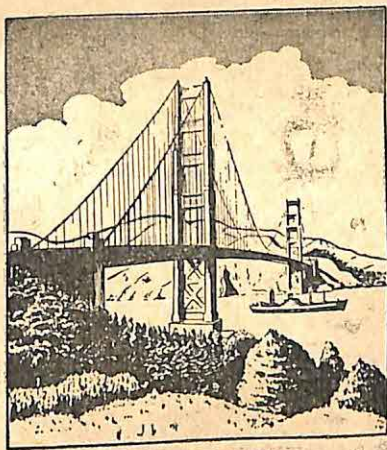
মজার পুল—অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে গোল্ডেন গেট ব্রিজ পুলটি ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সে দেশে বায়ুর চাপ বেশ প্রবল, ভূমিকম্পও বেশ হয়। তাই ভূমিকম্প ও বায়ুর চাপে যাতে পুলটির ক্ষতি না হয় এজন্য একে এমন কৌশলে তৈরী করা হয়েছে যে হাওয়ার দোলায় বা ভূমিকম্পের কাঁপুনিতে পুলটি ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দু'দিকের যে কোন দিকে সরে যেতে পারে। ফলে, ঐ সময় পুলটির কোন ক্ষতি হতে পারে না।
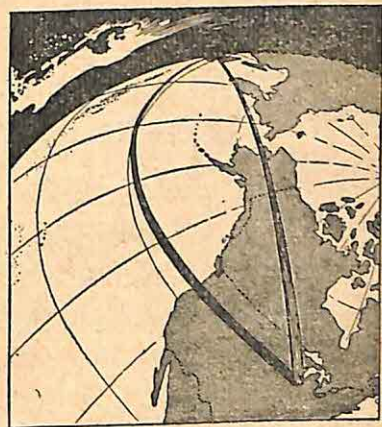
বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য্য—বিশ্বভারতীর পরলোকগত উপাচার্য্য প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মৃত্যুর পূর্ব্বে ইচ্ছা জানিয়েছিলেন যে তাঁর জায়গায় যেন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক বসুর এই পদে নিয়োগকে সকলেই বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে বিশ্বভারতীর মধ্যে রূপায়িত করে তোলবার পক্ষে অধ্যাপক বসুর মত যোগ্য ব্যক্তি সারা ভারতে এখন আর খুব বেশী নেই।

ডাক-বিভাগের বিপদ—দিল্লীর কাছাকাছি গুরগাঁও শহরের এক ডাকঘরে গিয়ে এক সাধু মণি অর্ডার ক্লার্ককে কিছু টাকা দিয়ে তাকে অনুরোধ করেন যে টাকাটা যেন তিনি ভগবানের নামে পাঠিয়ে দেন। "এয়সা হোতা নেহি" বলে যদি ক্লার্ক সাধুকে ফিরিয়ে দেন তবে সাধুজী হয়ত হাঙ্গামা বাঁধাবেন তাই তিনি একটু বুদ্ধি করে ফরম লিখে আনতে বলেন। সাধুজী তার কথা না শুনে ডাক বাক্সে টাকাগুলো ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে যান। চিঠি হলে সেটা ডেড্‌ লেটার অফিসে পাঠানো যায় কিন্তু এ টাকাটা কি করা যাবে তাই নিয়ে ডাকবিভাগে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে।

নতুন বই

সোনালী নদীর রাজা—লিখেছেন মণিলাল অধিকারী, ২৪৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, বাণী-তীর্থ থেকে গ্রন্থকারই প্রকাশ করেছেন। দাম আট আনা।

জন রাসকিনের বিখ্যাত গল্প The King of the Golden Riverকে মণিবাবু যারা সবেমাত্র পড়তে সুরু করেছে তাদের জন্য জোড়া হরফ বাদ দিয়ে বাংলার পরিবেশন করেছেন। তাঁর বলবার ঢং ভালো, ভাষাও ছোটদের উপযোগী। এ ধরণের বই তিনি আরও লিখেছেন এবং সে বইগুলো বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছে। এ বইখানাও তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। বইখানা দু রঙে ছাপা। আট আনা দামও বেশী নয়।

ওলোট্ পালোট—লিখেছেন প্রভাসচন্দ্র সেন। ৩৫।বি, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা ২৫ থেকে গ্রন্থকারই প্রকাশ করেছেন। দাম ১৷৹ আনা।

আগাগোড়া দুরঙে ছাপা বইখানায় ছোটদের উপযোগী কতকগুলো সুন্দর সুন্দর ছড়া আছে। ছড়া লিখতে হলে ছন্দের ওপর ভালো অধিকার থাকা দরকার। লেখকের সে গুণ বিশেষভাবেই আছে বলে মনে হয়। ছোটরা ছড়াগুলো পড়ে শুধু খুসীই হবে না, বইখানা পেলে তাদের ভেতর রীতিমত কাড়াকাড়িও পড়ে যাবে। বইয়ের ছবিগুলোও ছোটদের বেশ উপভোগ্য হবে।

ছোটদের গোর্কীর মা—লিখেছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র আর ১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ থেকে প্রকাশ করেছেন শিশুসাহিত্য সঙ্ঘ। দাম ২৲ টাকা।

গোর্কীর মা বিশ্ব-সাহিত্যের একখানা সেরা বই। পৃথিবীর সব সভ্য দেশের ভাষায়ই এ বইখানার অনুবাদ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ পাঠকের অভিনন্দনও লাভ করেছে বইখানা। বাংলায়ও এর একাধিক অনুবাদ আছে। সুসাহিত্যিক খগেনবাবু এ বইখানার কিশোর-সংস্করণ বার করে সত্যিকার একটি অভাব পূরণ করেছেন। তাঁর নিজস্ব চমৎকার ভঙ্গীতে বলা এই বিশ্ব-বিখ্যাত কাহিনীটি যে ছোটদের কাছে সত্যিসত্যি লোভনীয় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। ছাপা বাঁধাই প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় দেয়। বইখানা যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে তৃতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

নতুন ধাঁধা

বীতপাল

দুটী ব্যাং একটা ফড়িংকে তাড়া করল খাবার জন্য। ফড়িংটা গোলক ধাঁধার ভিতর আশ্রয় নিল। গোলক ধাঁধার দুটী পথ আছে। ব্যাং দুটো একই সঙ্গে ঐ দুই পথে গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করল। বলত কোন ব্যাংটার ভাগ্যে ফড়িংটা আছে—ডান্ না বাঁ দিকের টার।
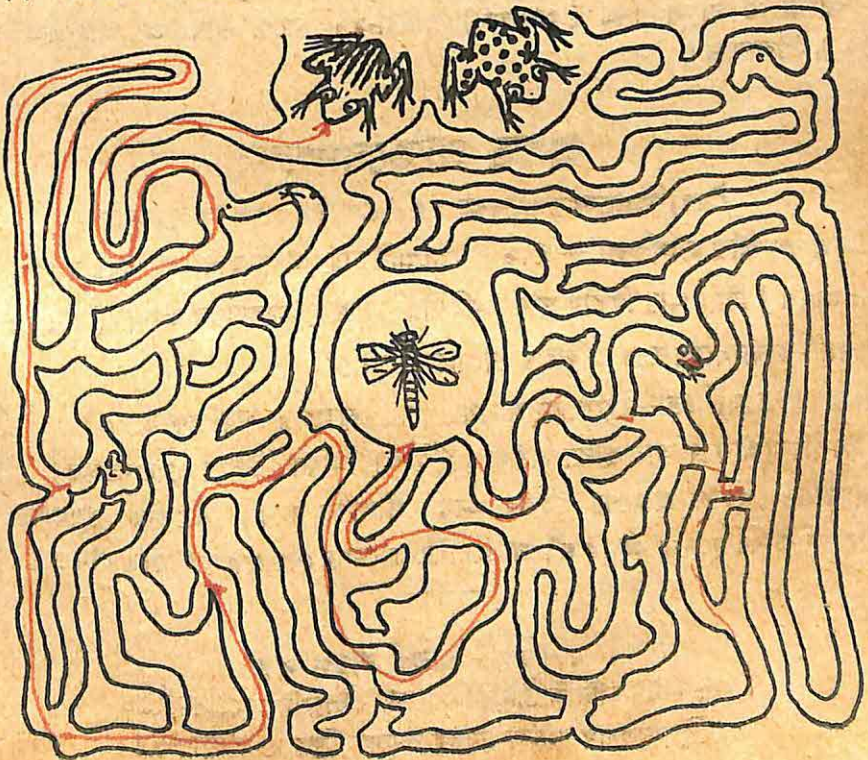
গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চার বন্ধুতে মিলে যে পথে এসেছিল, সেই দিকের নামানুসারে পোষ্টটি রেখে তারা বুঝতে পারলে ডায়মণ্ডহারবারের পথ কোনদিকে।

উত্তরদাতাদিগের নাম

ঝর্ণা মিত্র—১৫১৫৮, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীগোপালচন্দ্র, শ্রীসমরচন্দ্র ও শ্রীমদনচন্দ্র, বরাবাজার, মানভূম; বরুণ সরকার—৯২০৭, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা; সিদ্ধার্থ ও জয়ন্তী—১৭২৩৬, ভবানীপুর, কলিকাতা; রথীন দে—জামসেদপুর; শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য্য, হাবুল, নিত্যগোপাল ও শেলী—১৬১৪২, ডিব্রুগড়, আসাম; সমীর ও প্রবীর—১৭০৯৭, রামদাস পেট, নাগপুর; আরতি, অতনু, সুভাষ, সুচিৎ, অপর্ণা ও অলকা বসু—১১২২৭, বসুধাম, কাঁথি; উমা দেবী—১৬৯৯৪ সদর বাজার রায়পুর, মধ্যপ্রদেশ; শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু—আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি; শ্রীকুমারশশী দে—১৬৯২৩, শিলচর; অভিজিৎ, অমাজিৎ ও দেবযানী—১৫৬০১, লাবান, শিলং; পার্থরঞ্জন দাশগুপ্ত, বারাণসী-২; কুমারী ভারতীরাণী দে—১৭২২৭, জওহর স্কোয়ার, এলাহাবাদ; শ্রীসুশান্ত কুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসুমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, হালতু (শৈল নিবাস); রেবা ও বিমান বিশ্বাস—১৬৭২৬, যাদবপুর; প্রসাদ সেনগুপ্ত, তেজপুর; স্বস্তিকা, প্রমথেশ, ইরেশ ভট্টাচার্য্য, চাঁদঘিরা কাছাড়, আসাম; প্রণব রায়, মেদিনীপুর; কুমারী অনুভা সিংহ—১৭২৯৬, শালকিয়া, হাওড়া। অঞ্জলি, আরতি, সন্ধ্যা, রবিন, অনুপ, দিলীপ (১৫০৪১) শিলং; দিলীপকুমার মিত্র, কলিকাতা; সুবীর, আলো ও বাবুল মিত্র (১৬৪৭৩) পাটনা-১; অশোকনাথ ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (১৪৬৫৫), শ্রীরামপুর।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

জৈ্যষ্ঠমাসের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

"বুদ্ধ জয়ন্তীর সার্থকতা"—প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে মীরা ঘোষ (গ্রাঃ নঃ ৯৯৪৭) দিল্লী আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মনোরঞ্জন জানা (গ্রাঃ নঃ ১৭২৩২)। এরা শিশুসাথী কার্য্যালয়ের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করবে।

চিত্র প্রতিযোগিতা—মেয়েদের আলপনা আর ছেলেদের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে পাঠাতে হবে। চাইনিজ কালীতে আঁকবে আর ছবির সাইজ ৫½″×৩½″ ইঞ্চির উপরে যেন না হয়। প্রত্যেকটিতে একটি পুরস্কার। ২৫শে শ্রাবণের ভেতর এসে পৌঁছাতে হবে। প্রত্যেক পুরস্কারে আশুতোষ লাইব্রেরীর চার টাকা মূল্যের বই বিজয়ী প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরণ ধর**
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিশুসাথী
সম্পাদক

ডিরেক্টর বাহাত্বর কর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

৩৫শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

শিশু সাথী

ভাদ্র
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪, টাকা] [প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

শেষের শুরু...
যখন চুল উঠতে শুরু করে তখন মাথায় বালিশেই তার আরম্ভ। একবারও ভাববেন না যে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। এর সূত্রপাত হওয়ামাত্র ভাল করে মাথা ঘষে জবাকুসুম ব্যবহার শুরু করুন। স্নানের আগে অন্ততঃ দশমিনিট মাথায় জবাকুসুম মালিশ করুন। কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই চুল ওঠা বন্ধ হবে কিন্তু নিয়মিত জবাকুসুম ব্যবহার করতে ভুলবেন না।
এখনই সাবধান হউন
জবাকুসুম
কেশশ্রী বৃদ্ধি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে

লোকমান্য তিলক

৩৫শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৬৩ | ৫ম সংখ্যা

তাই ভাদ্দরে

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

আজকে আকাশ ক্লান্ত বেজায়
জল ঝ'রে তাই ভাদ্দরে,
মেঘগুলি ওই থম্‌কে দাঁড়ায়
গোম্‌রা মুখে হাত ধ'রে!

টিপ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ে
এইপাশে আর ওইপাশে,
জল ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ পড়ছে ঝ'রে
পুকুর পারের ঐ ঘাসে;
বৃষ্টি পড়ে আকাশ জুড়ে
জল থই থই মাঠে,
টাপুর টুপুর একতারাতে
আজ যে সময় কাটে!

ঘড়ির যেন নেইকো খেয়াল
আপিস বুঝি ছুটি
আকাশ তলে তাই মেঘেরা
করছে হুটোপুটি।
জল ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি পড়ে
দুষ্টু বাতাস গান ধরে,
আজকে আকাশ ক্লান্ত বেজায়
জল ঝ'রে তাই ভাদ্দরে!

স্বপ্ন

শঙ্কর বসু

বিনয় রাজনগর চলেছে।

কোন এক নামকরা ইংলিশ ফার্মে সে চাকরী করে। এম-এ পড়তে পড়তে এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়ে এই ফার্মের উদ্দেশ্যে একটা আবেদন-পত্র ছেড়েছিল। মাস তিনেক বাদে প্রায় অভাবনীয় ভাবেই সে কাজটা পেয়ে গেল। এই অফিসের কাজেই সে আজ রাজনগর চলেছে।

রাত্রি বারোটা হবে। হঠাৎ একটা ছোট স্টেশনে এসে ওদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে ট্রেন আসার কথা নয়। কি ব্যাপার জানবার জন্য সে জানলা দিয়ে মুখটা বাইরে বার করল।

বিনয়কে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী দেখে গার্ডসাহেব জানালেন যে, এক স্টেশন আগে একটা মালগাড়ীর ইঞ্জিন লাইন থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং রাস্তা খালি না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের এই স্টেশনেই থাকতে হবে। অর্থাৎ কাল সকালের আগে আর ট্রেন ছাড়বে না। বিনয় একটা কুলি ডেকে তার সুটকেস, বেডিং ও অ্যাটাচিটা নামিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম। এক মিনিটও ভেতরে থাকা যায় না। এক কোণে জিনিসপত্র রেখে বিনয় বাইরে বেরিয়ে এল। আব কি করবে এই রাত্রে, টর্চটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মটাই ঘুরেফিরে দেখতে লাগল।

বেশ বড় প্ল্যাটফর্ম। তবে অন্ধকার দূর করবার ভাল ব্যবস্থা নেই। বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে কয়েকটা সাবেক কালের কেরোসিন ল্যাম্প। আশপাশের রং ফেরাবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। মাঝে মাঝে বেশ ঘন অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে। বিনয় একটা বেঞ্চে বসল।...

বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। টর্চ জেলে ঘড়িটা দেখল। মাত্র সাড়ে বারোটা। বিনয় উঠে পায়চারী আরম্ভ করল। স্টেশনের উত্তর দিকে একটা বড় গাছ। কি গাছ কে জানে! বিনয় সেইদিকে এগিয়ে চলল। দূরের একটা ল্যাম্পের একটুখানি আলো এসে সেখানে পড়েছে। কোন কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। আলো আর অন্ধকার মিলে একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হয় গাছটার নীচে কাদের যেন ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের অজান্তেই বিনয়ের গা'টা রীতিমত শিরশির করে ওঠে। কেমন যেন মনে হয়।

ফিরে যাবার জন্য মুখ ফেরাতেই একটা আওয়াজ কানে এল।

"বাবু......"

বিনয় থমকে দাঁড়ায়।

আবার ডাক।

এবার বিনয় ঘুরে দাঁড়াল।

একটা লোক। গাছতলার আলো-আঁধারের মাঝে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একটু আগেই ত সে দেখেছে গাছের নীচে কেউ নেই। তাহলে এ লোকটা এল কখন? বিনয়ের কি রকম যেন সন্দেহ হয়।

"বাবু একটা কথা শুনবেন?"

লোকটা বিনয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে এল।

এবার তাকে আরও একটু ভালভাবে দেখা গেল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আধ-ময়লা ছেঁড়া শার্ট ও ধুতি তার রুক্ষ শীর্ণ দেহটাকে কোন রকমে যেন জড়িয়ে আছে। মাথায় বড় বড় তেলহীন চুল। পায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া কেড্স্। ফিতের কোন চিহ্ন নেই।

বিনয় টর্চটা জ্বালতে গেল।

কিন্তু লোকটা মানা করল।

"না, না, বাবু আলো জ্বালবেন না। আলো জ্বাললে চোখ যেন আমার অন্ধ হয়ে যায়, আমি দেখতে পাই না।"

"কি চাই তোমার?" বিনয় জিজ্ঞেস করল।

"সে অনেক কথা বাবু," লোকটা বলল, "বেশী শোনবার ধৈর্য আপনার থাকবে না। আমি খুব ছোট করেই বলছি। আমার নাম শশীশেখর চৌধুরী। আগে আমি কলকাতার একটা অফিসে কেরাণী ছিলুম। কিন্তু দু' বছর হল মিথ্যে বদনাম দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রী একটি বারো বছরের মেয়ে রেখে আজ এক বছর হল মারা গেছেন। সেই মেয়েই আমার এখন সব। কিন্তু আজ পনের দিন হল মেয়েটার ভীষণ জ্বর। আমার একটা পয়সাও নেই যে ডাক্তার দেখাই। জমিজমাও নেই, সব অন্য লোকে নিয়ে নিয়েছে। আপনি একবার আমার মেয়েকে দেখবেন চলুন।"

"আমি তোমার মেয়েকে দেখে কি করব," বিনয় বলল, "আমি ত ডাক্তার নই।"

"তবু আপনি একবার চলুন।"

বিনয় ইতস্তত করছিল।

"আসুন।" শশীশেখর বিনয়ের ডান হাতটা ধরল।

হাতটা কি ঠাণ্ডা! বিনয়ের শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শশীশেখরকে অনুসরণ করল।

রেললাইন পার হয়ে স্টেশনের বাইরের দিকে শশীশেখর চলল। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা, সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে। কিছুদূর গিয়ে শশীশেখর একটা মেটে ঘরের সামনে দাঁড়াল। তারপর ঝাঁপ ঠেলে বিনয়কে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে কাঠের বাক্সের ওপর একটা প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। হাওয়া লেগে শিখাটা এমন কেঁপে উঠল যে, মনে হল বুঝি বা নিবে যাবে। বাক্সের পাশে একটা ভাঙ্গা চৌকীর ওপর কে একজন শুয়ে আছে। বিনয় লক্ষ্য করে দেখল একটি বার তের বছরের মেয়ে।

শশীশেখর মেয়েটির কপালে হাত রাখল।

"উমা, মা আমার, কেমন আছিস্, এখন ?"

উমা উত্তর দিল না।

শশীশেখর আরও কয়েকবার ডাকল।

কিন্তু উমা চুপ।

শশীশেখরের অনুপস্থিতির সময় উমা মারা গেছে।

শশীশেখর বুঝতে পারল উমা আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ সে বিনয়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

"কে, কে তুমি? তুমিই আমার মেয়েকে মেরেছ। হাঃ হাঃ হাঃ—ভেবেছ কিছু বলব না। নাও, এখন তুমিও মর।..."

শশীশেখরের শীর্ণ হাতটা বিনয়ের গলায় চেপে বসছে। জোরে...আরও জোরে...বিনয়ের দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের সামনে সব অন্ধকার।...

সকাল হয়ে এসেছে। বিনয় চোখ খুলল। একি! সে যে ওয়েটিংরুমের সামনের বেঞ্চে শুয়ে! শশীশেখর আর তার মেটে ঘরের কোন হদিস নেই। সে বেঁচে আছে নাকি? চোখ কচলে ধড়মড় করে বিনয় বেঞ্চের ওপর উঠে বসল। চুল ধরে টেনে দেখল। নাঃ, সে বেঁচেই আছে। এতক্ষণ তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল! আড়মোড়া ভেঙে সে উঠে দাঁড়াল। ওঃ, সারা রাত একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছে। ওয়েটিংরুমে গিয়ে জিনিসপত্র ঠিক আছে কি না দেখে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে পা চালাল।

বাঙালী দেখে স্টেশন মাস্টার খুব খুসি। বিনয়কে চেয়ার দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। স্টেশন মাস্টারের নাম রামকৃষ্ণ লাহিড়ী। সংক্ষেপে কেষ্টবাবু।

"আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে কখন," এক সময় বিনয় জিজ্ঞেস করল

"পাঁচটা, ছ'টার আগে ছাড়বার কোন সম্ভাবনা নেই," ঘড়ি দেখে রামকৃষ্ণবাবু বললেন। "চা খাবেন ?" পরে প্রশ্ন করলেন।

"না, না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। পরে খেয়ে নেব।" বিনয় বাধা দিল।

"আরে রাখুন মশাই আপনার ভদ্রতা," রামকৃষ্ণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "চা আমিও খাব, আপনিও খান।"

বিনয় হেসে সম্মতি জানাল।

একটু পরেই চা এল।

চা খেতে খেতে বিনয় এ জায়গাটা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারল।

এক সময় সে প্রশ্ন করল ঃ "আচ্ছা, এখানে শশীশেখর চৌধুরী বলে কোন লোক থাকত কি ?"

"কেন বলুন ত ?" রামকৃষ্ণবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

বিনয় তখন তার রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে বলল। সব কথা শুনে তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ঃ "বেশ তাহলে গোড়া থেকেই শুনুন!"

চায়ের কাপে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে তিনি তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন।

"প্রায় দু-বছর আগের কথা—"

ঘটনাগুলো সাজিয়ে নেবার জন্য বোধহয় একবার থামলেন।

"হ্যাঁ, প্রায় দু-বছর আগের কথা, শশীশেখরকে চাকরী থেকে কোম্পানী ছাড়িয়ে দেয়। শশীশেখর এখানেই এসে থাকতে আরম্ভ করেন। কি কারণে তাঁকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেয় তা আমাদের অজ্ঞাত। তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। মাস ছয়েক বাদে তাঁর স্ত্রী মারা যান। জমিজমাও কিছু তাঁর ছিল না। কি করে তাঁর চলত কেউ জানে না। মাসের মধ্যে সাত আট দিন একবেলা খাওয়া হত। এইরকম ভাবে কিছুদিন চলল। তারপর তাঁর মেয়ের হল টাইফয়েড। কোন রকম চিকিৎসা সম্ভব হল না। দিন কুড়ি বাদে মারা গেল মেয়েটি। এর মাস তিনেক পরে একদিন রাত্তিরে শশীশেখর স্টেশন থেকে একজন লোককে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খুন করেন। পনের দিনের মধ্যে আরও দুটো খুন হল। এর কয়েকদিন পরে একদিন সকালে দেখলুম স্টেশনের উত্তরের ঐ গাছটায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় শশীশেখরের দেহটা ঝুলছে।" এই পর্য্যন্ত বলে রামকৃষ্ণবাবু থামলেন।

বিনয় চমকে উঠল। সেও ত স্বপ্নে তাই জেনেছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঃ

"আচ্ছা, স্বপ্নে যা দেখেছি তেমন করেই কি সকলকে হত্যা করা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ," রমকৃষ্ণবাবু উত্তর দিলেন।

ঢন্ ঢন্-ন্ ঢন্। ট্রেন ছাড়বার সময় হল। বিনয় বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ট্রেনে ওঠার পরও তার বার বার মনে হতে লাগল সে কি সত্যই স্বপ্ন দেখেছিল! বাস্তব আর স্বপ্নে এমন মিল!

অথ শশক-মৃগ কথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এমন নিরীহ প্রাণী নাকি আর নেই। কারও কোন অনিষ্ট করে না। এদের শান্ত, ভীরু চোখ দেখলে সত্যি মায়া হয়।

হ্যাঁ, আমি খরগোস আর হরিণের কথাই বলছি। এই দুই শ্রেণীর প্রাণীই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা খরগোস কিংবা হরিণ থাকে, তাহলে, ওদের দিকে তাকিয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা কর ত: এমন একটি দেশ আছে যেখানকার লোকেরা হিংস্র জন্তুদের মতই এদের ভয় করে, দূর থেকে এদের দেখতে পেলেই হায় হায় রব উঠে যায়।

সেই দেশটি হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। প্রচুর শস্য উৎপাদনের জন্য এটি বিখ্যাত। এর যে কোন অংশেই গেলে দেখা যাবে বহুদূর বিস্তৃত গমের ক্ষেত। কিন্তু খরগোস পালের উপদ্রবে শস্যের দারুণ ক্ষতি হয়। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা মনে করে, এমন সর্বনেশে জীব আর কিছু হতে পারে না।

নানাভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা সত্ত্বেও আনুমানিক হিসেব অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ায় খরগোসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি! এরা যে শুধু শস্যাদি খেয়েই দেশের ক্ষতি করে তা নয়। ভেড়ার মাংস এবং লোমজাত পশম থেকে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের প্রচুর লাভ হয়। কিন্তু খরগোসের পাল ঘাস খেয়ে ফেলার দরুণ ভেড়াদের ভাগ্যে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অথচ মজা হচ্ছে এই যে প্রথমে এই প্রাণীটিকে আদর করেই ঘরে নেওয়া হয়েছিল। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর জ্যাক্‌সন বন্দরে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ঔপনিবেশিকেরা যখন প্রথম অবতরণ করে, তখনই এদের আমদানি করা হয়। সেখান থেকে তাদের আনা হয় ভিক্টোরিয়াতে। তখন তাদের খাতির কত! একবার এক জমিদার বারোটি খরগোস কিনেছিলেন, প্রতিটির দাম পড়েছিল ১ পাউণ্ড, অর্থাৎ চোদ্দ-পনের টাকা!

কিন্তু হু হু করে খরগোগের সংখ্যা বেড়েই চলল, কুইন্সল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে এদের বেশী দেরী হল না। তখন তাদের আর পায় কে, মাটি খুঁড়ে অজস্র গর্তের বাসা তৈরী করে দিব্যি থাকতে লাগল, আর মনের আনন্দে শস্যাদি নষ্ট করে মানুষের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলল। এখন এরাই হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ানদের পয়লা নম্বরের শত্রু!

প্রথম প্রথম জমির মালিকেরা খরগোসদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। এদের ধ্বংস করার জন্যে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ভিক্টোরিয়ায় আইন পাশ করা হল। জমির মালিকদের মধ্যে যারা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে না, এই আইনের সাহায্যে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এখন খরগোসদের উপদ্রব থেকে নিজ নিজ জমি রক্ষা করার দায়িত্ব চাষীদেরই, অবিশ্যি গভর্ণমেণ্ট তাদের সাহায্য করে থাকেন।

খরগোসের মাংস আর চামড়া বিক্রি করে যে কিছু লাভ হয় না তা নয়, কিন্তু গোটা দেশের ক্ষতির তুলনায় সেটা এমন কিছু নয়।

আক্রমণ আর আত্মরক্ষা—যুদ্ধে এই দুই নীতিই অবলম্বন করা হয়। খরগোসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা এ দুটোকে গ্রহণ করেছে।

প্রথমে আত্মরক্ষা, আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়ার কথাই বলা যাক। খরগোস দমনের জন্য সরকারের একটা আলাদা বিভাগই আছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার গমক্ষেতগুলো লম্বা বেড়া দিয়ে ঘিরে গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে এই প্রাণীদের উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, সেটা সত্যি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের প্রধান তিনটি বেড়ার মাপ একত্রে ধরলে প্রায় ১৯০০ মাইল লম্বা! প্রথম বেড়াটির দৈর্ঘ্যই ত ১১০০ মাইল। এই বেড়াগুলোকে নিয়মিত ভাবে দেখাশোনা করার জন্য স্থায়ীভাবে লোক নিযুক্ত করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা যে যার নিজের জমিতে বেড়া দিয়ে থাকে।

এবার আক্রমণের কথা। খরগোসকুলকে একেবারে নির্মূল করা বর্তমানে সম্ভব নয়। তবে এদের যত নষ্ট করা যায় ততই মঙ্গল। বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে, খাঁচায় আটকে, গর্ত খুঁড়ে কিংবা গুলি করেও এদের মারা হয়। এখন আর একটি উপায়েও এই জীবদের ধ্বংস করা হচ্ছে। খরগোস মিক্সোম্যাটোসিস (mixomatosis) রোগে আক্রান্ত হলে পনের দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এই রোগের বিষ খরগোসদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ ফল পাওয়া যাচ্ছে।

এই 'নিরীহ, শান্ত' প্রাণীগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের শান্তি নেই!

অষ্ট্রেলিয়ার শত্রু যেমন খরগোস, নিউজীল্যাণ্ডের তেমনি হরিণ।

ইউরোপীয়ানরা আসার আগে এ দেশে গৃহপালিত জন্তু ত দূরের কথা, বন্যজন্তুও বিশেষ ছিল না। ঔপনিবেশিকেরাই এখানে গরু, ভেড়া ইত্যাদির সঙ্গে হরিণও নিয়ে আসে।

নিউজীল্যাণ্ডে নানা রকমের হরিণ আমদানি করা হয়েছিল। তার মধ্যে ইংলিশ রেড ডিয়ার শ্রেণীই নতুন দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিল, এদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলল। অবিশ্যি প্রথমে এদের প্রশ্রয় দেওয়ার কারণ ছিল। নবাগত বিদেশীরা হরিণের মাংস খেত, হরিণ-শিকারে আদেশ পেত, গভর্ণমেণ্ট শিকারের লাইসেন্স দিয়ে কিছু টাকাও পেতেন। আর হরিণ-শিকারের লোভে বিদেশ থেকে অনেক ভ্রমণকারী আসবে, এ আশা ত ছিলই। কিন্তু এখন হরিণদের জন্যে দেশের বিরাট ক্ষতিই হচ্ছে।

বনজঙ্গল প্রত্যেক দেশেরই বড় সম্পদ। নানা কারণে মাটি ক্ষয়ে যায়। গাছপালা নষ্ট করে ফেললে এই ক্ষয় বেশী পরিমাণে হয়, ফলে চাষের জমির অবনতি ঘটে, বন্যায় জমি সহজেই ধ্বসে পড়ে।

নিউজীল্যাণ্ডে হরিণের পাল বনজঙ্গলের ভীষণ ক্ষতি করে চলেছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বন মানুষের চেষ্টায় সদ্য গড়ে উঠছে সেখানেই এদের অত্যাচারটা বেশী। এরা ছোট ছোট গাছগুলোর পাতা খেয়ে, কোনটাতে শিং ঘষে গাছপালা সব তছনছ করে ফেলে। নিউজীল্যাণ্ডের বনজঙ্গল এভাবে নষ্ট হচ্ছে বলেই অনেক উর্বর জমি ক্রমশঃ সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে।

গভর্ণমেণ্ট এদের ধ্বংস করার জন্যে সুদক্ষ শিকারীদের নিযুক্ত করেছেন। তাদের অত্যন্ত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়, পাহাড়ে চড়া এবং জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলাফেরায় পারদর্শী হওয়া চাই। গভর্ণমেণ্ট বেসরকারি হরিণ-শিকারিদেরও রাইফেল, টোটা দিয়ে এবং চামড়া কিনে সাহায্য করে থাকেন। এর ফলে হরিণের সংখ্যা কিছুটা কমেছে, কিন্তু এদের উপদ্রব একেবারে বন্ধ করতে অনেক সময় লাগবে।

জীবাণু কি ?

পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমরা সকলেই নিশ্চয় জান যে, পৃথিবীতে দুই রকমের জীব আছে। প্রাণী আর উদ্ভিদ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই সব চেয়ে ছোট ও সরল এক কোষবিশিষ্ট এক প্রকার জীব আছে যাদের বলা হয় জীবাণু। এদের সমস্ত শরীরটাই ছোট্ট এক টুকরা থলথলে জিনিষ দিয়ে তৈরী—যার নাম প্রোটোপ্লাজম্। তার চারধারে আছে একটু পাতলা আবরণী। হাত পা নাক চোখ কিছুই এদের নেই। জীবাণুগুলি এত ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখাই যায় না। অনেকগুলি একসঙ্গে থাকলে তবে দেখা যায়।

জীবাণু কে প্রথম আবিষ্কার করেছিল জান? একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম লুই পাস্তুর। জীবাণুর সন্ধান তিনি সংসারের সাধারণ কয়েকটি দৈনন্দিন ঘটনা থেকেই পেয়েছিলেন। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে কোনও খাবার জিনিষ যদি খোলা অবস্থায় ঘরে ফেলে রাখা যায় তবে সেগুলি অল্পদিনেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। একটু চীজ বা একটু জেলী যদি খোলা অবস্থায় ঘরে ফেলে রাখা যায়, দুদিনেই দেখবে তার ওপর ছাতা পড়েছে। তেমনি চিনির রস বা ভাতের ফেন ফেলে রাখলে তাই থেকে গেঁজশ ওঠে। এসব কেন হয় কখনও ভেবে দেখেছ কি? বাড়ীতে মাকে দই পাততে দেখেছ ত? গরম দুধে অন্য দই থেকে একটু সাঁচা মিশিয়ে রেখে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুধটা জমে দই হয়ে যায়। কেন হয় বলতে পার? এসবই নানা রকমের জীবাণুর কাজ।

বাতাসের সঙ্গে নানা রকমের জীবাণু ভেসে বেড়ায়। তাদের চোখে দেখা যায় না। খাবার জিনিষের উপর দুই-একটা জীবাণু এসে পড়ে। তারপর জীবাণুগুলি ঐ খাবার থেকে নিজেদের প্রয়োজন মত জিনিষ নিয়ে বাড়তে থাকে। জীবাণুদের শরীরে নানা রকম জারক রস থাকে যার সাহায্যে তারা খাদ্যবস্তুর মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে তাদের প্রয়োজন মত নাইট্রোজেন কার্বন ইত্যাদি বের করে নেয়। এই রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য খাদ্য বস্তুর স্বাদ গন্ধ চেহারা বদলে যায়, যাকে আমরা বলি পচে যাওয়া। কখনও কখনও এই জীবাণু ঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আমরা কাজেও লাগাই, যেমন, দুধ থেকে দই বানাবার বেলায়। দইএ একরকম জীবাণু থাকে যেগুলি দুধে পড়লে দুধের মধ্যে এসিড তৈরী করে। সেই এসিডের জন্যে দুধ জমে যায়।

জীবাণুর অস্তিত্ব কি করে প্রমাণ করা যায় জান? খানিকটা মাংস টুকরা টুকরা করে কেটে নিয়ে খানিকটা জলে বেশ করে ফুটিয়ে নাও। তারপর মাংসের যে ঝোলটা তৈরী হল তাই থেকে মাংসগুলো ছেঁকে তুলে নাও। এখন শুধু পরিষ্কার টলটলে ঝোলটুকু থাকল। এইবার লম্বা

গলাওয়ালা দুটো স্বচ্ছ কাঁচের বোতলে ঝোলটুকু অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করে রাখ। তারপর দুটি বোতলই বেশ করে গরম করে ঝোলটা ভাল করে ফুটিয়ে নাও। যদি ঐ বোতলে কোনও রকম জীবন্ত পদার্থ থাকে তবে এই ফোটানতে সেগুলি নিশ্চয়ই মরে যাবে, এবার একটা বোতলের মুখ বেশ করে শীল করে বন্ধ করে দাও যাতে বাইরে থেকে হাওয়া বা ধুলো না ঢুকতে পারে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র
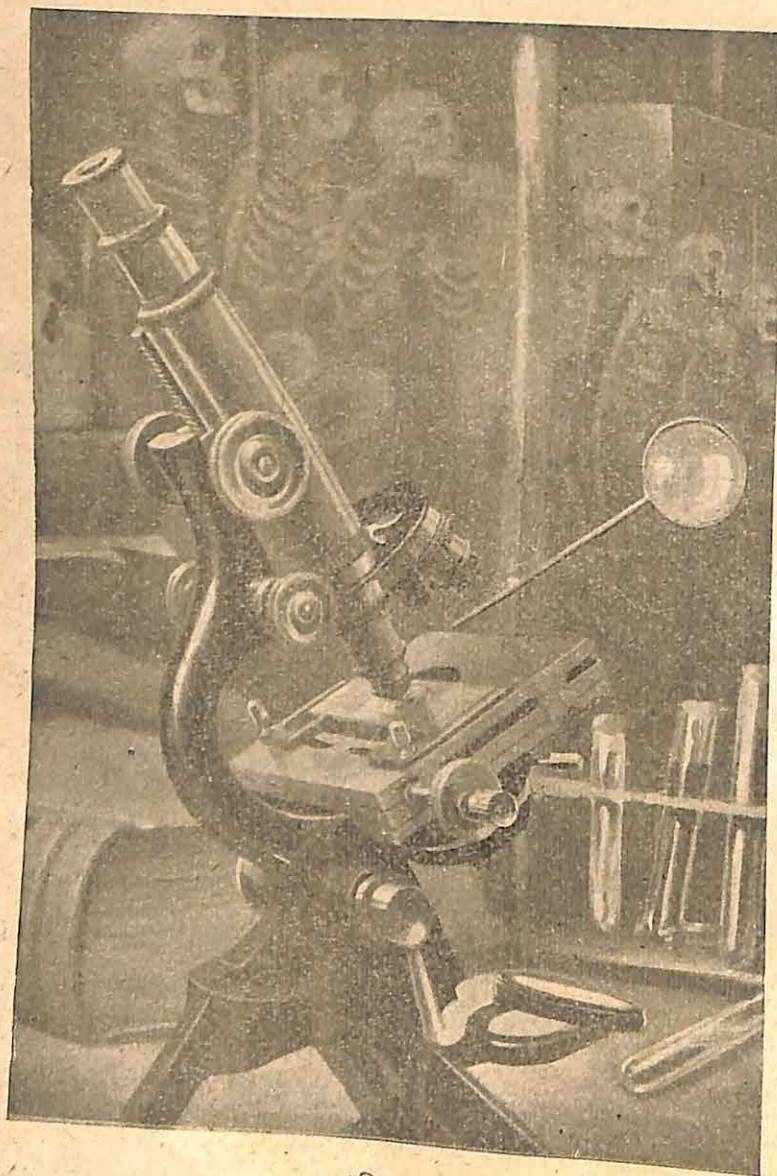
অন্য বোতলটা এমনি মুখ খোলা অবস্থাতেই রেখে দাও। এখন বোতল দুটো ঘরের তাকের ওপর রেখে দেওয়া যাক। ঘরটা যদি একটু গরম থাকে তবে দুই তিন দিন পরে দেখবে যে খোলা-মুখো বোতলের ঝোলটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। কিন্তু বন্ধ-মুখো বোতলে ঝোলটা পরিষ্কারই আছে। ঘোলাটে ঝোলের এক ফোঁটা নিয়ে যদি এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় তবে তাতে দেখা যাবে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর মত বা কাঠির মত জিনিষ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই গুলিই জীবাণু। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ...

অসংখ্য বংশ বিস্তার করেছে! এগুলি যে জীবন্ত জিনিষ এবং খাবার পেলেই তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যদি তুমি ঐ ঘোলাটে ঝোল থেকে এক ফোঁটা নিয়ে বন্ধ-মুখ বোতলটির মুখ খুলে তার ভিতরকার পরিষ্কার ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে যাও। তারপর আবার বোতলটির মুখ ভাল করে বন্ধ করে দাও। এক ফোঁটা ঘোলাটে ঝোল মিশিয়ে দিলেও পরিষ্কার ঝোলটি পরিষ্কারই রইল। কিন্তু ২।৩ দিন পরে দেখবে বোতলের মুখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঝোলটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এই থেকে বোঝা যাবে যে ঘালাটে ঝোলের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার ঝোলটাকে ঘোলাটে করতে পারেনি, কিন্তু দুই তিন দিনে সেই জিনিষ এত বেড়েছে যে ঝোলটা ঘোলা হয়ে উঠেছে। এইরকম করেই লুই পাস্তর জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে ছিলেন।

জীবাণু আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখতে পান যে, মানুষের অনেক রোগ নানারকম জীবাণুর আক্রমণ থেকে জন্মায়।

জীবাণু ঘটিত রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক। রোগীর শরীর থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে, থুথু, মল মূত্র ইত্যাদির সঙ্গে অনেক জীবাণু বেরিয়ে আসে এবং রোগীর জামা কাপড়, ইত্যাদি এবং রোগীর ঘরের হাওয়াও দূষিত করে। ঘরের ধূলার সঙ্গেও জীবাণু মিশে যায়। যেখানে সেখানে ঐ সব দূষিত থুথু, মলমূত্র ফেললে তাতে মাছি বসে। সেই মাছির পায়ে জীবাণু লেগে যায় এবং পরে মাছি কোনও খাবার জিনিষের ওপর বসলে সেই খাবার জিনিষও দূষিত হয়ে যায়। রোগীর জিনিষপত্রে হাত দিলে বা হাতে ধূলা ময়লা লাগলে তার সঙ্গেও হাতে জীবাণু লেগে যায়। তখন ভাল করে হাত না ধুয়ে খেলে আঙ্গুল থেকে জীবাণু মুখের মধ্যে চলে যায়। রোগীর দূষিত কাপড়-চোপড় পুকুরে ধুলেও পুকুরের জল দূষিত হয়ে যায়। সেই জল অন্য লোকে খেলে তাদেরও জীবাণুর আক্রমণ হয়।

জীবাণু অনেক রকম আছে। যেগুলি প্রাণীজাতীয় সেগুলিকে বলে প্রোটোজোয়া। এদের শরীর খুব নরম ও আবরণী খুব পাতলা। এরা শরীরের কোন অংশ শুঁড়ের মত লম্বা করে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং তাই দিয়ে খাবার ধরে খায়। গড়িয়ে গড়িয়ে চলেও বেড়াতে পারে। এ্যমিবা, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জীবাণু এই প্রোটোজোয়া শ্রেণীর। উদ্ভিদ জাতীয় জীবাণুর দেহের চার পাশে শক্ত আবরণী থাকে এবং সেগুলি খুব ছোট ছোট কাঠির মত বা বিন্দুর মত দেখায়। এগুলোকে বলে ব্যাক্টিরিয়া। বেশীর ভাগ ব্যাক্টিরিয়া চলে বেড়াতে পারে না। তবে কতকগুলির গায়ে সরু শুঁয়া থাকে। তাই দিয়ে তারা জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ বিভিন্ন রকম ব্যাক্টিরিয়া থেকে হয়।

সব জীবাণুই মানুষের রোগ সৃষ্টি করে না। অনেক জীবাণু আছে যেগুলি কেবল মানুষ বা অন্যান্য জীব-জন্তর দেহের মধ্যে বাস করে। বাইরে তারা বেশী দিন বাঁচতে পারে না। এগুলোকে প্যারাসাইট বা পরাশ্রয়ী জীবাণু বলে। এদের মধ্যে অনেক জীবাণু আমাদের কোনও ক্ষতি করে না, আবার কোনও কোনও জীবাণু আমাদের কাজেও লাগে। আমাদের পেটের মধ্যে বৃহদান্ত্রে অনেক

জীবাণু বাস করে। যে সব খাদ্যবস্তু আমাদের পরিপাক করবার ক্ষমতা নাই সেগুলি থেকে এই সব জীবাণু নানা রকমের খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন তৈরী করে দেয়।

যে সব জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে সেগুলি সাধারণতঃ আমাদের শরীরে খাদ্যের সঙ্গে বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করে। কোন কোন জীবাণু মশা বা অন্য পোকামাকড়ের কামড়ানতেও শরীরে প্রবেশ করে।

জীবাণুরা খুবই অল্প দিন বাঁচে। কিন্তু তাদের জীবন শেষ হয় দেহ ভাগ হয়ে আর ছোট ছোট শিশু জীবাণুর জন্ম দিয়ে। তারা এত তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করতে পারে যে একটি দু'টি জীবাণু উপযুক্ত খাবার ও পরিবেশ পেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ জীবাণু সৃষ্টি করতে পারে। জীবাণুদের সংখ্যা বৃদ্ধি খুব সহজেই হয়। জীবাণুর দেহের মাঝখানটা একটু সরু হয়ে হয়ে দুই ভাগ হয়ে যায়। আবার ছোট ভাগগুলি বড় হয়ে গেলে সেই রকম করে দুই ভাগ হয়ে যায়। এরকম করে জীবাণুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোনও কোনও জীবাণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াস বলে একটা অংশ থাকে সেইটে আগে অনেক ভাগ হয় তারপর একসময় জীবাণুটা ভেঙ্গে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি শিশু-জীবাণুরও সৃষ্টি হয়।
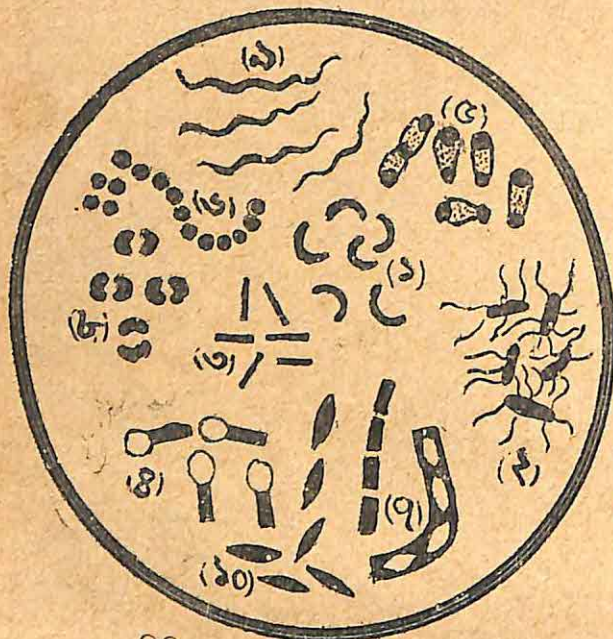
বিভিন্ন আকৃতির রোগ-জীবাণু
(১) কলেরা (২) টাইফয়েড (৩) যক্ষ্মা (৪) টিটেনাস্
(৫) ডিফ্‌থেরিয়া (৬) বিস্ফোটক (৭) অ্যানথ্রাক্স
(৮-১০) অপর কয়েকটি উৎকট রোগের জীবাণু

প্রোটোজোয়া বা ব্যাক্টিরিয়া ছাড়াও আর এক প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের বলে ভাইরাস। এদের দেহ এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাদের দেখা যায় না। এই ভাইরাস জাতীয় জীবাণুর দ্বারাও মানুষের অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। তোমাদের অনেকেরই হয় ত হাম জ্বর হয়েছে। এই হাম জ্বর একরকম ভাইরাসের আক্রমণ থেকে হয়। বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্পস্, সাধারণ সর্দি এ সবই নানারকম ভাইরাস থেকে হয়।

জীবাণুতত্ত্ব চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা প্রধান অংশ। বিভিন্ন জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে নানা রকম সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচবার উপায় জানা যায় না।

অভিশপ্ত বই

শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষণ মুখরিত সন্ধ্যা। ক্লাবঘরে আমি, রজত ও শুধাংশু বসিয়া আছি। বৃষ্টি বলিয়া অপর কেহ আসে নাই। আমরা এই তিনজন নেহাতই উপায়বিহীন বলিয়া অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা দিয়াছি, সকাল দুপুর সন্ধ্যা আড্ডা মারিয়া 'পকেটখালির' জমিদার সাজিয়া বসিয়া আছি বলিয়াই আসিয়াছি।

অন্যান্য সকলে আসে নাই বলিয়া আড্ডাটা ভাল জমিতেছিল না। তিনজনেই চুপচাপ বসিয়াছিলাম।

এই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমিই প্রথমে কথা বলিলাম: কিরে, তোরা চুপচাপ বসে বসেই এই সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটি ক'রে দিবি নাকি?

শুধাংশু বলিল: ঠিক বলেছিস অমর, আমারও এইরকম চুপচাপ বসে থাকাটা মোটেই ভাল লাগছে না। বরং তুই একটা জমাট গল্পটল্প বল—সন্ধ্যেটা বেশ কেটে যাবে।

আমি উত্তর দিয়া বলিলাম: না ভাই, আমি গল্প বলতে পারি না। ভাল ভাল কত বই পড়ি, কিন্তু বলতে গেলে একটাও মনে আসে না—সব গুলিয়ে যায়। তার চেয়ে রজত একটা গল্প বলনা কেন? আমাদের চেয়ে তোর অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী এবং আমাদের এই পাড়ায় আসার আগে তুই বহু দেশ ঘুরেও এসেছিস।

রজত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল: আচ্ছা, আমি বলছি। কিন্তু তার আগে বলে রাখি, যে গল্পটা আমি তোদের কাছে বোলব সেটা গল্প নয়—সত্য ঘটনা। আর ঘটেছিল আমারই জীবনে।

রজত বলিতে আরম্ভ করিল:

'আমি তখনও এ পাড়ায় আসিনি—সেই সময়ের ঘটনা। আমার তখন পুরোনো বই কিনবার এক ভয়ংকর বাতিক ছিল। পুরোনো বইয়ে আমি যে কি আনন্দ পেতাম, তা' ব'লে বোঝাতে পারব না, তোরা হয়ত অবাক হচ্ছিস আমার এই উদ্ভট স্বভাবের কথা শুনে। ভাবছিস, নতুন বই পড়েই তো বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। বইয়ের ভেতর থেকে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরোয়, পড়তে বেশ মৌজ লাগে। কিন্তু আমার ঠিক উল্টো ছিল। যাই হোক, একদিন সন্ধ্যাবেলা এসপ্ল্যানেডের ওধার থেকে ফিরছিলুম। এমন সময় নজর পড়লো গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় কারবাইড্ গ্যাসের আলো জেলে একটা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ও ঝাকড়া চুলওয়ালা লোক পুরোনো বই বিক্রী করছে। কাছে গিয়ে বই বাছতে লাগলাম। একটা ইংরেজী বই [illegible]

তুলে নিয়ে দু' এক লাইন পড়লাম। পড়ে বইটার ওপর একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। বইটার দাম জিজ্ঞাসা করলাম। ও বলল। আমি কিনে নিয়ে বাড়ী এলাম।

এই পর্যন্ত বলিয়া রজত একটু চুপ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : তারপর ?

ও আবার বলিতে আরম্ভ করিল : 'বাড়ীতে এসে পড়ার ঘরে ঢুকে বইটা পড়তে লাগলাম। তোরা হয়ত বিশ্বাস করবি না যে পড়তে পড়তে মনে হ'ল বইটা যেন আমি পড়ছি না—আমার ভেতর থেকে অন্য কেউ পড়াচ্ছে। অত সুন্দর ইংরাজী উচ্চারণ, ইংরাজীর অত ভালো ক'রে মানে বুঝতে আমি জীবনে কখনও পারিনি।

আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। ওই বইটা রেখে আর একটা ইংরাজী বই নিয়ে পড়তে লাগলাম। কিন্তু পড়াতে তেমন মন বসল না। আর ভালো ক'রে মানেও বুঝতে পারলুম না। ওই বইটাই আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলতে লাগলো : এই বই পড়ে কি হবে, ওই বইটা পড়। ওই রকম বই তুই জীবনে আর কখনও পাবি না—সময় থাকতে পড়ে নে। ওরে নির্বোধ, এই বই তুই অবহেলা করিস না।

আমার কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। বইটা রেখে দিলাম। ভাবলাম, আমার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে—সেইজন্য এইরকম অদ্ভুত কথা মনে আসছে। কিন্তু তার পরের দিন বইটা পড়তে আরম্ভ করেই বুঝলাম যে সত্যই, আমার ভেতর থেকে কে যেন পড়াচ্ছে।

আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে পড়লাম। যখনই সময় পেতাম, তখনই ওই বইটা নিয়ে বসতাম। ভালো ক'রে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না – মনে হ'ত, কথা ব'লে সময় নষ্ট করে কি করবো ? তার চেয়ে ওই বইটা পড়ি। বইটা যেন আমাকে 'হিপনোটাইজ' করলো। বই ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।

আমার এ রকম অবস্থা দেখে বাড়ীর সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—কিরে, তোর কি হয়েছে ? সব সময়ে একখানা বই পড়ছিস্, কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলিস্ না—ব্যাপার কি বলতো ?

আমি অতি কষ্টে হেসে উত্তর দিলাম : ব্যাপার কিছুই না। বইটা খুব ভালো কিনা, সেইজন্য যখনই সময় পাই তখনই পড়ি। কিন্তু সকলকে ফাঁকি দিলেও নিজেতো বুঝতে পারছি যে ওই বইটা ত্যাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মাঝে মাঝে মনে হ'ত, বইটা যখন আমি পড়ি, তখন কে যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। 'তাকে' আমি দেখতে পেতাম না, কিন্তু অনুভব করতে পারতাম।

আমার হাবভাব দিন দিন যেন রহস্যময় হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে বইটা পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা করত। কিন্তু সাহস করিনি কোনদিন। পোড়াবার কথা হতেই কেমন যেন একটা অহেতুক শংকা বোধ করতাম।

অবশেষে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, এই রকম সংশয়-দোলায় না থেকে একটা নিষ্পত্তি করতেই হবে।

এই ভেবে একদিন বিকেল বেলা ওই বইটা নিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। বাগবাজার খাল যেখানে গঙ্গায় মিশেছে, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিধারে ভালো ক'রে তাকিয়ে যখন বুঝলাম আশেপাশে কোন লোকজন নেই, তখন বইটা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলাম।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রজত একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল :

'কিন্তু ফেলতে পারলাম না। অদৃশ্য থেকে কে যেন আমার হাত চেপে ধরলো। আমি অত্যন্ত ভয় পেলাম। বইটা হাতে নিয়ে পাগলের মত বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে যেমনি রাস্তা পার হ'তে গেছি, অমনি কে যেন আমায় ধাক্কা মারল—এক প্রচণ্ড ধাক্কা! একখানা চলন্ত মোটরের সামনে এসে পড়লাম। মোটরটা ব্রেক কষবার আগেই গায়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। আমি আঘাত পেয়ে একপাশে ছিট্‌কে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান হতে দেখি বাড়ীতে শুয়ে আছি। আর আমার চারিপাশে বসেছে বাবা, মা, দাদা, ও বাড়ীর সকলে। চোখ মেলতেই সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আমার কি হয়েছিল? দাদা উত্তর দিলেন : শ্যামবাজারের মোড়ে তুই একটা গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি। আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোকে দেখে বাড়ীতে নিয়ে এলুম। কিন্তু ভাগ্যি তোর ভাল, গাড়ীটা সময়মত ব্রেক কষায় মাথায় সামান্য আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি।

[illegible]ার একে একে মনে পড়লো। ভাবলাম, আমি যে ধাক্কা খেয়ে গাড়ীর সামনে

গিয়ে পড়েছিলাম সে ধাক্কা কোন মানুষ নিশ্চয়ই দেয়নি—কেননা মানুষের ধাক্কা ও রকম হতেই পারে না। কিন্তু কেন এমন হোল? আমি বইটা গঙ্গায় ফেলে দিতে গিয়েছিলাম ব'লেই কি এই রকম দুর্ঘটনা ঘটলো?

হঠাৎ বইটার কথা মনে হতেই আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম: দাদা, আমার সঙ্গে কোন বই-টই পাওনি?

কই, না—দাদা উত্তর দিলেন।

আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, বাঁচা গেছে। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এর শেষ কোথায়!

দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার পর সেরে উঠলাম। কিন্তু সেই বইটা এবং তার সঙ্গে যে রহস্য জড়িয়ে ছিল, তার কথা আমার মনের মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছিল। বহু ভেবেও কোন কিনারা করতে পারছিলাম না, তবে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও পুরোনো বই কিনব না ও বাড়ীতে যত পুরোনো বই আছে সব বিলিয়ে দেবো।

একদিন দুপুরে সেল্ফ থেকে সমস্ত পুরোনো বইগুলো নামাতে লাগলাম। একখানা বইয়ে হাত পড়তেই আমি ভয় পেয়ে ভীষণ ভাবে চম্‌কে উঠলাম। বইখানা সেই অভিশপ্ত ইংরাজী বইটা। বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বইটা এখানে এল কোন উপায়ে! দাদাতো আমার কাছে কোন বই পান নি। তবে?

সমস্ত দুপুর ধরে চিন্তা করতে লাগলাম যে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে বই-টার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শেষকালে মাথায় বুদ্ধি এল। ভাবলাম, যার কাছ থেকে বইটা কিনে নিয়ে এসেছি, তাকেই বইটা ফেরৎ দেবো, তা' হ'লে আর কোন ভয় থাকবে না।

সন্ধ্যাবেলা যে জায়গা থেকে বইটা কিনেছিলুম সেখানে গেলুম। গিয়ে লোকটাকে বললাম: বইটা তুমি নিয়ে যাও—আমার দরকার নেই আর দামও ফেরৎ চাইনা।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার দিকে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল: মশাই, আপনিও বইটা ফেরৎ দিচ্ছেন?

আমি বললুম: কেন? আমার আগে আর কোন লোক বইটা কিনে ফেরৎ দিয়েছিলেন নাকি?

লোকটা উত্তর দিল: একজন নয়—সাত আটজন বইটা কিনেছিল, কিন্তু দিন কয়েক পরে সবাই ফেরৎ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

আমার মনে তখন চিন্তার ঝড় বয়ে গেলেও মুখে বল্লুম: ব্যাপার কিছুই না, এমনি ফেরৎ দিয়ে গেলুম।

বাড়ী ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম, আমার আগে যারা বইটা কিনেছিলেন, তারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই আমার মত এই রকম ঘটনার সম্মুখীন হয়ে অবশেষে ফেরৎ দি—

এরপর আমি এই ঘটনা সম্পর্কে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রহেলিকার মতই অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে ব্যাপারটা।'

রজতের কাহিনী সমাপ্ত হইল। কিন্তু কাহিনীর রেশ আমাদের মনে বহুক্ষণ পর্যন্ত অনুরণিত হইতেছিল। শেষকালে একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলামঃ রজত, বইটা তুই ফেরৎ দেবার পর আর কোনদিন সেই অশরীরীর অস্তিত্ব অনুভব করিস্ নি?

রজত মৃদুকণ্ঠে বলিলঃ না।

আর কোন কথা বলিলাম না। বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম বৃষ্টিটা ইতিমধ্যেই থামিয়া গিয়াছে। অতএব বিদায় লইলাম।

বাড়ীতে আসিয়া আমিও ঘটনা সম্পর্কে নানা দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলাম। কিন্তু রজতের ন্যায় না পাইলাম কূল, না পাইলাম কিনারা। তবে আমার একটি কথা মনে হইল যে, হয়ত কোন অভিশপ্ত আত্মা কোন কারণে বইটার পিছনে পিছনে শনির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন অব্যক্ত ব্যথা ব্যক্ত করিতে চায়! কিন্তু সেই কারণই বা কি আর অব্যক্ত ব্যথাই বা কি? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই।

———

খোকার প্রশ্ন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজ্‌ছে পথে, ঘুমের ঘুঙুর ঘরে,
পুকুর পাড়ে ব্যাঙ্‌গুলো যে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে।
জোনাক জ্বলে হীরের মত ছাতিম গাছের তলে,
কাৎলা চিতল ঘাই দিয়ে যায় ভরা দীঘির জলে।

কদমকোরক দুল্‌ছে হাওয়ায় কল্‌কে ফুলের পাশে,
চাঁদের বুকে ওই দেখ মা কাজল-রেখা ভাসে।
কেয়ার রেণু ছড়িয়ে আছে ভুঁই-চাঁপাদের মাঝে
তেপান্তরের মাঠের পারে বাঁশের বাঁশী বাজে।

সবার চেয়ে ছোট্ট যে জন এলো মোদের শেষে,
সেই শুধু মা পালিয়ে গেল রূপকথারই দেশে।
ছোট্ট থালায় হাত রেখে সে ঢুল্‌তো এমন রাতে,
ছোট্ট খাটে শোবার সময় দুল্‌তো তোমার সাথে।
রাত হোলে মা তার কথাটী তারার মত জাগে,
কার উপরে রাগ করে সে গেল সবার আগে?

———

সেই ছেলেবেলায়

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

টালিগঞ্জের রাস দেখতে যাবার মতলবেই নীলমণির কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন আর রাস-হাটায় যাওয়া হোল না! নীলমণি বল্লে—"বিকেলের দিকে যাব, তাহোলে 'পুতুল-নাচ' দেখতে পাব।" সেই যুক্তিই ঠিক হোল। ঠিক হোল যে, বেলা চারটার আগে, ও এসে আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যাবে, আমি তৈরী হোয়ে থাকবো।

ঠিক সময়ে নীলমণি আমাদের বাড়ী এল। ঠাকুমার কাছ থেকে দু' আনার পয়সা, রাসের পার্ব্বণী হিসেবে চেয়ে নিয়ে আমরা রাস দেখতে চলে গেলুম। 'নাগর-দোলা'য় চড়া ছিল, রাসের একটা প্রধান আকর্ষণ। সুতরাং প্রথমেই দু'জনে 'নাগর-দোলা'য় চেপে বসলুম। ভারি মজা। ওপর-নীচ চারটে দোলায় বসবার জায়গা। প্রত্যেক দোলায় সামনা-সামনি দুটো কোরে 'সিট্'। প্রত্যেক 'সিটে' দু'জন কোরে বসবার নিয়ম। সর্বসমেত ষোল জন বসবে। প্রত্যেককে দিতে হোত দু'পয়সা হিসেবে। দু'পয়সাতে কুড়ি পাক। এর পাক ঘোরানো পাক নয়, ওপর-নীচ পাক। প্রথম তিনচার পাক একটু আস্তে-আস্তে হোয়ে, তারপর হোত খুব জোরে। আর যত জোরে ওপর-নীচ ঘুরতো, চড়নদারদের আনন্দ তত বেশী হোত। তবে, ওপর থেকে নীচে নামবার সময়, মাথাটা কি-রকম যেন একটু ভোঁ ভোঁ করতো। যাদের একটু দুর্বল মাথা, তারা ঐ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতো না। তারা ভয়ে চাপতো না ওতে। তারা শুধু দাঁড়িয়ে দেখতো এবং সেই দেখাতেই তারা আনন্দ পেতো। তাদের সেই আনন্দের দামটাই বেশী। কারণ কোন ব্যয় নেই, বিপদ নেই—বিনামূল্যে বিনা বিপদে আনন্দলাভ। 'নাগরদোলা'র চড়নদারদের কিন্তু বিপদের ভয় থাকতো। অত জোরে ঘোরবার মুখে, কোন কারণে যদি 'দোলার বাঁধা দড়িদড়া ছিঁড়ে যায়, তাহোলে ঐ ষোল জনেরই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! তবে তেমনটা যে কখনো হোয়েচে, তা শুনিনি। যাই হোক, 'নাগর-দোলা' চেপে আমরা চলে এলুম, যেখানে লম্বা খানিকটা জায়গা জুড়ে 'পুতুল নাচ' দেখানো হচ্ছিলো।

আমরা যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন 'পুতুল-নাচে' 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' পালার অভিনয় হচ্ছিলো। সেই হিরণ্যকশিপু, সেই প্রহ্লাদ, সেই কয়াধু, সেই ষণ্ড, সেই অমর্ক। খালি মানুষের পরিবর্তে পুতুল। আর কথার পরিবর্তে হাত-পা-মুখ প্রভৃতি দেহের ভঙ্গী। অর্থাৎ মূক-অভিনয়। বুঝতে কিছুমাত্র বাধে না। এইসব পুতুল তৈরী কোরেছিল—কেষ্টনগরের কারিগরেরা। আবার তারাই এসে এইসব পুতুল নাচাতো। এই পুতুল আর পুতুল-নাচ কেষ্টনগরের কুম্ভকারদের এক অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য। বোধ হয়, চীন দেশ ছাড়া এ-শিল্পের এত উন্নতি জগতের আর কোন দেশ এখনো করতে পারে নি। দুঃখের বিষয়, দেশের লোকের কাছে এত বড় একটা শিল্প আদর উৎসাহ না পেয়ে লোপ পেতে বসেছে। এখনো বাজারে কেষ্টনগরের যে-সব মৃৎ-শিল্প পাওয়া যায়, তার

তুলনা নেই। বর্তমান যুগের বাংলার দুর্ভাগ্য যে তার গতদিনের অপূর্ব শিল্প-সমৃদ্ধি আজ বিলুপ্তির পথে যেতে বসেছে। সর্বশ্রেণীর এই সমস্ত শিল্প ইত্যাদি নিয়েই, তখনকার দিনের বাংলা ছিল— 'সোনার বাংলা'। জানি নে, আবার সেই 'সোনার বাংলা' ভবিষ্যতে কখনো ফিরে আসবে কি না। মুখে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, সে 'সোনার বাংলা'র কিছুটাও এখনো ফিরে আসে নি।

পুতুল নাচ দেখবার জায়গায় অসংখ্য ভীড়। পুরুষও যত, স্ত্রীলোকও তত। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী বলে মনে হয়। তাদের কারো কারো কোলে আবার ছোট ছেলে। সেই ভীড়ের মধ্যে যাকে বলে 'চিঁড়ে চ্যাপটা'—সেই রকম হোয়ে তারা পুতুল-নাচ দেখচে। কিন্তু কিসের 'পালা' হচ্চে, কার সঙ্গে কার আলাপ হচ্চে, ঘটনাটা কি—সে সব তারা কিছুই জানে না বা বোঝে না। এইসব দেখতে দেশের কোন শিক্ষিত-ঘরের পুরুষ বা মেয়েছেলে আসতো না। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সংখ্যাই অধিক। আর আমাদের মত ছেলেদের সংখ্যাও কম নয়।

খানিকক্ষণ সেই ঠেলা-ঠেলির মধ্যে দাঁড়িয়ে পুতুল-নাচ দেখে, আমরা একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। সেখানে, একটু দূরে একজন পাদরী-সাহেব তাঁর দু'তিন জন সহকারীকে নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর ছোট ছোট বইয়ের মত কাগজ বিলুচ্ছিলেন। কাগজগুলো সুন্দর ঝর-ঝরে ছাপা, বেশ রং-চংয়ে ও সুদৃশ্য। গল্পের ভঙ্গীতে সেগুলো লেখা। ছবিও আছে। আমরা সেই বই পাবার লোভে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহেব নিজেই তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন— টোম্‌রা অনুঢোকারে প্রস্টরের মটো ডাঁড়িয়ে আছ। টোম্‌রা টোমাডের চক্ষুর ডারা কোন পডার্ঠ ডেখিটে পাইটেছ না। ট্রাণকর্টা টোমাডের নিকট্ রহিয়াছেন, কিণ্টু অণ্ডের মটো ডেখিটে পাইটেছ না টাহাকে। প্রোভু যীশু টোমাডের ট্রাণকর্টা……" ইত্যাদি। এইসব পাদরী সাহেব তখন প্রত্যেক 'মেলা'তে, তাঁদের অনুচরবর্গ নিয়ে, খৃষ্টধর্ম প্রচার কোরে বেড়াতেন। এঁদের অধ্যবসায় আর ধৈর্য অসীম। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এঁরা প্রভূত অর্থব্যয়ও করে থাকেন। ফলে, দুশো বছরের অক্লান্ত চেষ্টায়, ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে এঁরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হোয়েছেন। তবে, দীক্ষিত খৃষ্টানদের মধ্যে অধিকাংশই সমাজের খুব নিম্নস্তরের লোক। ওড়িষ্যা ও মধ্যভারতের দুর্ভিক্ষের সুবিধা নিয়ে, এইসব মিশনারীরা, এককালে একসঙ্গে হাজার হাজার হিন্দুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। বিরাট হিন্দুসমাজ একটু সচেতন থাকলে, এ দেশে খৃষ্টান মিশনারীরা একটি লোককেও দীক্ষিত করতে পারতেন না। যাক,—এখানে বেশীলোকের ভীড় ছিল না। একটু দূরে, আদি গঙ্গার কিনারায় এক স্থানে বহু মেয়েপুরুষ ভীড় কোরে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গঙ্গায় তখন অনেক নৌকো। একখানা 'ছই'-বিহীন বড় নৌকোয় অনেক স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদ্যসহযোগে গান গাচ্ছিলো। এঁরা পূর্ববঙ্গের লোক। এই ধরণের গানকে বলে—'সারি-গান'। এই 'সারি-গান', 'ভরা'র গান প্রভৃতি তখনকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল। 'ভরা'র মেয়েরা মিলে 'ভরার গান' গাইতো। 'ভরা'র মেয়ে কাদের বলে, তা তোমরা বড় হোয়ে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পড়লে

জানতে পারবে। সারি গান শুনতে অনেক লোক জমা হোয়েছিলো। আমাদের কিন্তু মোটেই তা ভাল লাগলো না। বরং পাদরী সাহেবের—'টোমাডের ট্রাণকর্টা'র কথা মন্দ লাগছিলো না।'

গঙ্গার ধারে, আর একটু তফাতে একস্থানে একজন অন্ধ মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে গান করছিলো। খুব বড়ো ও মজবুত একটা মাটির হাঁড়ি। সেইটে বাঁয়া-তবলার মত সে তার গানের সঙ্গে সুন্দর বাজাচ্ছিলো। অন্ধের গলাটি খুব মিষ্ট। তার গানের প্রথম কলিটা আমার মনে আছে—

'কালা, কি অভাবে গৌর হলি, তাই আমারে বল্।'

নীলমণির তার ওপর খুব দয়া হোল; পকেট থেকে একটা পয়সা বার কোরে তার চাদরের ওপর ফেলে দিলে। সুতরাং তার দেখা-দেখি, আমিও একটা দিলাম। লোকটির চাদরে অনেক পয়সা, চাউল পড়েছিল। এই সূত্রে, চাউল সম্বন্ধে একটা কথা তোমাদের বলি। এখন যেমন কোলকাতার সব সংসারেই দেশী সিদ্ধ চাউল ব্যবহার হয়, তখন এই চাল কোলকাতায় চলতো না। তখন কোলকাতার ঘরে ঘরে 'বালাম' চা'ল ব্যবহার হোত। 'বালাম-চা'ল' এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই চা'ল একমাত্র বরিশাল জেলাতেই উৎপন্ন হোত। এর ভাত খুব হাল্‌কা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর ভাত হজম হোয়ে যেত। সে সময়ে, খুব উৎকৃষ্ট বালামের দাম ছিল ৪৷৷০ টাকা ৫ টাকা মণ। মাঝারির দাম ছিল—৩৷৷ টাকা ৪ টাকা।

কালীঘাটের টালিগঞ্জের কোল দিয়ে প্রবাহিত 'আদি-গঙ্গা' তখন বেশ প্রশস্ত ছিল। ওপারে 'চেতলা'য় এই 'আদি গঙ্গা'র ধারে ধারে তখন অসংখ্য ধান চা'লের বড় বড় আড়ৎ ছিল। এইসব আড়তে তখন অসংখ্য নৌকো বোঝাই ধান-চাল রোজই আমদানী হোত। এখন সে-সব আড়তের একটাও নেই। সেই আদি-গঙ্গাও আজ লুপ্ত প্রায়। এক সময়কার সেই আদি-গঙ্গা এখন যেন একটা ময়লাবাহী নালায় পরিবর্তিত হোয়েছে। তখন ছেলেবেলায় আমরা আদি গঙ্গায় স্নান করতুম, ঝাঁপাই ঝুড়তুম, সাঁতার কেটে এপার ওপার হতুম, ছোট ছোট পান্‌সী চোড়ে দাঁড় বাইতুম! আদি গঙ্গার জলই তখন প্রত্যেক বাড়ীতে পান করা হোত। তখন জলের কল হয়নি, রাস্তায় গ্যাসের আলোর সৃষ্টি হয়নি। কাঠের এক একটা 'পোষ্ট'য়ের মাথায়, চারদিকে কাচ বসানো একটা বড় গোছ ল্যাণ্ঠানের মধ্যে, কেরাসিনের আলো জেলে দেওয়া হোত। তারপর ক্রমে গ্যাসের আলো জললো। তারপর এখন ত বিদ্যুৎ-আলোকে কালীঘাট স্বর্গের ইন্দ্রপুরী। তখন ঘরে ঘরে যে গঙ্গাজল পান করা হোত, তাতে কখনো কারো কোন অসুবিধা বা অসুখ হোত না। একজন উড়িয়া ভারী, বাঁকে কোরে গঙ্গাজল এনে আমাদের বারান্দার জালা ভরতি কোরে দিত। ঠাকুমা একখণ্ড লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে, তার টক্‌-টকে লাল অবস্থায় জালার জলের মধ্যে ছ্যাঁক্ কোরে ডুবিয়ে ধরতেন। এতে না কি জলের দূষিত অবস্থা কেটে যেত। সেই জল আমরা পান করতুম। এর অনেকদিন পরে কলের জলের সৃষ্টি হোল কালীঘাটে।

—————

[চল্‌বে]

ভুতুড়ে চিনির ঢেলা

যাদুকর এ. সি. সরকার

'ভুতুড়ে চিনির ঢেলা' খেলাটা সত্যিই খুব মজাদার। ছোটদের তো কথাই নেই বড়দেরও অবাক করে দেওয়া যাবে এ খেলা দিয়ে অতি সহজেই। 'সুগার কিউব' বা চিনির ঢেলা দেখেছ কি তোমরা ? বড় বড় হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে তো এর ছড়াছড়ি। ছক্কার মতন চৌকো আকৃতির ছোট ছোট চিনির ঢেলা—দেখনি কি তোমরা ? এ খেলার জন্যে প্রয়োজন হবে এই জাতীয় চিনির ঢেলার। তবে হাঁ, ইচ্ছে করলে কাজ চালানো গোছের ঢেলা তোমরাও তৈরী করে নিতে যে না পারো তেমন নয়। মুঠো খানেক চিনি নিয়ে তাতে ঢালো অল্প একটু জল আর হাতে করে ঢেলা পাকিয়ে নাও। হাতে করে ঢেলা না পাকিয়ে অন্য একটা কাজও করতে পারো। একটা পুরানো দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে তার ট্রেটা (যে অংশে কাঠি থাকে) বের করে নিয়ে সেটাকে ঠেসে ভর্ত্তি করো ঐ জলে ভেজা চিনি দিয়ে। পরে কিছুক্ষণ রৌদ্রে বা উনুনের ধারে রেখে শুকিয়ে নিলেই হল, দেখবে বেশ বড় সাইজের চৌকো চিনির ঢেলা তৈরী হয়ে গেছে একটা। এই চিনির ঢেলা দিয়েই কেমন করে আমার এক ফরাসী বন্ধু খুব মজাদার একটা যাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন সেই কথাই এখন বলছি।

১৯৫৬ সালের New Year Dayতে আমি ছিলাম প্যারিস সহরে। জাঁকজমক আর পরিচ্ছন্নতায় প্যারিস সহর যে বিশ্ববিখ্যাত সে কথা তো শুনেছো তোমরা সবাই। এমনিতেই তো সব সময়ে রাস্তাঘাট থাকে সাজানো-গোছানো তার উপরে আবার নববর্ষের উৎসব কাজেই রাস্তাঘাট দোকানপাট সব সজ্জিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রিতেই। কয়েকজন ফরাসী যাদুকর বন্ধুর আমন্ত্রণে সেদিন আমাকে বেরুতে হয়েছিল পথে যাদু প্রদর্শনীর শেষে। তাঁরা বেরিয়েছিলেন নতুন বছরকে আবাহন জানাতে আর তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে আমাকেও তাদের সঙ্গী হতে হয়েছিল। যাদুকর বন্ধুরা আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন "কাফে এতোয়াল"এ। 'আর্কদ্য ত্রিয়মৃক'এর কাছে 'এভেন্যু দ্য সানসে দিজে'র উপরে অবস্থিত প্যারিসের এই অভিজাত রেস্তোরাঁ। ঢুকে দেখলাম সব সিট ভর্ত্তি, কোন টেবিলই খালি নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কোণের দিকে একটা টেবিল খালি হতেই আমরা চারজন বসলাম তাতে। কফি এলো—এলো কেক আর 'কোয়াস্তো' নামক ফরাসী পিঠে। খেতে খেতে সুরু হল আমাদের কেরামতি—খাবার, দেশলাই, সিগারেট ইত্যাদি নিয়ে। বন্ধুবর মঁসিও ম্যুলোঁও দেখালেন একটা মজার খেলা। হাতের

জলন্ত সিগারেটটা ছাইদানিতে নামিয়ে রেখে তিনি হাতে উঠিয়ে নিলেন একটা চিনির ঢেলা আমার সামনে রাখা চিনির পাত্র থেকে। এই চিনির ঢেলাটাকে ছাইদানীর একধারে রেখে তিনি একজন পরিচারিকাকে বললেন এই চিনির ঢেলাতে অগ্নি সংযোগ করতে। পরিচারিকাটি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে চেষ্টা করেও ঐ চিনির ঢেলাতে আগুন জ্বালাতে পারলো না। একটা দেশলাইয়ের সবগুলো কাঠি ফুরিয়ে গেল কিন্তু একটুও জ্বললো না চিনি কেবলমাত্র একটু কালুচে রঙ ধরলো সাদা চিনির ঢেলাটায়।
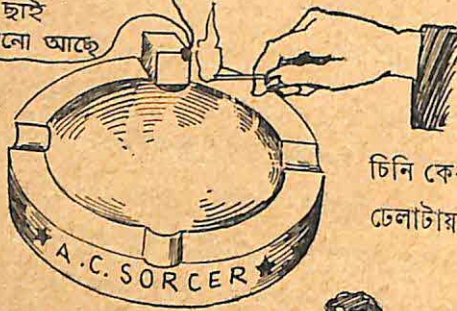
এর পরে ম্যাঁসিও ম্যুলেঁা হাতে তুলে নিলেন চিনির ঢেলাটা। বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লেন—দু'বার ফুঁ দিলেন তারপর ঢেলাটাকে আবার রাখলেন ছাইদানীর এক কোণে। একটা জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি এইবার তিনি ধরলেন চিনির ঢেলাটার গায়ে—জ্বলে উঠল চিনির ঢেলাটা—ছোট্ট একটা নীলচে শিখা বের করে জ্বলতে থাকলো তা। দেখে তো সবাই হলেন অবাক। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যে টেবিলের চারদিকে জড়ো হয়েছিলেন অনেক লোক।
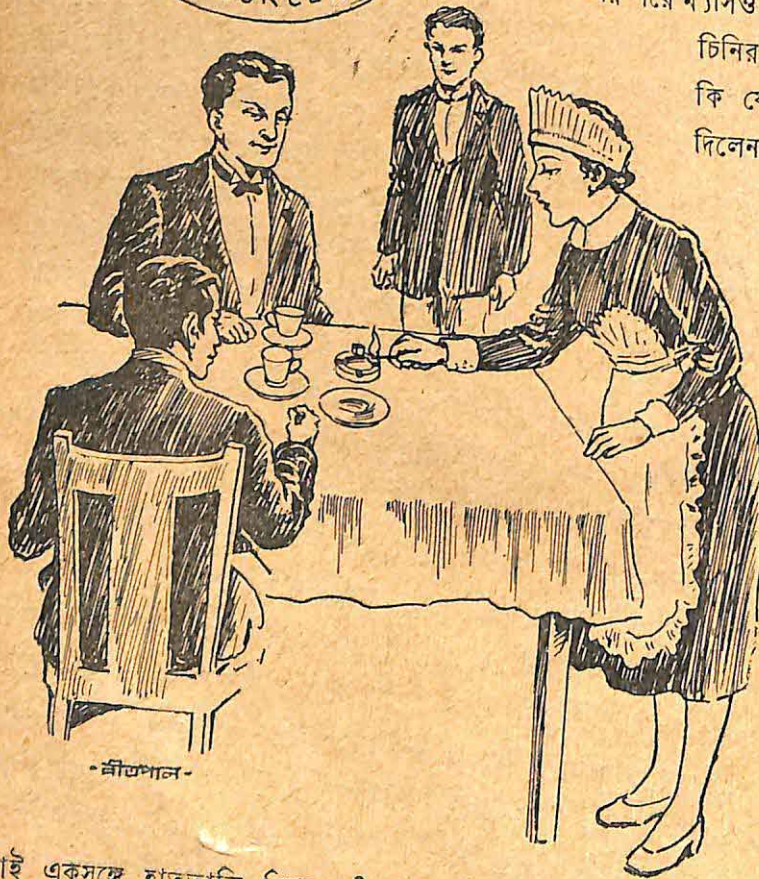
সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে।

বলতে পারো কেমন করে এ সম্ভব হয়েছিলো? মন্ত্রের গুণে! না মন্ত্র-তন্ত্র নয়। এটাও

একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। চিনির সঙ্গে 'এ্যালকোহল' জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এ হচ্ছে দাহ্য জিনিষ। আগুন লাগলে এ জলে সত্যি কিন্তু সে দহন ক্রিয়াটা ভাল করে আরম্ভ না করিয়ে দিলে কোনই ফল হয় না। এজন্যে চিনির ঢেলাটার একটা কোণে মঁ্যসিও ম্যুলোঁ একটু ছাই লাগিয়ে নিয়েছিলেন আর এই কোণেই লাগিয়েছিলেন আগুন। এই ছাই লাগানোর কাজটা তিনি করেছিলেন অতি সাবধানে যাতে কারও নজরে না পড়ে। কাঠ কয়লা জ্বালালে যে সাদা ছাই পড়ে থাকে—সেই ছাই ব্যবহার করে তোমরা অতি সহজে এই খেলা দেখাতে পারবে। যে পাত্রে চিনির ঢেলাটা বসিয়ে রেখে তোমরা খেলা দেখাবে সেই পাত্রের তলায় আগে থেকেই রেখে দেবে কিছুটা কাঠকয়লা পোড়া সাদা ছাই। পরে খেলা দেখানোর সময়ে সকলের অগোচরে একটু ছাই তুলে নিয়ে লাগিয়ে দেবে চিনির ঢেলার এক কোণে।

ভালভাবে অভ্যাস করে দেখ তো বন্ধুদের অবাক করতে পার কিনা এ দিয়ে।

শরৎ-ভোরের চিঠি

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

শরৎ-ভোরের চিঠি পেলাম সবুজ ঘাসে ঢাকা,
হাসি-খুসি শিউলি ফুলের গন্ধ গায়ে মাখা।
আকাশ-ভরা নীলে নীলে
খবরটি কে পৌঁছে দিলে,
আচম্বিতে শিশির-কুঁড়ি চিকণ কচি ঘাসে
হঠাৎ আলোর ঝিলিক নিয়ে হীরের মতো হাসে।

শরৎ-ভোরের চিঠি যে ঐ আলতো বাতাসেতে
ছড়িয়ে গেল কাশের বনে, ভাদুই ধানের ক্ষেতে।
বিপিন মাঝির কণ্ঠস্বরে
মনটা হঠাৎ উদাস করে,
কোন্ সে স্মৃতি গুমরে উঠে রাখালিয়ার গানে ?
আকুল-করা বাঁশীতে তার শিহর জাগে প্রাণে।

সবুজ চিঠি পড়েছে ঐ সাদা বকের সারি,
অথৈ নীলের সমুদ্দুরে দিচ্ছে তারা পাড়ি।
শিলাই নদীর সিক্ত চরে
গাং চিলেরা হল্লা করে—
একটি দুটি নৌকা এসে ভিড়ছে রে ঐখানে।
দূর-প্রবাসী বন্ধু আসে গাঁয়ের মাটীর টানে।

শরৎ-ভোরের সবুজ চিঠি ডাকছে জনে জনে,
কিশোর তুমি, বাইরে এসো আনন্দিত মনে।
জলে স্থলে নীল আকাশে
পুলক যে আজ উথলে আসে,
আগমনীর সানাই বাজে, বোধন সুরু হবে,
বেদন ভুলে এসো সবাই আনন্দ-উৎসবে।

উল্টা বুঝিলি রাম

পরিতোষকুমার চন্দ্র

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় ত্রিশ বছর আগে। তখন আমি বীরভূম জেলার মহকুমা সহর রামপুরহাটে সরকারী ভেটারিনারি হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে কাজ করতাম। একদিন সকালে হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম করছি এমন সময় একটি লোক এসে সেলাম করে আমার হাতে একটি চিঠি দিলো। লোকটির পরনে আধময়লা একটা খাটো কাপড়, খালি গা ও খালি পা,—কাঁধে কেবল একটা ঝাড়ন। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, সে রামপুরহাটের রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের সহিস এবং চিঠিটা তার সাহেবই দিয়েছেন। সাহেবটি কিন্তু বিলাতী সাহেব নন, পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী। বিশেষ কারণেই কিন্তু তাঁর নামটি প্রকাশ করলাম না। চিঠিটি অবশ্য তিনি ইংরাজীতেই লিখেছিলেন, তাই তোমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য এখানে সেটি বাংলাতে অনুবাদ করে দিলাম ঃ
ভেটারিনারি সার্জেন, রামপুরহাট,

এই পত্রবাহক আমার ঘোড়ার সহিস। আজ সকালে আমার ঘোড়াটি তাকে কামড়ে দিয়েছে, তাই তাকে আপনার কাছে পাঠালাম। তার যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ঘোড়াটা তাকে কোথায় কামড়েছে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাঁ কাঁধটা নীচু করে দেখালো। দেখলাম, সেখানটা সামান্য একটু ছড়ে গেছে, কোথাও ঘোড়ার দাঁতের দাগ নেই। মোক্ষম ভাবে কামড় বসাবার আগেই বোধ হয় লোকটি কাঁধ সরিয়ে নিয়েছিল। এই সামান্য ঘায়ের জন্য তাকে কোনো হাসপাতালে পাঠাবারই দরকার ছিল না। যে কোনো একটি বীজবারক (এ্যান্টিসেপ্টিক্) ওষুধের লোশন বা একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিলেই হোতো। তা না করে ভদ্রলোকটি কেন যে তাকে হাসপাতালে,—বিশেষ করে ভেটারিনারি হাসপাতালে পাঠালেন তা ঠিক বুঝতে না পারলেও কিছুটা অনুমান করতে পারলাম। কুকুর কামড়ালেই মানুষের জলাতঙ্ক রোগ হয়, এই রকম একটা ভয় অনেকেরই আছে। ঘোড়া বা অন্য কোনো জন্তু কামড়ালেও মানুষের হয়তো বা সেই ধরনের কোনো রোগ হোতে পারে এই ধারণাতেই বোধহয় ভদ্রলোকটি তাঁর সহিসটির বিশেষ চিকিৎসার জন্য উৎসুক হোয়েছিলেন। তারপর তাকে যখন মানুষে কামড়ায়নি, কামড়েছে ঘোড়ায় এবং ঘোড়া ভেটারিনারি ডাক্তারের এলাকাভুক্ত,—তাই বোধ হয় তিনি সহিসটিকে আমার কাছেই পাঠিয়েছিলেন।

যাহোক, সহিসটির ছড়ে যাওয়া জায়গাতে সামান্য একটা কিছু ওষুধ লাগিয়ে বিদায় করে দিলেই হোতো, কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে একটু রগড় করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। সহিসটিকে কোনো ওষুধ না দিয়েই তার আনা চিঠির নীচে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখে চিঠিসহ তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

আপনার ঘোড়া আপনার সহিসটিকে কামড়েছে জেনেও তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আপনার সহিস যদি ঘোড়াটিকে কামড়াতো আর আপনি যদি ঘোড়াটিকে আমার কাছে পাঠাতেন তবে অবশ্যই আমি ঘোড়াটির চিকিৎসা করতাম; কিন্তু এ ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্‌টো হওয়াতে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। ক্ষমা করবেন।

আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোকটি আমার লিখিত টিপ্পনী পড়ে তার মর্মার্থ বুঝতে পারবেন; কিন্তু তোমরা শুনে অবাক হবে যে, সেটাতো তাঁর বোধগম্য হয়ইনি, উল্‌টে, তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর সহিসের চিকিৎসা না করে তাকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য তিনি আমার ওপর চটে গিয়েছিলেন। এমন কি তিনি এর জন্য আমার বিরুদ্ধে রামপুরহাটের সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার বীভারের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিলেন। এই ঘটনার দিন দুয়েক পরেই মিষ্টার বীভারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। নালিশের কথাটা অবশ্য তাঁরই মুখে শুনেছিলাম। মিষ্টার বীভারের কাছে শুনেছিলাম যে, ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি আলোচ্য চিঠিতেই আমার মন্তব্যের নীচেই আমার বিরুদ্ধে নালিশ লিখে চিঠিটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নালিশ শোনো:

ঘোড়ার কামড়ের চিকিৎসার জন্য আমার সহিসকে স্থানীয় ভেটারিনারি সার্জেনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুই না করে সরাসরি তাকে বিদায় করে দিয়েছেন। সহিসটির চিকিৎসা না করার কারণ স্বরূপ তিনি যা লিখেছেন তা এই চিঠিতেই লিপিবদ্ধ করলাম তাঁর মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশাকরি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করার জন্য আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

তাঁর উপরোক্ত নালিশের উত্তরে মিষ্টার বীভার তাঁকে যা লিখেছিলেন সেটাও অবশ্য মিষ্টার বীভারের মুখেই শুনেছিলাম, তোমরাও তা শোনো। মিষ্টার বীভার লিখেছিলেন:

আপনার সহিসের চিকিৎসা না করে তাকে ফেরত দিয়ে ভেটারিনারি সার্জেন কোনো অপরাধ করেননি, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সহিসটিকে ঘোড়ার কামড়ের চিকিৎসার জন্য মানুষের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।

মিষ্টার বীভারের মন্তব্য পড়ে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি কি করেছিলেন তা অবশ্য আমি জানতে পারিনি, তবে এর দিন কয়েক পরে স্থানীয় মানুষের হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম তিনি সহিসটিকে সেখানেও পাঠাননি। *

---

* আমার এই সত্য কাহিনীটি ইতিপূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকায় রায়জী পরিচালিত 'অফ্ দি ট্র্যাক' কলমে প্রকাশিত হোয়েছিল। রায়জীর অনুমতি নিয়েই সেটি বাংলায় লেখা হোলো।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

কাঠের শিল্প কাজ

অবসর সময়ে টুকরো কাঠ থেকে কত শিল্প কাজ করা যায়। এজন্য যন্ত্রপাতিও খুব বেশি দরকার নেই। হাত করাত, হাতুড়ী, বাটালী এবং একখানি ধারাল ছুরি হ'লেই চলবে।
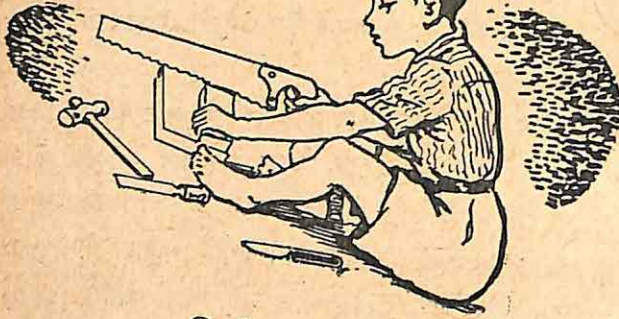
মেহগ্নি প্রভৃতি নরম কাঠের আধ ইঞ্চি পুরু তক্তা ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে তেমনি করে সিকি ইঞ্চি বর্গ ক্ষেত্রে ভাগ করে নাও। তারপর বাটালী দিয়ে ওটা কেটে নিয়ে ধারাল ছুরির সাহায্যে পরিষ্কার করে নাও। পরিষ্কার করবার পর কোন্‌টার কি চেহারা হবে ছবিতেই তা দেখানো হ'য়েছে।
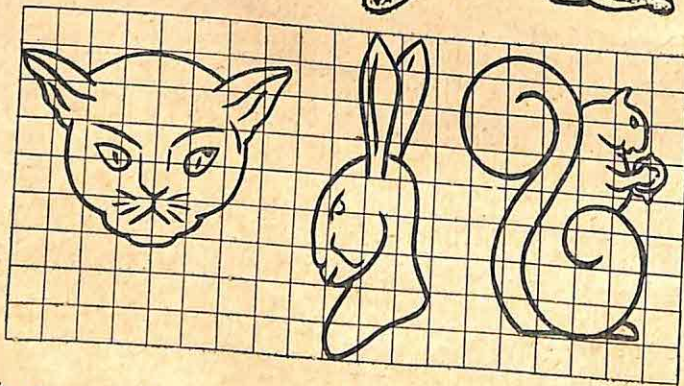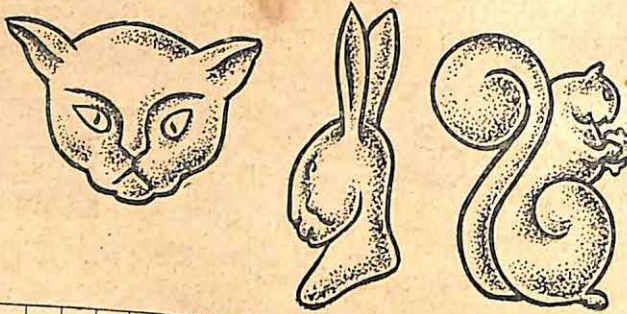
কাঠের এই শিল্প কাজগুলি একটু বড় করে করলে এগুলিকে দেওয়ালের সঙ্গে আটকিয়ে ব্রাকেট হিসাবেও এগুলির ব্যবহার চলে।

শিমুল গাছের বড় কাঁটা—একসঙ্গে যেখানে দুটো তিনটে হয়েছে, এমন জায়গা থেকে ঐ

কাঁটাগুলি তুলে নিয়ে ওর নিচের দিকটা পাথরে ঘষে নিয়েও ছোট আকারের ঐ সব শিল্প কাজ করা চলে। শিমুল কাঁটার কাঠ বেশ নরম। নরুণ দিয়েও এই কাঁটার নক্সা, ফুল প্রভৃতি তোলা
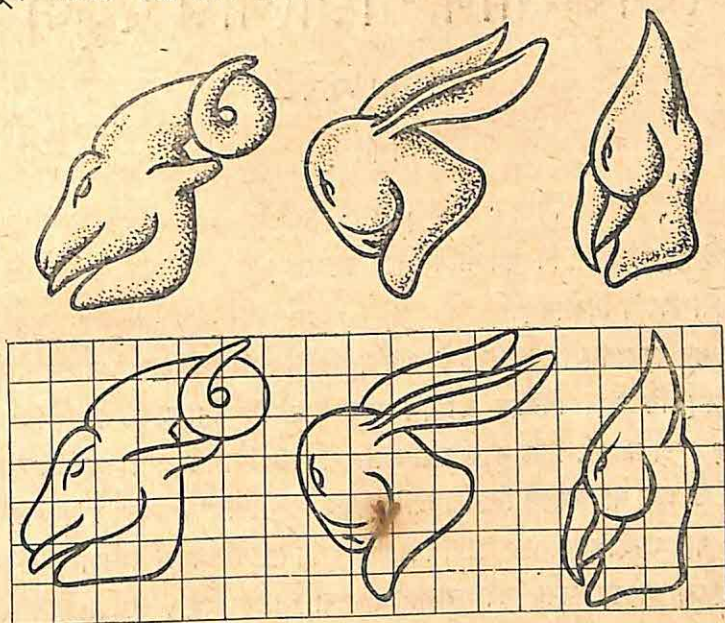
যায়। ছেলেরা তাদের লাইব্রেরী বা ক্লাবের জন্যও এই কাঁটা দিয়ে সুন্দর 'ষ্ট্যাম্প' তৈরী করে নিতে পারে।

ভালো চটকানো এটেল মাটি শুকিয়ে নিয়েও ছুরি দিয়ে ঐসব শিল্প কাজ দেখানো যায়।

খুকুর রাগ

পলাশ মিত্র

খুকু রাগ করেছে ভারি
সকাল থেকে বলছে মাকে
দিচ্ছে নাকো তবুও তাকে
টুক্‌টুকে লাল চওড়া পাড়ের
রঙ্গীন ডোরা সাড়ি
সবার সাথে তাইতো খুকু
আজ করেছে আড়ি।

খুকুর মুখটি বড় ভার
রান্না ঘরে চাইলে যেতে
কিংবা শুতে নাইতে খেতে
বড়দি' দাদা আসবে তেড়ে
বকবে বারেবার
পুতুল বিয়ের নেমতন্ন
করবে না সে আর।

তোতলামি সারানোর ইস্কুল

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রথম দৃশ্য

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্ময়

হিরণ্ময়। শুনেচিস্, আমাদের নিরঞ্জন নাকি বিয়ে করেছে ?

হিরণ্যাক্ষ। পরোপকারী নিরঞ্জন ?

হিরণ্ময়। শ্বশুর খুব বড়লোক। শ্বশুরের টাকায় ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেত যাবে নাকি !

হিরণ্যাক্ষ। বলিস্ কিরে! নিরঞ্জন তাহলে অ্যাদ্দিনে কি নিজেকে পর বলে বিবেচনা করতে পেরেচে ? তা না হ'লে নিজেকে ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে ? নিজেকে পর বলে ভাবতে না পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয় !

হিরণ্ময়। বাঁচা যায় তাহলে। ওর পরোপকারের খর্পর থেকে আমরা বাঁচি।

হিরণ্যাক্ষ। ইস্কুলে পড়ার সময় কী জ্বালানটাই না জ্বালিয়েছে! তোর মনে আছে, সেইবার— সেই ফুটবল ম্যাচ জিতে ফেরার সময়। তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে, সামনে লেমনেডের ঝুড়ি, ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে। বলচে এত দৌড়ঝাঁপের পর জল খেলে সর্দিগর্মি হবে। হার্ট ফেল করতেও পারে।

হিরণ্ময়। মনে আছে বই কি। আমরা যতো বলি, করে করুক, আমাদের হার্ট, তোমার কি ! ও ততই বলে আহা মারা যাবে যে।

হিরণ্যাক্ষ। যতই বলি যে জল না খেলেও যে মারা যাবো, তা দেখচ না ! ও ততই বলে সেও ভালো। তা বলে হার্ট ফেল করে কি সর্দিগর্মি হয়ে তোমাদের মরতে দিতে পারি না। দিল না জল খেতে।

হিরণ্ময়। সেদিন কি ইচ্ছে হয়েছিল জানিস ? ইচ্ছে হয়েছিল যে আরেকবার ম্যাচ খেলা সুরু করি— নিরঞ্জনকেই ফুটবল বানিয়ে। কিম্বা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমনেডের বোতল-গুলোকে ব্যাটের মতন কাজে লাগাই !

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

হিরণ্যাক্ষ। এই যে নিরঞ্জন! তোমার কথাই হচ্ছিল। বলি চুপি চুপি বিয়েটা সারলে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের ? জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি। অনেক কিছু ভালো মন্দ খেয়ে পাছে পেটের অসুখে মারা পড়ি—সেই কারণেই কাউকে জানাওনি। কিন্তু

না হয় কিছু নাই খেতাম আমরা, বিয়েটাই দেখতাম কেবল। বৌ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না নিশ্চয় ?

নিরঞ্জন। কী যে বলো! বিয়েই হোলো না তো বিয়ের নেমন্তন্ন!

হিরণ্ময়। তবে যে শুনলাম বিয়ে করে বড়লোক শ্বশুরের টাকায় ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেত যাচ্ছো ?

নিরঞ্জন। বাজে কথা! ভুলেও নিজের উপকার করবো তোমরা তাই ভেবেছ আমাকে ? পাগল! ভাবছি তোতলাদের জন্যে একটা স্কুল খুলব। মূক-বধির বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোতলাদের জন্য তো কিছু নেই। অথচ কী সম্ভাবনাই না রয়েছে তাদের মধ্যে।

হিরণ্যাক্ষ। কি রকম ?

নিরঞ্জন। জানো না ? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস আসলে কী ছিলেন ? তোতলাই তো ? মুখে মার্বেল গুলি রাখার প্র্যাকটিস করে নিজের তোতলামি সারিয়ে ফেল্লেন। অবশেষে, তিনি এত বড় বক্তা হলেন যে, অমন বক্তা পৃথিবী কখনো ছাখেনি। সেটা সেই মার্বেল গুলির কল্যাণেই কিম্বা তোতলা ছিলেন বলেই-কি-সে যে হোলো তা আমি বলতে পারব না।

হিরণ্যাক্ষ। বোধ হয়—ওই দুই কারণেই।

নিরঞ্জন। আমারো তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস বানাবো। তোতলা তো তারা রয়েছেই; এখন দরকার খালি মার্বেল গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস বানাবার আর বাকী কী রইল ?

হিরণ্যাক্ষ। তা বটে!

হিরণ্ময়। কিন্তু ভাই, ডিমস্থিনিসের কি খুব বেশী প্রয়োজন আছে এ দেশে ?

নিরঞ্জন। নেই আবার! বক্তার অভাবেই তো দেশটা মাটি হচ্ছে। দেশের এত দুর্গতি। লোককে কাজে প্রেরণা দিতে তো বলতে হবে, বলে বোঝাতে হবে। বক্তা চাই আগে। শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ কি জাগবে ? কেন, বক্তৃতা ভালো লাগে না তোমার ?

হিরণ্ময়। খুব ভালো লাগে—থেমে যাবার পর। কিন্তু যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় কালারাই এই দুনিয়ায় সুখী।

নিরঞ্জন। কালারাই ? তাহলে আমি এমন বক্তা তৈরী করবো যারা শুধু মানুষের চোখ ফোটাবে না, কালাদেরও কান ফুটিয়ে দেবে।

হিরণ্যাক্ষ। কি বল্লে ? কান ফুটো করে দেবে ?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়, তা নইলে বক্তা কিসের। বক্তৃতা কী! তাহলেই ভেবে দেখো, দেশের জন্য চাই বক্তা আর বক্তার জন্যে চাই তোতলা। কেন না ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোতলাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব; যেহেতু ডিমস্থিনিস নিজে একজন তোতলা ছিলেন।

অতএব ভেবে দেখলে, তোতলারাই আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। কী, কি ভাবচো কি ?

হিরণ্যাক্ষ। ভাবছি কি করে তোতলা হওয়া যায়।

নিরঞ্জন। তোতলাদের একটা ইস্কুল খুলব।- সবই ঠিক। বিস্তর তোতলাকে রাজিও করিয়েছি। এখন ইস্কুলের একটা পছন্দসই নাম পেলেই হয়। ভালো নামের অভাবে ইস্কুলটা খোলা হচ্ছে না।

হিরণ্ময়। নামের আবার অভাব কি !

নিরঞ্জন। একটা নাম ঠিক করে দাও না ভাই। নাম না হলে কি চলে ?

হিরণ্ময়। কেন, নাম তো পড়েই আছে। নিঃস্বভারতী। খাসা নাম। চমৎকার !

নিরঞ্জন। নিঃস্বভারতী ? তার মানে ?

হিরণ্ময়। ভারতী মানে বাক্য। বাক্য যাদের নিঃস্ব, কিনা; থেকেও নেই—তারাই হোলো গিয়ে নিঃস্বভারতী।

নিরঞ্জন। উঁহু, ও নাম দেওয়া চলবে না। বিশ্বভারতী ভাববে তাদের দেখে তাদের থেকেই নামটা চুরি করেছি। তারা আপত্তি করতে পারে।

হিরণ্যাক্ষ। তাহলে একটা ইংরিজি নাম দাও—Sanatorium for Faltering Tongues (স্যানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংগস)।

নিরঞ্জন। কিন্তু বড্ডো লম্বা হোলো না ?

হিরণ্যাক্ষ। তাতো হোলোই। যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা অবলীলায় উচ্চারণ করছে—গড়গড় করে গড়িয়ে দিচ্ছে—আটকাচ্ছে না কোথথাও—সেদিনই বুঝবে তারা পাশ হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে ! কিম্বা জিভ দেখিয়ে।

হিরণ্ময়। নামকে নাম, কোশ্চেন পেপারকে কোশ্চেন-পেপার !

নিরঞ্জন। ঠিক বলেছ, এই নামটাই থাকলো তবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্যানাটোরিয়ম্ ফর্ ফলটারিং টাংগস্ স্কুলের ইণ্টারভিউ রুমে

হিরণ্ময় আর হিরণ্যাক্ষ

হিরণ্ময়। অনেক দিন থেকেই ইস্কুলটা দেখতে আসবো আসবো ভাবি—কিন্তু সময়াভাবে আর আসা হয়ে ওঠে না।

হিরণ্যাক্ষ। আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু অবকাশ পাই না, তারপরে সঙ্গী না পেলে কোথাও যাবার উৎসাহ হয় না আজকাল।

হিরণ্ময়। আমারো তাই। আজ তোমাকে পেলাম বলেই এধারে আসা হোলো। কিন্তু অনেকদিন থেকে নিরঞ্জনের ইস্কুলের খবর কানে আসছিলো—

হিরণ্যাক্ষ। নিরঞ্জন এদিকে দেশের আর দশের উপকার করে মরছে ; আর আমরা যে এখানে এসে ওকে একটু উৎসাহ দেব এটুকুও আমাদের সময় হয় না। ধিক্ আমাদের।

হিরণ্ময়। মার্বেল গুলির কল্যাণে নিশ্চয় অনেকের তোতলামি সেরেছে এতদিন। ডিমস্থিনিসের মত বক্তা বানাতে মার্বেলের গুলি অব্যর্থ।

হিরণ্যাক্ষ। তাছাড়া মার্বেল গুলির আরও উপকারিতা আছে—যেমন দাঁত শক্ত করা, মুখের হাঁ বড়ো করা—আনুষঙ্গিক ভাবে এসবও হয়ে যায়। এসব লাভও নেহাৎ কম নয়।

[কয়েকটি ছেলে এসে ঢুকলো]

একটা ছেলে। কা—কা—কা—কা—কাকে চান ?

দ্বিতীয়টি। মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা······ ?

তৃতীয় জন। মাস্টার বা—বা—বা—বা—বা—

হিরণ্যাক্ষ। কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কারুকে আমরা চাইনে। নিরঞ্জন আছে ?

[ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। জনৈক আধাবয়সী ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ভদ্রলোক। মাস্টার বা—বাবুকে খু—খুঁজছেন আপনারা ? ডে—ডেকে দিচ্ছি। আমিই এই ই—ইস্কুলের কে—কে—কে—কেলার্ক। [ভদ্রলোকের প্রস্থান। ছেলেদেরো।]

হিরণ্যাক্ষ। বাঃ, নিরঞ্জনের বেশ রুচি আছে। তোতলামীর ইস্কুলে ক্লার্কও তোতলা দেখে রেখেছে। মন্দ নয় ত !

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। এই যে অ—অনেক দিন প—পরে !

হিরণ্ময়। (হিরণ্যাক্ষকে জনান্তিকে) হ্যাঁরে, তোতলাদের পাল্লায় পড়ে নিরঞ্জনও তোতলা হয়ে গেল না-কি ?

হিরণ্যাক্ষ। বোধ হয় ঠাট্টা করছে আমাদের সঙ্গে।

নিরঞ্জন। তা খ—খবর সব ভা—ভালো ?

হিরণ্ময়। মন্দ কি ! কিন্তু তোমার খবর তো ভালো বোধ হচ্ছে না। তোতলামি প্র্যাক্‌টিস্ করেছো নাকি ? কবে থেকে ?

নিরঞ্জন। প্যা—প্যা—প্যা—প্যারাক্—প্রাস্‌টিক করব কেন ? তো—তো—তোতলামি কি কে—কেউ প্র্যাকটিস্ করে ?

হিরণ্যাক্ষ। তবে তোতলামিতে প্রোমোশন পেয়েছো বলো !

নিরঞ্জন। ভাই হি—হি—হির—হিরণ্—না - ক্ষা—ক্ষা - ক্ষা—ক্ষা - ক্ষা—

[দম আটকে চোখ উল্‌টে যাবার যোগাড়]

হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়, মুখে বাধে, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বোলো। 'কশিপু'র মধ্যে 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।

নিরঞ্জন। ভাই হি—হিরণ্যকশিপু, আমার এই স্যানাটো—টো—টো - টো·········

হিরণ্ময়। বুঝেছি, তোমার এই স্যানাটোজেন, তারপর ?

নিরঞ্জন। (চটে গিয়ে) স্যানাটোজেন ? আমার ইস্কুল হো—হো—হোলো গিয়ে স্যা—স্যানাটোজেন ? স্যানাটোজেন তো এ—একটা ও—ও—ওষুধ !

হিরণ্যাক্ষ। আহা, ধরেই নাও না হে ! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ। তোতলামি সারানোর একটা ওষুধ নয় কি ?

নিরঞ্জন। (খুশি হয়ে একটু হাসল)। তা—তা—বটে !

হিরণ্ময়। তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দূর ডিমস্থিনিস্ হোলো ?

নিরঞ্জন। ডি—ডিম হয়েছে !

হিরণ্যাক্ষ। বলো কি ! তা, আদ্দেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কী ?

হিরণ্ময়। বাকিটাও হয়ে যাবে ! ঘাবড়ো না। লেগে থাকো।

নিরঞ্জন। আ—আর হবে না। মা—মা—মা - মা—মার্বেলই মুখে রাখতে পারে না তো কি - কি—কি - করে হবে ?

হিরণ্যাক্ষ। মুখে রাখতে পারে না ? কেন পারে না ?

নিরঞ্জন। স—স—সব গি—গিলে ফ্যালে।

হিরণ্ময়। গিলে ফ্যালে ? তা—হলে আর তোতলামি সারবে কি করে !

হিরণ্যাক্ষ। সত্যিই তো ! তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল। যেমন করে হোক মার্বেল-টার্বেল মুখে রেখে—যা করে হয়। রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার। দেরি করা ঠিক না।

নিরঞ্জন। (হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে) আ—আমার যে ডি—ডি—ডি—ডিস পে—পে—পেপ সিয়া আছে। হ—হ—হজম করতে পারব কেন ?

হিরণ্ময়। ও, ডিস্‌পেপসিয়া থাকলে তোতলামি সারে না বুঝি ?

নিরঞ্জন। আ—আর আমার কি পা—পা—পা—পাথর হজম করার ব - ব—বয়েস আছে ?

হিরণ্ময়। কেন, পাথর হজম করতে হবে কেন ?

নিরঞ্জন। আ—আমিও যে গি—গিলে ফেলি।

হিরণ্যাক্ষ। তাইত ! ভারি মুস্কিল তো ! তাহলে তোমার চলছে কি করে ?

হিরণ্ময়। ছেলেরা সব নিয়মমত বেতন দেয় তো ?

নিরঞ্জন। উঁহু—স—সব ফি—ফি—ফ্রি যে ! অ—অনেক সা—সাধাসাধি করে আনতে হয়েছে।

হিরণ্যাক্ষ। তবে তোমার চলছে কি করে ?

নিরঞ্জন। কে—কেন ? মা—মা—মার্বেল বেচে ? এক একজন দ—দ—দশটা বারোটা করে খায় রোজ। ওগুলো মু—মুখে রাখা ভা—ভা—ভারি শক্ত !

হিরণ্ময়। ব—ব—ব—বটে ?

হিরণ্যাক্ষ। ব-ব-ব-ব-ব—বলো কি !

হিরণ্ময়। (হিরণ্যাক্ষের দিকে সভয়ে তাকিয়ে) অ্যাঁ ? আ—আমরাও কি তো—তোতলা হয়ে গেলাম নাকি ?

হিরণ্যাক্ষ। ভা—ভা—ভারি মা—মা—মা—মা—রাত্মক জায়গা ! এখানে আর থাকে না…… পা—পা—পা—পালাও !

[তীরবেগে উভয়ের প্রস্থান]

॥ যবনিকা ॥

বর-বধূ

আধুনিক এ মিলন
বর-বধূ একই জন।

ফটো : কালীয়দমন মুখার্জ্জি

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

জ্যোতিষ্মান উদ্ভিদ

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে ভূতের কথা প্রায়ই শোনা যায়। বন, জঙ্গল, মাঠ, শ্মশান এই সব জায়গায়, সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরেই নাকি ভূত বাস করে। আবার বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীতেও ভূতেরা আস্তানা করে নেয়। ভূত আবার অনেক রকম আছে, তার মধ্যে একরকম ভূতের নাম আলেয়া। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধে লোকমুখে গল্পই শোনা যায়, চাক্ষুষ ভূত দেখেছে এমন লোক পাওয়া যায় না ; কিন্তু আলেয়া ভূত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এ রকম লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। আলেয়া সম্বন্ধে যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, রাত্রে এই ভূতের আবির্ভাব হয় আর ভূত যখন ঘোরাফেরা করে তখন হঠাৎ কোনও কোনও জায়গায় আপনা হতেই অনেকটা আগুন বা আলো জ্বলে ওঠে, অথচ সেখানে কোনও লোক আগুন বা আলো জ্বালায় না। সাধারণ লোকে এটাকে একটা ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে করে আর বিপদের আশঙ্কায় এই রকম আলো বা আগুন থেকে দূরেই থাকতে চায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ জিনিষটাকে অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাদের কাছে আলেয়ারও নিস্তার নেই। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে এই রকম আলো অনেক কারণেই হয়, যেমন, গ্যাস থেকে পাওয়া আলো, কীট পতঙ্গের শরীর থেকে নির্গত আলো আর উদ্ভিদ থেকে পাওয়া আলো। যদি কোনও বদ্ধ স্থানে গাছের পাতা বা ছোট ছোট মাছ বা অন্য প্রাণী জমা হয়ে মরে পচে ওঠে তখন তা থেকে এক রকম গ্যাস বার হয় তা বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। পল্লী অঞ্চলে জলা জায়গায় রাত্রে যে আলেয়া দেখা যায় তার প্রধান কারণ হল এই গ্যাস ও বাতাসের সংমিশ্রণ। জোনাকি যেমন আলো দেয়, সে রকম কেঁচো, কেন্নাই প্রভৃতি প্রাণীর দেহ থেকেও এক রকম আলো বার হয়, কিন্তু তাতে বেশী আলো হয় না। সমুদ্রে এক প্রকার জীবাণু থাকে সেগুলিও এক রকম আলো দেয় ; এই জীবাণু এক সঙ্গে কোটি কোটি থাকে এবং যখন এগুলি জলের উপর ভেসে ওঠে তখন এক আশ্চর্য্য আলোর খেলা দেখা যায়।

উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি আলোক বিকীরণ করে তা হ'ল কয়েক জাতীয় ছত্রাক। এই সব ছত্রাকের সাধারণতঃ যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাকে আমরা বলি ব্যাংএর ছাতা। এ ছাড়া এর অন্য অংশ অতি সূক্ষ্ম সূতার জালের মত হয়। ছত্রাক ভিজা খড়কুটা, কাঠ, পচা পাতা প্রভৃতির উপর জন্মায় আর ছত্রাকের এই সূক্ষ্ম জালের মত অংশ খড়কুটা বা কাঠের গায়ে ছড়ান থাকে বা তার ভিতরে প্রবেশ করে। এইগুলি ভিজা জায়গা পেলেই বিস্তৃত হতে থাকে এবং অল্প সময়েই অনেকটা জায়গা ঢেকে ফেলে কিন্তু আবহাওয়া শুষ্ক হলেই এগুলো মরে যায় বা নির্জীব হয়ে পড়ে। আলোক বিকীরণ-কারী ছত্রাকের অধিকাংশই এই সূক্ষ্ম জালের মত অংশটি থেকেই আলো দেয়। কোনওটির বা ছাতার

চক্রাকার অংশের নিম্নভাগ থেকে কোনওটির বা ছাতার দণ্ড থেকে আলো বার হয়ে আসে। ছত্রাকটি যত সতেজ থাকে আলোও তত উজ্জ্বল এবং শুষ্ক হতে থাকলে আলোক ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যায়।

বনের মধ্যে অনেক সময় এক বিস্তীর্ণ অংশে পচা ডালপালা বা ভূপতিত বৃক্ষ কাণ্ডে এই রকম ছত্রাক জন্মে, আর বর্ষার সময় প্রায় প্রতি রাত্রে ঐ সব জায়গা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের কাছে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। জীব-বিজ্ঞানী শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য একবার নিজের সাহস ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে এই রকম এক ভৌতিক আলোর রহস্য ভেদ করে স্থানীয় লোকের ভয় দূর করেন। এক গ্রামে জঙ্গলে ঢাকা একটি পোড়ো ভিটায় প্রতি রাত্রে আলেয়ার আবির্ভাব হয় শুনে তিনি দুই জন সঙ্গী নিয়ে এক রাত্রে সেইখানে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে একটি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, সেই গুঁড়িটার অনেক অংশই পচা। সারা গুঁড়িটা থেকে আলোর আভা বার হচ্ছিল। কাঠকয়লা যেমন জ্বলে কিন্তু শিখা থাকে না, মনে হচ্ছিল গুঁড়িটা যেন সেই ভাবেই জ্বলছে। পরের দিন সকালে সেই আলোর আর চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি সেই গুঁড়ি থেকে কয়েকটি কাঠের টুক্‌রা এনেছিলেন. সেগুলি রাত্রে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল। এ রকম দুই রাত্রির পর সেই টুকরাগুলির আলো বন্ধ হয়ে গেল।

উপরে যে আলোকবিকীরণকারী কাঠের গুঁড়িটির কথা বলা হল সেইখানে আলোকের উৎস ছিল এক রকম ছত্রাক যা সেই গুঁড়ির উপর জন্মেছিল। কিন্তু ছত্রাক ছাড়া অন্য শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও দু'একটিকে কখনও কখনও এ রকম আলোক বিকীরণ করতে দেখা যায়।

জোনাকি

গোপাল চক্রবর্ত্তী

হিজল গাছে কি জ্বলছে?
জ্বলছে জোনাকি!
আকাশভরে তারার আলো
নিচের আঁধার নিকষ-কালো
তার মাঝেতে এই তো ভালো
হাজারখানা কি!
হিজল গাছে কি জ্বলছে,
জ্বলছে জোনাকি।

রূপকথার-ই রূপোর মত
আলোর কথা বলে
দৈত্য-দানোর চোখটা ওকি
বনের মাঝে দিচ্ছে উঁকি
"হাঁউয়ো" বলে আসবে নাকি?
ব্যাপারখানা কি!
হিজল গাছে কি জ্বলছে
জ্বলছে জোনাকি।

দু'খানি হারানো পুঁথির কথা

(বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ও রাজতরঙ্গিণী)

শ্রীঅনিরুদ্ধ সেন

অনেক অনেক দিন আগে যখন কাগজের ব্যবহার ছিল খুব কম, ছাপার যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়নি, বই তখন হাতে লিখতে হ'ত। তালপাতা বা পাতলা কাঠের ওপর লেখা এই সেকেলে পুঁথিগুলি তোমরা হয়ত কেউ কেউ দেখেছও। এইসব পুঁথিগুলি আজকে প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু পুঁথি খুঁজে বের করতে কত ধৈর্য্য, পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। আজকে সেই পুঁথি আবিষ্কারের কথাই বলবো।

অনেককাল আগে কাশ্মীরে, রাজা অনন্তবর্মের রাজকবি ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বৃহৎ কথা' নামে একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 'বৃহৎ কথা'র রচয়িতার নামও ক্ষেমেন্দ্র। সেজন্য অনেকে মনে করেন এই ক্ষেমেন্দ্রই, অনন্তবর্মের রাজকবি ছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্র যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তবুও জাতকের নানা কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে তিনি এক মনোজ্ঞ বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই বিখ্যাত বইয়ের নাম 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'। এই পুঁথির সন্ধান বহুদিন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। আজ এই বইয়ের অনুবাদ নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তিব্বতে এই বই বিশেষ সমাদৃত হয়।

পুরনো পুঁথির যখন খোঁজ করা হ'তে থাকে তখন এই বইটির জন্য খুব অনুসন্ধান করা হয়। নেপালের বৌদ্ধমঠে বহু পুঁথি পাওয়া যায়। এই সব পুঁথির মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। নেপালের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হাডসন ও রাইট সাহেবদ্বয়ের সহায়তায় এই সব পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই সব পুঁথির মধ্যে 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। হাডসন ও রাইট সাহেব এই পুঁথির কিছু অংশ পেয়েছিলেন মাত্র। অনুসন্ধানে জানা গেল বাকী অংশ নেপাল হতেও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এদিকে সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ, চীন, ভূটান, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধমঠ থেকে প্রাপ্ত পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হ'তে থাকে। সে তালিকাতেও 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র কোন সন্ধান মিলল না।

প্রথম বাঙালী তিব্বত-পর্য্যটনকারী (আধুনিক যুগে) শ্রীশরৎচন্দ্র দাস মহাশয় লাসায় বহু সংস্কৃত ও তিব্বতীগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারেন ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' ডালকের ছাপাখানায় ছাপা হয়। সেখানে কাঠের অক্ষরগুলি রয়েছে। বহু পরিশ্রমে, তিনি তিব্বতী অক্ষরে সংস্কৃতে এই পুঁথির একখণ্ড সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থের যথার্থতা সম্বন্ধে

পরীক্ষা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়। গ্রন্থের যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার বাকী সবটুকুরই সন্ধান মিলল। স্থচিপত্র মিলিয়ে এই গ্রন্থের সত্যাসত্য জানা গেল।

যে পুঁথির অনুসন্ধান জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজেরা পাননি সেই পুঁথিরই আবিষ্কারক হলেন একজন বাঙালী পণ্ডিত। এই পুথি এখন পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়।

রাজতরঙ্গিণী হচ্ছে কাশ্মীরের ইতিহাস। এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন সংস্কৃতে প্রখ্যাত পণ্ডিত কহ্লন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা এই বইয়ের নামটাই জানতেন কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত সেটা পড়ার সৌভাগ্যলাভ করেন নি। তাঁরা মনে করেছিলেন এই বইটি বুঝি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা যখন ভারত অধিকার করেন তখন বহু পুঁথির ধ্বংস সাধন করা হয়। অবশ্য শুধু পুঁথিই নয়, ধ্বংস করা হয়েছিল আরও অনেক কিছু। যাই হোক এরপর ইংরেজেরা ভারত অধিকার করেন। এই সময়েই প্রথম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো হ'তে থাকে। শুধু ইংরেজেরাই ন'ন তার সঙ্গে জার্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতার নিদর্শনসমূহ জগতের দরবারে তুলে ধরেন।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের বিলুপ্তির যে সংবাদ প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল না। এরই একখণ্ড জনৈক কাশ্মীরী পণ্ডিতের অধিকারে ছিল। পরে পণ্ডিতের পুত্রেরা এই বইয়ের অধিকার পান। তাঁরা এই পুঁথির সম্বন্ধে কিছু না জেনেই পুঁথি পূজো করতে স্থরু করেন।

প্রখ্যাত পর্য্যটক স্যার অরেল ষ্টেইন রাজতরঙ্গিণীর অনুসন্ধানের জন্যে কাশ্মীরে যান। অনেক খোঁজ করার পর তিনি পণ্ডিত-পুত্রদের সংবাদ পেলেন। তারপর বহু অর্থের বিনিময়ে ও বহুকষ্টে এই পুঁথি সংগ্রহ করেন। (পুঁথি পড়া কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। ভক্তির আতিশয্যে পুঁথির ওপর এত সিঁদূর, চন্দন প্রভৃতি লাগানো হয়েছিল যে ফলে বইখানা নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।) ষ্টেইন সাহেব এরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ফলে, এই লুপ্তপ্রায় বই থেকে পৃথিবীর মানুষ কাশ্মীরের রাজাদের সম্পর্কে বহু নতুন কথা জানতে পারে।

শুধু এই দুটি পুঁথিই নয়, এমন বহু পুঁথি আবিষ্কার করতে হয়েছে বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয়ে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সর্দার কে. এম. পাণিক্কর হারানো পুঁথির সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন মার্চ্চ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় কিছুদিন আগে। গোবি মরুভূমির কাছে চীনা সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে তুন্-হুয়াং গুহায়। অজন্তার অনুকরণে এখানে বহু গুহাচিত্র খোদিত আছে। কোন একজন প্রখ্যাত পর্য্যটনকারী পরিচালককে হাত করে এখানকার বহু অমূল্য পুঁথি স্বদেশে নিয়ে যান। এজন্য আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের দেশ থেকেও বহু মূল্যবান বই বাইরে চলে গেছে। সেগুলো দেশে থাকলে আমাদের দেশের পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার পক্ষে অনেক কাজে আসতো। আমাদের ভারতবর্ষের পুঁথিগুলি যাতে এদেশেই থাকে এবং তার ব্যবহার হয় সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

—দুই—

কলকাতায় ফিরে আসতেই হিরণের পরীক্ষার ফল জানতে পেরে ওর বড় দাদা হেমেন্দ্র বল্লেন—এঃ, প্রতিযোগিতায় হেরে গেলি ? আর একটু চেষ্টা করলেই যে সরকারী চাকরী পেতিস্। এখন সাত দরজায় খোসামোদ করে বেড়াতে হবে, তাও তোর ভাগ্যে যে কি জুটবে বলা যায় না। হেমেন ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মুখের ওপর কথা কওয়া চলে না। হিরণ বলতে পারলে না যে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সারা ভারতবর্ষের বাছাই করা ভালো পরিশ্রমী ছেলে ঐ কলেজে জোটে, সে যা-তা ছেলেদের দ্বারা পরাজিত হয় নি। চাকরীর কথায় একবার ওর মনে হ'ল যে বাড়ীর ঘটনাটা দাদাকে বলে। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ে গেল যে মন্ত্রগুপ্তি কার্য্যসিদ্ধির প্রধান কথা, আগে কাজটা হবার প্রমাণ পাওয়া যাক তারপর না হয় বলা যাবে।

হিরণ কিছুদিন বিশ্রামের নামে টো-টো করে বেড়িয়ে কাটাল। নিউসেলের আর কোন খবর না পেয়ে সে ভাবলে সাহেব বুঝি ভুলেই গেল। না হ'লে লক্ষ্ণৌ আর কাশী বেড়াতে কতদিনই বা লাগে! কিন্তু ও বয়সে গুরুতর কোন চিন্তা মনে বাসা বাঁধবার কথা নয়। নিউসেলের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে এই যা। কলকাতা যখন ভাল লাগে না হিরণ নিজের গ্রাম দত্তপুকুরে গিয়ে ছিপ দিয়ে মৎস্যকুলের ও বন্দুক দিয়ে পক্ষীকুলের প্রাণ সংহার করে, সে সব একঘেয়ে হলে, আবার

কলকাতার জনারণ্যে ফিরে আসে। বাড়ীর লোক বিশেষ করে বৌদিদিদের নানা ফরমায়েস খাটে আর দিবানিদ্রা দেয়। ওর দাদারা, হেমেন ও শুভেন্দু মাঝে মাঝে ওকে চাকরীর চেষ্টা করবার জন্য তাগিদ দেন। হিরণ দু চারটে আবেদন এখানে ওখানে যে পাঠায়নি এমন নয়, কিন্তু চাকরী খোঁজার তার বিশেষ গা দেখা যায় না। কারণ তার মন থেকে তখনো নিউসেলের কথা মুছে যায় নি।

মাস দেড়েক এই ভাবে কাটার পর হঠাৎ এক বিকালে হিরণ খুব মোটা একটা খামে একখানা চিঠি পেলো। খুলে দেখে সেটা নিউসেলের চিঠি, সাহেব তাকে পরদিন চারটের সময়ে দেখা করতে লিখেছে। চিঠিটা পড়ে হিরণ আনন্দে নেচে উঠল, ইচ্ছা হল তখনই অন্ততঃ মেজবৌদিকে সে শুভ সংবাদটা দেয়। কিন্তু আগেকার মত আবার মন্ত্র গোপন করার কথাটা মনে পড়ে গেল। পরের দিনটা আর যেন কাটতে চায় না। হিরণ বেলা আড়াইটার সময়েই সাজগোজ করতে আরম্ভ করলে। ট্রেনে যখন নিউসেলের সঙ্গে তার আলাপ হয় তখনও যেমন তার অঙ্গে দেশী বেশ ছিল, এবারও সে যত্ন করে ধুতি পাঞ্জাবী পরলে। তাহার দেহের পেশীর স্ফীতিটা একবার নিউসেলের নজরে পড়ুক। বেরোবার সময়ে তার ইচ্ছা হল কিছু একটা গন্ধদ্রব্য বৌদিদিদের কাছ থেকে নিয়ে জামায় লাগায়। তখনই কিন্তু নিজ মনে সে বল্লে থাকগে গন্ধ পেয়ে শেষে সাহেব আমাকে মেয়েলী বলে ধরে না নিয়ে বসে।

হোটেলে গিয়ে নিউসেলের কাছে যখন ও কার্ড পাঠিয়ে দিলে, তখন কাটায় কাটায় চারটে বেজেছে। নিউসেল ওকে দেখে খুব খুসি হ'ল ও খুব সমাদর করে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। খানিক নানা কথা আলোচনা করার পর নিউসেল ওকে জিজ্ঞাসা করলে—চাকরীর কথা ভুলে যাওনি তো? সে বিষয়ে তোমার মন বদলায়নি ত?

হিরণ হাসলে—সেই ভরসায় আমি বাড়ীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অন্য চাকরীর বিষয়ে কোন মন দিইনি।

দেখ, চাকরী তোমাকে দেব এক রকম স্থিরই করেছি। কিন্তু গোটা কয়েক কথা আছে। দেহ তোমার মজবুত তা দেখলেই বোঝা যায়! কিন্তু বিয়ে করে বসনি ত? তোমাদের যা সকাল সকাল বিয়ে হয়। তাহলে তোমাকে এ কাজ দেওয়া চলবে না।

হিরণ বাধা দিয়ে বল্লে—না সাহেব, বিয়ে এখনো করিনি ও চিন্তাটাও মনে আসেনি।

গুড। একটা জিনিষ সাফ হয়ে গেল। যা কাজ আমরা করতে যাচ্ছি তাতে যে কোন সময়ে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কাজেই ও সর্তটা করা দরকার। আমার বা মেরিলের কারোই বিয়ে হয় নি। তোমার শেষে একটি নাবালিকা বিধবা না থেকে যায় আমার সেই ভয় হচ্ছিল। এখন চাকরী নিতে তোমার আপত্তি নেই ত? তোমার দাদাদের আপত্তি হবে না ত? রেলে ভ্রমণের সময়েই নিউসেল হিরণের আত্মীয়-স্বজনের খবর নিয়েছিল।

হিরণ একটু ভেবে উত্তর দিলে—আমার বড় ভাইয়ের হয়ত একটু আপত্তি হবে, কিন্তু মেজ ভাইএর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বড়দাকে আমি এই কাজের বিষয়ে সব খবর এখন দেব না ঠিক করে রেখেছি। আপনি আমাকে যদি চাকরী দেন তাহলে তাকে বলব যে, আপনি আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে খনিজ তেল অনুসন্ধান করতে যাচ্ছেন, সেই সংক্রান্ত চাকরী। কাজটায় একটু বিপদের সম্ভাবনা যে নেই তা নয়, তবে সাবধানে থাকলেই হ'ল।

বোস্, তুমি বন্দুক চালাতে পারো ?

শট গ্যন ব্যবহার করতে পারি কিন্তু রাইফেল্-এ কখনো হাত দিইনি।

আচ্ছা কাল সকালে একবার এস, তোমার বন্দুক ধরবার বিদ্যা কতদূর দেখা যাবে।

পরদিন সকালে নিউসেল হিরণকে ম্যাণ্টন কোম্পানির রেঞ্জে নিয়ে গেল ও তাকে একটা শটগ্যন দিয়ে পরীক্ষা করলে। ভিন্ন ভিন্ন পাল্লা থেকে হিরণ কয়েকবার বুল্স্ আই ভেদ করলে। নিউসেল ওর নিশানা দেখে খুসি হল ও পরদিন থেকে এই রেঞ্জেই তার রাইফেল্ চালানো শিক্ষার ব্যবস্থা করে দুজনেই ওরা হোটেলে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ পরেই নিউসেলের ঘরে মেরিলও এসে উপস্থিত হ'ল। নিউসেল তাকে বল্লে, তুমি এসেছ ভালই হল, আমি বোসকে মোটামুটি পরীক্ষা করে মনোনীত করেছি। ওকে আমার চৌকষ বলেই মনে হচ্ছে।

নিউসেল কাগজপত্র বার করে একটা চিঠি লিখে হিরণের হাতে দিলে। সেট হিরণের নিয়োগপত্র। সে সত্যই অবাক হ'ল। চাকরীটা আপাততঃ এক বৎসরের জন্য, মাইনে মাসে আটশো টাকা। কাপড়-চোপড়ের জন্য হিরণ আরো পাঁচশো টাকা পাবে, আর ওর জীবনবীমা করা হবে দশ হাজার টাকার। নিউসেল জিজ্ঞাসা করলে খুসি হ'লে, বোস্ ? এবার বোধহয় হাভানা খেতে কোন গোল হবে না ? কই এবার তোমাকে ধূমপান করতে দেখলুম না ত ? বিস্মিত হিরণ ঘাড় নাড়লে। ওঠবার সময় নিউসেল ওকে একটা সাঁইত্রিশশো টাকার চেক দিলে। চারমাসের আগাম মাইনে, আর কাপড়-চোপড় তৈয়ের করে নেবার টাকা। নিউসেল ওকে অভিযানের উপযুক্ত নানা কাপড়ের একটা তালিকাও দিলে। অন্য সরঞ্জাম ওকে কিছুই জোগাড় করতে হবে না, সে সব জোগাবে অভিযানকারীরা।

হিরণ হোটেল থেকে সোজা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গেল ও নিজের নামে একটা হিসেব খুলিয়ে, কিছু টাকা নিয়ে প্রথমে কাপড়-চোপড়ের ফরমাস দিলে, তারপর বাজার ঘুরে ঘুরে বাড়ীর প্রত্যেকের জন্য নানা জিনিষ কিনে একটা ফিটন বোঝাই করে বাড়ী এল। সেগুলো চুপি চুপি বৈঠকখানায় রেখে দিয়ে ওপরে যেতেই বেলা করে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফেরবার জন্য তাকে মার কাছে মৃদু গঞ্জনা শুনতে হ'ল। সকলকে আনন্দের সংবাদটুকু দেবার জন্য তার মন তখন ছটফট করছে, কিন্তু হিরণ তখনকার মত সংযত হয়ে রইল।

ওর বড়দা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে সোজা তাঁর পড়ার ঘরটিতে ঢুকতেন। সেদিন ঘরে ঢুকেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। দেওয়ালের একদিকে চমৎকার এক তাক কাঠের ক্যাবিনেটে ইণ্ডিয়া পেপারে ছাপানো ঝকঝকে নূতন এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থমালা। এই বইগুলি কেনার তাঁর বহুকালের সাধ ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে অধ্যাপকদের আজকালের মত মোটা বেতন ছিল না, তিনি অল্প মাইনে পেতেন, তার ওপর আবার বৃহৎ পরিবার পালন করবার ভার তাঁর ওপর, কোন রকমে সে সাধ পূর্ণ হবার উপায় ছিল না।

কিন্তু বইগুলো আনলে কে? কারই বা সম্পত্তি সেগুলো? এক-খানা বই বার করে তিনি মলাট উল্টে দেখলেন তাঁরই নাম লেখা এবং লেখাটা হিরণের। নূতন বইএর মনমাতানো গন্ধ তখন তাঁর অন্তরে ঢুকেছে, নিজের মনেই তিনি বল্লেন — গাধাটা এই বই হঠাৎ পেলে কোথায়? উঠোনে বেরিয়ে এসে তিনি উর্দ্ধমুখে ডাক দিলেন—হিরণ?

হিরণ সে ডাক শোনবার জন্য কান খাড়া করেই ছিল। চটি জুতো ফটফট করতে করতে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। হেমেন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন বই পেলি কোথায়, আর আমাকেই বা দিলি কি করে অত দামী বই?

হিরণ বল্লে ঘরে চল ত বলি। ওঁরা ঘরে ঢুকলেন এবং হেমেন্দ্র সাগ্রহে হিরণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ব্যাপারটা খুব সোজা বড়দা। একটা চাকরী পেয়েছি আর পেয়েছি আগাম চারমাসের মাইনে, তাই তোমাদের সকলের জন্য কিছু উপহার কিনে এনেছি। তোমারটায় একটু বেশী খরচ হয়েছে এই যা। সে তার নিয়োগপত্র আর একগাদা বাজারের ভাউচার দাদার সামনে রাখলে। নিয়োগপত্রটা পড়ে হেমেন্দ্র খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। অবশেষে কপালের ঘাম মুছে বল্লেন, সাহেবটা পাগল নাকি যে তোকে নিযুক্ত করলে? তুই এ সবের জানিস্ কি?

হাভানা চুরুটের কথাটা বাদ দিয়ে হিরণ তাঁকে রেগে নিউসেলের সঙ্গে আলাপ থেকে সুরু করে চাকরী পাওয়ার গল্পটা বল্লে। হেমেন্দ্র ভালমানুষ, অধ্যাপক, সহজেই বুঝলেন যে ভায়াকে জঙ্গলে অয়েল প্রস্পেক্‌টিং করে বেড়াতে হবে, চাকরীটাতে ভয়ডরও কিছু আছে। তারপর বাড়ীতে ভীষণ হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। উপহার বিতরণ করা হয়ে গেলে মা গেলেন পূজা দেবার ব্যবস্থা করতে। হিরণের বৌদিরা তাকে পেয়ে বসলেন—ও শাড়ীজামার ফাঁকিতে হবে না, ঠাকুরপো। নিজে মজা করে কাশ্মীর বেড়িয়ে এলে, যতদিন না আমাদের সেখানে ঘুরিয়ে আনছ ততদিন আমাদের মন উঠবে না। সন্ধ্যাটা সেদিন ওদের খুব আনন্দেই কাটল।

রাত্রে হিরণ বড়দাকে তার ব্যাঙ্কের পাস বইটা দিলে! সে খাতাতে টাকার লেন-দেন করার বিষয়ে হেমেন্দ্রেরও ওর এজেন্ট বলে নাম ছিল এবং হিরণের অবর্ত্তমানে গচ্ছিত টাকাটা তাঁরই পাবার কথা ছিল। কিন্তু এই বিশেষ সর্ত্তটা দেখে হেমেন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—এ কেমনতর চাকরী রে বাপু যে গোড়া থেকেই বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান থাকার কথা ওঠে। হিরণ তাঁকে বুঝিয়ে দিলে যে, ওটা একটা কথার কথা মাত্র, লেন-দেন করায় ওঁর এজেন্ট থাকাটাই আসল কথা। কিন্তু এই জটিল ব্যাপারটা হেমেন্দ্রের মাথায় তেমন ঢুকলো না, সারারাত তিনি চিন্তায় কাটালেন।

অনেক ভেবে চিন্তে পরদিন সকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হেমেন্দ্র নিউসেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড মেরিলও তখন সেখানে উপস্থিত থাকাতে তার সঙ্গেও হেমেন্দ্রের দেখা হয়ে গেল! কথাবার্ত্তা কয়ে হেমেন্দ্রের মনে হ'ল ব্যাপারটা তত জটিল নয়। পরোক্ষভাবে সাহেব দু'জন হিরণের রক্ষণাবেক্ষণেরও ভার নিয়েছে। তারা দুজনেই মুক্তহস্ত ধনী, এ টাকা দেওয়া বোধহয় ওদের গায়ে লাগে না। হেমেন্দ্র নৃতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল নিউসেলের লেখা বই তিনি পড়েছেন। লোকটা বিরাট পণ্ডিত। মেরিল ইংরেজ, বেশী বাক্যব্যয় করতে বা নিজের বাহাদুরী জাহির করতে জানে না। হিরণের ধারণা হয়েছিল যে লোকটা হোঁৎকা গোছের, হয়ত মানুষ আর জন্তু বধ করবার ওস্তাদ, আসলে আনবার মত কিছু নয়। তাকে এখন মেরিলের কথা জিজ্ঞাসা করলে লজ্জিত হয়ে বসে—আমারই বা দোষ কি! বিদ্যার তক্‌মা দেখে ও নিজেদের

মাপকাঠিতে সকলকে আমরা বিচার করি ; জানতুম না ত' হাতে কলমে শেখার মত গুণ, আর সে শেখা কত বিচিত্র !

দুদিন পরে কাজে যোগ দিতে হরণের যা কিছু কাগজপত্র দেখবার সুযোগ হ'ল তাতে দেখা গেল নিউসেল ও মেরিল আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব সভার বিশিষ্ট ব্যক্তি। ওরা ব্রেজিল, আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে আদিম জাতিদের বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করেছে। বোর্ণিওর ডায়াকদের বিষয়ে যেমন মেরিল, আফ্রিকার পিগমীদের বিষয়ে তেমনি নিউসেল, সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন গবেষক। দুজনেরই লেখা কয়েকখানা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বই আছে।

[চল্‌বে]

ঘুমপাড়ানী ছড়া

চিত্ত ভট্টাচার্য

ঘুম আয় আয় ঘুম আয়
খোকার চোখে ঘুম আয়
খুকুর চোখে ঘুম আয়
দু' চোখ বেয়ে নামরে ছেয়ে
ঘুম আয় আয় ঘুম আয়
খোকার চোখে ঘুম আয়।

তালপুকুরের পাশ দিয়ে
গোলাঘরের বাঁক দিয়ে
গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে
দর দালানের মাঝ দিয়ে
ঘুম নেমে আয় ঘুম আয়
খুকুর চোখে ঘুম আয়।

চাঁদামামার গা ছুঁয়ে ঘুম নেমে আয় ধান ভুঁয়ে
দুধ সায়রে গা ধুয়ে খুকুর পাশে যা শুয়ে
ঘুম আয় আয় ঘুম আয় খোকার চোখে ঘুম আয়
জুজু বুড়ো ঘুমায় জুজু বুড়ি ঘুমায়
দুষ্টু খোকন ঘুমায় লক্ষ্মী খুকু ঘুমায়
সারা জগৎ ঘুমায় ঘুমের চুমায় চুমায়
ঘুম আয় আয় ঘুম আয়।
ঘুম আয় ঘুম আয়॥

বাঘ মারা

শ্রীতারাপ্রসাদ চৌধুরী

বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বিল অঞ্চল। আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলের মাঠ-ঘাট জলে ডুবে থাকে। এ অঞ্চলে ঐ সময় জলপথ ভিন্ন এতদিন সংযোগ রাখার কোন সুযোগ ছিল না। সবে মাত্র জেলা বোর্ডের রাস্তা হয়েছে।

অনেক দিন আগের কথা। হালকা মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরির চক্রান্তে আকাশে কখনও চাঁদ হাসে কখনও বা মেঘ ভাসে। দিগ্‌ভ্রমে সুন্দর বনের এক প্রকাণ্ড বড় বাঘ উল্‌টো দিকে বিলের রাস্তায় এসে পড়ে। স্বাধীনতা-পুলকিত মন, অরণ্যে অফুরন্ত স্বেচ্ছাহার-পুষ্ট মহাবলিষ্ঠ দেহ। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, শিকার সন্ধান ও নিরাপত্তার জন্য অনেকদিন নৈশ ভ্রমণ সূচি অনুযায়ী ত্রিশ চল্লিশ মাইল তাকে পরিভ্রমণ করতে হয়। ভ্রান্ত বাঘ বীরদর্পে অবলীলাক্রমে এগিয়েই যাচ্ছে। চির-বাঘ-বিহীন এই বিলা অঞ্চলের চাষার ছেলেরা দল বেঁধে দারোগা বাবুর ঘোড়া মনে করে বাঘের পিছু নেয়। শুধু ঘোড়া দেখার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই নয়। ঘোড়ার লেজ ও ঘাড়ের সুদীর্ঘ লোম তুলে তারা ঘুঘু ধরার ফাঁদ পাতবে। ছেলেদের একজন বোঝায় সে পাঠশালায় এক বইয়ে বাঘের ছবি দেখেছে। হল্‌দে জানোয়ারের গায়ে কালো ডোরা থাকলে তাকে বাঘ বলে। এ নিশ্চয়ই বাঘ হবে। শুনে প্রাণভয়ে ছেলেরা পালিয় যায়। ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আশ্রয়াতুর বাঘ ত্বরান্বিত পদে এগিয়ে চলে।

দিনের আলো ফুটে উঠে। চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধূ ধূ করে অনন্ত মাঠ ; তার মাঝে মাঝে চাষাদের কুঁড়ে ঘর, জিরাত পাতা ও গাছপালায় ঘেরা! কোথায় গেল চিরঅভ্যস্ত বাঁদার নলবন, তারাবন, সুন্দরবন ? কোথায় হাওয়ায় বাঘের গন্ধ পেয়ে অতি দ্রুতগতিতে গহন বনে পলায়মান ভীত হরিণের দল ? নিকটবর্তী গ্রামের চাষাদের গোহাল থেকে কাল রাতে যে বলিষ্ঠ গরুটার ঘাড় মটকে শুধু রক্তটা চুমুক দিয়ে খেয়ে জংগলের ধারে পরদিন খাবে বলে রেখে দিয়েছিল সেটাইবা কোন্ দিকে ? সারারাত খুঁজেও সে পেলনা। কোথায় তার জীবন-সংগিনী বাঘিনী, আর প্রাণপ্রিয় বাচ্চাগুলো ? প্রতিবেশী কোন ব্যাঘ্র পরিবারের কোন সাড়াও ত এখানে পাওয়া যাচ্ছেনা! ভাবছে এ কোথায় এলেম। শেষরাত্রে রাস্তায় একবার বাঘিনীকে এগিয়ে আসবার জন্য ডেকেছিল, কিন্তু জবাব পায়নি। বাঘের বিকট গর্জন শুনে শুধু পাশের এক বাড়ীর ঘুমন্ত ছেলেমেয়েরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে লেপের ওয়ারের মধ্যে ঢুকেছিল।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত বাঘ নদীতে গিয়ে সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে চক্ চক্ করে জল খেল, আকাংখা মিটিয়ে। শেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্দস্রোতা ক্ষুদ্র নদীর বুকে। অপর তীরে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলে। মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত চাষাদের এক পুকুরের কোণে একটা ছোট লতাগুল্ম ঝোপ। সেইখানেই সে সাময়িক আশ্রয় নিল! তন্দ্রালু বাঘ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জিভ কাঁপাচ্ছিল যেমন গ্রীষ্মের দুপুরে হোগলা বনের মাথা কাঁপে তেমনি ভংগিতে। পরে শুয়ে পড়ল। প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে তার সমস্ত দেহ আন্দোলিত হচ্ছিলো।

বিলের চাষারা বাঘের আগমন-বার্তা পেয়ে কোচ, জুতি, টেঁটা, বর্শা, লাঠি, ঠেংগা যার যা আছে নিয়ে দলে দলে জমায়েৎ হচ্ছে অদূরে। তাদের ঐ ভীষণ কোলাহলের মধ্যে বিশ্রাম করা অসাধ্য। এরি মধ্যে কোন বিশেষ উৎসাহী তরুণ দল শুকনো খড় সংগ্রহ করে পুকুরের চারিধারে বিচালীর প্রাচীর রচনা করেছে। এগুলিতে আগুন দেওয়ায় বাঘ বিদেশে বিভুঁয়ে অসহায় একাকীত্বের কথা মনে করে কখন দাঁত দেখায়, কখনও হাই তোলে, কখনও বা পেছনের দুই পায়ে বসে লেজ ঘোরায়। মাংসল ওষ্ঠাধর উপরে নীচে দোলে, লোল-রক্ত-জিহ্বা—বাড়িয়ে নাক চাটে, মুখে বিকট ভেংচি কাটে। সুদীর্ঘ গোঁফ সংকুচিত ও প্রসারিত ক'রে কখন বা নখর আস্ফালন করে। তার করুণ চাহনিতে আসন্ন অজানা বিপদের দুশ্চিন্তা সুপরিস্ফুট। রাগে ঘড় ঘড় শব্দ করে। পারলে যেন জনতার মাঝে লাফিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালিয়ে প্রতিহিংসানল প্রশমিত করে।

বেলা দুপুর হয়েছে। নিকটেই থানা। কর্তব্যবোধে খাকি পোষাক পরিহিত দারোগাবাবু কনেষ্টবল সাথে উপস্থিত হয়েছেন। সেকালের দিনের গ্রাম্য দারোগা। বিপ্লবী বা কম্যুনিষ্ট ঠেঙিয়ে তেমন হাত পাকাবার সুযোগ পাননি। বন্দুক চালাবার পদ্ধতিটা ভুলে না যান সেজন্য বছরে একবার বাধ্যতামূলক টারগেট প্রাকটিসে যেতে হয়। বন্দুক নিয়ে নিকটের এক গাছে উঠলেন দারোগাবাবু কিন্তু বাঘের চেহারাটি দেখে ও একবার তার সাথে চোখাচোখি হতেই ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে সুরু করলেন। তারপর বইতে পড়েছেন বাঘের হৃৎপিণ্ডে গুলি না মারতে পারলে তাকে ঘায়েল করা যায় না। গুলি খেলে বাঘ গুলির ধোঁয়া লক্ষ্য করে সেইদিকে লাফ দেয়। তিনি নেবে এলেন। সমবেত হতাশ জনতার মাঝ থেকে একটা তীব্র অসন্তোষ ও প্রবল চাপা ধিক্কার উঠল দারোগার কাপুরুষতার বিরুদ্ধে।

গ্রামের এক চাষীর জোয়ান ছেলে দুঃসাহসী বীর লখা একা এগিয়ে এল উদ্-মারা ষ্টীলের সুতীক্ষ্ণ টেঁটা নিয়ে। পুকুরে নেমে ডুব দিয়ে যেখানে বাঘ আছে তার কাছে গিয়ে সে উঠল। বাঘের সামনে গিয়েই বাঘের বুকে ভীষণ বেগে সে হানল প্রচণ্ড এক আঘাত। আহত বাঘ ক্রোধে গর্জ্জন করতে করতে ফুলে দেড়গুণ হলো। এক থাবায় লখার পায়ের ডিম থেকে এক খাবলা মাংস বিচ্ছিন্ন করে নিলো। এক হাতে বাঘকে প্রতিরোধ করে অপর হাত দিয়ে কুল গাছের শক্ত ডাল ধরে লখা নিজেকে নিরাপদ করার চেষ্টা দেখছে। তখন লখা বাঘের কবল থেকে মুক্ত করার অধীর আগ্রহে উৎসাহ-ক্ষিপ্ত জনতা উন্মত্ত চীৎকারে দুর্বার বেগে মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। একা বাঘ প্রতিরক্ষার কোন বন্দোবস্তই আর করতে পারে না। বিপক্ষের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও উচ্চ শ্রেণীর মারণাস্ত্রের কাছে সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যুর মত অসম যুদ্ধে বাঘ হল ধরাশায়ী। বার ফুট লম্বা বাঘকে এনে থানার বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয় জনসাধারণের দেখার সুবিধের জন্য। সরকারী ডাক্তারখানায় লখার পায়ে ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেয়া হল। জেলার সদর থেকে পুরস্কারও মিলেছিল তার মহা বীরত্বপূর্ণ বাঘ মারার দরুণ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ডাকাত রামার ভদ্রকালী

—এক—

রামা শ্যামা—দুই ভাই।

বিখ্যাত ডাকাত তারা।

তাদের ভয়ে ফরিদপুর জেলার লোকেরা প্রাণভয়ে কাঁপে। পদ্মার এক বাঁকে তাদের বাড়ী। বেশ বড় বাড়ী। বড় বড় চলা ঘর। আটচালা, চৌচালা, দোচালা। গরু বাছুর। চরার, উর্ব্বর মাঠে তাদের লোকজনেরা চাষবাস করে, সেটা শুধু লোক দেখান মাত্র। রাত্রিতে দলের লোকেরা এসে বৈঠক করে, তারপর ছিপ নৌকা ছোটে দিকে দিকে ডাকাতি করিতে।

রামা শ্যামা জাতিতে বাগদী! এমন ভীষণ চেহারা বড় দেখা যায় না। যমক দুই ভাই। বলিষ্ঠ চেহারা। লম্বা চওড়া যোয়ান। সেকালের ইতর ভদ্র সকলেই রাখিতেন—লম্বা বাবৃড়ী চুল। ইহাদেরও ছিল তাই। গলায় শঙ্খের মালা। হাতে বাজু, বালা—সোনার তৈরী। তাদের তাঁবে ছিল শ দুই লাঠিয়াল ও তরোয়ালধারী, বল্লমধারী ডাকাত দল। জলপথে ও স্থলপথে দুই দিকেই তারা ডাকাতি করিত। জেলার হাকিম, পুলিশ দারোগা, তাদের ধরিতে পারিত না। কোম্পানীর আমল কলিকাতায় কালেক্টার সাহেব পাঠাইতেন রিপোর্ট—সাহায্য চাহিতেন লোকজন, গোয়েন্দা ও জলপথে স্থলপথে সাহসী সেনার। তবু তাহাদের দমন করা সম্ভব ছিল না।

রামা শ্যামাকে ধরা সহজ ছিল না, কেননা সেকালে কয়েকঘর ডাকাত জমিদার বাস করিতেন পদ্মার পাড়ে। বিরাট ছিল তাদের বাড়ী। দালানকোঠা অতিথিশালা-কাছারী, বরকন্দাজ,

দারোয়ান। এমন দুর্দ্দান্ত দস্যু জমিদার ছিলেন তাহারা যে দল বাঁধিয়া যোগ দিতেন রামা ও শ্যামার সঙ্গে ডাকাতি করিতে। ডাকাতদের সঙ্গে মিলিয়া করিতেন দশমহাবিদ্যার পূজা। সে পূজায় দিতে হবে নরবলি। জমিদার বংশের একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মা কালী তাঁহাকে দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি নরবলি দিতে আদেশ করিয়াছেন।

প্রচার হইল স্বপ্ন কথা। গ্রামে গ্রামে সকলে সতর্ক হইল নিজ নিজ ছেলেদের লইয়া! কেহ ঘর হইতে ছেলেদের বাহির হইতে দিতেন না। 'ঐ ছেলে নিতে এলরে। শোনা যাইত জননীদের মুখে ঘরে ঘরে! দারোগা পুলিশ সতর্ক নজর রাখিতে লাগিলেন চারিদিকে। কিন্তু নির্ভীক চৌধুরী জমিদারেরা রামা ও শ্যামার সাহায্যে একটি শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া গভীর নিশীথে দশমহাবিদ্যার কাছে বলি দিলেন। তান্ত্রিক সাধক শ্যামানন্দ করিয়াছিলেন দশ মহাবিদ্যার পূজা!

সেকালে ধর্ম্মের নামে ছিল এমনি নৃশংসতা! এখনও কি নাই!

এই চৌধুরী জমিদারেরা ছিল রামা ও শ্যামার মত দুর্দ্দান্ত দস্যুদের সঙ্গী, কাজেই ইহারা নির্ভয়ে সর্ব্বদা ডাকাতি করিয়া ফিরিত! কে তাদের ধরিবে।

—দুই—

সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে ঢাকা সহরে ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা সহরে। লোক বিপন্ন। কলিকাতা হইতে কোম্পানীর একদল সিপাই দুইজন ইংরাজ কাপ্তেনের সঙ্গে গিয়াছে ঢাকা সহরের দিকে। দেশী সিপাহীই ছিল বেশী। তারা নৌকা ভিড়াইয়া রান্নাবান্না করিতেছিল। সাহেব কাপ্তেনেরা বোটে খানা খাইতেছিলেন। নৌকা ছাড়িবার সময় হইতেছিল। কাপ্তেন বাঁশী বাজাইতে যাইবেন, এমন সময় ঘটিল অঘটন।

সিপাহীরা আহারাদির জন্য কলাপাতার সন্ধানে চৌধুরীদের বাগানে প্রবেশ করে। চৌধুরীদের কর্ত্তাও তাহার লোকেরা তাহাদের বলে, খবরদার একপা এগুবে না। কাটতে পারবে না কলাপাতা!

সিপাহীদের মেজাজ ত স্বাভাবিক ভাবেই ছিল চড়া। উদ্ধত সিপাহীরা তাহাদের কথা শুনিল না। নিঃশব্দ চিত্তে কলাপাতা কাটিতে লাগিল।

সেদিন রামা ও শ্যামা সদলবলে সেখানে উপস্থিত ছিল। কথা ছিল—নদীর পরপারের এক জমিদার বাড়ী লুঠ করিবে সেদিন! কিন্তু আকস্মিক ঘটিল এই বিপদ। চৌধুরীদের কর্ত্তা হুকুম দিলেন তাঁর লোকজনদের ওদের মেরে তাড়িয়ে দাও। সিপাহীদের নৌকো ডুবিয়ে দাও পদ্মার জলে। টেনে তোল পাড়ে কাপ্তেন সাহেবদের বোট!

আরম্ভ হইল ভীষণ হাঙ্গামা। লাঠালাঠি, বল্লম বর্শা ছোড়াছুড়ি, একটা ছোটখাট লড়াই ঘটিল। সিপাহীদের নৌকা ডুবাইয়া তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিল একটা

অন্দরের বড় দুইটা ঘরের ভিতর। সাহেবরা অবশ্য ঢাকা চলিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। রামাশ্যামার দল এই লড়াইয়ে খুবই বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

পরের কথা। এক সপ্তাহ পরে ঢাকা হইতে আসিল বহু সৈন্য-সামন্ত। চৌধুরীদের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

কোম্পানীর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছিল তখন হুকুম আসিল অতি ভীষণ—চৌধুরীদের বাড়ীতে তেল ঢেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেল।

আদেশ পালিত হইল। নিরুপায় চৌধুরীরা সর্ব্বস্ব হারাইয়া এক দূর নির্জ্জন পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদের বংশধরেরা অতি হীন অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছে।

রামা শ্যামার খবর শোন এইবার।

—তিন—

রামাশ্যামা দাঙ্গা হাঙ্গামার শেষে মনে করিল ফলটা ভাল হইবে না। যদি ধরা পড়ে, তবে ফাঁসী হইবে নিশ্চিত।

তাহারা পলাইল। পলাইবার পথে পদ্মার একটা শাখা নদী বাহিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইল একখানি বড় বাড়ী। নদী সেখানে শীর্ণ হইয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। তাহারা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নৌকা নিয়া বাঁধিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

রামা বলিল, শ্যামা, বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখে আয়। বেশ বড় লোকের বাড়ী। এতদিন ত কোন মালই হাতে এল না!

দাদার ভাই শ্যাম, চারিদিক ঘুরেফিরে এসে বললো—দাদা! ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ী। বেশ জুটবে! তৈরী হও, রাত দুপুরে আমরা লুঠ করবো। সে ব্যবস্থাই হলো।

দুপুর রাতে—দলেবলে আক্রমণ করতে চললো রামাশ্যামা! কিন্তু—একি! বাড়ীর সকলেই যে জাগিয়া আছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে! কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ী ছিল নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার! সহসা এত আলো আসিল কোথা হইতে? এত লোকজনই বা আসিল কোথা হইতে।

রাম ও শ্যাম সেই লোকজন ও আলো গ্রাহ্য না করিয়া দলে দলে নানাদিক দিয়া হারে-রে-রে করিতে মশাল জ্বালিয়া উজ্জ্বল আলোকে উজ্জ্বলতর করিয়া ঘিরিল বাড়ী।

সিংহ দরজার মধ্য দিয়া যেসময় প্রবেশ করিতে যাইবে তখন দেখিতে পাইল এক ভয়াবহ দৃশ্য! চমকিয়া উঠিল রামা শ্যামা! তাহাদের হাত কাঁপিল, পা কাঁপিল!

ভীষণ দর্শন এক তান্ত্রিক সাধক। হাতে তাঁর—করালবদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িত কেশা এক চতুর্ভুর্জা দক্ষিণা কালী মূর্ত্তি! গলে তাঁর মুণ্ডমালা, বাম ভাগের অধোহস্তে সদ্যছিন্ন

মুণ্ড, ও ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরসূচক মুদ্রা রহিয়াছে!

সর্দ্দারের হুকুম নাই! কাজেই ডাকাতের দল নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

একি! একি! মা যে হাস্যমুখী! দুই ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তধারা! শিহরিয়া উঠিল রামা শ্যামা!

মূর্ত্তি হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন—ভীষণদর্শন, তান্ত্রিক! দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ, কপালে রক্তচন্দন লেপা। গলে দীর্ঘ-বিলম্বিত স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা! বাহুতে—কর প্রকোষ্ঠে, রুদ্রাক্ষ মালা—চোখ দুটি জলিতেছে অগ্নি গোলকের মত! সাধক হাসিতে লাগিলেন—হা-হা-হা অট্টহাসি!—গভীর রাত্রিতে কোথায় ডুবিয়া গেল ডাকাত-দের হারে রে শব্দ!

তান্ত্রিক সাধকের অট্ট-হাসি—দিকে দিকে বনে বনে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল ভীম ভয়ঙ্কর ভাবে! হা-হা!

রামা একটু জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—ঠাকুর! আপনি কে? সঙ্গে সঙ্গে পায়ে লুটাইয়া পড়িল দুই ভাই!

আমি—কে আমি? আমাকে জানিস্ না? আমার নাম কামদেব তার্কিক—তন্ত্রচূড়ামণি!

আপনি! আপনি—কথা বাহির হইতেছিল না, তাহাদের কণ্ঠ হইতে!

হাঁ আমি! এ আমার শিষ্যবাড়ী। আজ এই অমাবস্যা দিনে আমার মাকে নিয়ে শ্মশানে পূজায় বসেছিলাম। আমার ভক্ত ও শিষ্য—কালীচরণ, কেঁদে গিয়ে বললো!—বাবা, আমার যে বড় বিপদ!

বললাম, আমি থাকতে বিপদ! দেখি, রামা শ্যামা কত বড় ডাকাত যে আমার আশ্রিত মায়ের নিরীহ ছেলের উপর অত্যাচার করে! করবি ডাকাতি! এই দেখ মা হাস্‌ছেন—ঝরে পড়ছে রক্ত ধারা দুই ঠোঁট বেয়ে।

রামা ও শ্যামা, কামদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঠাকুর পদ্মা পারে একটা হাঙ্গামা করে এসেছি, তার পর এখানে দিলেন বাধা, কি করি বলুন তো, ঠাকুর মশাই।

তোদের হাঙ্গামায় বিপদ হবে না!

তাত হলো! তবে আমরা কি খাব, কেমন করে বাঁচবো। ডাকাতি ছাড়লে কে দেবে আমাদের খেতে?

মহাপুরুষ কামদেব বলিলেন—ভয় নেই এই কালীমূর্ত্তি দিচ্ছি। এই মাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে নির্ভর করে বসে থাক, মা-ই সমস্ত দেবেন।

একথা বলিয়া মায়ের পূজার মন্ত্র দিলেন—দীক্ষালাভ হইল তাহাদের!

—দিন যায় মাস যায়, অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটে! তন্ময় হইয়া মা মা বলিয়া ডাকে, তবু মা দেখা দিলেন না। তখন দুই ভাই শক্তিসাধক কামদেবের নিকট গিয়া কাঁদিয়া বলিল—ঠাকুর মা ত কথাও বলেন না, খাবারও দেন না!

কামদেব বলিলেন—মা যদি কথা না বলেন, তবে মুগুর পেটা করিস্, পেটানোর চোটে আপনি কথা বলবেন।

রামা শ্যামা দুই ভাই আবার আসিয়া বসিল। আবার একমাস ডাকাডাকি করিল, শ্যামার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। —কিন্তু রামা?—রামা একদিন মাকে স্পষ্ট বাক্যে বলিল, দেখ্ মা ভালমানুষের মত কথা বলিস্ ত বল, না হলে এই মুগুরে তোর মাথা চূর্ণ করবো। —এ কথা বলিয়া যেমন সে মুগুর তুলিয়াছে, মা অমনি পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাহার মুগুরের সহিত হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

সেদিন হইতে তাহাদের দৈন্য ঘুচিয়া গেল। নিত্য পূজা ও ভোগ দিতে প্রতিদিন শত শত লোক আসিতে লাগিল। মায়ের কৃপায় সব অভাব ঘুচিল।

ফরিদপুরের কয়ড়া গ্রামে—ডাকাত রামার ভদ্রকালী আজিও ভক্তের পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

শিলাবতীর আত্মকথা

শ্রীদিলীপকুমার গাঙ্গুলী

বিখ্যাত সাধক জয় পাণ্ডা।

মানভূমের কোন এক বড় গ্রামের রাস্তার ধারে সাধকের ছোট্ট কুটীর। বিখ্যাত সাধক জয় পাণ্ডাকে সবাই চেনে; জানে তাঁর সাধনার অলৌকিক তথ্যসমূহ আর তাঁর আলৌকিক সিদ্ধাই। এমনি সাধকের দাসীবৃত্তি করে শিলাবতী। সাধক জয় পাণ্ডা জানেন না যে, স্বয়ং গঙ্গার তনয়া শিলাবতী তাঁর দাসী হয়ে দিনের পর দিন তাঁকে সেবা করে যাচ্ছে।

সাধক জয় পাণ্ডা একদিন স্থির করলেন গঙ্গা স্নানে যাবেন। প্রকাশ করেন তিনি নিজের অভিলাষ শিলাবতীর কাছে। শিলাবতী সানন্দে স্বীকার করে নেয় তাঁর অভিলাষ কিন্তু সাধককে মিনতি করে যে যাবার সময় একটা জিনিষ গঙ্গায় ফেলবার জন্য নিয়ে যেতে। সাধক স্মিতহাস্যে স্বীকার করেন তার মিনতি। উত্তর দেন—হ্যাঁরে পাগলী নিশ্চয় নিয়ে যাবো।

যাবার দিন শিলাবতী শালপাতার একটা ছোট্ট পুটুলি এগিয়ে দেয় সাধকের দিকে। পুটুলিটাতে পূর্ব্ব দিন প্রসাধনের সময় দুটো কেশ শিলাবতীর মাথা থেকে খসে গিয়েছিল, সেগুলোই সে সযত্নে মুড়ে দিয়েছে।

সাধক পদব্রজে এগিয়ে যান গঙ্গার উদ্দেশ্যে নানা তীর্থ পর্য্যটন করে। অবশেষে ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে উপস্থিত হন। 'জয় গঙ্গা' বোলে তিনি এগিয়ে চলেন গঙ্গার বুকে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় শিলাবতীর দেওয়া ছোট্ট পুটুলিটির কথা। গেরুয়ার অঞ্চল থেকে পুটুলিটা খুলে নেন। সঘন উচ্চারণে গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—মা, শিলাবতী তোমায় এই পুটুলিটা দিয়েছে গ্রহণ কর। হঠাৎ তুমুল জোয়ারের সৃষ্টি হয়। সাধকের চোখে জলের তরঙ্গ এসে লাগে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য মাত্র। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ। সাধক জয় পাণ্ডা তাকিয়ে দেখেন স্বয়ং মা গঙ্গা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করছেন শিলাবতীর সেই পুটুলি! হতবাক হয়ে যান বিখ্যাত সাধক। বাক্যহীন হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন। অদৃশ্য হয়ে যান গঙ্গা! সাধকের ঘোর ধীরে ধীরে কেটে যায়। মনে তাঁর দেখা দেয় প্রশ্ন।

প্রশ্নের মীমাংসা বুঝি হয় না। তিনি প্রশ্ন জর্জরিত মন নিয়েই ফিরতে থাকেন স্ব-আবাসের দিকে।

উষার মিষ্টি হাওয়া বইছে, গেরুয়া পরিহিত উন্নত বলিষ্ঠ সাধক সঘন 'হরি ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এসে দাঁড়ান নিজ কুটীরের দ্বারে। শিলাবতী কমণ্ডলুতে জল নিয়ে মুখ ধোবার জন্য কুটীরের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসেন। 'হরি ওঁ' শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে সামনে সাধক দাঁড়িয়ে।

ত্বরিত গতিতে প্রণাম করতে যায় সাধককে। কিন্তু সাধক বাধা দেয়। তার মনের সঞ্চিত প্রশ্নগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়। সাধক গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"সত্যি বল ত শিলাবতী, তোমার ঐ পুটুলিতে কি ছিল?"

শিলাবতী যেন চমকে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে কৃত্রিম হাস্যে উত্তর দেয়—"বাবা, ওর ভেতরে আমার দুটো খসে যাওয়া চুল মাত্র ছিল।" অবাক হ'য়ে যান সাধক প্রশ্নের উত্তরে। বিস্ময়ের তড়িৎ প্রবাহ যেন মনে জাগে। হঠাৎ তিনি চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন…"শিলাবতী তুমি কে? সত্যি ক'রে বল তুমি কে? আজ আমার জানতেই হবে তোমার রহস্য। কেনই বা তোমার দুটো ছিন্ন কেশের জন্য স্বয়ং মা গঙ্গা হাত বাড়ালেন।"

শিলাবতী চমকে ওঠে, আজ সাধক নিশ্চয় তাকে চিনে ফেলেছেন কিন্তু তবুও তাকে শিলাবতী জানতে দেবে না—যে শিলাবতী স্বয়ং মা গঙ্গার কন্যা। সে পিছু হট্‌তে থাকে।

সাধক জয় পাণ্ডাও এগিয়ে যান তাকে ধরতে। শিলাবতী প্রমাদ গণে। হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে, 'মা, গো তুমি রক্ষা কর।' তারপর হস্তধৃত কমণ্ডলুর জল রাস্তার মাঝে গড়িয়ে দেয়। পলকের মাঝে সৃষ্টি হয় সেখানে এক নদীর। শিলাবতী ভাসতে থাকে। জয় পাণ্ডাও ঝাঁপিয়ে পড়েন ঐ নদীর জলে, ঢেউয়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলেন শিলাবতীকে ধরতে। শিলাবতী যতই এগিয়ে যান নদীর জলও ততই এগিয়ে চলে। প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে চলে শিলাবতী আর সাধক জয় পাণ্ডা। অবশেষে তাদের গতিও বুঝি শেষ হয়ে যায়। শিলাবতী এসে মিশে যান মা গঙ্গার দেহের সাথে। মা গঙ্গা মেয়েকে রক্ষা করেন। তারপর সেই শিলাবতীর বয়ে যাওয়া পথে সৃষ্টি হয় নতুন এক নদীর নাম হয় শিলাবতী।*

নিষ্পাপ ছবি

শ্রীঅমিয়মোহন বসু

নিষ্পাপ ছবি যে মিলে উদার আকাশে—
কিশোরের মুখপদ্মে, ভোরের বাতাসে।

---

* শিলাবতী একটি নদীর নাম। শিলাবতীর জন্ম সম্পর্কে মানভূম জেলায় জনসাধারণের মধ্যে এ কাহিনীটি প্রচলিত।

অদ্ভুত যত জন্তু-জানোয়ার

কোয়ালা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আজ তোমাদের আর একটি বিচিত্র প্রাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এর বাড়ী হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু তা বলে অষ্ট্রেলিয়ার যেখানে-সেখানে একে খুঁজে পাবে না। এককালে অনেক জায়গায় একে দেখা গেলেও এখন দেখা যায় শুধু দক্ষিণ-পূর্ব অষ্ট্রেলিয়ায়।

ভালুকের মত অনেকটা চেহারা ওর। শরীরটা যেমন মোটা-সোটা, মাথাটাও তেমনি বড়। গায়ের লোম খুব ঘন, পশমের মত নরম আর গাঢ় ধূসর বর্ণের, কিন্তু পেটের নীচের লোম শাদা। এর দেহের কোন কোন জায়গায় শাদা অথবা হলদে রঙের দাগ দেখা যায়। ভালুকের মত এরাও পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে চলে। ভালুকের মতই এদের পায়ের নখ বড় আর ধারালো। ভালুকের সঙ্গে এত সাদৃশ্য আছে বলেই বোধহয় অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা এদের বলে, 'দেশী ভালুক'। কিন্তু ওর আসল নাম হচ্ছে "কোয়ালা।"

'কোয়ালা' দ্বিগর্ভ বর্গের প্রাণী অর্থাৎ ছানাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবার জন্য মেয়ে কোয়ালাদের তলপেটে চামড়ার একটা থলি আছে। ছানাগুলি সেখানে থেকেই বড় হয়। তবে কোয়ালার ছানারা বেশীর ভাগ সময়ই মায়ের কাঁধে চড়ে বেড়ায়।

কোয়ালা লম্বায় হয় দু' থেকে তিন ফিট। এর কোন লেজ নেই। মাটিতে এরা ভাল করে চলতে পারে না। কেমন যেন শ্লথ গতি। তাড়া খেলে এরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ে। তারপর ডালে ডালে এমন সহজ ভাবে চলাফেরা করে যে দেখলে অবাক হতে হয়। মনে হয় সারা জীবন গাছে বাস করবার জন্যই যেন এদের সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতি?

এদের নাকের গড়নটা ভারী অদ্ভুত। তার উপরে আছে কালো কাপড়ের মত পর্দার ঢাকনি। চোখের রঙ হলদে ধূসর আর চোখের তারা খাড়া। এরা হা করলে নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ে। এদের মুখের দু'কসে দুটি থলি আছে, অনেকটা বাঁদরের মত। এখানে খাবার জিনিস জমিয়ে রাখে ওরা, পরে অবসর মত বসে বসে চিবোয়।

সাধারণত কোয়ালারা ডাকে না, কতকটা শূয়রের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে। তবে পুরুষ কোয়ালা সময় সময় গাধার মত ডেকে ওঠে। কোয়ালার বাচ্চারা ভয় পেলে ছোট ছেলেমেয়েদের মত কেঁদে ওঠে।

আগেই বলেছি কোয়ালা গাছে উঠতে ভারী ওস্তাদ ও গাছ বাইতে পারে। এ অভ্যাস তার নূতন নয়। এটা তাদের অভ্যাসও করতে হয় না। প্রকৃতির নিয়মেই ছোট থেকেই সে গাছ বাইতে পারে, কারণ সেখানেই থাকে তার খাওয়ার জিনিস। কচি পাতা, গাছের আঠা ইত্যাদি খেয়েই সে বেঁচে থাকে। তবে মাঝে মাঝে রাতে মাটিতে নেমে সে গাছের কচি শিকড় খুঁড়ে খুঁড়ে খায়। কোয়ালা নিরামিষাশী —অর্থাৎ মাছ মাংসের সে ধার ধারে না। তাই বোধহয় এত নিরীহ। কারু কোন ক্ষতি করার মধ্যে সে নেই। অবশ্য ক্ষতি করার সামর্থ্যও তার নেই, কারণ আত্মরক্ষার মত অস্ত্র তার নেই। শত্রুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ইউ-কেলিপটাস গাছের মত সু-উচ্চ গাছের ডালের অন্তরালে সে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু এমনি ভাবে কি প্রাণ বাঁচান সম্ভব ? সম্ভব নয় বলেই কোয়ালাকে হাজারে হাজারে হত্যা করা হয়েছে। এদের তাই লোভী শিকারীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকারকে আইন করতে হয়েছে। কিন্তু বড় দেরীতে আইন করা হয়েছে, কারণ এই সুন্দর আর নিরীহ জীবটি প্রায় নির্বংশ হয়ে গেছে। এদের যা কিছু দেখা যায় কোন কোন স্যাংচুয়ারিতে অর্থাৎ বন্যজন্তুদের নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখে বসবাস করবার জন্য যে সব স্থান সরকার তৈরী করে দেন সে সব জায়গায়। এদের চমৎকার লোম আর সুস্বাদু মাংসের জন্যই এরা শিকারীর লক্ষ্য হয়েছে।

শীতের প্রথম দিকে এদের সাধারণত ছানা হয়। একবারে একটির বেশী ছানা হয় না। জন্মের পর চার পাঁচ মাস এরা মায়ের বুকে থলিতে বসে থাকে। তারপরেও অন্ততঃ ছয় সাত মাস মায়ের কাছ ছাড়া হয় না, তার কাঁধে চড়ে বেড়ায়। কোয়ালা অতি সহজেই পোষ মানে।

সাগরদ্বীপের কেল্লা

নির্ম্মল চৌধুরী

বিস্মিত গঞ্জালেস ও স্বর্ণ দেখলে, স্বয়ং বার্থেলোমিউ। বার্থেলোমিউ গঞ্জালেসকে বললে, "কি হয়েছে ?"

গঞ্জালেস তার দিক থেকে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। শুনে বার্থেলোমিউ স্বর্ণকে বললে, "তোমার দিক থেকে কি বলবার আছে ?"

স্বর্ণও তার দিক থেকে সব কথা বললে।

বার্থেলোমিউ হুঙ্কার দিয়ে বললে, "তুমি এখানকার কে ? এখানে ন্যায় অন্যায় বিচার করবো আমি। জান, তোমার এই ধৃষ্টতার শাস্তি কি ? গাছের ডালে টাঙিয়ে নিচে আগুন জেলে একটু একটু করে পুড়িয়ে মারা।"

স্বর্ণ বুঝলে, বোম্বেটেদের রাজ্যে, দাসদের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়ম-কানুন উল্টো।

বার্থেলোমিউ ধমক দিয়ে উঠলো, "এখনই এখান থেকে যাও। আমাদের কোন বিষয়ে তুমি মাথা গলাবে না।"

স্বর্ণ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেল।

গঞ্জালেস ও দাসেরা বার্থেলোমিউর এই মিটমাটের মনোভাব দেখে অবাক হয়ে গেল। গঞ্জালেস মনে মনে বললে, "এবার রাজ্য ভাঙবে।"

কিন্তু বার্থেলোমিউ যে অন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে স্বর্ণকে কঠোর শাস্তি দিলে না তা তারা

কেউই বুঝতে পারলে না। বার্থেলোমিউও তারপর আর সেখানে থাকলো না, চলে গেল। সে এসেছিল কারখানার কাজ দেখতে। কারণ, তার কয়েকখানি নতুন জাহাজ দরকার।

এই যুদ্ধের ফলে, দাসদের মনে আশার সঞ্চার হলো। এতদিন তারা নীরবে সব সয়ে এসেছে। একটি কিশোরের শক্তি ও সাহস তাদেরও মনে শক্তি ও সাহস জাগালা। তারা মনে মনে স্থবর্ণর ভক্ত হয়ে পড়লো এবং গোপনে স্থবর্ণর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলো।

কালীকিঙ্কর বুদ্ধিমান। তাদের বুঝিয়ে দিলেন, এই রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ সকলে একতাবদ্ধ হওয়া। একতাবদ্ধ হয়েই এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর হাতিয়ারের লড়াই ছাড়া এদের পরাস্তও করা যাবে না। বার্থেলোমিউর অনুচরেরা সকলেই তার অনুরক্ত নয়। তাদেরও দলে নিতে হবে। দাসদের মধ্যে অনেক নাবিক ছিল। তারা হাতিয়ার ধরতে জানতো। বাঙালিরাও সেকাজে পটু ছিল।

তবুও কালীকিঙ্কর মুক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন না। আর কয়েকদিন পরেই বার্থেলোমিউ তাঁদের যে একমাস সময় দিয়েছে তা পূর্ণ হবে। তার আগেই চাই মুক্তি। কালীকিঙ্কর বড় দুশ্চিন্তায় সময় কাটাতে লাগলেন। দুশ্চিন্তার বেশির ভাগ স্থবর্ণর জন্যেই। তিনি মরেন ক্ষতি নেই। কিন্তু স্থবর্ণ? ওকে কি উপায়ে রক্ষা করবেন?

স্থবর্ণ কালীকিঙ্করের মতো চিন্তাকুল হয় নি। তার এক কারণ কালীকিঙ্কর। সে তাঁর বুদ্ধি ও সাহসের ওপর নির্ভর করেছিল। অপর কারণ তার কিশোর বয়স। অল্প বয়সে মানুষের মৃত্যুভয় থাকে কম। ইতিমধ্যে দাসদের আর এক বন্ধু জুটেছিল। লোকটির নাম শঙ্কর। সে ছিল ঢাকার এক সওদাগরী জাহাজের নেয়ে। বোম্বেটেরা সে জাহাজ লুঠ করে ডুবিয়ে দেয়। শঙ্কর ছাড়া জাহাজের আর একটি লোকও প্রাণে বাঁচে নি। তাকে বন্দী করে এনে জাহাজ তৈরির কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। শঙ্কর এই দ্বীপে আছে প্রায় এক বছর। স্থবর্ণ ও সে গোপনে অনেক পরামর্শ করেছে। তবুও উদ্ধার পাবার কোন কূল কিনারা করতে পারে নি।

এমন সময়ে একটা স্থযোগ দেখা দিল। আর দু দিন পরেই কেল্লা-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব। সেই দিন-রাত্রিভোর বোম্বেটেরা মত্ত হয়ে থাকবে কোন দিকেই নজর দেবে না। তখন যদি ওদের আক্রমণ করে কাবু করা যায়। কিন্তু সেও সহজ ব্যাপার নয়।

শঙ্করও সেই মতলব করেছিল। সে স্থবর্ণকে বললে, "ওরা আজ উৎসবের আয়োজনে এমন ব্যস্ত যে আমাদের দিকে নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করছে না।"

স্থবর্ণ বললে, "তা আমিও লক্ষ্য করেছি। উৎসবরাত্রেই আমাদের পালাবার স্থযোগ। কিন্তু কিসে চড়ে পালাবো?"

শঙ্কর বললে, "বন্দরে একখানি সুন্দর ছোটখাটো জাহাজ আছে দেখেছো?"

"দেখেছি। শুনেছি ওখানা বার্থেলোমিউর নিজের জাহাজ।"

"ওর গতিও খুব দ্রুত। পাল তুলে দিলে যেন বাতাসের আগে উড়ে চলে।"

"ওখানা নিয়ে পালাবার কথা বলছো? কিন্তু মাল্লা পাব কোথায়? কতকগুলো হাতিয়ার যেমন বন্দুক, তলোয়ার, ছোরা কি করেই বা সংগ্রহ করা যাবে?"

"তার জন্য ভাবনা নেই। ঐ জাহাজেই দুটি ছোট কামান আর ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র আছে। আমি একবার জাহাজখানার একটা কামরা মেরামত করতে গিয়ে এসব দেখে এসেছি।"

"কিন্তু জাহাজখানা দখল করবো কি ভাবে? ওর ওপরেও তো পাহারা।"

"উৎসবের রাত্রে তারাও হয় উন্মত্ত থাকবে বা ডাঙ্গায় নেমে আসবে। আর, মাল্লার কথা? তা জোগাড়ের ভার আমার।"

"বেশ।"

"কিন্তু আমাদের মুক্তি না দিলে—"

"সে কথাও ভেবেছি। যে পাহারাদার আমায় রাত্রে খাবার দিতে আসে তার কাছে অনেক চাবি দেখেছি। সে রাতে তাকে কাবু করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। তার কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে কাকার আর তোমাদের ক'জন ওস্তাদ কারিগরের ঘর খুলে ফেলবো। তারপর ছোট নৌকোয় চড়ে জাহাজে উঠে পাল তুলে, দাঁড় টেনে সরে পড়বো। এখন বাতাসও আমাদের অনুকূল বলেই মনে হয়।"

"তা বটে।"

"কিন্তু সব গোপনে রাখতে হবে। কেবল জানবে তারাই যারা আমাদের সঙ্গে যাবে।"

"তাই হবে। আমরা চলে গেলে যারা থাকবে তাদের ওপর যে অত্যাচার হবে—"

"তাও বন্ধ করবো। সম্রাটের রণতরী এনে এই রাক্ষসপুরী উড়িয়ে দিয়ে ওদের মুক্তি দেবো।"

শঙ্কর সুবর্ণর কথায় খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। সুবর্ণ বললে, "এখন কাকাকে মতলবটা জানাতে হবে। চল।"

—আট—

বার্ষিক উৎসবের দিন ভোর থেকেই বোম্বেটেরা খানা-পিনা, নাচ-গানে এমন মেতে উঠলো যে, প্রহরীরাও পাহারা দিতে ভুলে গেল। তাই বলে দাস ও বন্দীদের বেলায়ও কিছু ভাল খাবারের যে ব্যবস্থা না হলো তা নয়।

রাত্রে প্রহরী টলতে টলতে এল সুবর্ণর খাবার দিতে এবং খাবারের পাত্র নামিয়ে নিজেই সটান মেঝেতে শুয়ে পড়লো।

সুবর্ণ তৎক্ষণাৎ তার মুখে রুমাল ও হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে তার কোমর থেকে তলোয়ার ও পিস্তল খুলে নিজের কোমরে বেঁধে, চাবির গোছা খুলে নিয়ে ছুটলো কালীকিঙ্করের ঘরের দিকে। তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সুবর্ণর কপালগুণে তাঁর ঘরের তালার চাবিটা গোছায় পেতে দেরি হলো না। সে ঘর খুলতেই কালীকিঙ্কর বেরিয়ে এলেন।

তারপর দু'জন ছুটলেন শঙ্করের ঘরের দিকে। কিন্তু ততদূর তাঁদের আর কষ্ট করে যেতে হলো না। শঙ্কররা চারজনে ছিল একখানি ঘরে। তাদের খাবার দেবার সময়ে প্রহরী মনের ভুলে ঘরে চাবি দিতেই ভুলে গিয়েছিল। তারাও ছুটে আসছিল তাঁদের ঘরের দিকে।

মাঝপথে দু'দলে দেখা। কালীকিঙ্কর তাদের দলপতিরূপে জাহাজ ঘাটের দিকে যাবার নির্দেশ দিলে সকলে সেদিকে ছুটে চললে।

ঘাটে এসে একখানি ছোট নৌকোকে বালির ওপর থেকে ঠেলে জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁরা সাতজনে তাতে উঠে বসলেন। নৌকোতে একজোড়া দাঁড় বাঁধা ছিল। কাজেই জাহাজের কাছে যেতে তেমন বেগ পেতে হল না।

তারপর নোঙ-রের শিকল বেয়ে ওপরে উঠে দেখে জাহাজে কেউ নেই, সকলে ডাঙায় গেছে আমোদ করতে। তখন তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে, দাঁড় টেনে তাঁরা চললে বার সমুদ্রে।

পরিষ্কার আকাশ। তারায় তারায় ঝলমল করছে। কালীকিঙ্কর ও শঙ্কর পাকা নাবিক। বার সমুদ্রে পড়ে তাঁরা নক্ষত্র দেখে জাহাজ চালাতে লাগলেন।

এদিকে বোম্বেটেদের আড্ডায় হাসির হর্‌রা উঠছে; বাজনা বাজছে, গান হচ্ছে, খানাপিনা চলছে। আর দাস ও বন্দীরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। [চলবে]

রণজিত মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রের অগ্রপথিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।
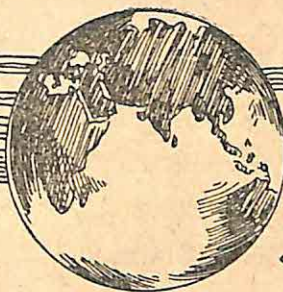
১৭৮৯ সালের ১৮ই নভেম্বর ফ্রান্সের এক গণ্ডগ্রামে জন্মালো একটি ছেলে। নাম তার লুই। আর পাঁচ জন ছেলের মতো স্রধু লেখাপড়ার গণ্ডীর মধ্যেই মন তার আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে দেখে আশেপাশে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। মনে তার একমাত্র জিজ্ঞাসা এমন কি কোনো উপায় নেই যার সাহায্যে নিখুঁত ভাবে ধরে রাখা যায় প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি? সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় হরেকরকম রঙের যে লীলাখেলা চলে নীল আকাশের পটভূমিকায়, তা যদি ধরে রেখে দেওয়া যায় বরাবরের মতো, তাহলে চিরদিনের খুশির খোরাক পাওয়া যাবে। এক উপায় রঙ তুলির সাহায্যে পটে এঁকে রাখা। কিন্তু কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন নেই তাতে।

ক্রমে বাল্য থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনের সীমানায় পদার্পণ করলেন লুই। তখনো তাঁর মনে সেই একই প্রশ্ন। ইতিমধ্যে লেখাপড়া সাঙ্গ করে একান্ত নিষ্ঠায় তিনি মনোনিবেশ করেছেন শিল্প-চর্চায়। তরুণ বয়সেই শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেও সন্তুষ্ট নন তিনি। কেবলি এক চিন্তা : কি করে প্রাণ আনা যায় ছবির মধ্যে। এমনি করে আরো কিছুদিন কাটলো। একদিন লুই "প্যানোরামা" নামে চলচ্ছবির এক প্রদর্শনী দেখতে গেলেন। বিরাট এক পটের উপরে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। রোলারের সাহায্যে একদিক খুলে আরেক দিক গুটিয়ে চলমান ছবির আভাস দেওয়া হয়েছে। লুই দেখলেন, মুগ্ধ হলেন এবং সেই সঙ্গে ভাবলেন এর মধ্যে প্রাণের যে অভাব তা যদি কোনোরকমে পূরণ করা যায় তাহলে উপভোগ্য হবে আরো।

কিছুকাল পরে আরেকজন শিল্পীর সহযোগিতায় "ভায়োরামা" নামে নতুন এক ধরণের চলচ্ছবি তৈরি করলেন তিনি। প্যারিসের 'হল অব মিরাকলস্'এ স্রুরু হোলো প্রদর্শনী। প্যানোরামা

চিত্রপটের মতো এটিও রোলারের সাহায্যে দেখানো হয়। কিন্তু পর্দার দুদিকে ছবি আঁকার জন্যে এবং একাধিক পর্দা থাকার জন্যে ত্রিস্তর ছবির আদল তাতে পাওয়া যায়। ডায়োরামার প্রদর্শনী থেকে বেশ কিছু উপার্জনও হোলো। এবং আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৮৩৯ সালে এটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত লুই-এর গ্রাসাচ্ছাদন চলতো ডায়োরামার প্রদর্শনী থেকে পাওয়া অর্থে।

নবলব্ধ খ্যাতি ও অর্থাগম তাঁর মনের সুপ্ত আকাংখা জাগিয়ে তুললো নতুন করে। সূর্যালোকের সাহায্যে ধাতু ফলকের উপর প্রাকৃতিক দৃশ্য কি উপায়ে চিরস্থায়ী ভাবে ধরে রাখা যায় তারই পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত হলেন তিনি। এইসময় নিসেফোর নীপ্‌সে নামে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ হোলো লুই-এর। ইনিও ফরাসী দেশের লোক এবং এঁরও আগ্রহ সূর্যালোকের সাহায্যে চিরস্থায়ী ছবি তোলার। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হোলো এবং ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত একযোগে গবেষণা চালালেন।

ক্যামেরার মধ্যে রাখা ধাতুর পাতের ওপর যে কোনো জিনিসের প্রতিকৃতিকে ধরে রাখতে সফল হয়েছেন তাঁরা। একমাত্র সমস্যা কি করে তাকে চিরস্থায়ী করা যায় সহজে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৩৩ সালের ৩রা জুলাই নীপ্‌সে পরলোকগমন করেন। লুই পড়ে গেলেন একা। কিন্তু তাতেও দমে না গিয়ে একমনে চালিয়ে যেতে লাগলেন গবেষণা। এমনিভাবে কাটলো আরো ছ' বছর।

এলো ১৮৩৯ সাল। একদিন ক্যামেরার ভিতর থেকে একখানি ছবির পাত বার করে রেখে দিলেন আলমারিতে। লুই ভেবে ছিলেন আরেকবার ছবি তুলে দেখবেন এতে। পরের দিন আবার ছবি তোলার জন্য সেখানা নিয়ে দেখেন পরিষ্কার এক ছবি উঠেছে। লুই অবাক। সারা আলমারি তচনচ করেও তিনি ধরতে পারলেন না কি করে এটা সম্ভব হোলো। আরেকখানা ছবির পাত রেখে দিলেন। আবার সেই ব্যাপার। যাই হোক, অবশেষে লুই ধরতে পারলেন যে, মার্কারি গ্যাসের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুকাল পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সোডিয়াম হাইপো-সালফেট (সংক্ষেপে হাইপো) ব্যবহার করলে ধাতুর পাতের উপর সূর্যালোকের সাহায্যে তোলা যে কোনো ছবি চিরকালের মতো ধরে রাখা যায়। এতোদিনে সফল হোলো তাঁর প্রচেষ্টা।

লুই তাঁর নিজের পদবী অনুসারে এই নতুন আলোকচিত্র গ্রহণ পদ্ধতির নাম দিলেন ড্যগেরোটাইপ। আধুনিক আলোকচিত্রের প্রথম পদক্ষেপ। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ধাতুর পাতের বদলে কাগজের উপর ছবি তোলা হয়। প্রথম ড্যগেরোটাইপ প্রচলিত হয় ১৮৩৯ সালে সেই জন্যে আলোকচিত্রের ইতিহাসে এই বছরটি অবিস্মরণীয়। সেই সঙ্গে অবিস্মরণীয় লুই ড্যগেঅর-এর নাম। ১৮৫১ সালের ২১ শে জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন কিন্তু আজো তিনি অমর হয়ে আছেন সারা বিশ্বে আলোকচিত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে।

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—"চিড়িয়া ভাগল্ বা"—

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাব্‌লা বললে, চুক্-চুক্-চ্চুঃ !

টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাব্‌লা ?

—কী আর হবে ? চিড়িয়া ভাগল্ বা !

—চিড়িয়া ভাগল্ বা মানে ?

আমি বললাম বোধ হয় চিঁড়ে টিঁড়ের ভাগ হবে। চিঁড়ে কোথায় পেলিরে ক্যাব্‌লা ? দে না চাট্টি, খাই। বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদী করতে হবে না। চিঁড়ে নয় রে বেকুব—চিঁড়ে নয়। চিড়িয়া ভাগল্ বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললাম, পাখি ? [illegible]াঃ— পালায়নি তো। ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, দুত্তোর। এই প্যালাটার মগজে খালি বাসক পাতার রস আর সিঙ্গি মাছ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালালো—দেখছিস না ? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি ?

—পালিয়েছে তো কী হয়েছে ?—টেনিদা বললে, আপদ গেছে।

হাবুল তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। এক হাঁড়ি রসগোল্লার নোলা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর খোঁচা খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা!

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিস্‌নি। গজাদা ভালো লোক। ভালো লোকই ত বটে। তাই ত ডাক বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায়—তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুটুর-কাটুর করে কী সব ছাপে। আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়! ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হু-হু-হু। আমি বুঝতে পেরেছি।

টেনিদা বললে, খুব যে ডাটের মাথায় হু-হু করছিস। কী বুঝেছিস বল!

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকালো। তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে?

এমন করে বললে যে আমার পালা জ্বরের পিলেটা একেবারে গুর্‌ গুর্‌ করে উঠল। একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেটে ব্যথা হয়েছে বলে ঝট্‌কা মেরে পড়েছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারী পড়ে—আমার পেট ব্যথা শুনে সে একটা আধ হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইঞ্জেক্‌সন দিতে এসেছিল আর তখুনি পেটের ব্যথা উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ্‌ নিয়ে আমায় তাড়া করেছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ আবার কে? আমরা সবাই বীরপুরুষ।

—তা হলে চলো—যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—ওই নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কি! পাগল না পাঁপড় ভাজা। মাথা খারাপ না পেট খারাপ। মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল!

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা ক্যামন কইর‍্যা? উইড়্যা যাইবা নাকি?

ক্যাবলা বললে, চল্‌—বড় রাস্তায় যাই। ওখান দিয়ে অনেক লরী আসা-যাওয়া করে। তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে।

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে?

—নীল মোটর আর যাবে কোথায়—বড় জোর রামগড়। আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আবার ফিরে আসব।

—কিন্তু মিথ্যে এ-সব দৌড়ঝাঁপের মানে কী ?—টেনিদা বললে, খামোখা ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করেই বা কী হবে ? পালিয়েছে আপদ গেছে। এবার ডাকবাংলোয় ফিরে প্রেম্‌সে মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ওসব বিচ্ছিরি হাসি-টাসিও আর শুনতে হবেনা রাত্তিরে।

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি! আমাদের বোকা বানিয়ে ওরা চলে যাবে—সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে। তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না—সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে। ওসব চলবে না, দোস্ত। তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও না গেলে। কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা ?

—একা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে। কাঁকড়া বিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ ছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তা হলে সক্কলকে কাটলেট্ বানিয়ে খাবে। পেঁয়াজ চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল।—ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তা হলে তুই একাই থাক এখানে—আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়। হু হু ! আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা; মানুষ মরে গেলে তাকে পটল তোলা বলে। আমার এক মাস্‌তুতো ভাই আছে—তার নাম পটল সে এক সঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশো বেগুনী খেতে পারে। ছোট্‌দির একটা পাঁঠা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা সখের শাদা নাগরাকে সাতমিনিট তের সেকেণ্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি। আর শিঙ্গি মাছের কথা কে না জানে! আর কোন মাছের শিং আছে ? মতান্তরে ওকে সিংহ মাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কি খাস বল ? আলু আর পোনা মাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু-প্রত্যয়। সেই সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা ? ছোঃ। লোকে কথায় বলে—ছানাপোনা পুচকে—অ্যাত্তোটুকু। কোথায় সিংহ আর কোথায় পোনা। কোনো তুলনা হয় ? রামচন্দ্র।

আমি যখন এই সব তত্ত্ব কথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ফেলেই।

অগত্যা পটোল আর শিঙ্গি মাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু পিছু ছুটতে হল।

বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল দেড়েক দূরে। যেতে যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শাল পাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন—টাট্‌কা শাল পাতার ঠোঙা। কেমন কৌতূহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনি ভাবে চট করে তুলে নিয়ে সেটা শুঁকে ফেললুম। ইঃ—নির্ঘাৎ সিঙারা ছিল ওতে—গরম সিঙারা। এখনো তার খোসবু বেরুচ্ছে।

কী ছোটলোক। সবগুলো খেয়ে গেছে। এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষেতিটা ছিল।

—এই প্যালা—মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান্ র‍্যা ?—টেনিদার হাঁক শোনা গেল।

এমনিতেই ক্ষিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছে পিছে হাঁটতে লাগলুম। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। ঠোঙাটা আরো একটু শোঁকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল।

বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি—তখন ভোঁক ভোঁক। একটা লরী।

আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম—'রোখ্‌কে—রোখ্‌কে'—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কী যে করিস গাড়োলের মতো তার ঠিক নেই। ওটা তো রায়গড় থেকে আসছে।

—ওরা তো উলটো দিকেও যেতে পারে।

—তুই একটা ছাগল। দেখছিস্ না কাঁচা রাস্তার ওপরে ওদের মোটরের চাকা কি ভাবে বাঁক নিয়েছে! অর্থাৎ ওরা নির্ঘাৎ রামগড়ের দিকেই গেছে। উলটো দিকে হাজারীবাগ—সেদিকে যায়নি।

ইস্—ক্যাবলার কী বুদ্ধি! এই বুদ্ধির জন্যই ও ফাষ্ট হয়ে প্রোমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু। তা-ও অঙ্কের খাতায়। আমার মনে হল লাড্ডু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরো নগদ নগদ করা ভালো। খাতায় পেন্‌সিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয়? যে গোল্লা খায়—তাকে এক ভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয়। কিংবা গোটা আষ্টেক বড়বাজারের লাড্ডু। তিলের নাড়ু নয়—একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁতে ব্যথা করেছিল।

—ঘর্‌র—ঘ্যাস্?

পাশে একটা লরী এসে থামল। কাঠে বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরী ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হোয়েছে খোকা বাবু? তুমরা ইখানে কী করছেন?

—আমাদের একটু রামগড় পৌঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব।

—পয়সা দিতে হবে যে। চার চার আনা।

—তাই দেব।

—তবে উঠে পড়। লেকিন কাঠকে উপর বোসতে হোবে।

—ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।—ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা···ওঠো। হাবলা—আর দেরি করিসনি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা? উঠে পড় শিগ্‌গির—

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ? টেনে-হিচড়ে কোনোমতে যখন লরীর ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদীয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন জল উঠে গেছে। সারা গা বিড়বিড় করে জ্বলছিল।

আর তক্ষুনি—

ভোঁক ভোঁক করে আরো গোটা দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ী ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। এঃ—কী যাচ্ছেতাই ভাবে নড়ছে কাঠগুলো। কখন ধপাস করে উল্‌টে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই। আমি সোজা উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দু'হাতে মোটা কাঠের গুঁড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরীটা পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল। আর মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়ী-টাড়ীগুলো সব এক সঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে। (ক্রমশঃ)

স্থাপত্যের কথা

কাফী খাঁ

গতবারে তোমাদের প্রাচীন মিশর দেশ, ব্যাবিলন ও অসুরের দেশ আর প্রাচীন গ্রীসের সৌধ স্মৃতিমন্দিরগুলোর কথা বলেছি। আর সেগুলোকে ছবি এঁকে বুঝিয়েও দিয়েছি। তা থেকে তোমরা একটা জিনিষ দেখেছ যে মানুষ বাড়ীঘর তৈরীর বিষয়ে ক্রমে ক্রমে কেমন উন্নতি করেছে। প্রাচীন গ্রীসের বাড়ীঘরগুলোর ছবি দেখেই বুঝেছ যে, সেগুলো যেন অনেকটা pillar বা থাম-সর্ব্বস্ব। ছাদগুলো ছিল সব কাঠের কড়ির উপর পাথরের টালি দিয়ে ঢাকা। ওরা কিন্তু ছাদ তৈরীতে খুব উন্নতি করতে পারেনি।

প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্যের পরেই হচ্ছে রোমান স্থাপত্যের কথা। রোমানেরা একটা বিষয়ে গ্রীসের উপর টেক্কা মেরে দিয়েছিলো। সেটা হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম খিলান ব্যবহার করা। আর এই খিলান তৈরীর স্থাপত্য বিদ্যায় উন্নতি করেই রোমানেরা তাদের সারা সাম্রাজ্যময় এত রকমারি ধরণের বাড়ীঘর তৈরী করতে পেরেছিলো। বাড়ীঘরের শিল্প-সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে অবশ্য রোমানেরা গ্রীসের কাছে দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু আরাম ও সুবিধা ভোগ করতে ও রাজৈশ্বর্য্য দেখাতে রোমানদের জুরী ছিল না। তাই তারা নিজেদের ব্যবহারের ও জীবনধারণের কায়দার জন্যে কতকগুলি নতুন জিনিষ তৈরী করেছিলো। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধর, রোমান কর্ত্তারা কোনো এক দূর

দেশ শাসন করার জন্য সেখানে একটা সহর পত্তন করেছেন। এখন সেখানে কাছে কোনো ভালো জল নেই বা ভালো নদী নেই যেখানে লোকেরা জল পাবে। অথচ কর্ত্তাদের জল না হলে চলে না। তখন তৈরী হল বিরাট একটা পয়ঃপ্রণালী। সেটা পাহাড়, মাঠ, নদী পার হয়ে ধীরে ধীরে ঢালু পথে সেই সহরে রোমান কর্ত্তাদের জন্য ভালো জল সরবরাহ করতে লাগলো, অম্নি তৈরী হয়ে গেল বিরাট খিলান দিয়ে তৈরী পুলের মত দেখতে Aqueduct, আর বয়ে যেতে লাগলো তার উপর দিয়ে সেই নালা ভরা ভালো জল রোমান সহরের দিকে।

শুধু এই নয়। বড়লোক হলে মানুষের যেসব বড় ধরণের অভ্যাস জন্মায়, যেমন বেশ আরাম করে স্নান করা, ভালো জল খাওয়া, আমোদপ্রমোদ করা, এ সবই রোমানদের প্রয়োজন হল। তাই তারা তৈরী করলো দলবদ্ধভাবে স্নানাগারের বাড়ী বা Bath, খিলানের উপর দাঁড় করালো খালের জল, আর তার সাথে স্নানের জন্য বড় বড় চৌবাচ্চা, রোমানদের আমোদ আহ্লাদের প্রবৃত্তি শেষে এমন নৃশংস হয়েছিলো যে তারা গ্রীসদের মত সাধারণ খেলা বা থিয়েটারে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা একেবারে গোল গ্যালারীওয়ালা বিরাট বাড়ী বানালো, আর তাতে মানুষে জন্তুতে লড়াই সুরু হলো। দেখতে লাগলো লক্ষ লক্ষ রোমানেরা দল বেঁধে—Amphitheatre এতে।

তারপর ধর কোনো রোমান সম্রাট একটা দেশ জয় করেছেন। এবার তিনি রীতিমত আসাসোটা নিয়ে বাজনা বাজিয়ে বিজিত রাজারাণীদের সোনার শিকলে বেঁধে মিছিল করে রোমে প্রবেশ করবেন। তখন তৈরী করা হলো এক বিরাট 'বিজয় তোরণ' রোমের একটা চৌরাস্তায়। আর তারপর সেই তোরণের (Triumphal Arch) মধ্যে দিয়ে সেই সম্রাটের বিজয়ী মিছিল Triumph মার্চ্চ করে সহরে ঢুকলো।

তবেই বুঝে দেখ রোমানেরা কত দাম্ভিক ছিল। সাম্রাজ্যবাদ প্রীতিটা ছিল এদের মজ্জাগত। কিন্তু গ্রীকদের তা ছিলনা। গ্রীকরা ছিল দার্শনিক, শিল্পী ও সৌন্দর্য্যের পূজারী। তাই ওরা দিয়েছে পৃথিবীকে তাদের শ্রেষ্ঠ দর্শন, তাদের শিল্প, তাদের সাহিত্য। কিন্তু রোমানেরা ছিল ঘোর সংসারী। তাই রোমানেরা পৃথিবীকে দিলো তাদের শাসনের সুবিধার জন্যে 'আইন কানুন' অর্থাৎ Roman Law আর তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও ঐশ্বর্য্য। সেইজন্য সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে গেলে কি কি কাজ গুছিয়ে করা উচিত সেগুলিও তারা জগৎকে শিখিয়েছে। যেমন রোমান পয়ঃপ্রণালী, যাতে করে যে কোনো গহন স্থানে তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে আরামে শাসন করতে পারে। তেম্নি তারা দিয়েছে একদেশ থেকে অন্য দূর প্রান্ত দেশে খুব সুবিধায় যাতায়াতের জন্য ভাল রোমান সড়ক বা Road, যাতে যে কোনো জায়গায় সৈন্য পাঠিয়ে সাম্রাজ্য ঠাণ্ডা রাখা যায়, ইত্যাদি। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে এখনো পৃথিবীতে ইটালীয়ানেরা রাস্তা তৈরী করতে সব চাইতে ভালো ইঞ্জিনীয়ার। অত বড় জাত আমেরিকানরাও এদের কাছে দাঁড়াতে পারে নি এখনও।

রোমান স্থাপত্যের কথার পর এবার তোমাদের বলছি ঠিক তার পরের যুগের স্থাপত্যের কথা।

এটার নাম আমরা দিয়েছি 'বৈজয়ন্ত' স্থাপত্য। এর একটু গল্প শোনো। রোমান সাম্রাজ্য শেষ দিকে
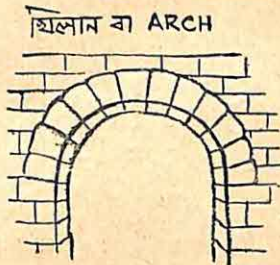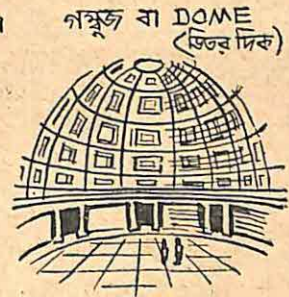
এই খিলান, ও খিলান দিয়ে মাথার উপরে গোল ধরনের ছাদ তৈরীর যে সব রকমারি দেখছ, এ সবই কিন্তু রোমানেরা পৃথিবীতে সবার আগে করেছিল।
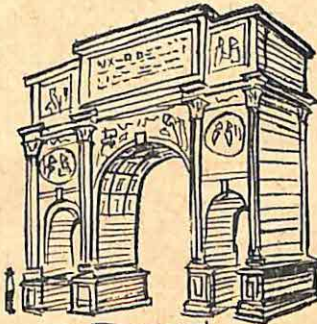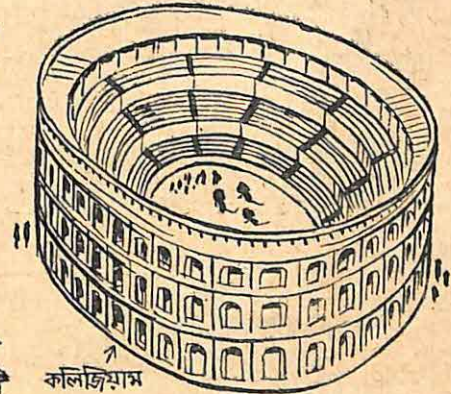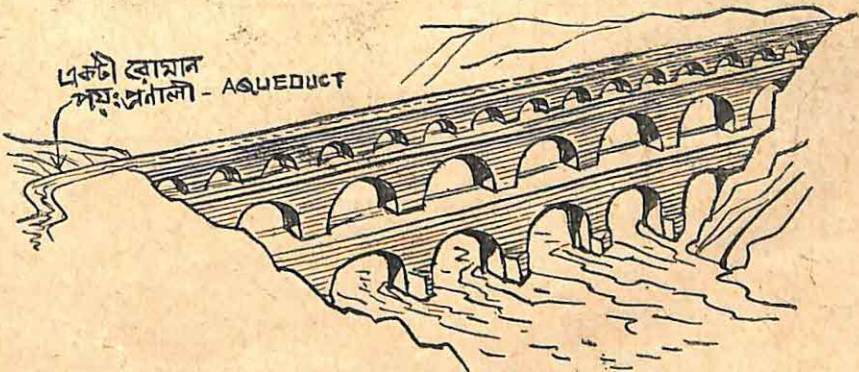
এত বড় হয়ে গেলো যে সাম্রাজ্যের ভেতর এমন ঝগড়া সুরু হলো যে, শেষ পর্য্যন্ত রোমান সম্রাট

কনস্টাণ্টাইন শাসনের সুবিধার জন্য তাঁর রাজধানী রোম থেকে আরো পূর্বদিকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তাঁর নিজের নামে বসান সহর কনস্ট্যান্টিনোপোল্‌সে (অর্থাৎ কনস্টাণ্টাইনের সহরে)। গ্রীকদের সময়ে এর নাম ছিল বাইজ্যান্‌শিয়াম্‌। এর থেকেই আমরা এই দিককার রোমান সাম্রাজ্যের
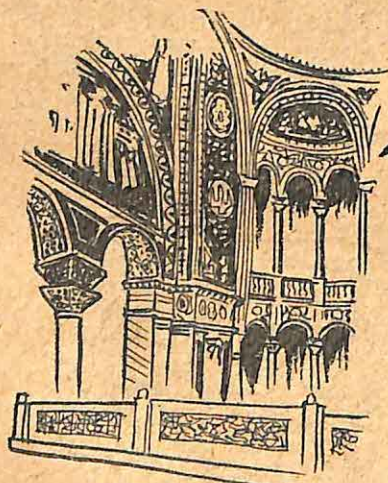
সভ্যতার নাম দিয়েছি বৈজয়ন্ত সভ্যতা। এই কনস্ট্যান্টিনোপোলের হালের নাম তুর্কীরা দিয়েছে—ইস্তাম্বুল। এর মধ্যে আরো মজা আছে, কনস্টাণ্টাইনের এই পুব দিককার রোমান সাম্রাজ্যটা হাজার বছরেরও বেশী ধরে রাজত্বের পরে তুর্কী মুসলমানদের হাতে চলে যায়! তখন থেকেই ঐ তুর্কী

রাজারা নিজেদের জাহির করত রূমের বাদশা বলে!' এখন বুঝলে তো, গল্পের রূমের বাদশা নামের মানে কি? আসলে রোম নামের সম্মানটাই ছিল এত বেশী।

এবার বৈজয়ন্ত স্থাপত্যের কথা শোনো---আগেই তোমাদের বলেছি, এই সাম্রাজ্যটা ইউরোপের একেবারে পূবদিকে—যাকে আমরা বলি বলকান ও এশিয়া মাইনর। তাই এশিয়ার প্রভাব এই স্থাপত্যে খুব বেশী। অর্থাৎ এতে রয়েছে অসম্ভব রকমের কারুকার্য্যের খেলা আর রং বেরংয়ের দেয়াল, ঝুলানো ঝাড় লণ্ঠন গালিচা, আর দামী মার্বেল ও মোজেক দিয়ে তৈরী সব বিরাট গির্জা ও বাড়ীঘর। দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সঙ্গেকার ছবিগুলো দেখলেই তোমরা সব বুঝতে পারবে।

এবার 'মোজেক' জিনিষটার কথা বলি। মোজেক (Mosaic) কাকে বলে জানো? লাল নীল সাদা সব রং বেরংয়ের পাথরের বা চীনামাটীর টুকরো দিয়ে মেঝেতে বা দেয়ালে সিমেন্টের উপর চেপে চেপে বসিয়ে যে সব কারুকার্য্য বা ছবির মত করে সাজিয়ে জমি তৈরী করা হয়, তাকে বলে মোজেক। এর থেকেই গুঁড়ো পাথরের কুচি বসানো সিমেন্টের মেজেকে আমরা বলি মোজেক। কলকাতার 'নাখোদা' মসজিদের গম্বুজটা যেটা আলোতে চক্‌চক্ করে, সেটা সাদা মোজেক দিয়ে তৈরী। কলকাতায় পরেশনাথের মন্দিরেও বহু মোজেকের কাজ আছে।

মোজেক জিনিষটা কিন্তু সর্ব্বপ্রথম রোমানেরা দেয়ালে ছবি তৈরী করতে ব্যবহার করতো। তারপর সেটা পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকেই সেটা মুসলিমদের মধ্যে ও তাতারদের সাহায্যে রুশ দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ)

অঙ্গুলিমাল

শ্রীগার্গী দত্ত

কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ছিলেন গার্গ্য। গার্গ্যের পুত্রের নাম অহিংসক।

অহিংসক ছিল খুবই শান্ত আর সৎস্বভাবের ছেলে। এজন্য সবাই ছিল তার ওপর খুসি। যে কাজ করবার দায়িত্ব অহিংসক নিত, তাতে অবহেলা করতে কেউ তাকে কোনদিন দেখেনি। ছেলেবেলা থেকেই তার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, পরিজনের সঙ্গে ব্যবহার এবং সর্বোপরি তার তীক্ষ্ণধী এক আশ্চর্যের বিষয় ছিল। গার্গ্য স্থির করেছিলেন, পুত্রের বয়স যখন হবে ষোল, তখন তাকে তিনি গুরুগৃহে পাঠাবেন শিক্ষালাভের জন্য। গুরুগৃহে না গেলে সেকালে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হোত না।

আজকাল যেমন ছেলেমেয়েরা নিজের বাড়ী থেকে ইস্কুলে গিয়ে বেতন দিয়ে পড়ে আসে তখনকার দিনে কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। গুরুগৃহে থেকে শিষ্য শিক্ষালাভ করত। আজকালকার মত সেজন্য মাইনে দিতে হোত না। গুরুর পুত্রের মতই তারা গৃহকর্মাদি করত, গরু চরাত, গুরুর সেবা করত। আর

তার বদলে গুরু তাদের শিক্ষাদান করতেন। এমনি ভাবে দীর্ঘকাল কেটে গেলে যখন গুরু মনে করতেন শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে তখন গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে তারা নিজগৃহে এসে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করত।

অহিংসককেও তার পিতা এমনি এক গুরুর গৃহে পাঠালেন। স্বীয় চরিত্রবল ও বুদ্ধিমত্তার ফলে অনতিকাল মধ্যেই সে গুরুর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু গুরুর প্রিয় হওয়ার বিপদও আছে। অহিংসক যে গুরুর প্রিয় হয়েছে তার সহপাঠীরা তা সহ্য করতে পারল না। ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল তারা। অহিংসক যাতে গুরুর বিরাগভাজন হয়ে ওঠে তার চেষ্টার অন্ত থাকল না তাদের।

একদিন তারা গিয়ে গুরুর কাছে নালিশ জানাল, "ব্রহ্মচর্য পালন না করে অহিংসক নানা ব্যভিচারে রত হয়েছে। আপনি এর প্রতিকার করুন।"

তাদের একথা গুরু প্রথমে বিশ্বাস করেন নি। ভাবলেন, শিষ্যেরা তাঁর প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যই এ রকম অভিযোগ করছে। কিন্তু এ রকম অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। মানুষের মন তো। গুরুর মনেও সন্দেহ উপস্থিত হোল এবং ক্রমে তা বিশ্বাসে পরিণত হল। বার-বার অভিযোগ শুনতে শুনতে শেষে তিনি অহিংসককে কিছু জিজ্ঞাসা করাও আর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর মন এমনি বিষিয়ে উঠেছিল যে, তাঁর মনে হোল অহিংসকের মৃত্যু হওয়াই উচিত।

কিন্তু কি ভাবে তাকে বধ করবেন? গুরুগৃহে শিষ্য নিহত হোলে তো আর কেউ কখনও তার কাছে শিক্ষার্থে পুত্র পাঠাতে সাহস করবে না। অনেক ভেবে শেষে তিনি ঠিক করলেন অহিংসকের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এক হাজার লোকের প্রাণ চাইবেন। দক্ষিণা না দিলে শিক্ষা কার্যকরী হয় না বলে তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল। কাজেই অহিংসক এ কাজে আপত্তি করতে পারবে না। এত লোক হত্যা করতে গেলে কেউ না কেউ তাকেও হত্যা করবে এবং এ ভাবে তার কার্যসিদ্ধি হবে।

গুরুর আদেশ শুনে নিষ্কলুষ চিত্ত শিষ্য শিউরে উঠল। যে বংশে সে জন্মেছে, সে বংশের কেউ কখনও প্রাণী হত্যা করেনি। এ কাজ সে তবে কি করে করবে? নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করে কি নিজের পাপের বোঝা বাড়িয়ে তুলবে? কিন্তু গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনও তো সে করতে পারবে না। তাই এই নিদারুণ আজ্ঞা সে মাথা পেতে নিল। গুরুর চরণধুলি মাথায় নিয়ে সেদিনই সে বিদায় গ্রহণ করল। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে দেখে তার সঙ্গীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু এক হাজার লোক মারা তো সহজ নয়। অহিংসক কোথায় পাবে এত লোক যাদের সে বধ করতে পারে? আর এমন কুলে জন্মে মানুষ মারতে কি তার লজ্জা করবে না? লোকালয়ে সে মুখ দেখাবে কি করে?

তাই সে প্রথমে গেল অরণ্যে। সেখানে সে লুকিয়ে থাকত। যে কেউ অরণ্য অতিক্রম করতে যেত অহিংসক অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করত। কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটতে এসে এমনি করে তার হাতে প্রাণ হারাতে লাগল। কোশল দেশের অরণ্যে কত লোক যে এ ভাবে প্রাণ হারাল তার ঠিক নেই।

তার নিজের কিন্তু প্রাণের ভয় নেই। অনুক্ষণ মনে কেবল এক ভাবনা কতদিনে গুরুর ঋণ শোধ করতে পারবে। হত, ব্যক্তির সংখ্যা গুণে যখন সে আর মনে রাখতে পারে না তখন মানুষ মেরেই তার একটি আঙ্গুল মালায় গেথে সে গলায় পরে রাখতে লাগল। গুরুর কাছে যে প্রমাণ দিতে হবে।

প্রাণ.হারাবার ভয়ে লোক আর অরণ্যে প্রবেশ করতে সাহস করে না। অহিংসক তখন রাত্রির অন্ধকারে গোপনে গ্রামে নগরে প্রবেশ করে নিদ্রিত গৃহস্থকে সপরিবারে হত্যা করতে লাগল। মন থেকে ক্রমে তার স্নেহ মমতা প্রীতি সব দূর হয়ে গেল। তার পূর্ব পরিচয় লোকে ভুলেই গেল। নির্মম দস্যু হয়ে দাঁড়াল সে। কোশলের লোকের মনে আর শান্তি রইল না। প্রাণভয়ে তারা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। অহিংসকের গলার মালা দেখে লোকে তার নাম দিল অঙ্গুলিমালা। দেশ জুড়ে আতঙ্ক উপস্থিত হোল। কোথা থেকে এক দস্যু এসেছে, সে কোশলের সব লোক মেরে শেষ করছে।

প্রসেনজিৎ ছিলেন এই সময়ে কোশলের রাজা। তিনি ছিলেন প্রবলপরাক্রমশালী নৃপতি। কোশলের অধিবাসীরা দস্যুর অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে রাজধানী শ্রাবস্তীতে গিয়ে রাজার কাছে কেঁদে পড়ল, "মহারাজ এই ব্যাধকে মেরে আমাদের রক্ষা করুন।"

রাজা প্রসেনজিৎ এই সংবাদে চিন্তিত হলেন। খানিকক্ষণ ভাবলেন তিনি। তারপর পাঁচ শ' অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। এই সৈন্য নিয়ে তিনি নিজে যাবেন দস্যুকে বধ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

শ্রাবস্তী নগরীতেই ছিল বৌদ্ধদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান জেতবন মহাবিহার। অঙ্গুলিমালার অত্যাচারে যখন কোশল দেশ জুড়ে ক্রন্দনের রোল উঠেছে, ভগবান বুদ্ধ তখন জেতবনে বাস করছিলেন। তাঁর কানেও এ কাহিনী পৌঁছল। মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন তিনি। সঙ্কল্প করলেন এই দস্যুর মনে প্রীতি ও মৈত্রী জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি অভিযান করবেন। সকলে তাঁকে বারণ করল। হয়তো সে দস্যু বুদ্ধকেও হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু বুদ্ধ তাতে নিরস্ত হলেন না। এমন ভ্রান্ত ব্যক্তির মনের সুপ্ত করুণাকে যদি জাগিয়ে তুলতে না পারেন তবে বৃথাই তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন অঙ্গুলিমালা গ্রামের পথে চলেছে তার গুরুঋণ শোধের চেষ্টায় তখন সে দেখল বুদ্ধ একাকী চলেছেন আপন মনে। দেখে সে বিস্মিত হোল। তাকে দেখে লোকে পালিয়েই যায়। কিন্তু এই গৈরিকধারী শ্রমণ একা তার কাছে আসতে সাহস করলেন কি করে? তাঁর কি প্রাণের মায়াও নেই? বুদ্ধের অনুপম রূপকান্তি দেখে ক্ষণিকের জন্য তার মনটা বিচলিত হোল কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সে কঠিন করে নিল। তার গলার মালাতে আর একটি আঙ্গুল বাড়িয়ে নেবার সুযোগ ছাড়বে কেন সে?

শ্রমণকে হত্যা করার জন্য সে প্রাণপণে ছুটল। কিন্তু অনেকক্ষণ ছুটেও বুদ্ধের মায়াবলে সে তাঁর কাছেও পৌঁছতে পারল না। ক্রোধভরে চিৎকার করে সে বলল, "অঙ্গুলিমালার হাত থেকে কেউ কখনও নিস্তার পায় না। অনর্থক দৌড়ে আর কি হবে? আমি তোমায় বধ করবই।"

আসলে তো বুদ্ধ দৌড়াচ্ছিলেন না। এবারে তিনি এগিয়ে এলেন দস্যুর কাছে। তাঁকে এমন নির্ভয়ে এগিয়ে আসতে দেখে দস্যুর মনে বিস্ময়ের অবধি রইল না। কাছে এসে স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—"কেন তুমি হিংসায় উন্মত্ত হয়ে প্রাণীর হৃদয়ে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করছ? এমনি করে কি কেউ কখনও জীবনে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে? আমায় দেখতো—আমি কখনও বাহুবল প্রয়োগ করে কাউকে দণ্ড দেই না। অহিংসা মৈত্রী ও শুভেচ্ছার বলেই আমি মানব হৃদয়ে চিরকালের স্থান করে নিয়েছি। অস্ত্র ত্যাগ কর—ভালোবাসা দ্বারা তুমিও মানব হৃদয়ে অনন্তকালের স্থান করে নাও।"

বুদ্ধের এই বাণী সহসা দস্যুর মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন নিয়ে এল। অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে সে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ল। বলল, "আমায় স্থান দিন আপনার ভিক্ষু সঙ্ঘে।"

সেদিন থেকে বুদ্ধ দস্যু অঙ্গুলিমালাকে শ্রমণ বেশে নিজের সঙ্গী করে নিলেন।

এদিকে সসৈন্য প্রসেনজিৎ আসছেন। অভিযানের পূর্বে বুদ্ধদেবের চরণবন্দনা করবার জন্য তিনি এলেন জেতবনে। তাঁর সঙ্গে এত সৈন্য দেখে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ কোনও প্রতিবেশী রাজা কি আপনার রাজ্য আক্রমণ করেছেন?"

প্রসেনজিৎ তাঁর রণসজ্জার কারণ জানালেন। তিনি কি তখন জানেন ভিক্ষুবেশে সেই দস্যুই বুদ্ধের কাছে বসে আছেন? বুদ্ধ সে কথা যখন তাঁকে জানালেন তখন প্রথমে তিনি ভীত হয়ে উঠলেন। তাঁকেও বধ করবার জন্য দস্যু ছদ্মবেশ ধারণ করে নি তো? বুদ্ধের কাছে অভয় পেয়ে তাঁর ভয় গেল বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হোল না। সেই পাপিষ্ঠ যে এমন সংযত হবে তা তিনি কি করে জানবেন? পিতামাতার নাম জিজ্ঞাসা করে যখন তিনি জানলেন পিতার নাম গার্গ্য আর মাতার নাম মৈত্রেয়ানী তখন সে সন্দেহও দূর হয়ে গেল। কিন্তু বিস্ময় গেল না। করজোড়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন এ পরিবর্তন কেমন করে হোল।

বুদ্ধের অনিন্দিত সুন্দর মুখে স্নিগ্ধস্মিত হাসি ফুটে উঠল। "মহারাজ ভালোবাসা। ভালোবাসাতে এ জগতে কি না হয়। দণ্ডে কাউকে দমন করা যায় না। শুভেচ্ছা মৈত্রী ও প্রীতি দ্বারাই হৃদয় জয় করতে হয়।"

দস্যু অঙ্গুলিমালার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। কঠোর সাধনায় নিয়োগ করলেন নিজেকে। ভিক্ষা করতে যখন তিনি নগরে প্রবেশ করতেন তখন পূর্বের দস্যুকে চিনতে পেরে অনেকেই তাঁকে নানা প্রকারে অপমান করতে ছাড়ত না। কিন্তু তখন তিনি আত্মসংযম অর্জন করেছেন। ক্ষমাগুণে প্লাবিত হয়েছে তাঁর অন্তর। প্রাণী সেবার কাজে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। এই অপমানে তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার আসত না। গুরুদক্ষিণা শোধ করা তার আর হোল না। কিন্তু পবিত্র হোল তাঁর অন্তর; নির্বাণ লাভ করলেন তিনি।

পনেরই আগষ্টের প্রতিজ্ঞা

প্রায় দু'শো বছর আগেকার একটি দিনের কথা স্মরণ করো।

মুর্শিদাবাদের নিকট পলাশী প্রান্তর। ছিল আম বাগান, পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে। সমবেত হয়েছে একদিকে ইংরেজ সৈন্য আর একদিকে নবাব সৈন্য। অশ্বের হ্রেস্বারবে, অস্ত্রের ঝনৎকারে, সৈন্যদলের চীৎকারে প্রকম্পিত হচ্ছে আম বাগান। যুদ্ধ আরম্ভ হল—দারুণ যুদ্ধ। বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা সিরাজদ্দৌলার দুই সেনাপতি মীরমদন আর মোহনলাল—স্বাধীন ভারতের দুই সু-সন্তান লড়াই করল ইংরেজের সঙ্গে প্রাণপণে। কিন্তু পারল না। হেরে গেল। ডুবে গেল বাংলার গৌরব রবি। অস্তমিত হল ভারতের স্বাধীনতা সূর্য সেদিন।

তারপর···

সেই সূর্য আবার নতুন দীপ্তি নিয়ে উদিত হল ভারতের পূর্বাকাশে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে। গৌরবের দিন সেটা, মহা আনন্দের দিন, স্মরণীয় দিন। সেই স্মরণীয় দিন আবার এসেছে, আমাদের জাতীয় আনন্দের দিন। আশা করি, তোমরা সবাই পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সেদিনকে স্মরণ করেছ, বরণ করেছ, আনন্দ করেছ।

এই জাতীয় আনন্দের দিনটি কিন্তু অমনি অমনি আসে নি। এজন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, বহু লড়াই করতে হয়েছে। প্রাণও বলি দিতে হয়েছে অনেকের। তবেই না আমরা স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি। তাই স্বাধীনতার মূল্য খুব। প্রতিজ্ঞা নিও প্রাণ যায় যাক, তবু স্বাধীনতাকে যেতে দেব না।
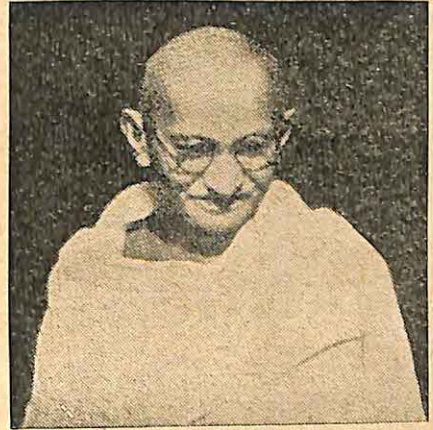
ইংরেজ আমাদের দেশে শাসক হয়ে বসলেও পরম নিশ্চিন্তে শাসন করতে পারে নি। ছোটখাট বহু বাধার, বহু বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। তবে সেগুলো ছিল প্রধানত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় শাসনকর্তাগণ কর্তৃক স্ব স্ব অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

১৮৫৭ সালে হয় ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ—ইংরেজরা যার নাম দিয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু সৈন্যদল সমর্থিত এই গণ বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না। ইহাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। চির-বিদ্রোহের দেশ বাংলায়ই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

তোমরা জান ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সার্থক হয় নি। হওয়া অস্বাভাবিকও কিছু নয়। ইংরেজ যে কেবল অস্ত্র ও সৈন্যবলে গরিষ্ঠ ছিল তা নয়, তারা ছিল সুসংবদ্ধও, যার অভাব ছিল অপর পক্ষের। ফলে তাঁরা হেরে যান। কিন্তু হেরে গেলেও তাঁরা যে প্রতিবাদের স্বাক্ষর রাখেন তার জয় হয়। ইংরেজ তাঁর শাসন-যন্ত্রের সংস্কার করে। বণিক কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসন ভার চলে যায় পার্লামেণ্টের হাতে। স্বেচ্ছাচারের স্থানে নিয়ম-তন্ত্রের কিছুটা প্রবর্তন হয়।

তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা দূর হল ভারতবাসীর মন থেকে। তারা বুঝল ওভাবে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এ চেতনা তাদের ১৮৫৭ সালের পরেই জাগেনি। এই বিপ্লবের পর ভারতবাসী প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুম ভাঙাবার অগ্রদূত হিসাবে স্মরণ করতে পারো রাজা রামমোহন রায়কে। তিনিই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদিগুরু।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় বিশ বছর পরে দেশের জনমত গঠনের সুবিধার জন্য সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি গঠন করলেন, 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। তারপর ১৮৮৫ সালে স্থাপিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেস গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন মিষ্টার হিউম নামক অবসরপ্রাপ্ত জনৈক ভারত-হিতৈষী সিভিলিয়ান। কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন হয় বোম্বাইতে। এতে সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

এখন থেকে বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সুরু হওয়া পর্যন্ত ঐ কংগ্রেস বা অন্য যে সব সমিতি ইত্যাদি গঠিত হয়েছে তাদের আদর্শ ছিল আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু শাসন সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা। পরবর্তীকালের কংগ্রেসের সঙ্গে ওর আদর্শের ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ।

লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত করায় বাঙালীর মনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেটা ১৯০৫ সালের কথা। তারা বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য তুমুল আন্দোলন সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলন —অর্থাৎ সমস্ত কিছু ভারতীয় করার চেষ্টা। সেই সঙ্গে বাংলায় গুপ্ত আন্দোলন দেখা দেয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ সারা ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও এক নূতন চরমপন্থী দল সৃষ্টি হয়। বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি ছিলেন ঐ দলের নেতা। তাঁরা কংগ্রেস থেকে স্বরাজের দাবী পেশ করেন। এই স্বরাজের দাবী গড়াতে গড়াতে এসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে এসে দাঁড়ায়। কংগ্রেস আবেদন নিবেদনের থালা দূরে ছুঁড়ে ফেলে সংগ্রামী জনতার মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেসকে যাঁরা এমনি ভাবে শক্তিশালী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর। তাছাড়া আরও রয়েছেন, যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি।
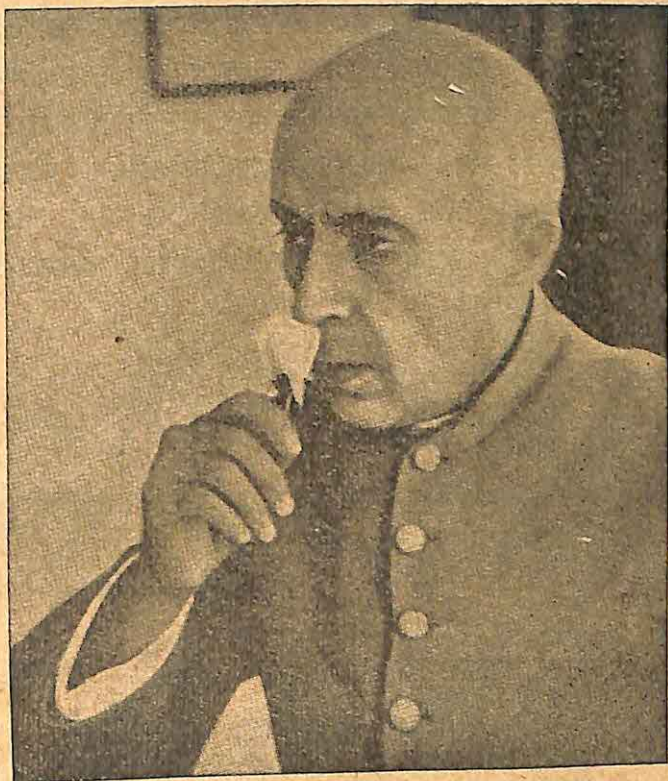
ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে। কংগ্রেস তখন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ডাক দিয়ে সবাইকে ইংরেজ বিতাড়নে প্রাণ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য তার আগেও কংগ্রেস কয়েকবার ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে এবং বহু শাসন সংস্কার করতে ইংরেজকে বাধ্য করেছে।

বিয়াল্লিশের সংগ্রামই শেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম চরম আকার ধারণ করে ভারতের দুঃসাহসী নেতা সুভাষচন্দ্র যখন ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে গঠন করেন ভারতীয় জাতীয় ফৌজ। তিনি রাশিয়ার পথে প্রথম যান জার্মাণীতে তারপর সেখান থেকে জাপানে। সেখানে এসেও তিনি গড়ে তুললেন মুক্তি ফৌজ এবং সেই ফৌজ নিয়ে ঢুকে পড়লেন ভারতের মাটিতে। তাঁর ঐ অসাধারণ কৃতিত্ব, যার তুলনা সচরাচর মেলে না, ভারতবাসীর বুকে অদম্য সাহস জাগল। মরণপণ করে তারা আঘাতের পর আঘাত হানল ইংরেজের শাসনযন্ত্রের উপর। ইংরেজ দেখল তার শাসনযন্ত্রের ভিত্তিমূল নড়ে গেছে। তাই আপোষে তারা ভারত ছেড়ে চলে গেল।

ভারত আবার স্বাধীন হল। ভারতকে বড় করবার, সমৃদ্ধিশালী করবার, জগৎসভায় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার গুরু দায়িত্ব পড়ল আমাদের চাচা নেহরুর উপর। তিনি সে দায়িত্ব পালন করছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। কিন্তু মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা রক্ষা করা, ভারতকে বড় করা এবং তাকে সমৃদ্ধিশালী করার দায়িত্ব কেবল নেহরুজীরই নয়—তা আমাদের সবার। আমরা সবাই যার যার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করলে তাঁর হাত শক্তিশালী হবে, 'ভারত আবার বিশ্ব-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

পনেরই আগষ্ট

শ্রীমিলনেন্দু বিশ্বাস

আগষ্ট মাসের পনর তারিখে,
নয়টি বছর আগে
ভারত ভাগ্য ভাতিয়া উঠিল
নবীন সূর্যরাগে।

শাসনদণ্ড হইল পতিত
ইংরাজ হ'ল সুপ্ত
পাশবন্ধন ছিন্ন হইয়া
ভারত হইল মুক্ত।

উড়িছে ত্রিবর্ণ প্রতীক আজিকে
তাদের আত্মদানে
মুক্তিসভায় যারা দিল স্থান
ভারতে সসম্মানে।

পনেরই-আগষ্ট পুণ্যদিনে
প্রণমি ভক্তিভরে
অমর ভারত-শহীদে স্মরি
আর ঐ পতাকারে।

স্বাধীনতার
স্বপ্ন
স্বাধীনতা
আন্দোলন
মায়ের
অপমান
১৯০৬
১৯০৮
'আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা — মানুষ আমরা ····
১৯২০
"বোমা পিস্তলে হবেনা, অসহযোগ কর, সত্যাগ্রহ কর !"

বৃটীশের
লবণ আইন ভঙ্গ কর !
১৯৩১
"ভারত ছাড়
হে ইংরেজ!"
৮ আগস্ট
১৯৪২
"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"
৯ আগস্ট
১৯৪২
"এ নহে কাহিনী
এ নহে স্বপন—"
লালকেল্লা
দিল্লী
১৫ আগস্ট
১৯৪৭

—বিশ্বদূত—
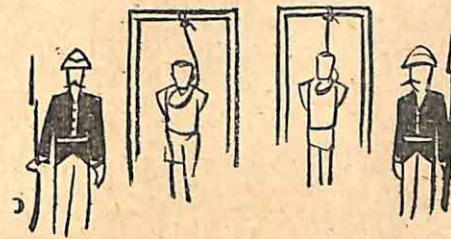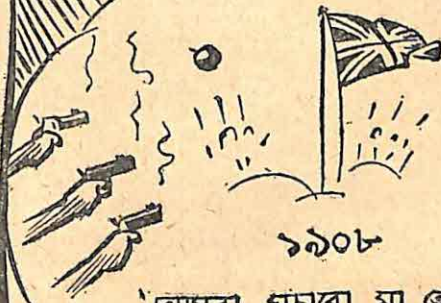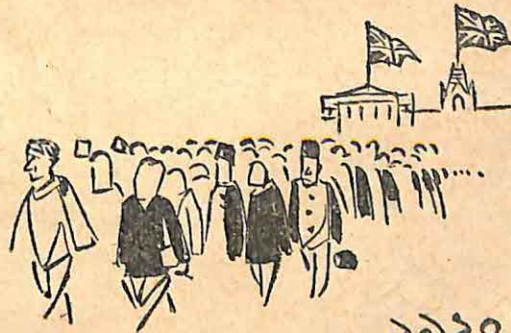
বানর কি চতুষ্পদ প্রাণী ?—কিছুদিন আগে কলকাতা করপোরেশন বানর চতুষ্পদ কি দ্বিপদ প্রাণী এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বানর-বিক্রেতা এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিতে গিয়ে। কিন্তু তারা শেষ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারের কোন সমাধান না করতে পেরে এক জীব-বিজ্ঞানীর পরামর্শ প্রার্থনা করেন। তিনি করপোরেশনকে জানিয়েছেন যে, চিড়িয়াখানায় বানরগুলোকে চতুষ্পদ শ্রেণীর প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বাঁকুড়ায় স্বগৃহে ২৯শে জুলাই রবিবার রাত্রিতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ৯৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। জীবনব্যাপী তিনি নিরলস ভাবে জ্ঞানের সাধনা করে গিয়েছেন ফলে আমাদের বাংলা সাহিত্যই শুধু সমৃদ্ধ হয় নি সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। তিনি জ্যোতিষ, গণিত, ভাষা-বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। এ সব সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করে গিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি কটক কলেজে অধ্যাপকের কাজ করতেন। ১৯১৯ সালে সেই চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে বিবিধ বিদ্যার অনুশীলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। উৎকলের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন বহু আগে। মৃত্যুর অল্পদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাঁকুড়ার গৃহে বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসবের অনুষ্ঠান করে তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের স্থান শূন্য হয়ে পড়লো।

ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা—বিগত ২১শে জুলাই কচ্ছ রাজ্যের আঞ্জার শহর ও তার কাছাকাছি অনেক জায়গায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ঐ রাত্রির ভূমিকম্পে ১১৭ জন লোক মারা গেছে ও ২৫০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ৮০০ লোক বাড়ী চাপা পড়ে ধ্বংস স্তূপের নীচে চলে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরে জানা গেছে যে, আঞ্জার তালুকের পাঁচটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আটটি গ্রামের সম্পূর্ণ বাড়ী ভূমিসাৎ হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা।

ডাকঘরের ব্যবস্থায় উন্নতি—সম্প্রতি ডাকবিভাগ কতকগুলো এমন গঠনমূলক প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিয়েছেন যা সত্যি সত্যি প্রশংসার যোগ্য। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বহু ডাকঘর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর খোলা হয়েছে। ফলে, যে সব জায়গায় সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা মাত্রই ছিলো না সেখানে তা হয়েছে। যোগাযোগ রক্ষার এই ব্যবস্থা শুধু তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নেই সাহায্য করবে না, নানা বিষয়ে জ্ঞান-লাভ, দুনিয়ার নানা খবর পাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারেও তাদের

সাহায্য করবে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের জেনারেল পোষ্টাফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কেরই মত চেক দিয়ে টাকা তোলার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে। কলকাতায় সম্প্রতি ভ্রাম্যমান ডাকঘর খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। ভ্রাম্যমান পোষ্টঅফিস মোটর যানে ঘুরে ঘুরে কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ডাকবিভাগের মোটামুটি কতকগুলো কাজ করবার জন্য দাঁড়াবে। সম্প্রতি কলকাতার ডাকঘরে যে ভীড় দেখা যাচ্ছে এর ফলে তাও অনেকটা কমবে এবং জনসাধারণের পক্ষে পোষ্টাফিসের সুযোগ গ্রহণ করবার সুবিধাও অনেক বাড়বে।

লোকমান্য তিলক জন্ম শতবার্ষিকী—বিগত ২৩শে জুলাই লোকমান্য তিলকের জন্ম শতবার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতের সর্ব্বত্র। ভারতবর্ষের নেতাদের মধ্যে তিলকই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে চেয়েছিলেন বৃটিশের সংস্রবহীন পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই আদর্শকে অনুসরণ করেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। সম্পূর্ণরূপে ভারতকে স্বাধীন করতে হলে গণ আন্দোলনের প্রয়োজন একথাও তিলকই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি চাষী, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর লোকের মধ্যে জাগরণের জন্য আন্দোলন সুরু করেছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। দেশের মানুষ সম্পর্কেও অসাধারণ জ্ঞান তাঁর ছিলো। তাঁর আদর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের মানুষকে উজ্জ্বল আলোকের মত চিরদিন পথ দেখিয়ে চলুক এই আমরা কামনা করি।

পরলোকে দানবীর হরেন্দ্রকুমার—গত ২২ শে শ্রাবণ বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় হঠাৎ কলকাতার রাজভবনে পরলোকগমন করেছেন। হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বাংলার রাজ্যপালরূপে পরিচিত ছিলেন। সে পরিচয়ই তাঁর বড় পরিচয় নয়। কৃতী শিক্ষক ছিলেন তিনি—পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি এসবও তাঁর বড় পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন দানবীর। তাঁর দান শুধু অর্থের পরিমাণ দিয়েই বিচার করা চলে না। কারণ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার এক দরিদ্র খৃষ্টান পরিবারে। তাঁর বাবা দশ টাকা মাইনের থেকে কর্ম্মজীবন সুরু করেছিলেন। আর হরেন্দ্রকুমারও জীবনের অধিকাংশ সময়ই গরীব শিক্ষাব্রতীরূপে কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে কাটিয়ে গেছেন। নিজে দুঃখ বরণ করে তিনি অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য তিলে তিলে অর্থ সঞ্চয় করে একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই পনেরো লক্ষ টাকা দান করে গেছেন। তিনি রাজ্যপালরূপে যে বেতন পেতেন তা থেকে মাত্র পাঁচ শত টাকা নিজে রেখে বাকী টাকা দান করতেন। তাঁর জীবন নিঃস্বার্থ সেবা ও মানবিকতার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হরেন্দ্রকুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী বলেন—"ডাঃ মুখার্জ্জী একজন শ্রেষ্ঠ জনসেবক, মহান্ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ খৃষ্টানের উজ্জ্বল প্রতিভূ।" আমরা এই দানবীরের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

—অষ্টাবক্র—

কলকাতার মাঠে ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। লীগের কতকগুলি খেলা বাকী থাকলেও এর আসল আগ্রহের অংশটা শেষ হয়ে গিয়েছে বলা চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুই বিভাগেরই চ্যাম্পিয়ান নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় মোহনবাগান দল এবারও চ্যাম্পিয়ান হয়ে পরপর তিন বছর লীগজয়ীর গৌরব অর্জ্জন করেছে। কলকাতায় একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর কোন দলের পক্ষে পরপর তিনবার লীগজয়ী হবার সৌভাগ্য হয় নি। এদিক থেকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রেকর্ড অতিক্রম করা এখনও দুরূহ ব্যাপার। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পরপর পাঁচবার লীগজয় করে তারা যে রেকর্ড করে রেখেছে তা ভাঙা এখনও কল্পনার বস্তু। তবে খেলার জগতে কোন রেকর্ডই চিরস্থায়ী নয়। আজ যে রেকর্ড অনতিক্রম্য বলে মনে হয় দেখা গেল পরের দিনই সেই রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। তাই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এই রেকর্ডও যে কলকাতার জনপ্রিয় টিমগুলির মধ্যে কেউ ভাঙতে পারবে না তা কে বলতে পারে?

মোহনবাগান দল এবছর লীগ প্রতিযোগিতার সুরু থেকেই ভাল খেলে দলের প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে। সমগ্র প্রতিযোগিতার ২৬টি খেলায় তারা ৪৩ পয়েণ্ট অর্জ্জন করেছে। ২৬টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান জয়লাভ করেচে ১৯টিতে, ড্র করেছে পাঁচটি এবং পরাজিত হয়েছে দু'টি খেলাতে। বহু গৌরবের অধিকারী মোহনবাগান উপরি উপরি তিনবার লীগজয় করে নবীন গৌরবে ভূষিত হয়ে তার অতীত ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র। এই নিয়ে মোহনবাগানের মোট সাতবার লীগ জয় হল। এখানেও তারা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে একধাপ পিছিয়ে আছে। মহমেডান স্পোর্টিং এ পর্য্যন্ত মোট আটবার লীগ জয় করেছে।

লীগ প্রতিযোগিতায় এবার ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং শেষ পর্য্যন্ত জোর পাল্লা দেয়। মহমেডান স্পোর্টিং ২৬টি খেলায় মোট ৩৮ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান দলের পাঁচ পয়েণ্ট পেছনে থেকে মরসুম শেষ করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ২৪টি খেলাতে পেয়েছে ৩৬ পয়েণ্ট। তাদের এখনও দুটো খেলা বাকী এবং এ দুটোতে জয়ী হলে তারা রাণার্স আপ হতে পারবে।

এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে হাওড়া ইউনিয়ান অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছে বছর প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। হাওড়া ইউনিয়ানের প্রথম ডিভিসনে প্রত্যাবর্ত্তনে ক্রীড়ামোদীরা খুসীই হবেন। এ টিমটি এককালে প্রথম বিভাগে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

এবার প্রথম ডিভিসন থেকে কালিঘাট দল এবং দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে কাষ্টম্‌স্ দল যথাক্রমে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনে নেমে যাচ্ছে। এ দুইটি টিমই কলকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালীঘাট দল একাদিক্রমে ২২ বছর প্রথম ডিভিসনে খেলার পর এবার দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যেতে বাধ্য হল। ওদিকে কাষ্টম্‌স্ দলকেও দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে তৃতীয় ডিভিসনে নেমে যেতে হল। হকিতে কাষ্টম্‌স্ কলকাতার সেরা দলগুলির অন্যতম। ফুটবলেও একদা এদলের খ্যাতি ছিল হকির মতই। আই-এফ-এ শীল্ড এবং লীগ প্রতিযোগিতায় বহু দুর্দ্ধর্ষ দলকে এই কাষ্টমসের নিকট পরাজিত হতে হয়েছে। বহু নামকরা খেলোয়াড়ও এই দল থেকে একদা কলকাতার প্রতিনিধিমূলক খেলায় স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতা উৎসবের সার্থকতা কি ?—সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। নাম, পুরো ঠিকানা, বয়স, গ্রাহক নম্বর প্রত্যেক প্রবন্ধের সঙ্গে থাকা চাই। ১ম পুরস্কার পাঁচ টাকা আর ২য় পুরস্কার তিন টাকা মূল্যের বই। কেবল মাত্র আশুতোষ লাইব্রেরী প্রকাশিত বই থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগিদের থাকবে। ২৫শে কার্ত্তিকের মধ্যে লেখা পৌঁছা চাই। ফল অগ্রহায়ণ মাসে বেরুবে।

আষাঢ় মাসের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

আষাঢ় মাসের **"ভ্রমণ কাহিনী"** প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে শ্রীরমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাঃ নঃ ১৪৭৫২) আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে শুক্লা গোস্বামী (গ্রাঃ নঃ ১০৫৭৭)। এরা অবিলম্বে শিশুসাথী কার্য্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এবার স্থানাভাবের জন্য আমাদের নিয়মিত বিভাগের কিছু কিছু লেখা বাদ দিতে হয়েছে। নতুন ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তরদাতাদের নামও এ মাসে ছাপা হলো না। আগামী মাস থেকে আবার সব নিয়মিত চলবে।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরণ ধর**
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিশুসাথী
সম্পাদক
শ্রীহরিশরণ ধর

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৩৫শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

শিশু সাথী

আশ্বিন
১৩৬৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

সূচী

সূচী

সূচী

শিল্পী—সমরনাথ ভৌমিক বুদ্ধ ও সুজাতা

৩৫শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

টিয়ে পাখী মাঠে বাতাসের আনাগোনা।
ঝিঙে গাছে ফিঙে দেয় দোল দোল দোলা।
নরম রোদে যে ছড়ানো গলানো সোনা।
চাঁদের আলোয় যেন চাঁদিরূপা গোলা।

খুশী খুশী মন, হাসি হাসি মুখ কারা।
তুলে কাশ ফুল দারকেশ্বর চরে।
শিউলি ঝরিছে যেন রে খইয়ের ধারা।
ঝরা শিউলিতে কাহারা আঁচল ভরে।

ঝিনি গুড় গুড় কমল ফুটিয়া উঠে।
বন হতে উড়ে উড়ে মৌমাছি আসে।
কানন সভাতে ছাতার শালিখ জুটে।
টুনটুনি নাচে, ফড়িং লাফায় ঘাসে।

এক, তুই, তিন চিল উড়ে যায় নভে।
এই আশ্বিনে শারদা আসিবে কবে?

'মা'র দীঘি

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

"মা, তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না। শুনলুম, তুমি আজও নাকি গোলাবাড়ি হ'তে আধমন ধান বের ক'রে দিয়েছ। এবছর চারদিকে অনাবৃষ্টির হাহাকার। এরপর ধান চাষ না হলে আমরাই বা খাব কি? আমাদের যারা পোষ্য তাদেরই বা খাওয়াব কি? তুমি ভবিষ্যতের কথা একটুও ভাবনা?"

"না, রাজমোহন সত্যি আমি ভাবিনে। তোর বাবা বলতেন, কে কাকে খাওয়ায়? তাঁর ইচ্ছা আমরা পালন করে যেতে পারি মাত্র। বৈষ্ণবের বংশ আমরা—জীব সেবাই যদি আমাদের ব্রত হয়রে, তবে, তবে, তুই আমায় একথা বুঝিয়ে বল্ চারদিকে ওরা সব না খেয়ে থাকবে, এর মধ্যে আমার মুখে অন্ন ওঠে কি করে?"

"না, মা, আর তোমার কাছে চাবি রাখব না। গোলাবাড়ির চাবি আমার কাছেই থাকবে এখন থেকে। ওরা তোমায় পেয়ে বসেছে।"

চব্বিশ পরগণা জেলার ক্ষুদ্র একটি গ্রাম স্বরূপবাড়ি। সেখানের একজন সম্পন্ন বৈষ্ণব গৃহস্থ রাজমোহন।

সেবার চারদিকে অনাবৃষ্টি—চাষীরা লাঙ্গল তুলিয়া 'হা' করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু আকাশে বিন্দুমাত্রও মেঘের লক্ষণ দেখা যায় না। চারদিকে হাহাকার। সম্বৎসরের সম্বল চাষীরা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। বৈশাখ মাস হইতে ধার করিয়া ধান সংগ্রহ করিয়া কোনও প্রকারে সংসারের ভরণপোষণ করে—কার্ত্তিক মাস বা অগ্রহায়ণ মাসে আউস ও আমন ধানের খন্দ আসিলে ধার বকেয়া সব শোধ করিয়া দেয়। এই ভাবেই বাংলার চাষীর দিন চলে—জীবন কাটে বৎসরের পর বৎসর। যাহারা ধার দেয় তাহারা এই প্রত্যাশায় ধার দেয় যে পরে ফিরিয়া পাইবে অন্ততঃ দেড়গুণ। কিন্তু এইবার সমূহ ফসলের আশা নাই দেখিয়া সম্পন্ন গৃহস্থেরা সকলেই সাবধান হইয়া গিয়াছে। রাজমোহনও সাবধান হইয়া তাহার 'মা'কে তাই সাবধান হইতে বলিতেছে।

রাজমোহনের পিতা ছিলেন সামান্য গৃহস্থ—তিনি নিজের চেষ্টায় সামান্য পাঁচ বিঘা জমি হইতে আশী বিঘা জমির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"কৃষ্ণের জীব—যে খাওয়াবে কৃষ্ণই তাহাকে দিবেন।" তিনি পুত্র রাজমোহনকে বারংবার মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ করেন যেন রাজমোহন কোনও দিন দেশের বাড়ী এবং জায়গা জমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া না যায়। রাজমোহন কিছু কিছু ইংরাজিও পড়িয়াছিল এবং হয়তো বাবার মত এতটা ভগবদ্বিশ্বাসী ছিল না। চারিদিকের অভাব অনটন তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। মা যে গোপনে গোপনে বহু লোককে সাহায্য করেন ইহা জানিতে পারিয়া সে মাকে প্রথম সাবধান করে। তাহাতেও যখন হইল না, তখন সে মার নিকট হইতে জোর করিয়া গোলাঘরের চাবি কাড়িয়া লইল।

—দুই—

গভীর রাত্রি।

রাজমোহন তাহার নিজের ঘরে নিদ্রিত। ঘরের দরজায় কেহ যেন আঘাত করিতেছে। রাজমোহনের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

"কে?"

"রাজু, আমি তোর মা!"

"মা, তুমি এত রাত্রে! ঘুমোও নি? কেন হঠাৎ উঠে এলে? তোমার শরীর অসুস্থ?"

"না, বাবা, তা তো নয়! একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুম আসচেনা।"

"কেন, মা কি হয়েছে? কি স্বপ্ন দেখেছ মা?"

"স্বপ্ন শুনে কি তোর বিশ্বাস হবে বাবা? স্বপ্ন দেখেছি তোর বাবা যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যেন তৃষ্ণা পেয়েছে বলে আমার কাছে জল চাইছেন। আমি তাকে কত ঘটি ঘটি জল দিচ্ছি—তাঁর সে বড় ঘটিটায় করে, কিছুতেই তাঁর তেষ্টা মিটছে না। তিনি আমায় ঠিক আগের মতই যেন ডেকে বলছেন, রাজুর মা! এতে কি জলের তেষ্টা মেটে? পুকুরের জল ছাড়া এ তেষ্টা মিটবে না। ঐ যে বড় সড়কের কাছে দু' বিঘে ভূঁই আমি রেখেছিলাম পুকুর কাটাব বলে—পুকুর তো কাটা হয়নি। যদি সে পুকুর কেটে দিতে পার, তবেই আমার জল তেষ্টা মিটবে!"

"কি বলছ মা! সত্যি আমার বাবা এসেছিলেন? বাবা।"
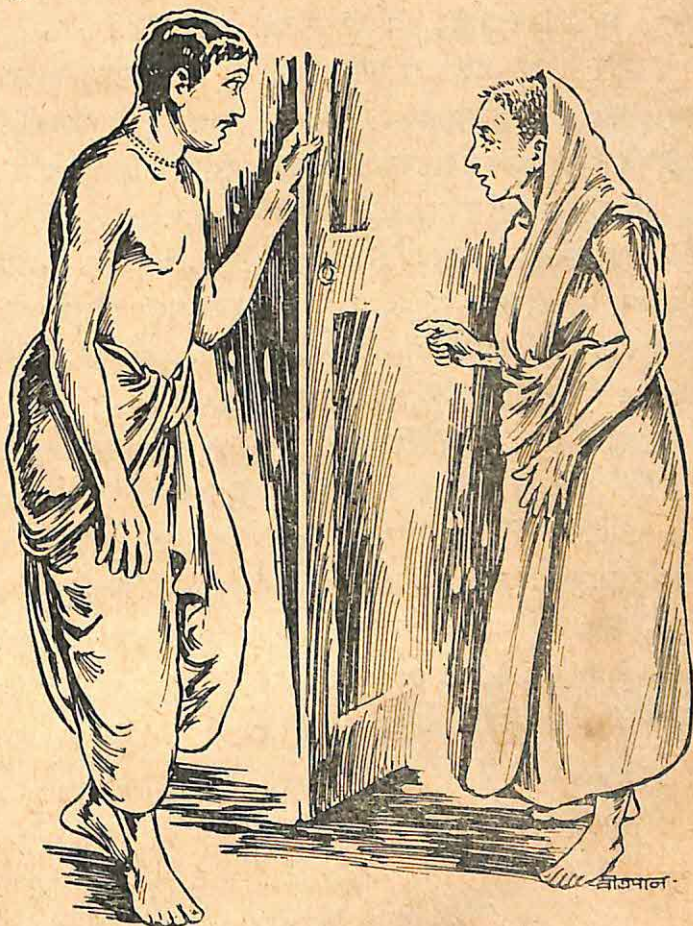
তুমি যদি এখন স্বরূপবাড়ি যাও—বাসের পথের ধারেই দেখিতে পাইবে 'মা'র দীঘি'।

সেখানে গেলে পুকুরের এক কোণে পাশাপাশি দুইটি ক্ষুদ্র বেদী লক্ষ্য করিতে ভুলিও না।

ওখানে মার পাশেই ছেলে ঘুমাইয়া আছে। দুই দিক হইতে দুইটি স্বর্ণচম্পক বৃক্ষ আসিয়া বেদীর উপর ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

মাঝে মাঝে বাতাসে দুইটি গাছের মাথা একত্র হয়। গ্রামের লোকেরা বলে—মা ছেলেকে আদর করে।

ওরা মাঝে মাঝে গিয়া বেদীর উপর চাঁপা ফুলের মালা গাঁথিয়া দেয়।

তুমি যদি ইচ্ছা কর—তুমিও দিতে পার।

কিন্তু সাবধানে যাইও—ওদের বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না।

মা যখন ছেলেকে আদর করিবেন—তখন একটু দূরেই থাকিও।

একটি ডাক টিকিটের কাহিনী

অমিতাভ রায়

তোমরা অনেকেই দেশবিদেশের ডাক টিকিট জমা কর। আচ্ছা, কখনও কী একথা মনে জাগে যে, এত সব যে নতুন নতুন টিকিট নানা দেশে বেরোয় তাদের সঙ্গে কোনও বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে? অপর পাতায় অস্ট্রেলিয়ার ডাক টিকিটটি দেখছো, কখনও কী জানবার ইচ্ছে হয়েছে যে, কেন এই টিকিট বের করা হয়েছে? এর পেছনে ইতিহাসের কী কাহিনী জড়ান আছে? এই টিকিটের পিছনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা যে কাহিনী জড়িয়ে আছে তা তোমাদের বল্‌ছি।

প্রায় সওয়াশো বছর আগে ইংলণ্ডে এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ীতে একটী ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এর পুতুল খেলার ধরন—আর সব সমবয়সী মেয়েদের থেকে তা একেবারে আলাদা রকম। পুতুলরা কেউ অসুখে পড়েছে আবার কেউ কেউ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাত পা ভেঙ্গে পড়ে আছে। মেয়েটি আপন মনে তাদের সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত, আপন মনে সে বকে চলেছে, তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'ভয় কী, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তোমার বুঝি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? এসো ওষুধ দিয়ে দিই।' এমনি আরও কত কি বকে চলেছে।

মাঝে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। মেয়েটী এখন বেশ বড়সড় হয়েছে, কিন্তু ছোট বেলায় রোগীদের সেবাযত্ন করবার যে বাসনা অন্তরে ছিলো তা এখনও মেটেনি। তার সমবয়সী মেয়েরা হেসেখেলে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটী গ্রামের ঘরে ঘরে রোগীদের সেবা করে সময় কাটাচ্ছে। খালি এই চেষ্টা তার কিসে তারা ভাল থাকে, কী করলে তারা শীঘ্র নীরোগ হয়।

এমনি করে আরো কয়েক বৎসর কেটে গেল। মেয়েটী এখন এক সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হয়েছে। তার বাবা মা ভাই রাজপরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাকে নিয়ে লণ্ডন গেলেন। কিন্তু লণ্ডনে অভিজাত সমাজের আমোদপ্রমোদে নিজেকে না ডুবিয়ে দিয়ে মেয়েটী লণ্ডনের হাসপাতালগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, শিখবার চেষ্টা করতে লাগলো কেমন করে রোগীদের ভাল করে সেবা-শুশ্রূষা করা যায়। তবে তখনকার দিনে ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলি এ ব্যাপারে বড্ড পেছিয়ে ছিলো। মোটেই সুব্যবস্থা ছিল না। তাই ভাল করে রোগীদের সেবা পরিচর্য্যা পদ্ধতি শিখবার জন্য মেয়েটী প্রথমে জার্মানী ও পরে প্যারিসে যায়।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বদেশের হাসপাতালগুলির সংস্কার করবার জন্য মেয়েটী উঠে পড়ে লেগে গেল। ইতিমধ্যে সুদূর ক্রিমিয়াতে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলো। তখনকার দিনে যারা যুদ্ধে যেতো তাদের বীরত্বের কথা নিয়েই সবাই মেতে থাকতো, কখনও ভেবে দেখতো না তাদের কথা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। আস্তে আস্তে ইংলণ্ডবাসীদের কানে আসতে লাগলো যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দুর্দ্দশার কাহিনী। তারা যুদ্ধক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। আহতদের নোংরা, রক্তাক্ত খাতের ভিতরেই ফেলে রাখা হচ্ছে, তারি মধ্যে অপারেশন।

এই সব কাহিনী এই তরুণীর কানেও গেলো। তার অন্তর কেঁদে উঠলো "কিছু করা চাই এই হতভাগ্য সৈনিকদের জন্য, দেশের এই বীর সন্তানদের জন্য।"

একদা পুতুলের সেবা-শুশ্রূষায় যে মেয়েটীর হৃদয়ে সেবাধর্ম্মের বীজ বোনা হয়েছিলো এবং যার সর্ব্বপ্রথম রোগী ছিলো একটি কুকুর—সেই মেয়েটী ইংলণ্ড থেকে বহুদূরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা করবার জন্য ছুটে গেলো। প্রায় চল্লিশজন নার্স নিয়ে এক দল গঠন করে মেয়েটী যুদ্ধের দপ্তরের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবা পরিচর্য্যা করবার অনুমতি চাইলো। তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হোল।

সেই মেয়েটী এবং তার সঙ্গিনী সেবাব্রতী মহিলারা যুদ্ধে আহত সৈনিকদের ক্যাম্পে অল্প সময়ের ভিতরেই নতুন প্রাণ এনে দিলো, আহত সৈনিকদের মধ্যে নতুন প্রেরণা যোগালো হাসতে হাসতে যন্ত্রণা সহ্য করবার। এই অল্প কিছু সেবাব্রতী নারী মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো যাতে তাদের দেশের বীর সন্তানদের কষ্ট কম হয়। যাতে তাদের মনে স্ফূর্ত্তি আসে। আহতদের মনোরঞ্জনের জন্য এরা গল্প পড়ে শোনাতো, আপন জনের মত তাদের সেবা করতো, এদের কোমল হাতের স্পর্শে তাদের অর্দ্ধেক জ্বালা যন্ত্রণা কমে যেত।

সেই মেয়েটী সব সময় রোগীদের মধ্যে থাকতো। তখনকার দিনে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হত না, কারো অস্ত্রোপচার হলে সেই মেয়েটী অস্ত্রোপচারের সময় তার পাশে থাকতো, তাকে বুঝিয়ে তার শরীরে হাত বুলিয়ে আপন জনের মত তার যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা কোরতো। এমন কী

রাত্রেও সে বিশ্রাম খুব কম কোরতো। রাত্রে হাতে বাতি নিয়ে নিঃশব্দে ঘুমন্ত আহত সৈনিকদের শ্রেণীবদ্ধ খাটের সারির মধ্য দিয়ে দেখে বেড়াতো, কেউ তো জেগে নেই, কেউ তো কষ্ট পাচ্ছে না। জাগ্রত রোগীরা যখন অন্ধকারে সেই বাতির আলো দেখতে পেতো তখন খুশীতে তাদের মন ভরে উঠতো, মনে হোত তাদের মাঝে স্বর্গের কোনও দেবী নেমে এসেছেন। তারা তাই আদর করে তার নাম দিয়েছিল 'The Lady With the Lamp ;

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই মেয়েটীরই ছবি ডাক টিকিটে ছাপা আছে। ইনি কে জানো—কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। এঁর যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে সেখানে প্রতি শত আহত সৈনিকদের ভিতরে বিয়াল্লিশ জন মারা যেত আর এঁর যাবার পর প্রতি শত আহতদের ভিতরে মাত্র দুই জন মারা যেত। ভেবে দেখো, কত মহান্ কাজ ইনি করেছিলেন, দেশের কত বড় উপকার করেছেন। সেইজন্য এই টিকিটটী ১৮৫৫ সালে এঁর ক্রিমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মহান্ সেবা কার্য্যের স্মরণে ছাপা হয়েছে।

স্বদেশে ফিরবার সময় লণ্ডনে তাঁর জন্য বিরাট সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করার কথা হচ্ছিল। ওঁর সম্মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেওয়া ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু তিনি নাম, যশ কিছুই চান নি। সেইজন্য গোপনে ইংলণ্ডে ফিরে সোজা নিজের বাবার বাড়ীতে চলে যান।

তাঁর সম্মানে যে টাকা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয় তিনি তা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সেই টাকায় সেবাব্রতী মহিলাদের ভালভাবে শিক্ষার জন্য এক সঙ্ঘ স্থাপন করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের ক্যাম্প হাসপাতালে নিদারুণ পরিশ্রমে Florence Nightingaleএর শরীর ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন রোগীদের সেবাযত্ন, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপ্রাণ খেটেছেন। সাতাশী বছর বয়সে ১৯১০ সালে এই মহীয়সী মহিলা দেহত্যাগ করেন।

যতদিন লোকে পৃথিবীর মহীয়সী নারীদের জীবনকথা পড়বে, ততদিন কেউই কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে ভুলবে না।

চার মূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"মোক্ষম লাড্ডু"

কাঠের লরীর সে কি দৌড়। একে তো হৈ হৈ করে ছুটছে, তার ভেতরে কাঠগুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে সুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিটকে পড়ে যাবে।

জাম-ঝাঁকানো দেখেছ কখনো? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকর-ঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আঁঠি কাঁঠিগুলো সব আলাদা হয়ে যায়? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকবনা—একেবারে বৃন্দাবনের কচ্ছপ হয়ে যাব! মানে, সব মিলিয়ে এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব!

এর মধ্যে ঝড়াৎ-ঝড়াৎ! নাকের উপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে! একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ—গেলুম! এই হতভাগা ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়ে আজ মাঠে মারা যাব।

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে : মাঠে নয়—রাস্তায়। রায়গড়ের রাস্তায়।

—রাস্তায়! টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার রায়গড় পৌঁছে যাই আগে। তারপর—তারপর বললে, কোঁৎ!

মানে, ক্যাব্‌লাকে কোঁৎ করে গিলে খাব তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকানি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে লাগল : ইস্ কর্ম তো সারছে! প্যাটের মধ্যে গজাদা'র রসগোল্লাগুলা যে ছানা হইয়া গেল।

আমি বললাম, শুধু ছানা? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা আবার সুরু করল : দুধ? দুধেও কুলোবেনা। একটু পরে পেট ফুঁড়ে শিং টিং শুদ্ধু একটা গোরু-ও বেরিয়ে আসবে—দেখে নিস্!

হাবুল আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বললে, হঃ—সত্য কইছ! প্যাট ফুইড়্যা গোরুই বাইর হইবো অখনে।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে : 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ—'

টেনিদা রেগেমেগে কী একটা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি! টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোঁৎ!

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরী রায়গড়ের বাজারে এসে পৌঁছুল।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে—আমরা চারজনে কোনোমতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি। হঠাৎ :

—আরে ভগ্‌লু, দেখো ভাইয়া। লরীকা উপর চার লেড়কা বান্দরকা মাফিক বৈঠল্ বা!

তিনটে কালো কালো ছোকরা। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললাম, তুম্‌লোগ্ বান্দর হো। তুম্‌লোগ্ বুদ্ধু হো।

শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা ঢিল চালিয়ে দিলে—একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরীর ড্রাইভার চেঁচিয়ে বললে, মারকে টিক্কি উখাড় দেব।

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না। তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লরীটা আর একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে, টেনিদা-কুইক। ওই যে, নীল মোটর!

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর! সেই ষণ্ডা

যোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা! এর চাইতে লরীর ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত—অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত!

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয়। টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত।

—শোন্ প্যালা। তুই আর হাবুলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক্। বসে বসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর। আমরা ততক্ষণ একটা কাজ সেরে আসি।

লরীটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতাম—তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তাম। কিন্তু একি গেরোরে বাপু! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে কঁ্যাক্ করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক!

আমি নাক-টাক চুল্‌কে বললাম, আমিও তোমাদের সঙ্গেই যাই না? হাবুল এখানে একাই বেশ সব ম্যানেজ করতে পারবে।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিস্‌নি। যা বললাম তাই কর—বসে থাক এখানে। গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ্য রাখবি। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। এসো টেনিদা—

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক্ করে যেন কোন্‌দিকে চলে গেল।

অমি বললাম, হাবুলা?

—উঁ?

—একি বিচ্ছিরি ফ্যাচাং বল্ দিকি?

হাবলা তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে, হঃ—সত্য কইছ?

—এভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনো মানে হয়?

হাবুল আর একটা হাই তুলে বললে, নাঃ! তার চাইতে ঘুমান ভালো। আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর‍্যা দিছস্—তার উপর লরীর ঝাকানি! ইস্—শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করতে আছে!

এই বলেই, হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজল। বললে বিশ্বাস করবেনা—আরো একটু পরেই 'করর, ফোঁ-ফোঁ' করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল।

কাণ্ডটা ছাখো একবার!

আমি ডাকলাম, হাবুলা—হাবুলা—

নাকের ডাক থামিয়ে হাবুল বললে, হুঁ!

—এই দিনে ছুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস্ কী বলে?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচেল্লি করবি না প্যালা—কইয়া দিলাম। শান্তিতে

একটু ঘুমাইতে দে। সঙ্গে সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর নাকের ভেতর থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে!

কী ছোটলোক—কী ভীষণ ছোটলোক! এখন আমি বসে ঠায় পাহারা দিই। কী যে রাগ হল বলবার নয়। ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাং করে একটা চিম্‌টি দিই। কিন্তু তক্ষুণি দেখলাম—তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে। ওদের গোটা কয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

একটা শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

—আরে খোকা—তুমি এহিখানে?

তাকিয়ে দেখি: শেঠ ঢুণ্ডুরাম!

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দু' ডজন সিঙ্গিমাছ এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলাম, শুধু বললাম, আ—আ—আ—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন: রায়গড়ে বেড়াইতে এসেছো? তা বেশ বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো? লেকিন্ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ ক্ষিদে পেয়েছে।

ক্ষিদে! বলে কি! সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোঁকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে আকাশ খাই, পাতাল খাই! কিন্তু সে-কথা কি আর বলা যায় শেঠ ঢুণ্ডুরামকে?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে ক্ষিদে পেয়েছে—তাতে লজ্জা কী? আইসো হামার সঙ্গে। ওই দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড্ডু মিলে—গর্‌মাগরম সিঙারাও ভি আছে। খাবে? হামি খিলাবো—তোমাকে পয়সা দিতে হোবেনা।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ-ভালুকে কায়দা করতে পারে না—টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না। কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত!

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম, লেকিন্ শেঠজী—গজেশ্বর—

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর? কৌন্ গজেশ্বর?

আমি বললাম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান—হাতীর মতো চেহারা—আপনার গাড়িতে এসেছে—

ঢুণ্ডুরাম বললে, রাম—রাম—সীতারাম! হামি কোনো গজেশ্বরকে জানে না। হামার গাড়িতে হামি ছাড়া কেউ আসেনি।

—তবে যে স্বামী ঘুট্‌ঘুটানন্দের দাড়ি—

—ঘুট্‌ঘুটানন্দ?—ঢুণ্ডুরাম ভেবে চিন্তে বললেন, হাঁ—হাঁ—একঠো বুঢ্‌ঢা রাস্তায় হামার গাড়িতে

উঠেছিল বটে। হামাকে বললে, শেঠজী—রায়গড় বাজারে হামি নামবে। আমি তাকে নামাইয়ে দিলাম। সে ইষ্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আইসো খোকা—আইসো। ভালো লাড্ডু আছে—গরম সিঙারা ভি আছে—

আর থাকা গেলনা। পটলডাঙার প্যালারাম কাৎ হয়ে গেল। হাবুলা তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চডুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল, ওকে জাগাই—তার পরেই ভাবলাম ঃ না—থাক্ পড়ে। আমি গুটি গুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম।

মস্ত খাবারের দোকান। থরে থরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙারা ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়।

শেঠজী বললেন, আইসো খোকা—ভিতরে আইসো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিংবা ঘুট্‌ঘুটানন্দের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকেই পড়লাম।

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর। বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশ্যাল্ এক ডজন লাড্ডু আউর ছ'ঠো সিঙারা—

আমি বিনয় করে বললাম, আবার অত কেন শেঠজী?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা—খাওনা। বহুৎ বঢ়িয়া চীজ আছে।

শালপাতায় করে বঢ়িয়া চীজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি - যেন অমৃত! সিঙারা তো নয়—যেন কচি পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল! আর বলতে হল না। আমি কাজে লেগে গেলাম।

গোটা চারেক লাড্ডু আর গোটা দুই সিঙারা খেয়েছি—এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। তার পরে চোখে অন্ধকার দেখলাম। তারপর—

স্পষ্ট শুনলাম—গজেশ্বরের অট্টহাসি!

—পেয়েছি এটাকে। এক নম্বরের বিচ্ছু! আজই এটাকে আমি আলু-কাব্‌লি বানিয়ে খাব।

ব্যাস্—দুনিয়া একেবারে অথই অন্ধকার! আমি চেয়ার-টেয়ার শুদ্ধু হুড়মুড় করে মাটিতে উল্‌টে পড়ে গেলাম!

—আগামীবারে সমাপ্য

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য

১৩। স্ফীতোদর বৃক্ষকাণ্ড

ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

মাটির উপরে বৃক্ষের যে অংশটি স্তম্ভের মত দাঁড়ানো থাকে তাই হ'ল কাণ্ড বা গুঁড়ি। কাণ্ড থেকে ক্রমশঃ বের হয়ে আসে শাখা-প্রশাখা। সাধারণতঃ কাণ্ডটি নীচের দিকে মোটা হয় আর উপর দিকে যেমন ডাল পালা বার হতে থাকে সেইভাবে সরু হয়ে আসে। যে গাছের ডালপালা অনেক উঁচুতে হয় তার কাণ্ডও অনেক দূর পর্য্যন্ত সমান থেকে যায়। কোনও কোনও গাছের শাখা-প্রশাখা হয় না, যেমন তাল, নারিকেল প্রভৃতি। এই রকম গাছের কাণ্ড মাটি থেকে গাছের আগা পর্য্যন্ত সরল ভাবেই থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের কখনও কখনও ব্যতিক্রম দেখা যায়।
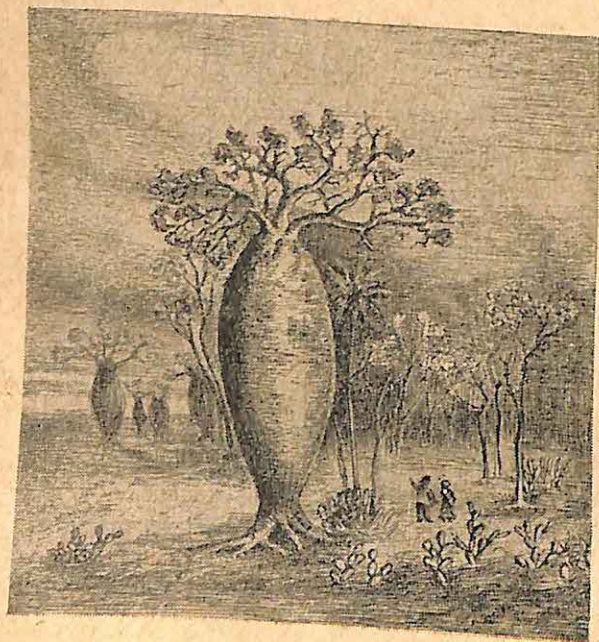
কলকাতার অনেক পার্কে বা বাগানে একরকম পাম গাছ তোমরা দেখেছ, তার নাম হ'ল "রয়ষ্টোনিয়া।" এই পামগুলি দেখতে খুবই সুন্দর, সেজন্য একে বলা হয় "রয়াল পাম"। এই পামের আরও একটা নাম আছে তা হ'ল "বটল পাম", কারণ এর আকৃতি অনেকটা বোতলের মত। কাণ্ডটি সরল ও মসৃণ এবং মাথার দিকে কিছু অংশ বোতলের গলার মত সরু। এই জাতীয় পামের মধ্যে এক একটি গাছে দেখা যায় যে, কাণ্ডটির মাঝখানে কিছু অংশ ফুলে উঠেছে, যদিও এই অংশটুকু বাদে কাণ্ডটি বেশ সরলই থাকে। রয়ষ্টোনিয়া ছাড়া দু'একটি ভিন্নজাতীয় পাম গাছেও কদাচিৎ কাণ্ডের এই রকম ফুলে ওঠা দেখা যায়। শিবপুর বটানিক গার্ডেনে এরকম একটি রয়ষ্টোনিয়া আছে।

পামের পক্ষে এটা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক নয়। তবে কয়েক জাতীয় গাছ আছে তাদের কাণ্ড স্বাভাবিক ভাবেই মাঝখানে মোটা হয়ে যায় আর উপরে ও নীচে সরু থাকে। এই রকম একটি গাছ অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়, তার নাম হল "এডানসোনিয়া গ্রেগরি"। এই গাছের গুঁড়িটি দেখতে একটি পিপার মত, সেজন্য চলতি কথায় এই গাছকে অষ্ট্রেলিয়ার "পিপাগাছ" বা "ব্যারেল ট্রি" বলা হয়।

এই প্রকার গাছের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ব্রাজিলের একটি গাছ, তার নাম "ক্যাভানিলেসিয়া আরবোরিয়া।" এই গাছগুলি ৬০—৬৫ ফুট উঁচু হয়। শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে না। কাণ্ডটি মাটির উপর থেকে ক্রমশঃ সরু না হয়ে ক্রমশঃ মোটা হতে থাকে, তারপর আবার ধীরে ধীরে সরু হতে থাকে। মাঝামাঝি জায়গায় কাণ্ডট বেশ মোটা হয়ে যায়, ফলে, গাছটিকে একটি প্রকাণ্ড পেটমোটা দানবের মত দেখায়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে যে গাছগুলি হয় তাদের গুঁড়িগুলোই বেশী মোটা হয় এবং তার ব্যাস ১৫ ফুট পর্য্যন্ত হতে দেখা গিয়েছে।

ছোট ছোট উদ্ভিদের মধ্যেও কোনও কোনওটির কাণ্ড এ রকম মোটা হয়ে যায়। এর মধ্যে ওলকপি বা গাঁটকপি আমাদের বেশ পরিচিত। এ ছাড়া ক্যাক্টস জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে অনেকেরই কাণ্ড দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান ভাবে বাড়ে বলে একেবারে গোলাকার হয়ে যায়।

ঘুম আসে-না

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রাত-নিশুতি, ঘুম আসে-না
একলা জেগে রই,
ভাবৃছি কখন উঠ্‌বে রবি
নীল আকাশে ঐ।
এ-নিশুতি আঁধারময়
একটু ভালো লাগার নয়,
কেবল ব্যাধি বাড়ায় ভয়,
মোটেই খুশী নই,
আকাশ পানে তাই তাকিয়ে
ভাবৃছি কই-কই।

একটু আলো উঠ্‌লে ফুটে
চম্‌কে ফিরে উঠি,
সকাল হ'ল—ভেবেই-না যেই
দরজামুখো ছুটি,
অমনি নাড়া পেয়ে ঘাড়ে
মা বলল : 'ঘুমো না-রে,
এখনো রাত, চাঁদ আড়ে—
তারা একটি-দুটি';
কপাল ! ফের বিছানাতেই
খেলাম লুটোপুটি।

লাগিয়েছিলেন। সামতাবেড়ের বাড়ীর চারপাশে বেড়া দিয়ে কত গাছ যে তিনি পুঁতেছিলেন তার সীমা নেই।

ছোটবেলায় ঘুড়ি ওড়ান, লাট্টু খেলা ও গুলি খেলায় তাঁর সখ ছিল প্রচুর। বিপক্ষের ঘুড়ি কেটে তাকে লটকে নিয়ে আসতে তাঁর জুড়ি ছিল না। গুলি খেলাতেও তাঁর টিপ ছিল অব্যর্থ। পনের-বিশ হাত দূর হতেও গাব্বু জিলোতে তাঁর কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। লাট্টু খেলাতেও তিনি এই রকমই দক্ষ ছিলেন। যে লাট্টুকে লক্ষ্য করে তিনি নিজের লাট্টু ছুড়তেন সে লাট্টুর দফা একবারে শেষ করে দিতেন।

যাত্রা থিয়েটার করা ও শোনা শরৎচন্দ্রের প্রধান সখ ছিল। গাঁয়ে এবং আশপাশে যেখানেই যাত্রা থিয়েটার হোক না কেন শরৎচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকবেনই। একবার 'মৃণালিনী' ও 'জনা'র প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যে, দর্শকবৃন্দ সেদিন বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু উপহার দেওয়া শরৎচন্দ্রের আর এক সখ ছিল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়কে তিনি একটি পোর্টেবল টাইপরাইটিং মেসিন উপহার দিয়েছিলেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টকে সোনার ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলেন। বিভূতিবাবু সেই পেনটি ফেরৎ দিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন, "এতো কলম নয় গয়না! এতে কাজ করা চলবে না। সদাই চুরি যাবার ভয়ে সশঙ্কিত থাকতে হবে।"

সোনার বদলে একটি রূপোর পেন পাঠিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "এই কলমেই তোমায় লিখতে হবে।" আরও যে কত উপহার কতজনাকে দিয়েছিলেন তা আজও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের আর এক প্রিয় সখ ছিল সঙ্গীত। এই সখটা তাঁর নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। কী কণ্ঠ সঙ্গীতে কী যন্ত্র সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র ছিলেন পাকা ওস্তাদ। উপরন্তু তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর। রবীন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশুরায়, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল, কীর্ত্তন, ভজন, দোঁহা প্রভৃতি গান তাঁর মুখ হতে যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন।

যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে হারমোনিয়ম, বেহালা, এস্রাজ, ও বাঁশীতে তাঁর হাত ছিল ভাল।

শরৎচন্দ্র জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সঙ্গীতই তাঁকে বারবার সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে আলোকের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

সাগরদ্বীপের কেল্লা

নির্ম্মল চৌধুরী

পরদিন সকালে বোম্বেটেদের আড্ডার চেহারা হলো আর এক রকম।

যখন ধরা পড়লো বার্থেলোমিউর শখের জাহাজখানি নেই আর সেই সঙ্গে নেই কালীকিঙ্কর, সুবর্ণ ও আর পাঁচজন বাঙালি বন্দী তখন বার্থেলোমিউ টেবিলে এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে হাঁক দিয়ে উঠলো। বললে, "নিয়ে এস তাদের যারা পাহারায় ছিল।"

কিন্তু পাহারায় কেউই ছিল না; উৎসবের রাত্রে কর্তব্যে শিথিলতা দেখালে বার্থেলোমিউ কিছু বলতো না। ওটা তার নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তারপরই বললে, "ওদের সন্ধানে এখনই যাও।"

পেড্রো বললে, "তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও আপনার জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায় নি।"

বার্থেলোমিউ দু'হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, "ক'টা বাঙালি আমাকে ঠকালে? এর পরিণাম কি জান, পেড্রো? আমার ইচ্ছে করছে…" বলে সে দাঁত কড়মড় করতে লাগলো।

পেড্রো বললে, "বাঙালিদের আমি চিনি। এই জন্যেই ওদের, ঐ রায় দু'টোর কাটামুণ্ড দেখতে চেয়েছিলাম। কেবল আপনিই ওদের বাঁচিয়ে রাখলেন গুপ্তধনের আশায়।"

"গুপ্তধনে লোভ তোমারও ছিল না কি?"

"ছিল।"

"ব্যস! আর কথা নয়।" বলে সে গম্ভীর মুখে পায়চারী করতে লাগলো; তারপর হঠাৎ পেড্রোর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "আমরা পর্তুগীজ। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে অকূল সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জাহাজে, নগর, গ্রাম লুঠছি। কেউ আমাদের রুখতে পারছে না। আর হার মানবো ঐ বাঙালি কুকুরগুলোর কাছে? ওই কালীকিঙ্কর শয়তানটার মতলব আন্দাজ করতে পারো? পারো না? ও দেশে গিয়ে আরও জাহাজ আর লোকজন এনে আমাদের কেল্লা ফতে করবে।"

"তা মনে হয় না, কাপ্তেন। ও যে দেশে গিয়ে পৌঁছবে তারই বা ঠিক কি? আমার মনে হয় ও আর এমুখো হবে না।"

"না পেড্রো। কালীকিঙ্কর বড় দুঃসাহসী। তুমি দ্বীপ আর কেল্লা রক্ষার কড়া ব্যবস্থা করো। দাস আর বন্দীদের খুব কড়া নিয়মে রাখো। এখন অন্ততঃ দু'মাস আমরা দূরে কোথাও যাবো না। তুমি আশপাশের সমুদ্রে টহল দেবার ব্যবস্থা করো। বাঙালিকে, বিশেষ করে কালীকিঙ্করকে, আমি বিশ্বাস করি না। ওর ভাইপোটাও হয়ে উঠছে ওরই মতো। আজ থেকে সাবধান।"

"যেমন আপনার হুকুম।" বলে পেড্রো চলে গেল।

বার্থেলোমিউ একাকী ঘরে পায়চারী করতে করতে একবার বলে উঠলো, "দেখা যাক্ কে হারে, কে জেতে।"

বার্থেলোমিউর দোষ ছিল অনেক কিন্তু গুণও ছিল যথেষ্ট। না হ'লে অমন বোম্বেটে দলকে নিজের অধীনে রাখতে পারে? সে মানুষের চরিত্র বুঝতো। তাই তার অনুমানই ঠিক হলো।

কালীকিঙ্কররা পালাবার মাস দুই পরে একদিন ভোরের দিকে বার্থেলোমিউর একখানি টহলদার জাহাজ থেকে কেল্লার প্রহরীকে সংকেতে জানালো, "দূরে পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ দেখা যাচ্ছে।"

প্রহরী সংকেতে জিগ্যেস্ করলে, "তারা কোন্ দিকে যাচ্ছে? কি অবস্থায় আছে?"

জাহাজ থেকে উত্তর হলো, "দ্বীপের দিকে আসছে। সার বেঁধে আছে।"

বার্থেলোমিউ খবর শুনে জাহাজকে হুকুম দিলে, "নজর রাখো।" আর কেল্লায় সকলকে তৈরি থাকতে বললে। তারপর দাস ও বন্দীদের সম্বন্ধে হুকুম দিলে, "ওদের ঘরে বন্দী কর। কেউ যেন বাইরে না থাকে।"

তারপর সে নিজে চললো সাতখানি জাহাজ নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে। কিন্তু বোম্বেটেদের আজকের যুদ্ধটা একেবারে আলাদা। আজ তারা আক্রমণকারী নয়, আক্রান্তের দলে।

এতকাল তাদের অবস্থা ছিল এর উল্টো—তারাই লোকের ওপর চড়াও হয়ে মেরে ধরে সব কেড়ে নিত।

বোম্বেটেদের জাহাজগুলোও সারবন্দী হয়ে এগিয়ে চললো। বার্থেলোমিউ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু পাল্লার মধ্যে এলেই কামান দাগবে।

এখানে একথা না বললেও চলে যে, যে জাহাজগুলো সাগরদ্বীপের দিকে আসছিল সেগুলো পরিচালনা করছিলেন, কালীকিঙ্কর। দেশে গিয়েই তিনি বোম্বেটেদের বাসা ভেঙে দিতে একটি নৌবহর গড়ে তুলতে থাকেন। সওদাগরেরা মুক্তহস্তে তাঁকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। কারণ বোম্বেটেদের অত্যাচারে তারাও যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। কালীকিঙ্করের সঙ্গে ছিল সুবর্ণ ও শঙ্কর।

কালীকিঙ্কর বোম্বেটেদের বাসা ভাঙতে আসছিলেন বটে কিন্তু তাঁদেরও যে পরাজয় ও মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল না, তা নয়। তবুও এটা একটা মস্ত কাজ। বোম্বেটেদের কাবু করতে পারলে বহু লোকের এবং তাঁর দেশের বড় উপকার হবে।

কালীকিঙ্করও তাঁর জাহাজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ তাঁর জাহাজের মাস্তুলের ওপর থেকে একজন নাবিক বললে, "একখানা জাহাজের বাজ-পাখী আঁকা পাল আর তার পিছনে ছ'খানা জাহাজ। আমাদের জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছে।"

কালীকিঙ্কর বললেন, "বোম্বেটে বার্থেলোমিউ, খুব হুঁসিয়ার। আমাদের আসা টের পেয়েছে। প্রস্তুত হও!"

তাঁর কথা শোনা মাত্র সুবর্ণ নিশানে সংকেত করলো।

মুহূর্তে নাবিকেরা নিজ নিজ জায়গায় প্রস্তুত হয়ে রইল।

শত্রু পাল্লার মধ্যে আসতেই সুবর্ণর জাহাজের একটি কামান থেকে ধূমকুণ্ডলী দেখা গেল। তারপর গ্রুম্ করে একটি শব্দ।

বার্থেলোমিউর জাহাজ থেকেও তৎক্ষণাৎ তার উত্তর এল এবং মুহূর্তের মধ্যে বাঙালি ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের মধ্যে লড়াই জমে উঠলো।

জাহাজগুলো পরস্পরের দিকে আরও এগিয়ে এল। উভয় পক্ষেরই দু'খানি জাহাজের পালে আগুন ধরে গেল, হাল উড়লো, দাঁড় ভাঙলো, মাস্তুল ভেঙে পড়লো। কামান-বন্দুকের শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ, বার বার যুদ্ধ-হুঙ্কার সমুদ্রের সেই অংশে ছড়িয়ে গেল। দু'পক্ষের জাহাজেই হতাহত হলো অনেক ও রক্ত দেখা গেলো, আর্তনাদ উঠলো। কিন্তু কে কাকে দেখে?

হঠাৎ কালীকিঙ্কর ও বার্থেলোমিউর জাহাজ দু'খানা এত কাছাকাছি এসে পড়লো যে মাঝে ব্যবধান রইলো সামান্যই।

কালীকিঙ্কর মনে মনে বললেন, "হয় আমি আজ মরবো নয় ওদের মারবো।"

বার্থেলোমিউও নিজের মনে বলে উঠলে, "বাঙালি কুকুরটাকে আজ পায়ে পিষে মারবো।"

কিন্তু সুবর্ণদের জন কতক নৌযোদ্ধা মাস্তুলে উঠে লম্বা দড়িতে দোল খেতে খেতে বার্থেলোমিউর একখানা জাহাজে এমন অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে কামানগুলো দখল করলে যে, পর্তুগীজরা গেল হতভম্ব হয়ে। তারা অনায়াসেই জাহাজখানা দখল করে নিলে।

কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরও কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলো না।

তবে বার্থেলোমিউ ও কালীকিঙ্করের যুদ্ধ খুব ঘোর হয়ে উঠেছিল। কালীকিঙ্করের জাহাজও গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি শত্রুর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্চর্য যে বার্থেলোমিউ তাতে বাধা দিলে না। কালীকিঙ্কর শেষে জানতে পারলেন, বার্থেলোমিউর তিনখানি জাহাজ ডুবি হয়েছে, একখানি গেছে কাজের বার হয়ে। তাঁর নিজেরও তিনখানি জাহাজ ডুবে গেছে।

কালীকিঙ্কর হঠাৎ দেখলেন শত্রু দ্বীপের দিকে হটে যাচ্ছে অথচ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের শক্তি তার আছে। তিনি বার্থেলোমিউর মতলব বুঝতে পারলেন। বুঝলেন যে, ও চায় তিনি পশ্চাদ্ধাবন করুন এবং কেল্লার কামানের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পড়লে তার জাহাজ ও কেল্লার কামান একসঙ্গে তাঁর ওপর আগুন বর্ষণ করবে। কালীকিঙ্কর তার ফাঁদে কিন্তু ধরা দিলেন না।

কিন্তু সুবর্ণ কিশোর; তার সে সংযম কোথায়? সে বললে, "শত্রু পিছু হটছে মানেই আর পারছে না, হার স্বীকার করছে। চলুন, আমরা ওদের তাড়া করি।"

[চলবে]

শ্রীখেলোয়াড়

ফল বাছা

যত খুশি খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলাটি খেলা চলবে।

যারা খেলায় যোগ দেবে খেলা সুরু করবার আগে তারা সমান সংখ্যায় দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়েরা নিজেদের দলের মধ্যে থেকে একজন করে নেতা ঠিক করে নেবে। যেখানে খেলা হবে সেই মাঠের দুই দিকে মাটিতে দাগ কেটে দুটো ঘর করে নেবে। ঐ দুটো ঘরে দুই দলের খেলোয়াড়েরা দাঁড়াবে। দু'দলের নেতা দু'জন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দাঁড়াবে।

খেলা সুরু হলে প্রথমে যে কোন দলের একজন খেলোয়াড়ের চোখ সেই ঘরে যে নেতা আছে সে ভালো করে বেঁধে দেবে। ভালো করে চোখ বাঁধা হয়ে গেলে সেই ঘরের নেতা বিপক্ষ ঘরের নেতাকে ইসারা করলে বিপক্ষ দল থেকে সেই ঘরের নেতা যে কোন একজন খেলোয়াড়কে পাঠাবে। যে খেলোয়াড়টি আসবে সে চুপি চুপি এসে চোখ বাঁধা খেলোয়াড়টিকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে যাবে। ঐ খেলোয়াড়টি তার নিজের ঘরে পৌঁছে গেলে যার চোখ বাঁধা হয়েছিল তার চোখ খুলে দেওয়া হবে। সেই খেলোয়াড়টি তখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘরে যাবে এবং কোন্ খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়ে এসেছে তার নাম বলার চেষ্টা করবে। যদি সে, যে খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়েছে তার নাম বলে দিতে পারে তাহলে যে খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়েছিল তাকে নিজেদের দলে লাভ করবে এবং সেই খেলোয়াড়কে সঙ্গে করে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসবে। আর যদি সে, যে খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়েছে তার নাম না বলতে পারে তাহলে সে বিপক্ষ দলে থেকে যাবে।

একজন খেলোয়াড়ের নাম বলবার সুযোগ হয়ে গেলে তখন আবার বিপরীত দলের একজন খেলোয়াড়ের চোখ সেই ঘরে যে নেতা থাকবে সে বেঁধে দেবে। চোখ বাঁধা হয়ে গেলে বিপক্ষ-দলের নেতাকে ইসারা করলে বিপক্ষ দল থেকে যে কোন একজন খেলোয়াড়কে সে পাঠাবে। সেই খেলোয়াড় ঠিক আগের মতই চুপি চুপি এসে চোখ বাঁধা ছেলেটিকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে যাবে। ঐ খেলোয়াড় নিজের ঘরে ফিরে গেলে তখন যার চোখ বাঁধা হয়েছিল তার চোখ খুলে দেওয়া হবে। সেই খেলোয়াড় তখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এসে কোন্ খেলোয়াড়টি তাকে

ছুঁয়েছে তার নাম বলার চেষ্টা করবে। যদি সে ঠিক নাম বলতে পারে তাহলে যে খেলোয়াড় তাকে ছুঁয়েছিলো তাকে নিজের দলে লাভ করবে। আর যদি সে ঠিক নাম না বলতে পারে তাহলে সে বিপক্ষ দলে থেকে যাবে। এইভাবে যে কোন একদলের খেলোয়াড় যখন বিপক্ষ দলের সব খেলোয়াড়দের নিজেদের দলে নিয়ে আসতে পারবে তখন একবারের মত খেলা শেস হবে। আবার দুজন নতুন নেতা ঠিক করে একই ভাবে খেলা সুরু করবে।

নেতারা প্রত্যেকবার এক একজন নতুন খেলোয়াড়ের চোখ বেঁধে এবং একজন নতুন
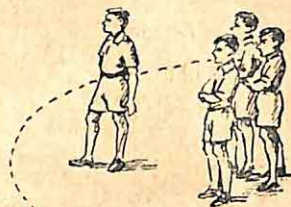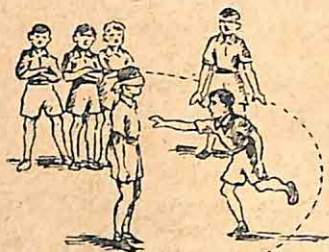
খেলোয়াড়কে চোখ বাঁধা ছেলেটিকে ছোঁবার জন্য পাঠিয়ে সকল খেলোয়াড়কে সমান ভাবে খেলবার সুযোগ দেবে। কোন খেলোয়াড় কখনও কোন্ খেলোয়াড় ছুঁয়েছে তার নাম বলতে পারবেনা। যদি কোন খেলোয়াড় ইসারা বা ইঙ্গিতে যে খেলোয়াড় ছুঁয়েছে তার নাম বলে দেয় তাহলে তাকে তখনই খেলা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

চীনদেশের ছেলেমেয়েদের কাছে এ খেলাটি অত্যন্ত প্রিয়।

খোকার সাধ

প্রভাসচন্দ্র সেন

যখন ভাবি একলা বসে
কোন্ সে গভীর জলে
পুচ্ছ তুলে তিমির দলে
খেল্‌ছে সাগর তলে।

মাখব গায়ে এমনি করে
সাত সাগরের ঢেউ
হারিয়ে যাব অতল জলে
দেখবে না আর কেউ।

ঢেউয়ের তালে উঠব নেচে
খেল্‌ব জলের মাঝে
এমন কত সাধ যে আমার
মনের কোণে বাজে।
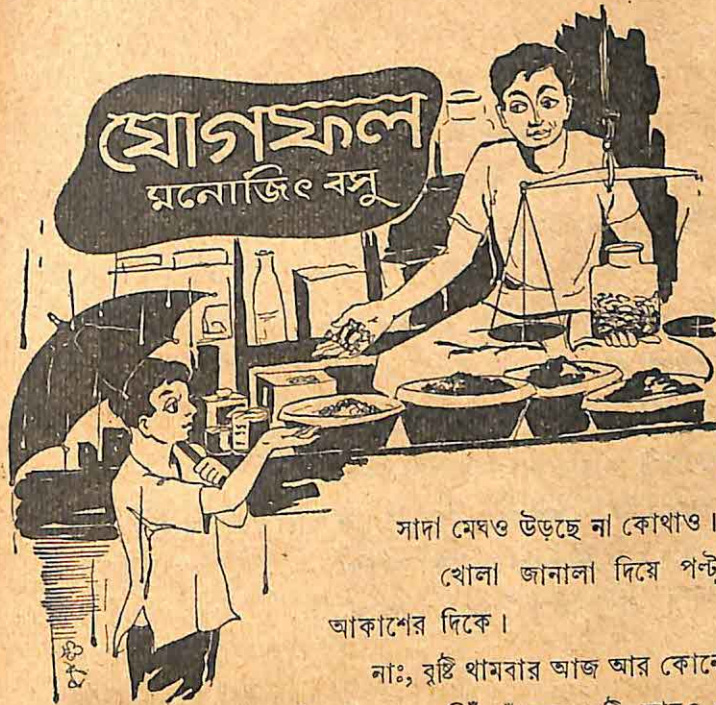
সারাদিন ধ'রে বৃষ্টি পড়ছে ঝির্ ঝির্ ক'রে।

কখনও কম, কখনও বেশি।

আকাশ ঢেকে আছে কালো মেঘে। যেন বিরাট একখানা কালো শ্লেট্। সাদা খড়ির কোনো আঁচড় নেই তার গায়ে। এক টুকরো সাদা মেঘও উড়ছে না কোথাও।

খোলা জানালা দিয়ে পন্টু চেয়েছিল সেই মেঘে-ঢাকা আকাশের দিকে।

নাঃ, বৃষ্টি থামবার আজ আর কোনো আশা-ই নেই।

সব মাটি! ছুটির দিনে এরকম ছিঁচ্‌কাঁদুনে বৃষ্টি কারও ভালো লাগে? কোথায় এতক্ষণ সে সুবীরদের বাড়ি গিয়ে মজা ক'রে ক্যারম খেলবে, তা ভগবানের কি সেদিকে হুঁশ আছে? সেই যে ভোরবেলা থেকে তিনি বৃষ্টি নামিয়েছেন তা বন্ধ করবার তাঁর কোনো চেষ্টাই নেই! এ শুধু তাকে জব্দ করবার একটা ফন্দী!

মাঝে মাঝে ভগবানের ওপর ভারী রাগ হয় পন্টুর।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এইভাবে ঘরে আট্‌কে রেখে ভগবান যে কি আনন্দ পান, তা একমাত্র তিনিই জানেন! সারা রাত ধ'রে যত ইচ্ছে তিনি জল ঢালুন না, কে মানা করছে তাঁকে? তা নয়, তাঁর যত দুষ্টুমি এই দিনের বেলায়!

বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই দেখে, পন্টু গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পাশের ঘরে মা তখন রোজকার মতো দিবানিদ্রায় মগ্ন! দুপুরবেলায় না ঘুমোলে মার মেজাজ বড় বিগড়ে যায়। সে ভয়েই তো, পন্টু আজ তাঁকে লুডো খেলার জন্য বায়না ধরতে পারেনি। খাবার খেতে ব'সে একবার অবিশ্যি মনে হয়েছিল, মাকে ব'লে রাখে দুপুরবেলায় লুডো খেলবার কথা। কিন্তু মার দিবানিদ্রার কথা মনে হওয়ায়, সে-কথা আর বলতে সাহসই পায়নি পন্টু।

বাবাও বাড়িতে নেই। টুরে বেরিয়েছেন, অফিসের কাজে। পরশু ফেরবার কথা।

থাকবার মধ্যে আছে রামের মা। পন্টুদের বুড়ি ঝি। কিন্তু, সে-ও তো লুডো খেলার কিছু জানে না। প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোচ্ছে রান্নাঘরে।

ধুত্তোর!

ভারী রাগ হয় ভগবানের ওপর। বৃষ্টি থামাবার ইচ্ছে নেই তাঁর, না থাকল। তাই ব'লে মার দিবানিদ্রার অভ্যেসটাও তো তিনি একটি দিনের জন্য ছাড়াতে পারতেন। তাও ছাড়াবেন না। আসলে, পন্টুকে জব্দ করবার জন্যই তিনি আজ কোমর বেঁধে লেগেছেন!

খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে পন্টু উঠে পড়ল।

মনে প'ড়ে গেল, সুবীরের দেওয়া বইটার কথা।

ঐ-য্-যাঃ, দু'দিন হ'লো সে বইটা এনেছে, অথচ পড়বার কথা মনেই নেই!

তাক থেকে বইটা নিয়ে এসে পন্টু আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাজপুত্তুর চ'লেছেন তিন বন্ধুর সঙ্গে। মন্ত্রী পুত্র, কোটাল পুত্র আর সওদাগর পুত্র।···

চলছেন তো চলেইছেন। কত মাঠঘাট, পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল······

গাছের ওপর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। কথা বলছে ফিস্ ফিস্ ক'রে······

বাঃ, বেশ গল্প তো!

বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল পন্টু।

বৃষ্টি ঝরার শব্দ নেই আর। একটানা সাতঘণ্টা ধ'রে ঝিরঝিরিয়ে প'ড়ে বৃষ্টি বুঝি এবার থামল। পন্টুর কিন্তু হুঁশ নেই সেদিকে।

রূপকথার রাজপুত্তুরের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও চলেছে কোন্ অচেনা দেশে। যে-দেশের গাছে গাছে রূপোর পাতা, সোনার ফল। রাজপুত্তুরকে বাধা দিতে এগিয়ে আসছে একদল সৈন্য। মন্ত্রী পুত্র, কোটাল পুত্র, সওদাগর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্তুর তাদের রুখে দাঁড়িয়েছেন। পন্টুর মনে হ'লো, সেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে। রাজপুত্তুরের কানে কানে যেন বলছে—ভয় নেই, এগিয়ে যাও, সঙ্গে আছি আমি। দরকার হ'লে, সুবীর, সুমন, চারু, প্রশান্ত সব্বাইকে ডেকে এনে জড়ো করব। চাই কি, বিজয়রতনের বাবাকেও ডেকে আনা শক্ত নয়। মস্ত বড় বন্দুক আছে তাঁর। একবার গুড়ুম করলেই বিপক্ষের সৈন্যরা তীর-ধনুক ফেলে পালাবার পথ পাবে না। বিজয়রতনের বাবা মস্ত বড় শিকারী।······

বই পড়তে পড়তে কখন যে পন্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল সে-কথা তার মনে নেই।

ঘুম ভাঙতেই, জানালার দিকে চেয়ে দেখে বৃষ্টি ধ'রে গেছে। রান্নাঘরে রামের মার সঙ্গে মা যেন কিসব বলাবলি করছেন।

তড়াক্ ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল পল্টু।

টাইমপিস্‌টার দিকে চোখ পড়তেই মনটা দ'মে গেল তার। ইস্, পাঁচটা বেজে গেছে। সুবীররা তো এক্ষুণি বেরুবে সিনেমায়। সুবীর, লতাদি, প্রবীর। পৌনে ছ'টায় সিনেমা, ফিরবে সেই সাড়ে আটটা-ন'টায়।

কাজেই, ওদের ফ্ল্যাটে যাবার এখন উপায় নেই। কিন্তু যাওয়া যায় কোথায় এখন? সারাটা দিন বাড়িতে আটকে থেকে পল্টু যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

চোখমুখটা ধুয়ে তো আসা যাক্ আগে।

বাথরুমে গিয়ে ঢুকল পল্টু।

ফিরে আসতেই, মা এসে ঢুকলেন ঘরে।

কাছে এসে বললেন—যা তো বাবা, মোড়ের ঐ দোকান থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আয়। রাত্তিরে আজ খিচুড়ি রাঁধব। বাদ্‌লা-রাতে জম্‌বে ভালো।

খিচুড়ির কথায় নেচে উঠল পল্টু। উঃ, কতদিন খিচুড়ি খাওয়া হয়নি।

দিবানিদ্রার অভ্যাসটা ছাড়া মার আর সবই ভালো। কখন কী রাঁধতে হয়, সব ঠিক জানেন। আজ সকালেই তো খিচুড়ির কথা মনে হয়েছিল পল্টুর। আর, মা কিনা রাত্তিরে তারই আয়োজন করছেন।

জামাটা গায়ে দিতে দিতে পল্টু বলল—দাও, ফর্দটা দাও। যাব, আর আসব।

ফর্দ আর দুটো টাকা এনে, মা দিলেন পল্টুর হাতে।

আতপ চাল একসের, বার আনা। মুসুরীর ডাল আধসের, চার আনা। হ'লো গিয়ে একটাকা। গরম-মশলা চার আনার, তেজপাতা দু'পয়সার, পেঁয়াজ দু'আনার। তার মানে, একটাকা সাড়ে ছ'আনা, আরও আছে। ঘি আট আনার, আর আদা চার পয়সার। সবসুদ্ধ হ'লো গিয়ে একটাকা সাড়ে পনের আনা। যোগে ভুল হয় না পল্টুর। ইস্কুলে টাকা-আনা-পাইয়ের যোগে তার সঙ্গে পেরে ওঠে না কেউ।

ফর্দটার দিকে তাকিয়ে পল্টু বলল—দুটো পয়সা ফেরত পাওয়া যাবে মা! ওটা কিন্তু আমার।

আচ্ছা, আচ্ছা, নিস্—হাসতে হাসতে বললেন মা।

থলি আর ঘিয়ের শিশিটা নিয়ে বেরুবার মুখেই আবার বৃষ্টি। আবার সেই টিপ্ টিপ্ টিপ্।

নাঃ, জ্বালালে বাপু।

দাও মা, ছাতাটা দাও—ঘরের ভিতরে আবার এসে দাঁড়াল পল্টু।

মোড়ের মাথায় খোকাদার দোকান। রামকিঙ্কর সাধুখাঁ, খোকাদার নাম। কিন্তু সবাই বলে,

খোকা। খোকার দোকান, খোকাবাবুর দোকান, খোকাদার দোকান। যে বয়সের যে, সে সেইভাবে বলে। বড় ভালো মানুষ এই খোকাদা। জিনিসপত্রের দাম যেমন বেশি নেয় না, ওজনেও তেমনি ঠকায় না কাউকে।

ছাতা মাথায় পল্টু গিয়ে দাঁড়াল দোকানের সামনে।

এই যে পল্টুবাবু, কী নিতে এসেছ এই বৃষ্টিতে?—পল্টুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে খোকাদা।

ফর্দটা বাড়িয়ে দিয়ে পল্টু জবাব দেয়—খিচুড়ি হবে আজ। দিন্ সব ফর্দ মিলিয়ে। ঘিয়ের শিশি আর থলিটাও সে এগিয়ে দেয় খোকাদার সামনে।

খোকাদা ওজন ক'রে ক'রে সব জিনিস বাঁধতে থাকে কাগজের ঠোঙায়। বেঁধে না দিলে নেবার ভারী অসুবিধা হয় পল্টুর। খোকাদা জানে তা।

পল্টুর নজর গিয়ে পড়ে কতগুলি বয়মের ওপর। সুন্দর সুন্দর টফি আর লজেন্সে ভর্তি বয়মগুলি। টফি খেতে বড় ভালো লাগে পল্টুর। কেমন সুন্দর কাগজে মোড়া, কেমন সুন্দর গন্ধ। গালে ফেলে দাও একটা, তারপর রসিয়ে রসিয়ে খাও। কতদিন টফি খায়নি পল্টু।

পয়সা তো বাঁচবে মোটে দু'টি। দু'পয়সায় মাত্র একটি টফি পাওয়া যায়।

মনটা বড় দ'মে গেল পল্টুর।

আহা, কম ক'রে গোটা চারেক টফি না হ'লে কি চলে?

বার বার ক'রে সে দেখতে লাগল বয়মগুলি।

খোকাদার কথায় তার চমক ভাঙল।

এই নাও। সব দিয়ে দিয়েছি।—এই ব'লে খোকাদা তার দিকে থলি আর শিশিটা এগিয়ে দিল। আর হাতে দিল দু'আনা ফেরত।

চক্‌চকে দুটো আনি।

পল্টু যেন একটু অবাক হ'ল। দু'আনা তো ফেরত দেবার কথা নয়! সে তো ফেরত পাবে মাত্র দু'পয়সা! নিশ্চয়ই যোগ দিতে ভুল হয়েছে খোকাদার। তেজপাতা আর আদার দাম মোট ছ'পয়সা। হয়তো, ঐ ছ'পয়সাই বেমালুম বাদ দিয়েছে খোকাদা।

পল্টুকে পয়সা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, খোকাদা জিজ্ঞাসা করে—কি হ'লো, আর কিছু নেবে?

খোকাদার ফেরত-দেওয়া দু'আনা আবার তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে পল্টু বলল—হ্যাঁ, দু'আনার টফি দিন। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কেমন যেন একটু কেঁপে উঠল পল্টুর।

বয়ম থেকে গুনে গুনে পাঁচটি টফি বের ক'রে তার হাতে দিয়ে খোকাদা বলল—দু'পয়সায় একটা টফি। কিন্তু, একসঙ্গে দু'আনার নিলে পাঁচটি।

টফিগুলো প্যান্টের পকেটে পুরে নিল পল্টু। তারপর, ছাতাটা খুলে এক হাতে থলিটা গলিয়ে আর ছাতার বাঁটটা ধ'রে, অন্য হাতে ঘিয়ের শিশিটা নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল সে।

নাঃ, ভগবান ভারী ভালো! পল্টুর মনের ইচ্ছাটা তিনি কেমন পূর্ণ করলেন এক মিনিটে। কোথায় দু'পয়সা ফেরত পাবার কথা সেখানে সে কেমন দু'আনা ফেরত পেয়ে গেল। ভগবান কেমন দুষ্টুমি ক'রে খোকাদার যোগ অঙ্কে ভুল করিয়ে দিয়ে তাকে বাড়তি ছ'টা পয়সা পাইয়ে দিলেন। আর, সেই জন্যই না একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটা টফি পাওয়া গেল!

বাড়িতে এসে মাকে জিনিসপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে পল্টু চ'লে গেল বসবার ঘরে।

পকেট থেকে টফিগুলো বের ক'রে সে দেখতে লাগল উল্টে পাল্টে। খাবে নাকি একটা? নাঃ, এখন নয়, কাল ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে। স্বপনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে সে। সেদিন স্বপন যেমন তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে টফি খেয়েছিল, কাল পল্টুও তাই করবে। সুবীরকে অবশ্য একটা দেবে। কারণ, ইস্কুলে সুবীর কখনও কিছু খেলে তাকে না দিয়ে খায় না। কিন্তু—

মনে প'ড়ে গেল খোকাদার কথা। খোকাদাকে হিসেবে ঠকিয়ে এইভাবে কি তার টফি খাওয়া উচিত! হিসেবে কার না ভুল হয়? খোকাদারও নিশ্চয় ভুল হয়েছে। তেজপাতার দরুন দু'পয়সা আর আদার দরুন চার পয়সা, মোট এই ছ'পয়সা তিনি যোগ দিতে একেবারে ভুলে গেছেন। নইলে, দু'পয়সার জায়গায় দু'আনা সে ফেরত পায় কেমন ক'রে?

টফিগুলো হাতে নিয়ে পল্টু ভাবতে লাগল সেই কথা। মনের মধ্যে কী যেন একটা খচ্‌খচ্‌ ক'রে বিঁধতে লাগল তার। অপরের ভুলের সুযোগ নিয়ে, এইভাবে কিছু খেতে কি আনন্দ আছে? নাঃ, খোকাদাকে সে চারটে টফি এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

সে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। ছাতাটা হাতে নিয়ে যেই সে বেরুতে যাবে অমনি রান্নাঘর থেকে মা'র গলা শোনা গেল।—পল্টু, এদিকে আয়। খাবার খেয়ে যা।

একটু পরে মা। আসছি এক্ষুণি।—এই ব'লে পল্টু ছাতা মাথায় দিয়ে আবার, বেরিয়ে পড়ল। তাকে আসতে দেখে খোকাদা হেসে জিজ্ঞেস করলে—কি হ'লো আবার পল্টুবাবু? কী নিতে এসেছ?

পল্টু কিছু না ব'লে পকেট থেকে টফি আর মায়ের দেওয়া সেই ফর্দটা বের ক'রে দিল খোকাদার হাতে। তারপর খুলে বলল সব কথা। খোকাদার ভুলের সুযোগ নিয়ে কিছুতেই সে বেশি টফি নেবে না।

ফর্দটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে উঠল খোকাদা। তারপরে হেসে বলল—যোগে ভুল করেছি আমি? উঁহুঁ, ভুল হয়েছে তোমার। এই দেখ, আতপ চাল একসের এগার আনা, মুসুরীর ডাল আধসের চোদ্দ পয়সা—

সেকি! মা'তো ধরেছিলেন বার আনা আর চার আনা।—ব'লে উঠল পল্টু।

হেসে জবাব দিল খোকাদা—তা' ধরেছিলেন ঠিকই। কিন্তু, তিনি তো জানেন না আতপ চাল আর মুসুরীর ডালের দাম সের প্রতি এক আনা ক'রে ক'মে গেছে! কাজেই, ছ'পয়সা বাঁচল এখানে—

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পল্টুর মুখখানা। তাহ'লে তো যোগ ঠিকই আছে। চাল এগার আনা, ডাল চোদ্দ পয়সা, গরম-মশলা, তেজপাতা আর পেঁয়াজ সাড়ে ছ'আনা—হলো গিয়ে এক টাকা পাঁচ আনা। তারপর ঘি আট আনার, আর আদা চার পয়সার—অর্থাৎ কিনা, মোট এক টাকা চোদ্দ আনা। ব্যস্, তাহ'লে তো দু'আনাই সে ফেরত পাবে।

নাঃ, ভগবান একেবারে অন্তর্যামী! দু'পয়সার টফিতে পল্টুর মন উঠবে না দেখে তিনি চাল-ডালের দামই কমিয়ে দিলেন!

আনন্দে তক্ষুণি একটা টফি গালে পুরে দিয়ে পল্টু পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে।

বায়ুল বাতাস

শ্রীঅরুণা দাশগুপ্ত

হেথায় রাত নিঃঝুম,
এলোমেলো বয় বায়ুল বাতাস,
নয়নে নাহিক' ঘুম।
কান পেতে শুনি অন্তর মাঝে
আত্মার ক্রন্দন,
ভাগ্যের পায়ে মাথা কুটে মরা,
দুঃসহ বন্ধন।
বসি বাতায়ন পাশে,
পুষ্পিত ঐ মাধবীর লতা
শিহরি উঠিছে ত্রাসে।
অশরীরী কোন প্রেতের দীর্ঘশ্বাসে।
কাদের চরণ ধ্বনি,
হিংস্র কুটীল মন্ত্রণা ঐ
উঠিতেছে রণ রণি,
আঁধার মুখোসে ঢাকা
কোন কুচক্রী হাসে বিদ্রূপে
তীক্ষ্ণ ধার সে বাঁকা।
অবিশ্বাসের ছায়া
নেমেছে আমার চোখের প্রান্তে,
প্রেতেরা ধরেছে কায়া,
আত্মারে মোর করেছে বন্দী
নিষ্ঠুর উল্লাসে,
আত্মা কাঁদিছে গুমরি গুমরি
নিষ্ফল আক্রোশে।
জীবন দেবতা হাসিছে আড়ালে
ঝঞ্ঝা নিশির বুকে
বয় এলোমেলো বায়ুল বাতাস
ঘুম নেই মোর চোখে।

খেলনা বক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

তোমাদের বাড়ীর পুকুর, গর্ত কি নীচু জায়গায় একটা বকপাখী বসে থাকলে কেমন দেখায়? দূর থেকে ওটা ভারি অদ্ভুত বলেই মনে হবে।

ও পাখীটা তৈরী করা কিন্তু কঠিন নয়।
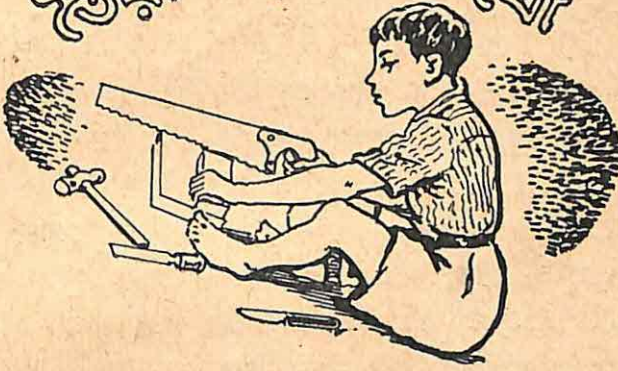
ছবি অনুযায়ী ১″ বর্গ কতকগুলি অংশে ভাগ করে নাও ½″ পুরু একখানি তক্তায়। বাটালী দিয়ে কেটে নাও ওর ঠোঁট সহ মাথাটা আর দেহটা। সিকি ইঞ্চি মোটা (পরিধি) লোহার সিক দিয়ে তৈরী কর বকের পা। দেওয়াল ঘড়ির অথবা গ্রামোফোনের কেটে-যাওয়া স্প্রীং—যা' আর কোন কাজে আসচে না, তাই দিয়ে কর বকের গলা।
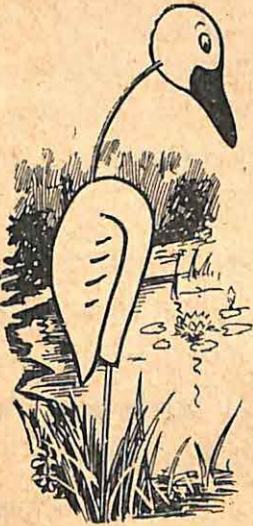
এইবার রং দেওয়ার পালা। বকের ঠ্যাং (একটা হ'লেই চলবে) ফিকে হ'লদে, দেহ সাদা এবং ঠোঁটটা হ'লদে করে নিলেই ভালো হবে। 'হ্বাবাক' মাখিয়ে পাখীটাকে সাদা করা কঠিন নয়। স্প্রীং দিয়ে দীর্ঘ গলাটা করার ফলে একটু বাতাস হ'লেই ওর মাথাটা বেশ দুলবে। মাথাটা খুব হাল্কা কাঠ দিয়ে করতে হবে কিন্তু পাখার কাছে থাকবে কালো দাগ।
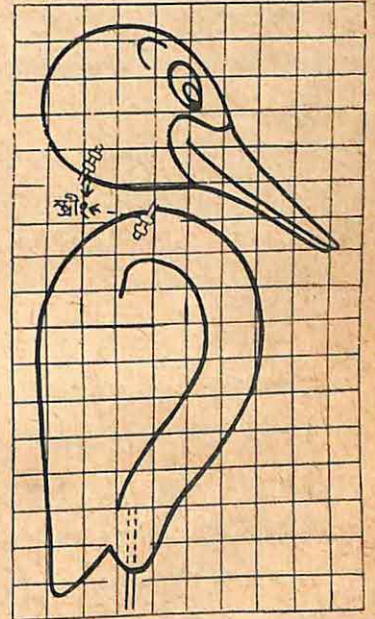
কাগজের মুখোস যে ভাবে করে ঐ ভাবে কাগজ দিয়েও বক তৈরী করা চলে, কিন্তু বৃষ্টির সময় হ'লেই মুস্কিল।

ফকিরের কেরামতি

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সুলতান মামুদের দরবার-কক্ষ। আজ বিশেষ সভা। পাত্র-মিত্র, সেনাপতি, সভাসদ যার যার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট ! কেউ বা দণ্ডায়মান। দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করে বসে আছেন সুলতান মামুদ,—দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু তিনি ছিলেন ডাকাত। রক্তাক্ত তরবারি হস্তে ছুটেছেন হিন্দুকোশ হ'তে দিল্লী। রক্তে লাল করে দিয়েছেন পথ ঘাট। নগরের পর নগর করেছেন ধ্বংস—করেছেন ভস্মস্তূপে পরিণত। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান সব দিয়েছেন ধূলিসাৎ করে। কত নরনারীর করেছেন সর্ব্বনাশ। শিশু ও বৃদ্ধের রক্তে করেছেন তরবারি রঞ্জিত। লুণ্ঠন করেছেন, অগণিত ধনরাশি—স্বর্ণ, রৌপ্য। অপবিত্র করেছেন হিন্দুর দেব-মন্দির। সেই দিন ভারতের হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে উঠেছিল কান্নার রোল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর হয়েছিল জনহীন—শ্মশান। শূন্যতা বিরাজ করছে সারা ভারতে। মহানগরীর রাজপথে, নর-নারী, শিশুর মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত—শকুনী, শৃগালের মহোৎসব সুরু হয়েছে।

সুলতান মামুদ ধ্বংসের উপর, মহাশ্মশানের উপর তুলে দিলেন তাঁর রক্ত-পতাকা। উল্লাসে নৃত্য করে উঠলেন জয়ের আনন্দে। অহঙ্কারে স্ফীত হ'য়ে উঠল তাঁর বিশাল বক্ষস্থল। উদ্বাস্ত অসহায় শিশুদের প্রাণ ভয়ে জর্জ্জরিত। উল্লাস হবার ত কথাই। সুলতান মামুদ একবার গর্ব্বিত বদনে চাইলেন সভাগৃহে।

দরবার কক্ষ নিস্তব্ধ। নত মস্তকে দ্বিধাকম্পিত অন্তরে বসে আছেন পারিষদগণ ! একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করছে এই সভাকক্ষে। সুলতান মামুদের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তারপরেই জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—'আজ আমার শক্তির নিকট, ভগবানের শক্তি তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হ'ল।'

সভাগৃহে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল। সভাসদ সকলেই ভয়ে কম্পিত। কে দেবে এই অহঙ্কারী, বর্ব্বর নরঘাতক দস্যু সুলতানের কথার উত্তর। কার ঘাড়ে আছে দুটো মাথা যে মামুদের কথার উপর করবে প্রতিবাদ। গুঞ্জন উঠল তৎক্ষণাৎ আবার তা নীরব হ'ল। সুলতান আবার চাইলেন জলন্ত নয়নে। সেই দৃষ্টির নিকট সভাসদ সকলের মাথা নত হ'য়ে এলো। স্বীকার করে নিল সুলতানের কথা। নিস্তব্ধ নগরী, ততোধিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সভামধ্যে।

আবার, আবার সুলতানের কণ্ঠস্বর বজ্রের মতন গর্জ্জে উঠল, 'বলুন আপনারা আমার কথা সত্য কি না !'

হঠাৎ এই সভা কক্ষের মধ্যস্থল হ'তে উঠে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ ফকির। ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেন সুলতানের দিকে। দাঁড়ালেন এসে সুলতানের সিংহাসনের নিকট।

'কি বলতে চাও বল।' সুলতানের কণ্ঠ গর্জ্জে উঠল।

শান্ত কণ্ঠে ফকির বললেন,—'আমি জানাতে এসেছি,—আপনার চেয়ে শক্তিমান, ক্ষমতাবান পুরুষ আছেন, জাঁহাপনা।'

রোষপূর্ণ নয়নে সুলতান তাকালেন ফকিরের দিকে, বললেন, 'কে সে শক্তিমান পুরুষ !'

নিস্তব্ধ দরবার কক্ষের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল ! একটু একটু করে গুঞ্জন গুণ গুণ করে উঠল, ক্ষণিকের জন্য ! বিস্মিত হতবাক্ সভাসদগণ, আতঙ্কে সকলের বক্ষ করছে দুরু দুরু। 'কে এই মূর্খ? এর মৃত্যুর কি ভয় নেই? জীবনের কি মায়া নেই? এখনি হয়তো ওর মুণ্ড লুটিয়ে পড়বে এই ধরণীর উপর !' ফকিরের জন্য সকলের প্রাণ কেঁদে উঠল।

কিন্তু ভয় নেই ফকিরের প্রাণে। মুখে মধুর হাসি। তিনি নির্ভীক, জীবন ও মৃত্যু তাঁর নিকট সমান। ফকির সাহেব স্নেহ-মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—'ভগবান !'

'ভগবান !' সুলতানের আঁখি দুটি দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। বললেন,—'কি ! কি বললে, অর্ব্বাচীন?'

'ভগবান।' ফকির দৃঢ় স্বরে জানালেন, 'আপনার চেয়েও তিনি সহস্র গুণ শক্তিমান। আপনি যা করেছেন সারা জীবন ধরে—ভগবান তা পারেন এক মুহূর্ত্তে।'

উদ্ধত রোষ সংযত করে নিলেন সুলতান, বললেন, 'প্রমাণ দেখাতে পার তুমি—ফকির সাহেব?'

ফকির সাহেব আবার হাসলেন, তেমনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'কেন পারব না,—জাঁহাপনা !'

সুলতান ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, নিজের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন, পরে বললেন, —'উত্তম ! প্রমাণ তোমাকে দেখাতে হবে, যদি না পার তোমাকে শূলে চড়াব আমি। ফকির বলেও ক্ষমা পাবে না তুমি।'

ফকিরের চোখেমুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠল,—কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে বললেন—'আর যদি প্রমাণ দেখাতে পারি,—জাঁহাপনা?'

—'তবে তুমি মুক্ত !'

ফকির সাহেব হাসি মুখেই বললেন,—'মুক্তির আমার প্রয়োজন নেই,—জাঁহাপনা।'

'কি চাও তুমি !' সুলতানের স্বরে বিদ্রূপ মিশান।

'প্রতিজ্ঞা করুন,—জাঁহাপনা। আর কখনো, হত্যা, ধ্বংস—নারীর উপর অত্যাচার করবেন না।'

'বেশ ! কথা দিলাম। কিন্তু প্রমাণ—চাই।'

ফকির বললেন,—'এক গামলা জল নিয়ে আসতে হুকুম দিন,—জাঁহাপনা।'

সুলতান চাইলেন, তাঁর পার্শ্বচরের দিকে। পার্শ্বচর জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে এলো এবং সুলতানের সামনে রাখলো।

দরবার কক্ষের সকলের অন্তর আতঙ্কে কেঁপে উঠল। ভয়ে শিউরে উঠল দেহের প্রতি লোমকূপ। এই অর্ব্বাচীন ফকির এবার নিশ্চয় মরবে। ঘাতকের হাতে যাবে তার জীবন। নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে আসছে সভাসদদের। কি যে ঘটবে, কে জানে? সভাগৃহে গভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

সুলতান বললেন,—'কি করতে হবে শীগ্‌গীর বল।'

নির্লিপ্ত স্বরে ফকির সাহেব বললেন,—'কিছুই না। শুধু আপনার মুখখানি একবার জলের ভিতর ডুবিয়ে তুলে আন্থন।'

সুলতান হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বিজ্ঞের মত বললেন,—'এ, এমন শক্ত কি!' পার্শ্বচর, মন্ত্রী, এসে দাঁড়ালেন সুলতানের সামনে। দরবার কক্ষে আবার গুঞ্জন উঠল। তামাসা দেখবার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

সুলতান মুহূর্ত্তের জন্য তাকালেন ফকিরের দিকে। দেখলেন, সেই প্রশান্ত হাসি সারা মুখে ঝরে ঝরে পড়ছে। কি শান্ত, কি সৌম্য মূর্ত্তি! গর্ব্বিত সুলতান ক্ষণিকের জন্য তাঁর নয়ন ফিরালেন সভা কক্ষের দিকে। সকলেই ভীতিপূর্ণ নয়নে সুলতানের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্ত্তের জন্য সুলতান ইতস্ততঃ করলেন,—তারপর সেই জলপূর্ণ পাত্রে নিজের মুখ ডুবিয়ে দিলেন।

কি আশ্চর্য্য! সুলতান দেখলেন, তিনি আর সভাগৃহে নেই। নেই তাঁর সুলতানের পোষাক। নেই তাঁর পার্শ্বচর ও সেনাপতিগণ। সামান্য পোষাকে তিনি পড়ে আছেন এক নদীর তীরে—নিকটেই ঘন বন।

সুলতান বিস্মিত হলেন, ভীত হয়ে উঠলেন। নদীর তীরে তিনি একা। চিৎকার করে ডাকলেন, কেউ কোথায়ও নেই। জনহীন প্রান্তরে সেই প্রতিধ্বনি গুম্ গুম্ করে উঠলো। কিন্তু অনেকক্ষণ
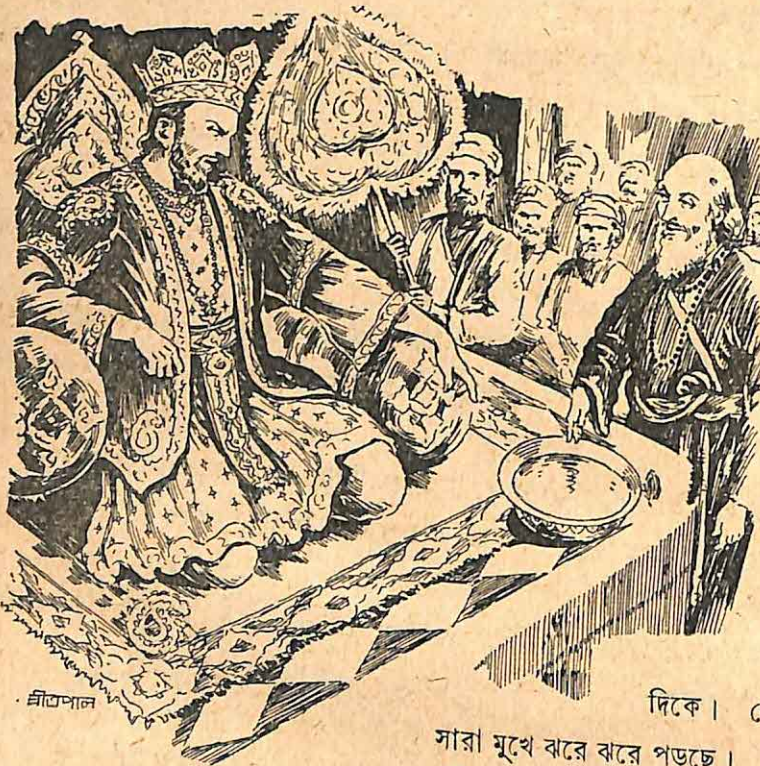
গত হল কেউ এলো না। এবার সুলতান সত্য সত্যই উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠলেন; এই নির্জ্জন নদীর তীরে কারো দেখা নেই, কোন গ্রামের চিহ্ন নেই।

এখন উপায়! কোথায় যাবেন, কোথায় দাঁড়াবেন। অনেক ভেবে চিন্তে অস্থির দ্বিধাকম্পিত কলেবরে অগ্রসর হতে লাগলেন। সম্মুখে ঘন জঙ্গল। তিনি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কোথায় পথ, ছোট ছোট আগাছা এসে তাঁর পথ রুদ্ধ করে দিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় তাঁর দেহের শক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। তথাপি পথ চলেছেন সুলতান। দেহ-মন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

টলতে টলতে সুলতান এগিয়ে গেলেন। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো সহসা জ্বলে উঠল আনন্দে। মনের সাহস এলো ফিরে। তিনি একদল কাঠুরিয়ার দেখা পেলেন, তারা কাঠের বোঝা মাথায় করে চলেছে।

'শোন! শোন! দাঁড়াও।'

কাঠুরিয়ার দল ফিরে দাঁড়াল। সুলতান দ্রুত এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে, বললেন,—'আমি সুলতান, বিপদে পড়েছি, বাঁচাও।'

কাঠুরিয়ার দল একবার মাত্র সুলতানের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। সুলতানের দীনহীন বেশ দেখে, তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে গন্তব্য স্থানে চলে গেলো।

হতাশ হয়ে পড়লেন সুলতান। নিজের অদৃষ্টকে দিলেন ধিক্কার। রাগান্বিত হলেন ফকির সাহেবের উপর। কিন্তু এখন উপায় কি? এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া। সুলতান তাঁর বিপদের কথা জানালেন এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুলতানের দিকে। পরে তাঁকে নিয়ে এলো নিজের পর্ণ কুটিরে। আহারের জন্য দিল শুকনো রুটি আর ঠাণ্ডা জল। সুলতান তা খেয়েই তৃপ্ত হলেন।

সুলতান কাঠুরিয়ার বাড়িতেই বাস করতে লাগলেন। কাঠুরিয়ার সঙ্গে তিনি কাঠ কাটতে যান। রাত্রে ফিরে আসেন। সমস্ত দিনের কাটা কাঠ বিক্রি করে যে পয়সা হয়, তাতে চলে যায় তাঁর দিন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি কেটে গেল। কিন্তু সুলতানের সুদিন আর ফিরে এলো না।

বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার এক কন্যা ছিল। সুলতান তাকে বিয়ে করলেন। কালক্রমে সেই কন্যার গর্ভে সুলতানের তিনটি সন্তান জন্মাল। সুলতানের আয় সামান্য কিন্তু সংসার বড়। এই সামান্য আয়ে সংসার চালান কঠিন হয়ে উঠল। দুঃখ দৈন্য অভাব ক্রমে বৃদ্ধির দিকেই গেল। এই সব কারণে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ বিবাদ চলতে লাগল। চলল মন কষাকষি। সুলতান অশক্ত হলেন সংসারের ভার বহন করতে, ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল তাঁর মন-মেজাজ। একেই সংসারের জ্বালা,

তার উপর স্ত্রীর গঞ্জনা, তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এক দিন এ যন্ত্রণা তাঁর সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করলো। তিনি ছুটলেন আত্মহত্যা করতে।

সুলতান ফিরে এলেন সেই নদীর পাড়ে। নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য এলো অনুতাপ, এলো ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের নিকট, বললেন,—'প্রভু! আমি দোষী, অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।' সুলতান নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

একি অদ্ভূত কাণ্ড। সুলতান দেখলেন, তিনি তাঁর দরবার কক্ষে দাঁড়ানো। সভাসদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুলতান অবাক-বিস্ময়ে সকলের দিকে চাইলেন, চাইলেন ফরিরের দিকে, সেই সৌম্যমূর্ত্তি সাধকের মুখে মৃদু হাসি। সুলতান তাঁকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন।

সব শুনে পারিষদের দল বলল,—'এ অসম্ভব জাঁহাপনা। আপনি কেবল জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তুলে এনেছেন।'

সুলতান সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি ফকির সাহেবকে বললেন,—'প্রভু! আপনার বাক্য অভ্রান্ত। সত্যি, ভগবানই শক্তিমান। আপনি আমাকে জ্ঞান দান করলেন। আপনার ঋণ ইহ জীবনে শোধ হবার নয়। আজ হ'তে হত্যা, ধ্বংস, অত্যাচার সব বন্ধ।'

ফকির সাহেব শুধু হাসলেন, এবং সুলতানকে আশীর্ব্বাদ করে প্রস্থান করলেন। অপলক নয়নে সুলতান চেয়ে রইলেন ফকিরের দিকে। দরবার কক্ষে আবার উঠল মৃদু গুঞ্জন।

আশ্বিনে

বাসুদেব গুপ্ত

আশ্বিনে রোদ্দুর ঝিকমিক আকাশে,
মেঘপরী ভেসে যায় ঝিরঝির বাতাসে।
পাখী দু'টি এলোমেলো,
পাখা নেড়ে এলো এলো,
হাসিখুশী অঙ্গনে ঝিলমিল আভাষে।

আশ্বিনে খোকাখুকু এইখানে মন্ দে ঃ
ফুলমল্লিকা হাসে মৃদুমধু গন্ধে;
পরাগের অঞ্জন
মেখে নিয়ে গুঞ্জন
তুলে তুলে চলে যায় মৌমাছি ছন্দে।

আশ্বিনে কুলুকুলু জলধারা বক্ষে
ঢেউ ওঠে,—কাশফুল হাওয়া দেয় বক্ষে।
ভোরে ভোরে ঝলমল,
শিশিরেরা টলমল
আঁখিদীপ তুলে ধরে আকাশের লক্ষ্যে॥

সেই ছেলেবেলায়

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

রাস-মেলায় এদিক ওদিক ঘুরে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। সেখানে তিনদিক কাপড় দিয়ে ঘিরে একটা দোকান বা স্টলের মত করেচে। ভালো ভালো সৌখীন ও সুন্দর জিনিস থাকে থাকে সেই স্টলে সাজানো, যেমন সুদৃশ্য ক্লক-ঘড়ি, বড় বড় পোর্সিলেনের পুতুল, চামড়ার হ্যাণ্ড-ব্যাগ, হাত-হার্মোনিয়ম (কন্‌সার্টিনা), 'হিঙ্কে'র বড় ডুপ্লেকস্‌ কেরোসিন ল্যাম্প, উৎকৃষ্ট ছাতা, ছড়ি প্রভৃতি। প্রত্যেক দ্রব্যের ঠিক পাশেই একটা কোরে লম্বা কাঠি পোতা। সামনের দিকে, চার পাঁচ হাত তফাতে ওপরে ওপরে দুটো বাঁশ দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে দর্শকদের দাঁড়াবার স্থান। আর ভেতর দিকে একটা টুলের ওপর একজন ওদেরই লোক কতকগুলো লোহার তারের বালা নিয়ে বসে আছে। তিন গাছা বালা এক পয়সাতে সে বিক্রী করচে। ঐ বালা কিনে, এমন ভাবে সেই সাজানো জিনিসগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিতে হবে, যাতে জিনিসগুলোর পাশে যে একটা কোরে কাঠি পোঁতা আছে, তার মধ্যে সেই বালা গলে গিয়ে পড়ে। এইভাবে ছুঁড়ে কোনও বালাকে যদি কোনও একটা কাঠির মধ্যে ফেলা যায়, তা হোলে সেই কাঠি-সংলগ্ন জিনিসটা সে বিনামূল্যেই পেয়ে যাবে। সুন্দর সুন্দর জিনিষগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে, লোভ সামলানো যায় না। নীলমণি আর আমি দু'জনে একপয়সা কোরে দু'পয়সাতে ছ' গাছা বালা কিনে, খুব সতর্ক দৃষ্টিতে তাগ কোরে এক একটা নির্দিষ্ট জিনিসের কাঠির দিকে ফেললুম। কিন্তু, কাঠির ভেতর না গলে, তা তার পাশে পড়লো। আবার ফেললুম। পড়লো না। আবার,······তা'ও পড়লো না। প্রত্যেকবারই কাঠির বাইরেই পড়তে লাগলো। আরো দু'একজন ফেলছিলো। তাদেরও দশা আমাদের মত। তিন তিনবার অকৃতকার্য হবার ফলে আমাদের ঝোঁক বেড়ে গেল! আবার দু'জনে দু'পয়সা দিয়ে বালা কিনলুম। আবার ছুঁড়তে লাগলুম। কিন্তু ফল—'যথা পূর্বং তথা পরম'। তখন দুঃখের সহিত স্থান ত্যাগ কোরে চলে এলুম। রাস-হাটার এদিক-ওদিক আরো খানিকক্ষণ ঘুরে, আমরা বাড়ী ফিরে এলুম।

বাড়ীতে ফিরে, খেয়ে-দেয়ে শুতে সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই আর ঘুম এলো না। রাসহাটায় সেদিন যা সব দেখে এসেছিলুম, সেই সবই মাথার মধ্যে বায়োস্কোপের ছবির মত উদয় হোতে লাগলো। রাত সাড়ে ন'টার তোপ কোনদিনই শুনতে পেতুম না; তার আগেই ঘুমিয়ে পড়তুম। কিন্তু সেদিন, শুয়ে শুয়েই রাত্রির তোপ শুনতে পেলুম। তারপর, অবশ্য এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তখন প্রত্যহ গড়ের মাঠের কেল্লা থেকে (Fort William) দু'বার কোরে তোপ দেগে কোলকাতাবাসীকে সময় জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। একবার ঠিক বেলা একটার সময়; আর একবার রাত সাড়ে ন'টার সময়। এখন সেটা বন্ধ হোয়ে গেছে। রাত্রের তোপটা অনেক দিন আগেই বন্ধ হোয়েছে। বেলা একটার তোপটা কয়েক বছর আগেও, মনে হয় যেন দাগা হোত। শুনেছি, প্রত্যেকবার

কামানের তোপ দাগতে নাকি পনর টাকা কোরে ব্যয় হোত। বেলা একটার তোপটা খাঁটী সময়-জ্ঞাপক ছিল। সূর্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। সেই হিসাবে বেলা ঠিক একটায় ঐ তোপটা পড়তো। রাত সাড়ে ন'টার তোপটা ঘড়ি দেখে দাগা হোত।

পরের দিন সকালে উঠতেই ঠাকুমা'র ডাক শুনে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। ঠাকুমা বল্লেন—"জটার মাকে কিছু কড়ি বার কোরে দে দেখি, পাঁচকড়ি বেনের দোকান থেকে নুন আর মশলা নিয়ে আসুক।" জটার মা আমাদের বাড়ীর ঝি। তাকে ডেকে দালানের একটা আমকাঠের বাক্স থেকে দু'চার আঁজলা কড়ি বার কোরে তার আঁচলে দিয়ে দিলুম। চুপি চুপি তাকে বোলে দিলুম—"এক পয়সার 'লবনজুস' আনবি, কড়ি বেশী দিয়েছি।" তখন বেনের দোকান থেকে মাঝে মাঝে কড়ি দিয়ে জিনিস কেনা হোত। এই কড়ি আমরা পেতাম কালীর মন্দির থেকে। কালী মন্দিরের আমরা ছিলাম—অন্যতম সেবাইত। তখনকার দিনে অনেক দর্শনার্থী কালী মন্দিরে 'কড়ি' দিত। মুদীর দোকানে, বেনের দোকানে তখন কড়ির বিনিময়ে দ্রব্যাদি দেবার রেওয়াজ ছিল। আমাদের পাড়ার পাঁচকড়ি বেনের দোকানে খুব বড় একটা মাটীর গামলা ছিল। তার ওপর একখানা কাঠের 'বারকোষ' থাকতো। সেই 'বারকোষের' ওপর কড়িগুলো ঢেলে দেওয়া হোত। পাঁচকড়ি সেই কড়িগুলো একগণ্ডা একগণ্ডা কোরে গুণে নিয়ে, সেই মূল্যের জিনিস দিত। কড়িগুলো তার আগেই সে সেই গামলাটার মধ্যে ঢেলে রাখতো। কড়ি, তখন শুধু মুদ্রা হিসাবেই ব্যবহৃত হোত না, অনেক দিকেই তখন কড়ির ব্যবহার ছিল। কাপড়-চোপড় রাখবার জন্য তখন কড়ির আল্না তৈরী হোত। এ আল্না—দাঁড়-করানো আল্না নয়, ঝোলা-আল্না। মাটীর ঘর হোলে, 'আড়া'র সঙ্গে আর পাকা ঘর হোলে কড়ির সঙ্গে এ আল্না ঝোলানো থাকতো। দেখতে খুব সুন্দর ও পরিষ্কার ঝক্-ঝকে ; অর্থচ তার দাম খুব কম। আমাদের ঘরে এখনো একটা কড়ির আল্না আছে ; ওর বয়স—অন্ততঃ একশো বছর।

যাই হোক, খানিক পরে জটার মা দোকান কোরে ফিরে এল। রান্নাঘরে তার গলার আওয়াজ পেলুম। সে শুধু দোকান থেকে জিনিস নিয়ে ফেরে নি, মস্ত একটা খবর নিয়েও ফিরে এসেচে—"মাগো-মা, ও-বাড়ীর পদ্মবুড়ী ফিরে আইলো।"

কথাটা কানে শোনবামাত্র ছুটলুম—রান্নাঘরে। ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হোয়েচে ঠা-মা ?"

"পদ্ম পিসি না কি যমের বাড়ী থেকে ফিরে এসেচে !"

শোনবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুট্লুম—উমেশ দাদাদের বাড়ী। তাঁরি মাসি, থুড়-থুড়ে পদ্মবুড়ী, বয়স তাঁর পঁচানব্বই বছর—তিনি মরে গিয়ে আবার নাকি ফিরে এসেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! সুতরাং, পড়ে রইলো আমার লজেঞ্জুস্, পড়ে রইলো আমার জলখাবার—ভোঁ-ছুট্ দিলুম উমেশ দাদাদের বাড়ী।

পদ্মবুড়ীর ব্যাপারটা তাহোলে বলা যা'ক।

আমাদের বাড়ীর সামনে, রাস্তার বিপরীত দিকে, উমেশ বাঁড়ুয্যের বাড়ী। পদ্ম ঠাকরুণ হোলেন তাঁর মাসী। পাড়ার ভেতর পদ্মপিসিই ছিলেন—সকলের চাইতে বয়সে বড়; সম্ভবতঃ একশো পার হোয়ে গেছলেন। পদ্মবুড়ীর মস্ত একটা গুণ ছিল। তিনি নাড়ী দেখতে পারতেন খুব ভালো। রোগীর নাড়ী দেখে তিনি বলে দিতেন যে সে মরবে কি না; কিংবা যদি মরে, ত কখন মরবে। তখনকার দিনে অনেক বিজ্ঞ কবিরাজের এইরূপ নাড়ী-জ্ঞান থাকতো বটে, কিন্তু সাধারণ একজন স্ত্রীলোকের এইরূপ নাড়ী-জ্ঞান থাকা বিস্ময়ের কথা। পদ্মপিসির চেহারা ছিল, ঠিক একটি শুকনো, চুপসে-যাওয়া পাকা আম। গায়ের রং গৌর বর্ণ, মাংস শুকিয়ে যাওয়ায়, গায়ের ছাল সব কুঁচকে গিয়েছিলো, কোমর ভেঙ্গে যাবার ফলে, শীর্ণ দেহখানা কুঁজো হোয়ে গিয়েছিলো। মাথায় চুল ছিলইনা; সামান্য যা ছিল, তার রং ছিল ঘোলাটে সাদা। এ অবস্থাতেও পদ্মপিসি একগাছা যষ্টির সাহায্যে পাড়ার মধ্যে এবাড়ী ওবাড়ী বেড়িয়ে বেড়াতেন। ঐ সময়ে তাঁর এক হাতে ঐ যষ্টি, অন্য হাতে ছোট্ট একটি পিতলের হামান্‌দিস্তা থাকতো। ওই কচি বয়সেও, দন্তবিহীন মুখে তিনি পান না খেয়ে থাকতে পারতেন না। সুতরাং যে বাড়ীতেই যেতেন, তাঁরা তাঁকে পান দিতেন আর সেই পান তিনি তাঁর ঐ হামান্‌-দিস্তাতে ছেঁচে খেতেন। দাঁত না থাকায় তিনি—শক্ত সুপারির জন্যে হামান্‌-দিস্তায় পান থেঁতো কোরে খেতেন বটে, কিন্তু ভাত, তরকারী, আলু-পটল ভাজা, এমন কি রুটী, পরেটা, লুচি তিনি তাঁর দন্তহীন মাড়ির দ্বারাতেই বেশ কায়দা কোরে ফেলতেন—মাড়ি তাঁর এত শক্ত পোক্ত হোয়ে পড়েছিল। পদ্মপিসির দাঁত গেলেও, চোখের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক ছিল। বিনা চশমাতেই তিনি বেশ দেখতে পেতেন ও সব কাজই করতে পারতেন।

এহেন পদ্মবুড়ী, বছর পাঁচ আগে হঠাৎ একদিন মর মর হলেন। তখন তাঁর বয়স অন্ততঃ পঁচানব্বই বছর। তখনই ভবানীপুর থেকে তখনকার দিনের নাম-করা গোপাল ডাক্তারকে আনা হোল। সারা দিনরাত ওষুধপত্তর চললো। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার দিকে তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়লো। সকলে ব্যস্ত হোয়ে কানাই কবিরাজকে ডেকে আনলে। কানাই কোবরেজ কালীঘাটের নামকরা কবিরাজ। তিনি এসে সব শুনলেন; শুনে পদ্মপিসির নাড়ী টিপে ধরে বসলেন। আশ্চর্যের কথা যে, সকলের নাড়ী ধোরে যিনি বলে দিতেন যে, সে বাঁচবে কি মরবে, আজ তাঁরই নাড়ী টিপে বসলেন—কানাই কোবরেজ! কানাই কোবরেজ একমনে অনেকক্ষণ নাড়ী ধরে দেখে বল্লেন—

"শেষ অবস্থা; এখনি 'গঙ্গা-যাত্রা'র ব্যবস্থা কর।"

তোমরা এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই হয়ত 'গঙ্গা-যাত্রা' কথাটা শোননি, বা ব্যাপারটা যে কি, তা জান না। তখনকার দিনে মানুষের—বিশেষতঃ বুড়োবুড়ীদের যদি গঙ্গাতীরে মৃত্যু হোত, তাহোলে সকলের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর সেই সব মৃতের স্বর্গলাভ হোত। এই উদ্দেশ্যে অনেক মুমূর্ষু কেই মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়া হোত। সেখানে নিয়ে যাবার পর, কেউ বা দু'চার ঘণ্টা, কেহ বা দু'চার দিন পর্যন্ত বেঁচে থেকে মারা যেতেন। 'গঙ্গা-যাত্রা' করালেই বুঝতে হবে

যে গঙ্গাযাত্রীর মৃত্যু নিশ্চিত। দৈবাৎ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হয়ত হাজারে একজন, 'গঙ্গা-যাত্রা' করেও আবার সুস্থ হোয়ে উঠে ঘরে ফিরে এসেছেন। এই রকম গঙ্গাযাত্রীদের জন্যে, গঙ্গাতীরবর্তী ঘাটের ওপর দু'একখানা ঘর প্রস্তুত করা থাকতো। দূরাগত যাত্রীদের সঙ্গের লোকজনদের আহারাদি করবার জন্মে স্বতন্ত্র পাকের ঘরও থাকতো।

কানাই কোবরেজের অভিজ্ঞ হাত আর পদ্মপিসির মরণকালের ক্ষীণ নাড়ী—এ দু'য়ের মিলিত যুক্তি অনুসারে পদ্মপিসিকে গঙ্গাযাত্রা করাবার ব্যবস্থা হোতে লাগল। কিন্তু গোপাল ডাক্তার একটু ভেবে কানাই কোবরেজকে বল্লেন—"গঙ্গাযাত্রা করলেই ভাল হয়; তবে আজকের রাতটা দেখা যাক। কাল সকালে আমি এসে একবার দেখবো।" কিন্তু রাত্রের ভেতরেই পদ্মপিসির অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। সকালে গোপাল ডাক্তারও এলেন, কানাই কোবরেজও এলেন। পরিবর্তন দেখে তাঁরা দু'জনেই সেদিনকার মত 'গঙ্গাযাত্রা' বন্ধ রাখলেন। তখন আবার পুরোদমে চিকিৎসা চলতে লাগলো এবং তার ফলে পদ্মপিসি—আবার চাঙ্গা হোয়ে উঠলেন ও আবার পূর্বের মত, একহাতে তাঁর সেই যষ্টি ও আর একহাতে সেই হামান-দিস্তাটা নিয়ে পাড়ার এবাড়ী-ওবাড়ী বেড়াতে লাগলেন।

[চলবে]

হাওয়া আফিসের কথা

দুর্গাদাস সরকার

হাওয়া আফিসেই হাওয়া আটকানো আছে,
তাই এসে পৌঁছে না আমাদের কাছে।
প্রাণ করে আইঢাই
তবু হাওয়া কই পাই
পাখার তলায় প্রাণ কদ্দিন বাঁচে?

হাওয়া আফিসের হাওয়া পাবোই বলে'
হাফ ফার্লং কাছে এসেছি চলে।
তবু হাওয়া আসবে না,
মুখ খুলে হাসবে না
গরম কাটে না রাঙা বরফ-জলে।

'হাওয়া নেই হাওয়া নেই' ওঠে কলরব,
হাওয়ার আফিস থাকে তেমনি নীরব।
হাওয়া ছিল কদ্দূরে
টিন উড়ে ঘর উড়ে,
হাওয়া আফিসের কথা উল্টোই সব।
হাওয়ার আফিস থাকে তেমনি নীরব।
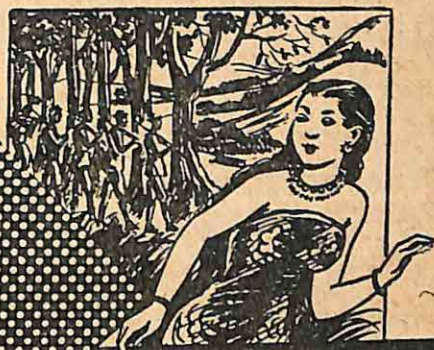
—তিন—

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সদিয়া শহর সভ্যজগতের শেষ ঘাঁটি। তারও পূর্ব্বে ও দক্ষিণে যে পর্ব্বত ও জঙ্গল ঢাকা জগৎ ও তাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে নানা জাতির বাস সে-সব সম্বন্ধে এই গল্পের যুগে বাইরের লোকের কিছু জানা ছিল না। দেশটি যেমন দুর্গম, দেশের অধিবাসীরাও তেমনি হিংস্র আর অসভ্য। ইংরাজের অধিকার সেখানে নামমাত্র। কোহিমার কাছাকাছি অসভ্য জাতিগুলি কতকটা বশীভূত হলেও সম্পূর্ণভাবে তারা ইংরাজের আয়ত্তে আসেনি। কিন্তু ইংরাজের শক্তির কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর তারা সংঘর্ষ এড়িয়ে চলত। এখনো সেই জাতিরা নিজেদের এলাকাতে বাস করে, নিজেদের ধরনে জীবন ধারণ করে। বহির্জগতের সঙ্গে তারা সহজে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না। কিন্তু যারা সদিয়া বা কোহিমার আশেপাশে থাকে তারা নিজেদের দেশে উৎপন্ন নানা জিনিষ নিয়ে ব্যবসা করতে আসে। তাদের ব্যবসা টাকাকড়ি নিয়ে নয়, দ্রব্য বিনিময় করবার ব্যবসা। চাল, তুলো, ভেষজ রং, হাতে বোনা কাপড় ইত্যাদি তাদের ব্যবসায়ের সামগ্রী। এই সকল জিনিষ তালপ মাকুম, সদিয়া ও পশ্চিমে কোহিমায় বিক্রীত হয়। কোন কোন অসভ্য জাতির তৈরী বেতের নানা জিনিষপত্র ও বিচিত্র কারুকার্য্য

করা হাতে-বোনা কাপড় সত্যই অতি সুন্দর। সেই সব বর্ত্তমানকালে স্যালভেশন আর্মির লোকদের হাতে পড়ে অত্যন্ত উন্নত হয়েছে, এবং সেগুলো কলকাতার কিছু সাহেবী দোকানে বেশ চড়া দামেই বিক্রি হয়। আমাদের গল্পের যুগে নাগাদের ব্যবসা শুধু কোহিমাতেই আবদ্ধ ছিল, সদিয়ার সঙ্গে খুব বেশী কারবার আরম্ভ হয় নি। এই সদিয়া শহরে নিউসেল অভিযানের প্রথম আড্ডা স্থাপিত হ'ল।

কলকাতা থেকে প্রভূত দ্রব্যসম্ভার একত্র করে সদিয়া পাঠানো হয়েছিল। হিরণ তার অধিকাংশ কলকাতাতেই দেখেছিল। সদিয়া পৌঁছে দেখা গেল, তাদের যে বাংলোটায় আড্ডা নিতে হবে তাতে জিনিষের আর অন্ত নেই, তার ওপর গাছের তলায় তলায় বাঁধা অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে অত্যন্ত কর্ম্মঠ চেহারার ঘোড়া ও দুটো হাতী। ঘোড়া যেমন মানুষকে 'সওয়ারী' দেয় তেমনি তারা অত্যন্ত বেশী বোঝাও বইতে পারে। এ-সব ছাড়া হিরণ দু'টি মানুষ দেখতে পেলে। যার সঙ্গে ওর আলাপ হ'ল তার নাম সর্দ্দার হরদেও সিং, দেহে বিরাট ও জীবিকায় ওভরসিয়র। হরদেও যে কাজ করেনি তাকে কাজ বলা যায় না। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ। সে পূর্ব্বে এ অঞ্চলে, অভিযানে কাজ করেছে। কোন এক শিখ রেজিমেণ্টে সর্দ্দার সাহেব ল্যান্স নায়েক ছিল, এখন সে ভারত সরকারের সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলেই ঘোরে। নিউসেল তাকে সরকারের কাছ থেকে ধার নিয়েছে। লোকটা অত্যন্ত দক্ষ। কতবার যে সর্দ্দার সাহেবের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে তার ঠিক নেই।

যে লোকটির সঙ্গে হিরণের আলাপ হল না সে লোকটা দীর্ঘাকৃতি, তার গায়ের রং তামাটে, মাথায় তার লম্বা লম্বা চুল। লোকটা অত্যন্ত চটপটে, তার ছোট ছোট চোখ দুটি যেন চাতুর্য্যে ভরা। লোকটির নাম তার-নেম। সর্দ্দার হিরণকে খবর দিলে, তার-নেম কোন একটা পাহাড়ী জাতির রাজা, তার গণ্ডাকয়েক রাণী আছে। তার-নেমকে আনা হয়েছে অভিযানের পথপ্রদর্শক হিসাবে, সমগ্র বুনো দেশটা তার নাকি নখদর্পণে। তার-নেম ও অঞ্চলে খুব কুটিল যোদ্ধা বলে খ্যাত। হিরণের কিন্তু লোকটাকে ভাল লাগল না।

সদিয়ায় যিনি ডেপুটি কমিশনার তাঁর নাম হার্ভি। লোকটি দেখতে সদাশয়, ব্যবহারে অমায়িক। কিন্তু তাঁর নামে বুনো জাতিগুলো থরহরি কাঁপে। হার্ভি আগে কোহিমার শাসক ছিলেন। সেখানকার নাগাদের বশ করে তিনি এখন সদিয়ায় এসেছেন। বুনো জাতিদের বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হার্ভির মত কোন সিভিলিয়ন তখন ভারত সরকারের আর কেউ ছিল না। এই হার্ভি হলেন নিউসেল অভিযানের বিশেষ উপদেষ্টা।

দু'টি জাতি তখনো ইংরাজের আয়ত্তে আসেনি একটি আবর ও অন্যটি পূর্ব্বাঞ্চলের আও নাগা। নিউসেলের এই দু'টি জাতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার আগ্রহ ছিল। হার্ভি সাহেব উপদেশ দিলেন, যে আগে নাগাদের পরিচয় নেওয়া শ্রেয়ঃ হবে, তাদের দেশে তখনো বাইরের লোকের পা পড়েনি,

হয়ত তারা খুব বেশী প্রতিকূল আচরণ করবে না। আবরদের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে আছে, তারা
সহজে বিদেশীদের নিজের দেশে ঢুকতে দেবে না।

নিউসেল হার্ভির কথা মেনে নিলে। কথা রইল যে নাগাদেশ দেখে শুনে হাতে সময় থাকলে,
আবরদের তত্ত্ব নেওয়া হবে, তাদের দেখবার জন্য অধিকতর স্থানীয় ও অনেক বেশী সরকারী
সাহায্যের প্রয়োজন।

যখন নাগাদেশে যাওয়াই মত হল, হার্ভি উপদেশ দিলেন যে, তখন সদিয়ায় মূল আড্ডা স্থাপন
করা উচিত হবে না, আরো কাছাকাছি কোন স্থানে আড্ডা স্থাপন করতে হবে। নূতন আড্ডা ছুটো
জায়গায় করা যেতে পারে, একটা মাকুম, নাগা পর্ব্বতমালার পাদদেশে, তালপ থেকে মাকুম রেল-
পথে যাওয়া যায়।

মাকুম অপেক্ষাকৃত বড় বসতি, সেখানে তেল আর কয়লার খনি আছে। মাকুম কয়লার
জন্য বিখ্যাত, অমন কয়লা ভারতের কোথাও জন্মায় না। কিন্তু তার চেয়ে উপযুক্ত স্থান হবে
মকলুম, নাগাদেশের যতটুকু জরিপ করা হয়েছে মকলুম তার অন্তঃস্থল। এই পর্ব্বত-সমাকুল
দেশের ওপারে, অর্থাৎ পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকটা একেবারে অজ্ঞাতরাজ্য, সেখানে যেতে হলে
লামটংএ আড্ডা করা ভিন্ন উপায় নেই।

উত্তরের স্থানগুলো হার্ভি সাহেবের এলাকায় কিন্তু লামটং ভিন্ন ডেপুটি কমিশনারের শাসনাধীন,
সেখানে যেতে হ'লে সদিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে সেই কোহিমা ঘুরে যেতে হবে,
তা হলে অভিযানের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হবে।

আবার জিনিষপত্র একত্র করে মাকুম চালান হ'ল। মাকুম থেকে মকলুম পর্য্যন্ত নিরাপদ
রাস্তা। অত্যন্ত ভারী ও বাড়তি কিছু মালপত্র মাকুমে ফেলে রেখে অভিযানকারীরা মকলুমে
গেল। ঘোড়া ও হাতীর পথ, পথটা নিরাপদ হলেও সুগম নয়। মকলুমে একটা মাটির কেল্লা, তাতে
মাত্র দশজন গুর্খা সেপাই ও একজন ব্রিটিশ অফিসার বাস করে। জীবন তাদের একদম নিরুদ্বেগেই
কাটে। মকলুমে বিরাট কাঠের আড়ৎ, এই সব কাঠ তালপ, লখিমপুরে চালান হয় ও তা দিয়ে চায়ের
বাক্স তৈরী হয়। মকলুমে অনেকগুলো খনিজ তেলের কূপ, কিন্তু সেগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,
তা থেকে বোধ করি আর তেল পাওয়া যায় না। এই এলাকার বাইরে যখন বিদেশী মানুষের
মুণ্ড সংগ্রহ করবার জন্য কোন বুনো জাতি ক্ষেপে ওঠে তখন দাঙ্গা করা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।
তারা মাঝে মাঝে বনে-জঙ্গলে একা পেলে এক-আধটা গুর্খার মুণ্ড যে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় না
এমন নয়।

হিরণের এই বৃটিশ অফিসারটিকে দেখে মায়া হল। লোকটি নিঃশব্দে নিজের দৈনিক কাজ করে
বিশ্রামের সময় পুরানো খবরের কাগজ পড়ে আর প্রতি রাত্রে নির্ব্বাসনের দুঃখ লাঘব করবার জন্য মদ
খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। বাইরের পৃথিবীতে হু হু করে দিনে আসে যায়, কিন্তু মকলুমে সূর্য্যোদয় হলে

আর যেন সূর্য্যাস্ত হ'তে চায় না, রাত্রি নেমে আসে তা আর প্রভাত হ'তে চায় না। হিরণ এই অফিসারটিকে অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখত।

মকলুমের নীচেই একটা বিস্তৃত নদী, তাতে হাজার হাজার গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনা হচ্ছে। নদীর ওপারে পায়ে চলা পথ! দু'দিন পরে অভিযানকারীরা তোড়জোড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি গ্রাম পার হয়ে প্রায় পনেরো মাইল দূরে একস্থানে তাঁবু ফেল্লে। তারপরেই নিবিড় জঙ্গল আর পাহাড়ের পর পাহাড়, সমতল ভূমি একেবারে বিরল।

হার্ভি নিউসেলকে বলে দিয়েছিল যে মকলুম থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভেতরের দিকে আকাশ বলে একটা জাতি আছে, তাদের গ্রামের নাম দুমা, এই জাতিটা শান্তস্বভাবের ও বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ অনেকদিন মিটে গেছে। তবুও তাদের যুবকেরা যে মুণ্ড খুঁজে বেড়ায় না এমন কথা নয়। কিন্তু দুমা যাবার পথ নেই। অভিযানের সুযোগে মকলুম থেকে দুমা পর্য্যন্ত একটা পথ তৈরী করে নেওয়া মন্দ হবে না।

হার্ভি পথ তৈরী করবার জন্য শ' দুই মজুর ও দশজন গুর্খা রক্ষীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হরদেও আর হিরণ এই পথ তৈরী করবার কাজে নিযুক্ত হল। রাস্তার কাজে বেরোবার সময়ে নিউসেল ওদের বলে দিলে যে শিকারের প্রয়োজন ছাড়া ওরা যেন পারতপক্ষে কোন মানুষের ওপর গুলি না চালায়, তাহলে অসভ্যেরা ক্ষেপে যাবে ও অভিযানটির নিরাপদে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে না ! মানুষের ওপর গুলি চালাবার সম্ভাবনার ইঙ্গিতে হিরণের হৃৎকম্প হল। হরদেও ওর মনের কথা বুঝে ওকে আশ্বাস দিলে তোমার ও কাজে হাতেখড়ি হয়নি বাবুজি। আপাততঃ আমি তোমাকে সামলে রাখব, ভয় পেয়োনা। তবে কালই হোক বা দু'দিন পরেই হোক আত্মরক্ষা করবার জন্য যে নানা জীবহত্যা করতে হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দু'দিনেই সব শিখে যাবে, মরদের আবার ভয় কোন্‌খানে !

আশপাশের গাছপালা কেটে পথ থেকে যথাসম্ভব পাথর সরিয়ে ওরা প্রথমদিন ক্রোশ তিনেক পথ পরিষ্কার করে ফেল্লে। সন্ধ্যার একটু আগে পথের ধারে খানিকটা খোলা জায়গায় ওদের তাঁবু পড়ল। সাহেব দু'জন তার-নেম ও হার্ভির আকাশদের কাছে প্রেরিত দূত ও কিছু জিনিষ নিয়ে এগিয়ে গিছল, কথা ছিল দুমাতে দু'দলের দেখা হবে। হিরণদের তাঁবুর অদূরে রক্ষীদেরও দুটো ছোট ছৌলদারী পড়ল, আর মজুরের দল তাঁবুর চারদিকে আগুনের বেড়া তৈরী করে মুক্তাকাশের নীচেই বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করলে। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সর্দ্দারজীর তৈরী পরোটা তরকারী খেয়ে হিরণের ঘুমোতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু অন্ধকার হবার পর থেকেই চারদিকে নানা স্বরের হুঙ্কার আর গর্জ্জন শোনা গেলেই মজুরেরা কানেস্তারার আওয়াজে বনকে মুখর করে তুলছিল। হরদেও হিরণের সচকিত ভাব দেখে হেসে ফেল্লে—"তুমি একেবারে নাবালক বোসজী, ভাগ্যে সাহেবেরা তোমাকে এ অবস্থায় দেখতে পায় নি। উঠে এস, তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে মজা দেখ।" সর্দ্দারের এই প্রিয়দর্শন বাঙালী ছেলেটির ওপর বোধ করি একটু মায়া জন্মেছিল।

দু'জনেই ওরা তাঁবুর বাইরে গেল। অদূরে গন্‌গনে আগুনের চক্র। মাথার ওপর শরৎ-প্রসন্ন ঝিকমিকে তারাভরা আকাশ। হীরকোজ্জ্বল বিরাট ছায়াপথের আলো বুঝি বা ধরণীকেও আলোকিত করেছে। সে আকাশ দেখে মনে কবিত্ব জাগে না এমন বাঙালীর ছেলে নেই, হিরণের এই পরিবেষ্টনীটা খুব ভাল লাগল। হঠাৎ আগুনের বেড়ার ওপারে আলোর পরিধির ভিতর একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল। হিরণ সবিস্ময়ে দেখলে হলুদবরণ অঙ্গে কালো ডোরাকাটা বিরাট এক ব্যাঘ্ররাজ, বিদ্যুৎগতিতে তিনি আলোর পরিধি পার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন।

[চল্‌বে]

রণজিত মুখোপাধ্যায়

স্যামুয়েল ক্লীমেন্স

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে স্বর্ণ-খনির সন্ধান সবেমাত্র পাওয়া গিয়েছে। দলে দলে লোক এসে হাজির হয়েছে এখানে। লক্ষী কারো প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, মাটির নিচে তাল তাল সোনা পেয়ে সে হয়েছে কোটীপতি। কেউবা সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খুইয়ে হয়েছে পথের ভিখারী।

স্যাম আর বিল নামে দুই ভাগ্যান্বেষী মাসাধিক কাল ধরে ঘুরছে সুবর্ণের সন্ধানে বনে জঙ্গলে। এ কাজে বিল অভিজ্ঞ। সে উৎসাহিত করে স্যামকে, আর কিছুদিন ধৈর্য ধরলেই নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে স্বর্ণ-খনি। স্যাম একটুও উৎসাহিত হয় না তাতে। ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্রমণে প্রলুব্ধ হয়েই সে এসেছে, সেই সঙ্গে যদি পাওয়া যায় কিছু সোনা তাহলে ধনী হতে বাধা নেই!

এমনি করে আরো কয়েকটি নিষ্ফল দিন অতিবাহিত হোলো। স্যামের ধৈর্য বুঝি আর থাকে না! একদিন সন্ধ্যায় নদীর জলের সঙ্গে পাওয়া কিছু স্বর্ণ রেণু পেয়ে বিল উল্লসিত হয়ে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো সে, "সোনা, এতোদিনে পাওয়া গেছে সোনা।" তার হাতের পাত্রের নিচে পড়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র কয়েক কুচি সোনা দেখে স্যামের যেটুকু উৎসাহ ছিলো তাও নিভে গেল। বনে বাদাড়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করবার পর এইটুকু মাত্র সোনা!

পরের দিনই সে মন স্থির করে ফেললো। সেদিন কাজ থেকে ফিরে স্যামকে কুটীরে দেখতে পেলো না বিল। তার বদলে পেলো একখানা চিঠি—স্যামের লেখা: "সব সোনা তুমিই নিয়ো বিল। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম আমার সইলো না। আরো সহজে বড়োলোক হবার কোনো রাস্তা আমায় খুঁজে বার করতে হবে।" এই ঘটনার মাত্র দুদিন পরেই ঠিক ঐ জায়গা থেকেই তাল তাল সোনা পেয়ে বিল হয়ে গেল বড়োলোক।

আর স্যাম? সোনার খনির মালিক না হয়েও সে হোলো বড়োলোক। বিলের কথা আজ কেউই জানে না কিন্তু স্যাম অর্থাৎ স্যামুয়েল ক্লীমেন্স-এর নাম জগদ্বিখ্যাত। আর তার থেকেও বিখ্যাত স্যামের ছদ্মনাম, মার্ক টোয়েন—যে নামে সে বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

আমেরিকার ফ্লোরিডা নামে এক জায়গায় ১৮৩৫ সালের ৩০ শে নভেম্বর স্যামুয়েল ক্লীমেন্সএর জন্ম হয়। মাত্র বারো বছর বয়সেই পিতৃহীন হওয়ার দরুন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। জীবিকা অর্জনের জন্যে অল্প বয়সেই ছাপাখানায় কাজ করতে সুরু করেন স্যামুয়েল; একাজে হাতেখড়ি হয় তাঁরই বড়ো ভাই-এর সংবাদপত্র "মিজৌরী ক্যুরিয়ারে" কাজ করবার সময়। ছোটোবেলা থেকেই মিসিসিপি নদীতে চলাচলকারী ফেরী ষ্টীমারের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিলো এবং এই ষ্টীমারে পাইলট হিসাবে শিক্ষানবিশী করবার সুযোগ পেতেই তিনি ছাপাখানার কাজ ছেড়ে দিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তিনি মিসিসিপি নদীতে ফেরী ষ্টীমারে কাজ করেন।

গৃহযুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছুকাল পরে ভার্জিনিয়া সিটিতে "এণ্টারপ্রাইজ" নামে এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন স্যামুয়েল। এই পত্রিকাতে লেখবার সময়ই প্রথম "মার্ক টোয়েন" ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। নিউইয়র্ক শহরের একখানি সংবাদপত্রে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত "দি সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব ক্যালাভেরা কাউন্টি" নামে একটি রচনা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দিলো। সারা আমেরিকা জানলো তাঁর নাম। এর পর থেকে তিনি অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৭০ সালে তাঁর বিবাহ হয় এবং কালক্রমে তিনটি কন্যা ও একটি পুত্রের জনক হন।
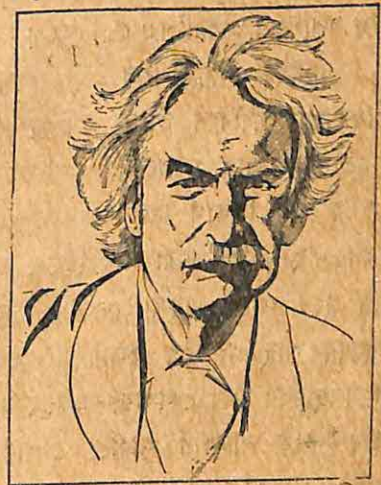
সোনার খনির সন্ধান করা ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে ধনী হবার জন্যে চেষ্টা করেছেন তিনি। তার মধ্যে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসা ও ছাপার হরফ তৈরি করার যন্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাঁর সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হয়। ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে বিভিন্ন দেশে ইংরেজি সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন স্যামুয়েল।

অল্পবয়সে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েও 'যেভাবে তিনি ইংরেজি সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন তার জন্যে আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও এল্. এল্. ডি, উপাধিতে ভূষিত হন। এমনকি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে "ডক্টর অব লিটারেচর" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯১০ সালে, যে বছর হ্যালীর ধূমকেতু আমেরিকায় দেখা গিয়েছিলো, ২১ শে এপ্রিল টম সইয়ার, হাক্‌লবেরী ফিন, লাইফ ইন দি মিসিসিপি প্রভৃতির লেখক মার্ক টোয়েন পরলোকগমন করেন।

তথাগতের মত ও পথ

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

—এক—

নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন—জীবনটা দুঃখ দিয়ে গড়া, মানুষ দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে না। আবার অন্যরা বলেন—সুখ রয়েছে তোমার হাতের মুঠোয়, ধার ক'রেও পায়েস পোলাও খাও! কিন্তু চোখের সামনে নিত্য আমরা রোগশোক জরামৃত্যু দেখতে পাচ্ছি,—দুঃখ নেই একথা বলি কী ক'রে? কেউ রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে, কেউবা মনের দুঃখে হা-হুতাশ ক'রে মরছে। সৃষ্টির সময় থেকে মানুষ আজ অবধি কেঁদেই চলেছে; সে অশ্রুবন্যার কাছে সপ্তসিন্ধুর জলরাশিও যেন তুচ্ছ! এ দুঃখের কি শেষ নেই?

বাণবিদ্ধ মরালশিশুর কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থ চোখের জল ফেলেছিলেন শৈশবে: মানুষের জরামরণদুঃখ যৌবনে তাঁকে করলো ঘরছাড়া। দুঃখকে অলীক ভেবে যে অস্বীকার করতে চায় সে তো মূর্খ, আর দুঃখকে চরম সত্য ব'লে মেনে নেয় যে—সে তো কাপুরুষ। বিলাসের মধ্যে বাস ক'রেও সিদ্ধার্থ অলস কল্পনার জাল বুন্‌তেন না,—শূন্যে সৌধ নির্মাণ করতেন না। তিনি বল্লেন—"দুঃখ তো মায়া বা মরীচিকা নয়,—উড়িয়ে দেবো বল্লেই তা'কে উড়িয়ে দেয়া যায় না; আর দুঃখ আছে একথা জেনেও শুধু ভোগসুখের স্বপ্ন দেখা চলে না। অথচ জীবন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো টলমল্‌ করছে। কাজেই মৃত্যু এসে চুলের মুঠি ধরবার আগে দুঃখের শেষ কোথায়—এই কথাটি জানা নিতান্ত দরকার। দুঃখের অবসান কেমন ক'রে সম্ভব—তাই জান্‌বার আগ্রহে রাজার দুলাল সিদ্ধার্থ ভিখারীর সাজে বেরিয়ে পড়লেন অজানা পথে। পেছনে প'ড়ে রইলো সিংহাসন, রাজ্যপাট ও ভোগের উপকরণ সম্ভার। পত্নীর আক্ষেপ, পুত্রের কান্না ও প্রজার দীর্ঘশ্বাস নিখিলের দুঃখরাগিণীর সঙ্গে সুর মিলালো।

কিন্তু পথের সন্ধান দেবে কে? সন্ধান করতে হয় সাধুসন্তের কাছে—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন সিদ্ধার্থ প্রকৃত গুরুর খোঁজে—যে গুরু তাঁর চোখ খুলে দেবেন জ্ঞানের কাজলকাঠি বুলিয়ে। কিন্তু খাঁটি সাধুর দেখা মিল্‌লো না: ভেক্‌ ধরলেই কিছু যোগী হয় না! পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ব'সে পড়লেন নিরঞ্জনা নদীর তীরে—নিজের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াবেন এবার, গুরুর সাহায্য ছাড়াই সাধনা করবেন। গুরুর কৃপা পাননি ব'লে সাধনা তো আর বন্ধ রাখা চলে না।

বনভূমির নিরালা কোণে সুরু হলো তপস্যা—সে কী দারুণ তপস্যা! শরীরের ওপর দুঃসহ অত্যাচার আর একাগ্রতার ভীষণ পরীক্ষা। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রায় ভুলেই গেলেন: শীতের হিম, গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা কোনো কিছুই তাঁর ধ্যানে বাধা দিতে পারলো না। অনশনে শরীর ও

মন নিস্তেজ হ'য়ে এলো, অনিন্দ্য কান্তিতে অসুখের কালোছায়া পড়লো, ফুলের মতো কোমল তনু জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হলো—তবু সে ধ্যানের বিরতি নেই। অবশেষে সে ধ্যান ভাঙলো, কিন্তু "দুঃখের নিবৃত্তি কিসে" এই প্রশ্নের উত্তর মিল্‌লো কি ? শাক্যমুনি তখনো যেই তিমিরে, সেই তিমিরে !

দেহ ও মনের যখন এ রকম অবস্থা—তখন একদিন নদী থেকে জল আন্‌তে গিয়ে হঠাৎ তিনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন। মূর্ছা যেম্‌নি ভাঙলো, তাঁর জ্ঞানচক্ষু চকিতে খুলে গেলো। শিষ্যদের ডেকে বল্লেন "বন্ধুগণ, ভুলপথে চলেছি আমরা ; সাধনার মার্গ এ-নয়। দেহের ওপর অত্যাচার করলেই আত্মার উন্নতি হয় না। মৃত্যুকে জয় করতে গিয়ে অকালমৃত্যুকে ডেকে আনা মর্মান্তিক উপহাস ছাড়া আর কি ?"

শিষ্যরা চম্‌কে উঠে বল্‌লে—"সে কি, প্রভু! শাস্ত্রে বলেছে—তপস্যা করে ইন্দ্রিয়কে দমন করতে হয়, তবেই না সাধনার পথ সুগম হবে ?" শাক্যসিংহ বল্লেন—"শাস্ত্র যা-ই বলুক, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি—এপথে সিদ্ধি আসবে না। বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া যেমনি পাপ, দেহকে অযথা ক্লেশ দেয়ার মধ্যেও তেম্‌নি কোনো পুণ্য নেই। ইন্দ্রিয়ের ওপর অত্যাচার না ক'রে তাদের বশ করতে হবে,—ঘোড়াগুলোকে খোঁড়া না করে লাগাম পরিয়ে রথে জুড়তে হবে, তবেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবে। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না,—সংযমী হ'য়ে আত্মবশে চলো। সংযমের পথই মধ্যপথ—লক্ষ্যে পৌঁছবার সবচেয়ে সোজা রাস্তা—হয়তো বা একমাত্র রাস্তা। এসো, আমরা এই মধ্য পথে চ'লে দুঃখের শেষ কোথায় দেখে আসি।"

তখন থেকে শাক্যমুনি প্রকৃত সংযমের নিয়ম মেনে চল্‌তে লাগলেন। শরীরকে আর অযথা ক্লেশ দিলেন না, ভক্তের উপহার উপেক্ষা করলেন না। সুজাতার দেয়া পায়েস খেয়ে দেহে বল ও মনে আনন্দ পেলেন। ক্রমশঃ দিব্য কান্তি ফিরে এলো, নিস্তেজ মন আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হ'তে লাগলো। সেই একাগ্র সাধনার ফলে অচিরে লাভ করলেন সুদুর্লভ "বোধি" বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বহুদিনের বেদনা সার্থক হলো, দুঃখ পথের শেষ কোথায়—তা' জান্‌তে পারলেন।—দলে দলে শিষ্য এসে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো, এবং দিকে দিকে আশার বাণী ছড়িয়ে দিলো। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্র—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

—দুই—

কী সে বাণী—যা' দুঃখ-কাতর নরনারীর বুকে আনন্দের ঝঙ্কার তুললো? সেই বাণী খুবই সহজ অথচ খুবই শক্ত ; অর্থাৎ তা'র মর্ম বুঝতে পারবে তোমরাও, কিন্তু লোকে তা' মেনে চলতে পারেনা ব'লে পৃথিবী থেকে হিংসাদ্বেষ আজ অবধি দূর হ'লোনা। যে পরম জ্ঞান লাভ ক'রে সিদ্ধার্থ "বুদ্ধ-আখ্যা" পেলেন, তা' রয়েছে চারিটি "আর্যসত্য" বা মহান্ তত্ত্বের মধ্যে :—(১) জীবনে বাস্তবিকই দুঃখ আছে, তবে (২) দুঃখের কারণ আছে এবং তা' জানা গেছে, সুতরাং (৩) ঐ

কারণ দূর করতে পারলে দুঃখেরও অবসান হবে, এবং (৪) নৈতিক জীবন বিশুদ্ধ রাখলে দুঃখকে সমূলে ধ্বংস করা যাবে।

এই চারিটি আর্যসত্যের প্রত্যেকটিও কিন্তু মধ্যপথেরই নির্দেশ দিচ্ছে। দুঃখ মায়ার খেলাও নয়; আবার চরম সত্যও নয়, কারণ তা'র বিনাশ আছে। দুঃখ অনাদি ও কারণহীন নয়, অথচ দৈবের খামখেয়ালও নয়; যেহেতু তা'র কারণ আছে। ঐ কারণ দূর করতে না পারলে দুঃখ যাবে না, কিন্তু তা'কে বিনাশ করতে পারলে দুঃখের চরম অবসান হবে। দুঃখের কারণ দূর করতে হ'লে বিলাসব্যসনে মগ্ন থাকা চলবে না, কিন্তু—অন্য দিকে দেহ মনকে অযথা আঘাত দিয়ে দুষ্কর বৈরাগ্য সাধনেরও প্রয়োজন নেই।

বুদ্ধের মতবাদ অসম্পূর্ণ কিনা সেটা এখানে আলোচনা করা চল্‌বে না। শুধু মোটামুটিভাবে দুঃখনাশের সাধনা সম্পর্কে দু'চারটি কথা তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা করবো। বুদ্ধের মতে দুঃখের আসল কারণ ভোগতৃষ্ণা—বাহ্যবস্তু লাভের অদম্য স্পৃহা। এই মহাতৃষ্ণার শেষ নেই—কারণ কামনার বস্তু রয়েছে অগুন্‌তি। কাজেই অতৃপ্তির জন্য মানুষ সারাজীবন দুঃখ পায় এবং মৃত্যুর পরেও বিষয়বাসনা পুনর্জন্ম ঘটিয়ে তা'কে—কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো—"ভবচক্রে" ঘোরায়। অথচ এই বাসনাকে বশ করতে পারলে মানুষ মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পায় ও পরম তৃপ্তি লাভ করে।

বিষয় বাসনা সংযত করতে চাইলে সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে। এই জন্যে ভজন পূজন আরাধনার দরকার নেই। জীবন ও ভোগের বস্তু ক্ষণস্থায়ী—এই জেনে সত্যবাক্য বল্‌তে হবে ও সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং সৎপথে জীবিকার সংস্থান ক'রে জগতের হিত সাধনে রত থাকতে হবে। এভাবে চ'ললে ক্রমশঃ ভোগের তৃষ্ণা লোপ পাবে ও অপূর্ব আনন্দে হৃদয় ভ'রে উঠবে। এই আনন্দেরই অন্য নাম নির্বাণ—যা' পেলে কর্মের বাঁধন খ'সে পড়ে,—দুঃখের অনল স্তিমিত হয়, এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়। এই অবস্থাকে শূন্যে বিলিয়ে যাওয়া বলে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন, আবার অন্যরা বলেছেন—এ যেন আনন্দের মহাসাগরে ডুব দেওয়া। এসব দার্শনিক তত্ত্ব তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করা খুবই শক্ত—বড়ো হ'লে সহজেই বুঝ্‌তে পারবে।

বুদ্ধদেব নিজেই কিন্তু ব'লে গেছেন এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে আলোচনা দৈনন্দিন জীবনের কোনো কাজে লাগবেনা—তা' নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করোনা। তোমার দরকার দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ঃ তাই যদি চাও, তবে হিংসাদ্বেষ বিলাসব্যসন ভুলে যাও। বিষয় বাসনা দূর হ'লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে, আর মৈত্রী ও করুণা থেকে অপার আনন্দ লাভ করবে। বুদ্ধের এই উপদেশ তোমাদের পক্ষেও বোঝা কিছু শক্ত নয়। মানসিক দুঃখের কারণ সাধারণতঃ বাঞ্ছিত বস্তু না পাওয়া। সবসময়ই আমাদের এটা চাই, ওটা চাই—চাওয়া-পাওয়ার পথের

যেন শেষ নেই। অথচ প্রায়ই আমরা "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাইনা।" কাজেই আকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখলে না পাওয়ার দুঃখ ডেকে আনবোনা; আর, নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করলে যে আনন্দ পাবো তা'র তুলনা মিলবে না। অথচ মানুষের স্বভাব এই যে ধর্ম কী জেনেও তা করবার প্রবৃত্তি হয়না; অধর্মের স্বরূপ জেনেও লোকে তা'র ফাঁদে ধরা দেয় এবং দুঃখের কবলে পড়ে।

তথাগত ছিলেন সংস্কারমুক্ত মহাপুরুষ—জীবনভ'র কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করেছেন তিনি অমিত জ্ঞান রশ্মি বিকিরণ ক'রে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে কোনোরকম গুহ্য তত্ত্ব বা ভেল্কির স্থান নেই। ধর্ম মানুষের জীবন যাত্রার পাথেয়—তা' শুধু মুষ্টিমেয় যোগীর করায়ত্ত নয়। নীতিসম্মত জীবনই ধার্মিকের জীবন—নৈতিক জীবনের পবিত্রতাই ধর্মের পূর্ণ অবদান। পরমাত্মা ব'লে কোনো অলৌকিক শক্তির হাতের পুতুল নয় মানুষ, নিজের অদৃষ্টের নিয়ন্তা সে নিজেই। যে দুর্বল ও জ্ঞানহীন, তার ভাগ্যে দুঃখ আছেই; সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বা সংখ্যাহীন দেবদেবী তা'র হাতে মুক্তিফল দিতে আস্‌বেন না। বৌদ্ধধর্ম সংযমী ও আত্মনির্ভরশীল বীরের ধর্ম।

কেউ কেউ গৌতম বুদ্ধকে "নাস্তিক" আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কিন্তু কোথাও বলেন নি ঈশ্বর নেই; এমনকি হিন্দুধর্মের দেবদেবীও তিনি মেনে নিয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে তাঁর মতে মুক্তিলাভে দেবদেবীরা সাহায্য করতে পারেন না, কারণ তাঁরা মানুষের চেয়ে উঁচু স্তরের জীব মাত্র। আর, ঈশ্বরের সাহায্য দরকার নেই এইজন্যে যে মুক্তি আসে অন্তরের শুদ্ধি থেকে, এবং প্রত্যেকে নিজের চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা সেই শুদ্ধি লাভ করে। বুদ্ধদেব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন তাই নিরর্থক কল্পনার আশ্রয় কখনো নেন্‌নি।

বৈদিক যজ্ঞবিধিকেও বুদ্ধ স্বীকার করেন নি। আত্মরক্ষা বা আহারের জন্য প্রাণী হত্যা দরকার হ'তে পারে, কিন্তু অসহায় জীবকে বলিদানের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নেই। জিঘাংসা সব সময়ই পাপ; হিংসার অর্ঘ্যে ঈশ্বরের তৃপ্তিসাধন হয় না, দেবদেবীকেও বশ করা যায় না। একটি হংসের শোণিত যাঁকে বিচলিত করেছিল, পশুবলির রক্তবন্যা তাঁকে যে বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরোধী ক'রে তুল্‌বে সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। অথচ বেদের মহৎ সূক্তগুলি তিনি অপছন্দ করতেন না,—এমন কি তাঁর কণ্ঠে আমরা সেই মন্ত্রের প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পাই। পরলোকেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন কারণ তিনি পুনর্জন্ম মানতেন। কাজেই ভারতীয় ঐতিহ্যমতে বুদ্ধকে নাস্তিক বলা চলে না। এই নাস্তিক অনেক আস্তিকের গুরু—বিশ্বের নমস্য।

—তিন—

বুদ্ধদেব নিজে কোনো পুস্তক রচনা ক'রে যান্ নি। তাঁর পরিনির্বাণের পর শিষ্যরা তাঁর অমূল্য বাণী "ত্রিপিটক" নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করে রাখেন। "মিলিন্দপ্রশ্নে"ও তাঁর মতের সুন্দর আলোচনা

আছে। ক্রমশঃ তাঁর জীবন বেদ নিয়ে এক বিরাট সাহিত্য ও দর্শন গড়ে ওঠে। তা'র মধ্যে "জাতকের" গল্প তোমরা অনেকেই হয়তো পড়েছো। এতে জাতিস্মর বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্মের অনেক কাহিনী আছে। বড়ো হ'লে এই বইগুলোর কিছু কিছু পড়তে চেষ্টা করো—কারণ বুদ্ধদেবের মতো জ্ঞানী ও সংস্কারক পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। আজকের দিনেও বুদ্ধভক্ত রাজর্ষি অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চল্‌তে চায় স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও বুদ্ধদেব ব'লে গেছেন—নিজের পথ নিজেই খোঁজো, "আত্মদীপো ভব"। মেকি গুরুতে এই দেশ ছেয়ে গেছে, সুতরাং ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর মত আজ আমাদের নতুন ক'রে স্মরণ করতে হবে। তাঁর অন্তিম বাণীর মানে এই নয়—যে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকো। তিনি বল্‌তে চেয়েছেন—জ্ঞানের আলো জেলে সৎপথে নিজে চলো, এবং সাধ্যমতো অন্যকে চল্‌তেও সাহায্য করো ; তবে—অন্যে তোমার নির্দিষ্ট পথে চল্‌বে কি না সেটা সে নিজেই ঠিক করবে।— "হীনযানী" বৌদ্ধরা অবশ্য নিজের মুক্তির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছিলেন ; কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলো। "মহাযানীরা" বল্লেন—"শুধু নিজের নয়, সমস্ত জীবের নির্বাণের জন্য চেষ্টা করতে হবে, কারণ আমরা পরস্পরের ওপর নানাভাবে নির্ভর করতে বাধ্য।" ভারতের সর্বত্র গ'ড়ে উঠলো শত শত সংঘ ও মঠ, এবং লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী জগতের মঙ্গল কামনায় নিজেদের উৎসর্গ করলেন। দেশবিদেশে তাঁরা বয়ে নিয়ে গেলেন অমিতাভের মৈত্রী ও করুণার বার্তা—যা' দুঃখতপ্ত নরনারীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন ক'রলো।

সাধারণ মানুষের চিত্ত দুর্বল—তা'রা ঐশী শক্তির আশীর্বাদ কল্পনা না ক'রে পথ চলতে পারেনা নির্ভয়ে। কিন্তু ঈশ্বর কোথায়? ভক্তরা বল্লেন—"বোধিসত্ত্বই আরাধ্য দেবতা,—প্রজ্ঞা ও করুণার লোকাতীত প্রতীক। শাক্যমুনিই এই ধর্মের গুরু—কর্মাধ্যক্ষ, অমিত যার জ্ঞান ও প্রেমের দীপ্তি।" মরজগতে অমৃতের বাণী এনে তথাগত নিজেও অমর হয়ে রইলেন।

হিন্দুধর্মের মনীষীরা একদিন বুঝতে পারলেন—সনাতন ধর্মের সামগানই বুদ্ধদেব নতুন সুরে গেয়ে গেছেন। ত্যাগ, প্রেম ও সেবার মন্ত্র—সে তো ভারতেরই চিরন্তনী বাণী। তাই তাঁরা বুদ্ধদেবকে ভগবানের অংশ ব'লে স্বীকার ক'রলেন—ধর্মসংস্থাপনের জন্য যে শক্তি যুগে যুগে বিচিত্ররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়। বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার রূপে স্থান পেলেন বুদ্ধদেব। ভক্ত কবি জয়দেব তাই গাইলেন—

"কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

সে-ই ধন্য নরকুলে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বর্ত্তমান সময়ে 'লোকে যারে নাহি ভুলে'—এই রকমের এক 'ধন্য'-পুরুষ ছিলেন ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। শেষ-জীবনে তিনি হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। এই পদের গৌরব নিয়েই গত ২২-এ শ্রাবণ কলিকাতার রাজভবনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রায় উনআশী বছর পূর্ব্বে কলিকাতার এক খৃষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ছাত্রজীবনে কৃতিত্বের সহিত এম্. এ. পাশ করার পরই তাঁর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি পি.-এইচ. ডি.-ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে সম্মানজনক ডি. লিট্.-উপাধিরও অধিকারী হন।

তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল শিক্ষা-বিভাগে এবং শিক্ষাব্রতীর কর্ত্তব্য-পালনেই চিরদিন তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা ছিল। প্রথমে তিনি বরি-শালের রাজচন্দ্র-কলেজে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ ক'রে অল্পকালের মধ্যেই সেই কলেজের অধ্যক্ষ হন। তারপর কলিকাতায় এসে একে একে কলিকাতার সিটি-কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগের সেক্রেটারী, কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টার এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট-শিক্ষা সম্পর্কে ইংরেজী ভাষার অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সমিতি এবং নিখিল বঙ্গীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতি একই সময়ে তাঁকে উভয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদে বরণ করেছিলেন।
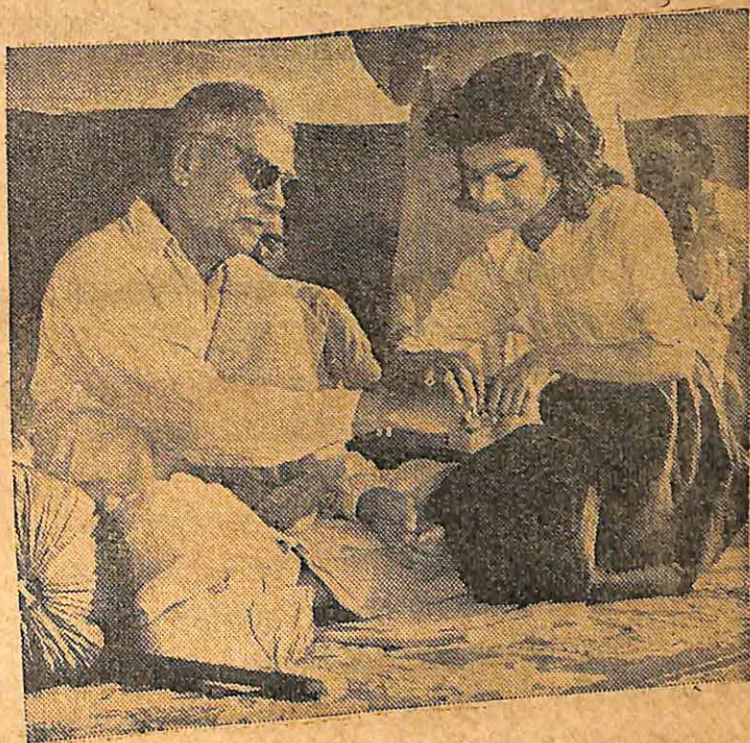
শিক্ষাসম্পর্কীয় কার্য্যের সঙ্গে হরেন্দ্রকুমার ক্যালকাটা-রিভিয়্যুর প্রধান সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত অনেক প্রবন্ধ নানা পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিবিধ তথ্যপূর্ণ তাঁর কয়েকখানি পুস্তক তাঁকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারেরও প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রেও হরেন্দ্রকুমারের বিশেষ কার্য্যতৎপরতা ছিল। তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে উদার-মতাবলম্বী। ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের নিখিল ভারতীয় পরিষদের এবং ক্যালকাটা য়্যাণ্ড সুবার্বণ ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়নের সভাপতিরূপে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাঁর সেই প্রভাবই রাজনীতি-ক্ষেত্রে এদেশের খৃষ্টান সমাজকে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

উনিশ বছর পূর্ব্বে বঙ্গীয় আইন-পরিষদের সদস্যরূপেই হরেন্দ্রকুমারের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তৎপর তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য হন এবং তার সহ-সভাপতিপদ লাভ করেন। তাঁর বিচক্ষণতা তখনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রায় পাঁচ বছর পশ্চিমবাংলার রাজ্যপালের কার্য্য করার সময়ে তাঁর ত্যাগ, অনাড়ম্বরতা, এবং সহজ-সরল আচরণ তাঁকে জনগণের বিশেষ প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন করেছিল।

সাংসারিক জীবনে হরেন্দ্রকুমার ছিলেন একেবারে সাদাসিধে মানুষটি। আহারের, পোষাক-পরিচ্ছদের, চলাফেরার বাহুল্য কোনোদিনই তাঁর ছিল না। হাস্যময় মূর্ত্তিতে দুদিনের আলাপ-পরিচয়েই তিনি সকলকে অন্তরঙ্গ ক'রে নিতেন।

কিন্তু এ সমস্তই তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁর দানে ও মনে। জনহিতকর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর দরদ ছিল প্রাচীন আচার্য্যদেরই মত। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে এজন্য প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা তিনি দিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যপালের বেতন হ'তে মাসিক পাঁচশ টাকা মাত্র গ্রহণ ক'রে বাকী সমস্তই তিনি দান করতেন লোকশিক্ষার নিমিত্ত। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেও তাঁর যত্ন ছিল অসীম। এই কার্য্যের জন্য তিনি নিজেই নয় লক্ষ টাকা দান করেছেন; তার উপর লোকের কাছে ভিক্ষার ঝুলি পেতে অর্থ-সংগ্রহ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু-স্মৃতিসংরক্ষণের এবং দীঘার সমুদ্রতীরে যক্ষা-আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্যনিবাস-স্থাপনের উপায় হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর এই দানের ধারার বিরতি ঘটেনি সম্প্রতি তাঁর বিধবা পত্নী শ্রীবঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁর নিজস্ব বহু পুস্তক ও পত্রিকাদি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন এবং তাঁর কলিকাতার ও মধুপুরের বাড়ী শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্যোদ্ধার-কল্পে দানের সংকল্প জানিয়েছেন।

হরেন্দ্রকুমারের মনের পরিচয়ের নিমিত্ত দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনা কয়েকটি সামান্য বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই তাঁর অসামান্য দরদী মনের যে-সন্ধান মিলবে তা আদর্শরূপে সকলেরই গ্রহণযোগ্য।

সে-ই ধন্য নরকুলে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব্বেকার কথা। হরেন্দ্রকুমার তখন পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগের সেক্রেটারী। চুরির অপরাধে তাঁর আপিসের একজন চাপরাশীর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। হরেন্দ্রকুমার সেই সূত্রে বলেছিলেন—চোরকে সাজা দেওয়া সোজা। কিন্তু এই রকম কাজ হ'তে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিবৃত্ত ক'রে শোধরাতে পারলেই তো তার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও কল্যাণ হয়।

তারপরের ঘটনা তিনি যখন ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার ইংরাজীর এক-অংশের প্রধান পরীক্ষক। পরীক্ষার পর ছাত্রদের ফল জানবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, সর্ব্বদাই তিনি তা মনে রেখে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। একজন ট্যাবুলেটর ছিলেন ভারী কড়া মেজাজের। কেউ তাঁর নিকট পরীক্ষার ফল জানতে গেলে তাকে ভর্ৎসনা ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব। একদিন সেই ভদ্রলোক নিজেই হরেন্দ্রকুমারের নিকট এক আত্মীয়ের ইংরেজীর ফল জানতে চাওয়ায়, প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার পর, তিনি সে-কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের কত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া করতে হয়, আর ছেলেপিলেদের পড়াবার জন্য অভিভাবকদেরও কত অসুবিধা, সে-বিষয়ে তিনি বরাবরই সচেতন ছিলেন। কাজেই দু-চার নম্বরের জন্য কাউকে ফেল করান তিনি পছন্দ করতেন না। মুখেও বলতেন—একটু দরাজ হাতে কাগজ পরীক্ষা করলে যদি দু-চার হাজার ছাত্র বেশি পাশ হয় তা হ'লে কার কি ক্ষতি ?

একবার এক খৃষ্টান মহিলা তাঁর ছেলের পরীক্ষার ব্যাপারে হরেন্দ্রকুমারের সুপারিশ চান এবং তিনি খৃষ্টান ব'লে তাঁর বিশেষ সাহায্যের দাবী করেন। ধর্ম্মমতের দোহাই মেনে হরেন্দ্রকুমার পক্ষপাতিত্ব করতে রাজী হননি। সঙ্গে সঙ্গে হেসেও বলেছিলেন—তিনি জাতে খৃষ্টান হ'লে কি হয়, আসলে নৈকষ্য কুলীন মুখুজ্জেরই সন্তান !

হরেন্দ্রকুমার রাজ্যপাল হওয়ার পর 'পুরশ্রী'-নামক একটি মহিলা-সমিতির কয়েকজন সদস্যা রাজভবনে গিয়ে সৎকার্য্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে শ তিনেক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষে তিনি তাঁদের সঙ্গে নানারকম ঘরোয়া গল্পগুজব করতে করতে নিজের স্বাস্থ্যের কথা তুলে বলেছিলেন—একবার তাঁর সর্দ্দির জন্য সরকারী ডাক্তার ব্যবস্থা করেছিলেন দামী একটা ঔষধ। সেই ঔষধ তাঁকে দেওয়া হ'তো বিনামূল্যেই। কিন্তু দেশে যে কত গরীব লোক আছে,—যারা ব্যারামপীড়ার সময়ে সামান্য একটু ঔষধ-পথ্য পায় না,—তাদের দিকে তাকায় কে ?

ঘটনাগুলি খুবই সামান্য ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়েই হরেন্দ্রকুমারের উদার প্রকৃতির ও বিশাল অন্তর-রাজ্যের যে-সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তার তুলনা কোথায় ?

দেশের লোককে তিনি মনের মণিকোঠায় সাদরে স্থান দিয়েছিলেন, দেশের লোকও তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর পুণ্য-স্মৃতি

'মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্ব্বজন।'

ধন্য তুমি, সাবাস্ ছেলে!

এ বছরে যাঁরা বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তার মধ্যে একটি নাম পাওয়া যাবে দেওনারায়ণ ঝা। দেওনারায়ণ ১৯৪৮ সালে শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'ন। তারপর সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হ'ন আই. এ. পড়বার জন্য। আই. এ. পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হ'ন এবং এবার তিনি বি. এ. পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা তিনি এম. এ. পড়বেন।

এ ত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এতে বিশেষত্ব কিছু নেই। এমন ত অহরহই ঘটছে। তবে···

সেই কথাই বল্‌ছি। দেওনারায়ণ বারো বছর আগে অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর চাকুরীতে ঢোকেন কন্‌ডাকটার হয়ে। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা থাকলেও হয়ত তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই তাঁকে চাকুরী নিতে হয়েছিলো নিজ জীবিকা ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য। চাকুরীটা একটু পাকাপোক্ত হয়ে যাবার সাথে সাথেই তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন তাঁর মনের গোপন ইচ্ছাটাকে রূপদান করতে।

ট্রামে তখন শ্রমিকদের তিন সিফট্ ডিউটি চালু হয়েছে। দেওনারায়ণ কোম্পানীর কাছে অনুমতি চাইলেন শুধু রাত্রির সিফটে কাজ করবার। রাত্রির সিফট্ অর্থ বাড়ী ফিরতে রাত বারোটা, কোন কোনদিন বা একটা। এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করে সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল দেওনারায়ণ পড়াশুনো করে কৃতকার্য্য হয়েছেন। সুতরাং তাঁর এ বি. এ. পরীক্ষা পাশে বিশেষত্ব আছে বৈ কি!

সারা সন্ধ্যা ও রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত কোম্পানীর ঝামেলাপূর্ণ কঠিন কাজের দায়িত্ব পালন আর দিনের বেলায় পড়াশুনো করা—ক'জনের ক'দিন এ সহ্য হয়, বল! কিন্তু অদম্য যাঁর আগ্রহ, অধ্যবসায় যাঁর সহায় কোন বাঁধাই তাঁর চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। দেওনারায়ণবাবুর সাফল্যের এই হচ্ছে গোপন কথা!

এ রকম ঘটনা আমাদের দেশে নিয়ম নয় ব্যতিক্রম তাই আমরা এ রকম ঘটনা শুনলে একটু

চমকে উঠি। আমাদের সমাজব্যবস্থাও এ ধরণের প্রচেষ্টার পক্ষে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। কারণ আজও আমরা শ্রমের মর্য্যাদা দিতে শিখি নি। দেওনারায়ণ যে কাজ করেন সে কাজকে আজও সবাই ছোট কাজ ব'লে ভাবেন! ট্রাম কন্‌ডাক্‌টারকে আজও সহজে কেউ 'আপনি' বলে না, যত ভদ্রঘরের ছেলেই ঐ কন্‌ডাক্‌টারটি হোন্‌ না কেন।

কিন্তু জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে সব দেশ আমাদের দেশের চেয়ে আজ অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের ব্যাপার ঠিক উল্টো। সে সব দেশের বহু ছেলেকে পড়াশুনো করতে দেখা যায় নিজে উপার্জ্জন ক'রে। সেখানে কেউ যদি ঝাড়ুদারের কাজ ক'রে কলেজে পড়ে, তবে তাকে কেউ ছোটলোক মনে করে না।

দেশের সার্ব্বিক উন্নতির জন্য প্রত্যেকেরই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, প্রত্যেককেই শ্রমের মর্য্যাদা দিতে হবে ; নইলে দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না।
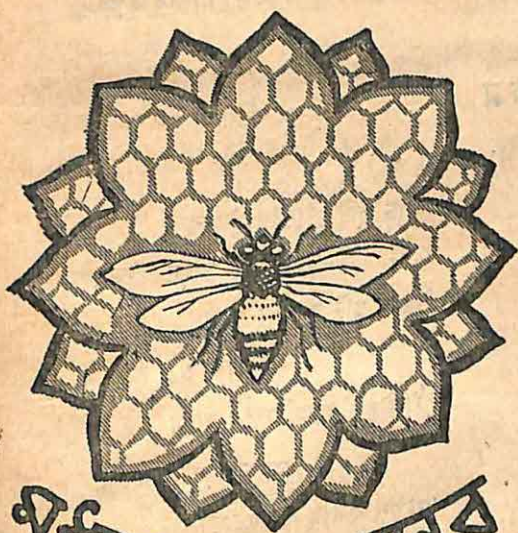
আমার প্রিয় ভাইবোনেরা,

মাঝে কিছুদিন তোমাদের কাছে অনুপস্থিত ছিলাম। যাক্‌ সেজন্য মনে দুঃখ করো না। এবারে তোমাদের লেখার আলোচনা করতে পারলাম না। তোমাদের পাঠানো লেখার ভেতর থেকে কতকগুলো কবিতা এবার ছাপালাম। পূজো ত এসে গেলো। প্রকৃতি ও পরিবেশে পূজোর আমেজ লেগে গেছে। আকাশে মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে, সেখানে বসেছে হাল্‌কা মেঘের মেলা। রোদে ধরেছে সোনালী রং। কী চমৎকার! সারাটা দুনিয়া যেন হেসে উঠেছে। তোমাদের মনেও পূজার আমেজ লেগে গেছে। শারদোৎসব বা দুর্গোৎসব বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙালীর কোন উৎসবই এক সঙ্গে এতদিন ধরে হয় না। তোমরা সবাই এ উৎসবের আসবার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো নিশ্চয়। তোমাদের সবার কামনা সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ করি। তোমরা আমার অনেক ভালোবাসা, অনেক আদর নিও। ইতি

আসর পরিচালক

সভ্যের রচনা

আজ শরতে

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সিংহ (গ্রাহক নং ১৬২০১)

আজ শরতে
হাওয়ায় মেতে
চল্‌বো মোরা ছুটি।
সোনার বরণ
অরুণ-কিরণ
ছু'হাত ভরে লুটি ॥
নদীর জলে
হেলে দুলে
ভাসাবো আজ তরী।
চল্‌বো ভেসে
আকুল হেসে
আনন্দে গান করি ॥

বৈকালেতে
ধানের ক্ষেতে
খেল্‌বো লুকোচুরি।
বাজাবো বেণু
কদম-রেণু
মাখবো গায়ে ভূরি ॥
বটের ঝুরি
জড়িয়ে ধরি
দুল্‌বো মনের সুখে।
আজ শরতে
নাই কিছুতে
দুঃখ মোদের বুকে ॥

খোকন

রত্নাকর (গ্রাহক নং ১৬৫৮৩)

সবুজ-শ্যামল কচি পাতা
কোমলতায় ধোয়া,
ছোট শিশুর নরম মুখে
সবুজ পাতার ছোঁয়া।
কোমল কুসুম যেমনি করে
প্রাণের হাসি হাসে
ছোট ছোট খোকন-কুঁড়ি
তেমনি ভালবাসে।

ছোট দুটি ঠোঁটের ফাঁকে
তরুণ-তপন-আভা,
উজল দুটি কাজল-চোখে
ঢেউএর ওঠা নাবা।
ঠোঁটের ফাঁকে মেদুর হাসি
আবলা বুলি ঝরে,
আপন কথায় স্বপন রচে
মধুর মতন করে।

কচি খোকন কাঁদে যখন
মুক্তা তখন ঝরে,
অলক্ষিতে মায়ের আশীষ
ঝরে খোকন 'পরে।

আত্মবিলাপ

শ্রীগুণধর বর্দ্ধন (গ্রাহক নং ১৬৭৬৪)

পথ ভুলে গিয়াছিনু ভুল পথে আমি, হায়
না বুঝিয়া কিছু।
মিটিল না আশা মোর, কলঙ্ক লাগিল গা'য়
ঘুরে পিছু পিছু।
মায়াবিনী মরীচিকা সে যে, ভাবি নাই আমি ;
গিয়াছিনু ছুটি'।
তার লাগি' গিয়াছিনু আমি নীচ পথে নামি,
(এবে) শুধু মাথা কুটি।

ভেসে গেল বন্ধু সব, তবু আমি আশা মুক্ত—
মন্ত্র-মুগ্ধ হায় !
শান্ত্রী যেন শাস্তি দেয় মোরে, আমি নহি মুক্ত,
সেথা কিছু নাই।
আজি ভাবি ক'রেছিনু কি বা ভুল—মহাভুল ;
এবে কি করিব ?
এসেছি কূলের কাছে—ঐ দেখা যায় কূল,
তবু কি ডুবিব ?

গৌতম বুদ্ধ স্মরণে

"নূরুল আনাম" (গ্রাহক নং ১৭২৪০)

হে সুন্দর মুক্ত আত্মা, নমি যুক্তকরে,
বিমোহিত চিত্ত তব গুণকীর্ত্তি স্মরে।
অন্ধকার ভারতভূমি আলোকি উদিলে তুমি
জগতের কল্যাণ সাধিবার তরে।
শুভ্র সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আহা কি সুন্দর,
বিধাতার মূর্ত্তিমান দয়ার সাগর।
এমন মহান মতি সরল সত্যের জ্যোতি
উদয়-শিখরে যেন দেব দিবাকর।

জনমি শাক্যকুলে হে কুল-পাবন,
কর্ম্মেতে করিলে ধন্য এ বিশ্ব ভুবন।
অসহায়ে দয়াদানে বাঁচালে তাদের প্রাণে,
করিলে জগত জয় অসাধ্য সাধন।
নমি তোমায় পুণ্যশ্লোক, নমি মহাপ্রাণ,
স্বর্গের দেবতাগণ গাক স্তুতি-গান !
আবার এস গো ফিরে ক্লেদময় এ সংসারে
এই ভিক্ষা সকাতরে যাচি ভগবান।

শাওন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত (গ্রাহক নং ১৫৮১৩)

ঘনিয়ে এল শাওন আবার
পল্লী-গগন ছেয়ে ;
হাসল সুখে কৃষাণ সবাই
মেঘের দেখা পেয়ে।
তাল-নারকেল পাতায় পাতায়
বর্ষা বাতাস কাঁপন লাগায়,
পিয়াসী প্রাণ গাছগুলো সব
উপর পানে চেয়ে।

আকাশতলে ভাসল আবার
চাতক পাখা মেলে—
মেঘের অলখ হাতের বুঝি
হাতছানি আজ পেলে।
কদম-কেয়ার গোপন আশা
এই বুঝি এই পেল ভাষা,
রুদ্ধ প্রাণের দ্বার খুলে আজ
মন চলেছে ধেয়ে।

শিশুসাথীর বৈঠক

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

স্নেহের ভাইবোন সব,

কেমন আছো তোমরা—খবর সব ভাল তো? এই বাদলা দিনে মজা করতে রাস্তাঘাটে বেরিয়ে না ভিজে ঘরে সবাই মিলে নানা বিষয়ে তোমরা আলাপ-আলোচনা কর আর মুড়ি নারকেল কিংবা আদা, মুড়ি, পেঁয়াজ, ছোলা, চিনেবাদাম ভাজা, তেল দিয়ে মেখে খাও অথবা ভাজা চিঁড়ে শুক্‌নো লঙ্কা, তেজপাতা ঘিয়ে ভেজে নুন দিয়ে খাও অনেক বেশী মজা পাবে; তা ছাড়া আরও ভাল হয় যদি গল্প করার সাথে সাথে ব্যায়ামের ছলে মাঝে মাঝে আনন্দদায়ক খেলাধূলা কর। এ জাতীয় আনন্দ অনুষ্ঠানের ভেতর মনের ও শরীরের একটা বেশ নতুন ধরণের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কি হবে বৃষ্টিতে ভিজে কাদায় হেঁটে সর্দ্দিকাশির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে? ও তো বার্লি, সাগু আর ঔষধ ছাড়া ক'দিন কিছুই খেতে দেবে না। অমন যেন করো না কেউ, মনে থাকবে তো আমার কথা?

আচ্ছা এবার ক'টি চিঠির জবাব দিচ্ছি—দেখো।

এম্. পি. এস্. চৌধুরী (বিকানীর—রাজস্থান)। প্রঃ—পেটের পেশী ভাল করার ব্যায়াম দিন। আপনার খুব ভাল ছবি পাঠাবেন। ঐ ছবি আমরা আমাদের ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়েল ক্রিকেট এসোসিয়েসানে রাখবো?

উঃ—শরীরের অবস্থা জানাতে হবে অথবা খালি গায়ের ছবি পাঠাতে হবে ভাই। ছবি পাঠাবো নিশ্চয়ই। ক'খানা চাই, কি মাপের চাই তা তো ভাই লেখা হয় নি!

অনুপকুমার গিরি (মেদিনীপুর)। প্রঃ—আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারে কিছু ব্যায়াম শিক্ষা দেবেন পত্র মারফৎ?

উঃ—তোমাদের মধ্যে কেউ এসো দু'এক দিনের জন্য কোলকাতা। কিছু কিছু শিখিয়ে দেবো,—চিঠিপত্রে ওকাজ খুব ভাল হয় না ভাই। মাঝে মাঝে আসতে হয়।

সুজাতা চাটার্জ্জি (বেলুন—হুগলী)। প্রঃ—ফুট বাথ কেমন করে নিতে হয়?

উঃ—টুলে বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বস, মাথায় একটা ভিজা তোয়ালে রাখ, গায়ে একটা কম্বল বা গরম কিছু জড়িয়ে নাও; এবার একটা বড় বালতি বা ড্রামে সহ্য হয় মত গরম জল নিয়ে তাতে হাঁটু পর্য্যন্ত চুবিয়ে রাখ,—১৫।২০ মিনিট। জল ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে সুরু করলে কমিয়ে নিয়ে গরম জল ঢাল ওতে (পা চুবিয়ে রেখে)। সময় অতিক্রম হয়ে গেলে, দরজা-জানালা বন্ধ করে—ঘামে ভিজা শরীরটি শুক্‌নো কিছু দিয়ে মুছে ফেল; জামা-কাপড় বদলে এক একটি করে দরজা ও জানালা খোল। একটু সময় শুয়ে থাক। এভাবে ফুট বাথ নেবে, বুঝলে? এতে সর্দ্দি ভাল হবে, মাথা ধরা, গা মেজমেজ করা, বাত, গাঁটে ব্যথা, জ্বর-জ্বর ভাব ইত্যাদি অনেক কিছুরই উপকার

পাবে। নিয়ম রক্ষা করে করো। অন্যথায় ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা বেশী থাকবে, উল্টো ফল দেখা দেবে, হুঁশিয়ার।

সলিল মিত্র (পলাশী, মীরা বাজার)। প্রঃ—নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগার আর্থিক অনটনে আর বোধ হয় রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না—কি করি উপায় বাত্‌লে দিন।

উঃ—একজন এসে দেখা কর। দেখি একটা Charity Show ব্যায়াম প্রদর্শনীর মারফৎ করা সম্ভব হয় কিনা! বেশ কিছু পয়সা পাবে বলে আশা করি।

প্রদীপ মণ্ডল (বর্দ্ধমান)। প্রঃ—গায়ে ছুলি হয়েছে—কি করি?

উঃ—সামান্য হাইপো জলে মিশিয়ে বেশ করে ছুলির জায়গায় ঘষে দেবে এবং একঘণ্টা বাদে পাতিলেবুর রস ঘষে লাগিয়ে দেবে। রাত্রে একাজ করো। কেমন থাকো লিখো।

জগদীশকুমার দাস (তিলজলা)। প্রঃ—আসন ব্যায়ামের আগে বা পরে করবো? মোটা লোকের পক্ষে কি কি আসন করা উচিত?

উঃ—ব্যায়ামের পর আসন করলে বোধ হয় ভাল হয়। মোটা মানুষদের হলাসন, সর্ব্বাঙ্গাসন, Hip rolling, শশঙ্গাসন, ধনুরাসন—অভ্যাস করলে ভাল হয়।

তরুণকুমার বক্সী (জামসেদপুর)। প্রঃ—একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে—কি ব্যায়াম করবো?

উঃ—ভাইটামিন 'বি' জাতীয় খাদ্য বেশী খাওয়া দরকার আর আপাততঃ হালকা ধরণের ফ্রি হেণ্ড ব্যায়াম ও দু' চারটি আসন করা যেতে পারে।

—বিশ্বদূত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী—১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে মহাসমারোহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলা বা ভারতেরই নয় এশিয়ারও গৌরবের বস্তু এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। '৫৭ সালের ১৯শে থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান চলবে। আশা করা যায় এ উপলক্ষে বিদেশ থেকেও বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি কলকাতায় আসবেন।

মঙ্গল গ্রহের পৃথিবীর নিকট আগমন—গেলো ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে এসে গিয়েছিলো। খুব কাছে বলতে মনে কোরো না যে দু' এক হাজার মাইল। এ দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ২০ হাজার মাইল। অবশ্য রকেটের যুগে এ দূরত্ব খুব বেশী নয়। কারণ রকেটে উঠে আজকাল এর চেয়েও অনেক বেশী দূরে অবস্থিত গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

রাজ্য কংগ্রেসের জ্ঞানী ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনা—গেলো বারের মত এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলার বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী জনের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছে মহা আড়ম্বরের মধ্যে। চৌরঙ্গীতে পূর্ব্বে যেখানে দারভাংগা মহারাজার বাড়ী ছিলো সেখানে এখন বিস্তৃত ময়দান। সেখানেই করা হয়েছিলো এই অনুষ্ঠানের স্থান। বাংলার ন'জন সুসন্তান সম্বর্দ্ধনার জন্য নির্ব্বাচিত হন। তার মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীদলের নায়ক, বর্ত্তমানে সাংবাদিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ ক্রীড়াবিদ্ সুধীর চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী, সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশু সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও সুখলতা রাও। এ দু'জনের সম্বর্দ্ধনা সভায় যাঁরা সভাপতিত্ব করেন তাঁরা দু'জনেও তোমাদের বিশেষ পরিচিত। সুখলতা রাওয়ের সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বপনবুড়ো আর দক্ষিণারঞ্জনের সভায় মৌমাছি।

বই তো পড়ো অনেকেই। কিন্তু তাতে
যে আঁকা ছবি থাকে কেউ কি তা চেয়ে
দেখো? সত্যিই যদি দেখো, তবে বলতে
পারো কোন্ দু'খানা বই, যার ছবিকে রেখেছি
চারটি ভাগে কেটে আর ওলট-পালট ক'রে।

—শ্রীসমর দে

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর

বাঁ দিকের ব্যাংটার ভাগ্যে ফড়িংটা আছে।

উত্তরদাতাদিগের নাম

তারকনাথ মণ্ডল (১৭৩৮৯) দুর্গাপুর ; রবীন্দ্র, ভারতী, কমলা (১৫৪০৯) নাগপুর ; সুবীর ব্যানার্জ্জী (১৭১০৪) মালদহ ; অমূল্য বসু (১৪৬২৪) বর্দ্ধমান ; মুকুল বসাক (১৬৬৬৮) রামকানালী ; রবীন্দ্রনাথ প্রধান (১৭১৭৫) মেদিনীপুর ; প্রশান্ত সিংহ (১৪৯২৯) কাটিহার ; সন্তোষ ও অসিত দত্ত (২১৬৭) কলিকাতা ; গৌতম ভদ্র (১৭১৭৯) আম্বালা সিটি ; রথীন্দ্র সিংহ (১৭২৮৭) হুগলী ; মিনতি গুপ্তা (১৬৩৪৮) কাছাড় ; বিনয় সৎপতি (১৬০৬৭) মেদিনীপুর ; রামচন্দ্র মণ্ডল (১৬৮৪৪) মালদহ ; মুক্তি সেনগুপ্ত (১৬০২০) মানভূম ; পান্না ও চুনি রায় (১৫৯৩৩) কলিকাতা ; সজল সেনগুপ্ত (১৭১৫৭) আগরতলা ; রণধীর দত্ত ও দীপক দাস (১৭১১৯) হালিসহর ; কুমারী ছায়া চাটার্জ্জী (১৩৯৫৮) বীরভূম ; শিশির ও সুচিত্রা নিয়োগী (১৫০৭) কলিকাতা ; বাণী ও দীপ্তেন্দু রায় (১৭৪৩৩) নিউ দিল্লী ; দিলীপ বসু-মল্লিক (১৭৪৭৬) সাহাবাদ ; অমল ভাওয়াল (১৫৪০১) জলপাইগুড়ি ; অশোক ও মিত্রা মুখার্জ্জী (১৪৮৭৭) দার্জ্জিলিং ; প্রণব গুহ (১৬১০৪) চাম্পারন ; সুশীল সরকার (৪৮৭ পি) যশোহর ; রত্না রায়চৌধুরী (১৪৯৩৩) কলিকাতা ; সুদীপ্ত রায় (১৭৩৭৫) কলিকাতা ; সেরিনা বেগম (১৭৩৬০) সিলেট ; রামপদ বেরা (১৬০৯২) মেদিনীপুর ; কুমারী শিপ্রা (৮২৮০) কুলডাঙ্গা ; সুধাংশুশেখর দাস (১৬৪৩৭) মেদিনীপুর ; প্রণতি ও জয়তি গোস্বামী (১০৯৭১) কাঁচরাপাড়া ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫১৪৮) শ্যামনগর ; শ্যামল সেনগুপ্ত (১৬২৪৮) ২৪ পরগণা ; আরতি, সমর, সরোজ প্রভৃতি (১৭১৬৫) হুগলী ; প্রবাল, সান্ত্বনা, সাধনা ঘোষ (১৬৯১৭) বোলপুর ; রণধীর কুণ্ডু (১৬৭৬০) বর্দ্ধমান ; সিদ্ধার্থ মিত্র (১৭৩৫২) মুঙ্গের ; তাপসী মিশ্র (১৬৬২০) শিলং ; অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী (১৬২৯১) হুগলী ;

বিকাশ ও গৌরীশঙ্কর (১২৪৫৬) কাঁচরাপাড়া ; ক্ষিতীশ বসাক (১৭১৫৯) কুচবিহার ; অমূল্য হাজরা (৩৪৫ পি) ঢাকেশ্বরী কটন মিল নং ১ ; দীপকরঞ্জন হোড় (১৭৭১৫) আসাম ; দীপালী ও শেফালি (১৩৮৬১) ঢাকুরিয়া ; বিশ্বরঞ্জন দাস (১৭৪৩১) দুয়ারদণ্ডী ; সমর বিশ্বাস (১৬৭০০) ২৪ পরগণা ; শ্রীলেখা, রঞ্জন, রমা প্রভৃতি (১৬৮০৪) ধুবড়ী ; মিহির মিত্র (১৫৭৯১) কলিকাতা ; দীপঙ্কর ও মৈত্রেয়ী দত্ত (১৫৯২০) আলিপুর ; ভূপাল ভৌমিক (১৭৩৪৮) নদীয়া ; রামকৃষ্ণহরি দে (১৭৩৬৮) বৈদ্যপুর ; অলোকা (১৬৪৭৩) পাটনা ; প্রদীপ চক্রবর্ত্তী (১৬৯১৪) ২৪ পরগণা ; অলকনন্দা দত্ত (১৫৯৪৮) সিওয়ান ; গুণধর বর্দ্ধন (১৬৭৬৪) মেদিনীপুর ; সমীর ও প্রবীর (১৭০৯৭) নাগপুর ; জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ (১৬৬০০) পাটনা ; সিপ্রা, বীথি, তপু প্রভৃতি (১৪৫৭৪) রাণীগঞ্জ ; প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত (১৭৩৩৫) কলিকাতা ; অমলকুমার বসু (১৭২১৯) আসাম ; হৃষীকেশ, সজনী, দুধকুমার প্রভৃতি (১৬৪৯৫) গোপীমোহন শিক্ষাসদন ; বিমলা (১৬৩৭৭) ২৪ পরগণা ; মতিয়ার রহমান (১৬৬১০) হুগলী ; মঃ আবদুর রসীদ (৫১০ পি) রংপুর ; রজত ও জয়ন্ত (১৬৫৫৯) কুচবিহার ; কুমারশশী দে (১৬৯২৩) শিলচর ; মুক্তি ও অরুণোদয় (১২৮১২)

হুগলী ; দীপা, রূপা (১৪০০৯) কলিকাতা ; মীনাক্ষী ও অমিতাভ (১৬২৫৭) মুজঃফরপুর ; সুবীর, প্রশান্ত (১৬৯১১) গৌরীপুর ; দেবব্রী, অলকনন্দ (১৪৯১৮) লক্ষ্ণৌ ; অর্চ্চনা মুখার্জ্জী (৪৪৯৫) হাতীশালা ; কুমারী মৈত্রেয়ী (১৭০৯৯) নদীয়া ; অজিত, রণজিৎ প্রভৃতি (১৬৮৮১) মুর্শিদাবাদ ; মৃণালকান্তি (১৬৬৭৭) বর্দ্ধমান ; রবিকান্ত ভট্টাচার্য্য (১৭৪৩৫) হুগলী ; কমল দলুই (৯৯২৪) কলিকাতা ; সুনীল দাশগুপ্ত (১৬৫৩২) কলিকাতা ; দীপ্তি দেবী (৬২৪৭) কানপুর ; শ্যামলী সিংহ (১৪০৭৩) কলিকাতা ; দীপক মুখার্জ্জী (১৬৪১১) বসিরহাট ; অসীম ও আশীষ বসু (১২০৫৯) কলিকাতা ; রঘুনাথ মিত্র (১৫৯২৭) দিল্লী ; বাসবদত্তা ও স্বপন (১৬৪৯৯) কাছাড় ; সুভাষ, টুলু ও সন্তু (১৭০৫৪) মেদিনীপুর ; সুবিনয় সিদ্ধান্ত (১৭৩২৫) জলপাইগুড়ি ; পান্না সেন (১৬৮৩০) মেদিনীপুর ; কমলা ও অসিত (১৭৩৪৬) হুগলী ; অসীম ও অমিত (১৭৩৩০) কলিকাতা ; অশোক রায় (১৭৪৪১) কলিকাতা ; তড়িৎ ও তাপস (১৭০৫০) মেদিনীপুর ; শুভেন্দু সেনগুপ্ত (১৫২৬৬) দমদম ; প্রদীপ চক্রবর্ত্তী (১৬৮৬২) হাওড়া ; সুব্রত, তাপস ও ছন্দা (১৫৫৭২) নৈনীতাল ; কিরীট মৈত্র (১০৯৯) তেজপুর ; প্রণব, প্রবীর ও প্রদীপ (১৬৩৫৪) চিরিমিরি ; কৃষ্ণপ্রিয় ও কনককান্তি (১৪৪৯৯) মেদিনীপুর।

সুশান্ত, সুভাষ প্রভৃতি (১৬১৪২) ডিব্রুগড় ; উমানাথ চাটার্জ্জী (১৭৪০২) নাগপুর ; পলটু, বাবলু ও টুলু (১৫৯৪৭) মেদিনীপুর ; তুষারকান্তি ঘোষ (১৬৭৭১) বর্দ্ধমান ; মণীন্দ্র মণ্ডল (১৬৮৫৩) নন্দীগ্রাম ; মৈত্রেয়ী ও গার্গী (১১২৭২) বর্দ্ধমান ; প্রণব রায় (১৬০৫৩) মেদিনীপুর ; দেবকুমার জৈন (১২৬১৪) মুর্শিদাবাদ ; তাপস দত্ত (১৫১৪২) নাগপুর ; অরুণ মিত্র (১৭২৮৬) হুগলী ; অশোক কর্ম্মকার (১৬১৩৬) কুচবিহার ; অলক ও দীপক (১৭৪০০) গয়া ; অঞ্জু, অরুণা প্রভৃতি (১৬৩০৮) ২৪ পরগণা ; চন্দ্রশেখর (১৬৭৪৫) বর্দ্ধমান ; অরুণ, বরুণ ভট্টাচার্য্য (১৪৮৭৩) বর্দ্ধমান ; দুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী (১৬৯২১) মেদিনীপুর ; রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য (১৭৪৩৫) হুগলী ; ছন্দা, অরুণা চাটার্জ্জী (১৭২৭৮) নিউদিল্লী ; অনুপম, অমর প্রভৃতি (১৪৮১০) লাহেরিয়া-সরাই ; সিদ্ধার্থ চাটার্জ্জী (১৬৩০৩) জলপাইগুড়ি ; রূপমঞ্জরী সিংহ (১৫২০৭) কলিকাতা ; পাপিয়া ব্যানার্জ্জী (১৭২১২) বাঁকুড়া ; হিমাংশু চক্রবর্ত্তী (১৭২৪৬) মেদিনীপুর ; বাসবী ভাদুড়ী (১০৩১৩) কলিকাতা ; কাশীনাথ দত্ত (১৭৩৮২) দিল্লী ; প্রেমতোষ ও পঙ্কজ (১৬৮৩৬) হাওড়া ; মিলন বিশ্বাস (১৬৭৬৩) পূর্ণিয়া , সুপর্ণা হালদার (১৬৫১৭) ২৪ পরগণা ; উৎপল বিশ্বাস (১৬৪৩৬) মালদহ ; অমল সমাদ্দার (১৭২৫৪) কলিকাতা ; সুব্রত দালাল (১৩১৭১) বসিরহাট ; ময়নুদ্দিন আহম্মদ (১৭৩৬৯) ২৪ পরগণা ; অলোক মজুমদার (১৬৮১৮) বর্দ্ধমান ; পার্থরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৪২৪৮) বারাণসী ; শৈবাল চৌধুরী (১৬৬৫৭) শিলচর ; সুজিৎ ঘোষ (১৪৮৪৮) হুগলী ; অজয় বসু (১৭৩১৭) আসাম ; বাসুদেব চক্রবর্ত্তী (১৭৪০৯) হুগলী ; সিতাংশু পুরকায়স্থ (১৬৯০৩) জালালপুর ; জ্ঞানব্রত রায় চৌধুরী (১৬২০৫) কলিকাতা ; রঞ্জন নাথ (১৬০৫৮) পলাশবাড়ী ; সোনা ও বাবু (১৫৯৩২) কলিকাতা ; প্রদীপ মিত্র (১৪৩২১) কলিকাতা ; কুমকুম বল (১৭৩৮৪) কলিকাতা ; বীথিকা ধর (১৭২১০) আসাম ; তাপস মুখার্জ্জী (com 15)

কলিকাতা ; বনানী দাশগুপ্ত (৪৫৫৭) উড়িষ্যা ; বিশ্বরঞ্জন মাইতি (১৭৩৩২) মেদিনীপুর ; নন্দিতা ও অমলেন্দু (১৬১২২) হাজারীবাগ ; সুব্রত চাটার্জ্জী (১৬১৩৭) শিলিগুড়ি ; মীরা বিশ্বাস (১৪৮৯৭) আসাম ; রাধা মিত্র (১৪৫২৮) ধানবাদ ; রথীন্দ্র ও নবকুমার (৬৪৪৭) কলিকাতা ; কুমার কিশোর পাল (১৫১৬৬) কলিকাতা ; বল্টু বোস (১৭৪২১) মুঙ্গের ; রমেশ বিশ্বাস (১৬৫৪৬) ফরিদপুর ; সোমনাথ, ঝন্টু প্রভৃতি (১১৫১৭) ; বুলবুল রায় (৬৫০৫) বর্দ্ধমান ; শুক্লা ও কৃষ্ণা বসু (১৪৩৫৭) রাঁচী ; শরদিন্দু ঘোষ (১৫৮২৭) কানপুর ; অভিজিৎ ও বন্দিতা পুরকায়স্থ (১৭২৮৯) লামডিং ; পৃথ্বীশকুমার বসু (১৭৩০৭) কলিকাতা ; কুণাল, প্রবাল ও পিয়াল দত্ত (১৬৫২৩) বর্দ্ধমান ; অণিমা, পরেশ ও গঙ্গাধর (১৭৩৪৯) জামসেদপুর ; কাবেরী ধর, বালীগঞ্জ (কলিকাতা)। প্রশান্ত ও প্রবীর লাহিড়ী, ঢাকুরিয়া ; ভীমরুল, ২৪ পরগণা ; মনসা, রবীন্দ্র, উৎপল প্রভৃতি, চাকুলিয়া ; অশোক মিত্র, মেদিনীপুর ; গৌতম রায়, মানভূম ; নিরাপদ চট্টরাজ, বর্দ্ধমান ; মৃণাল ও ছায়ারাণী, সিংভূম ; নিলু, খুকু, কেতু প্রভৃতি, কলিকাতা ; রণজিৎ লোধ, ২৪ পরগণা !

মিহির সোম, কলিকাতা ; প্রীতিরঞ্জন, দীনেশ প্রভৃতি, মালদহ ; শেখর, মঞ্জু, গৌরী প্রভৃতি কলিকাতা ; মঙ্গল, মোনা, লাইলি প্রভৃতি, জলপাইগুড়ি ; রথীন ও প্রদীপ, জামসেদপুর , সুশান্ত ঘোষ, কলিকাতা ; পিনাকেন্দ্র ও শেখরেন্দ্র, কালিয়া ; অনিল নাথ, কলিকাতা ; তাপু, রণজিৎ, বটু প্রভৃতি, জামসেদপুর ; বেবী, রুবী ও কবি, ২৪ পরগণা ; কর ব্রাদার্স, কৃষ্ণপুর কলোনী ; প্রসাদ, শ্যাম ও সুরজিৎ প্রভৃতি, তেজপুর ; অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমান ; গৌরী ও তারাশঙ্কর, বাঁকুড়া ; অসিত, মালতী, আরতি প্রভৃতি কলিকাতা ; তাপস ও বিশ্বনাথ, কলিকাতা ; অসিত সাহা, হাওড়া ; অরূপ ও রজত দত্ত, নৈহাটী ; সুশান্ত ও সুমন্ত ভট্টাচার্য্য, হালতু (ঢাকুরিয়া) ; নবু, তপু ও দীপু, শিলিগুড়ি ; অশেষ রায় চৌধুরী, কলিকাতা ; দাড়ু মাষ্টার, হাওড়া ; প্রতিমা ও পুতুল সুর, কলিকাতা ; অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ; সন্তোষ, শেখর ও শঙ্কর প্রভৃতি, হালিসহর ; ক্ষিতীশ মজুমদার, জলপাইগুড়ি ; শ্যামাপ্রসাদ ও শৈলেন্দ্র পাল, ঢাকা ; শেঙ্কু, দীপু প্রভৃতি, সিংভূম ; নরেন্দ্র ও নকুল মাইতি, জামসেদপুর ; দেবেশ, মিরণ, মণ্টু প্রভৃতি জলপাইগুড়ি ; সুব্রত, দেবযানী ও কৃষ্ণকলি, কলিকাতা ; সুভাষ সাহা, কলিকাতা ; মঞ্জু, মানু প্রভৃতি, মানকাচর ; আলোছায়া, কমলা, ডলি প্রভৃতি মেদিনীপুর ; সত্যেন, রাখাল, নিমু প্রভৃতি জামসেদপুর ; কৃষ্ণা, মাধবী, রত্না প্রভৃতি হাজারীবাগ ; সমীর, দীপু ও টুটুল, মেদিনীপুর ; অসিত ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ ; অতনু, পুষ্প, বাস্তব প্রভৃতি, গাজীপুর ; পার্থ রায়, কলিকাতা ; ঝণ্টু, মণ্টু ও অসিত, ২৪ পরগণা ; অমলেশ রায়, ত্রিপুরা ; উৎপলেন্দু মৈত্র, হালিসহর ; অমল ও রামকৃষ্ণ, হুগলী ; মন্দিরা, প্রবীর ও অনাদি, কলিকাতা ; আগমনী গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ, ঝাড়গ্রাম ; প্রশান্ত ও রবীন্দ্র, শ্যামপুর ; রামশঙ্কর ও সন্তোষ, ২৪ পরগণা ; গোপাল, ভানু, কানু, প্রভৃতি, লিডো (আসাম) ; দেবকুমার ও জীবনকৃষ্ণ, ঠাকুরনগর ; (১৬৮৪৯) ; সরোজ ও মৃণাল, কৃষ্ণনগর ; সুশীল, সমরেন্দ্র, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি,

ডিব্রুগড় ; সুনীল, অরুণ ও অপর্ণা ; বেণু, বিশ্বনাথ, সোনা প্রভৃতি, ২৪ পরগণা ; প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, কলিকাতা, রমারাণী, যূথিকা, রথীন্দ্র, ঝুমকা ; হীরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, জলপাইগুড়ি ; আশীষ, শ্যামল, শিশির প্রভৃতি, চাকুলিয়া ; তৃপ্তি দালাল, কলিকাতা ; জীবন, কুমকুম ও বেলা, হাওড়া ; ধ্রুবনারায়ণ ও পাঁচকড়ি, কলিকাতা ; কাঞ্চন, শ্যাম, আসাম ; বাবু, বাপী, নন্দ প্রভৃতি কলিকাতা ; প্রশান্ত পাঞ্জা, হুগলী ; ভারতী, প্রবীর ও দিলীপ (১৬০০১) পাঞ্জাব ; ভারতী, সোমনাথ, পবন প্রভৃতি, এলাহাবাদ ; বিজয়, অমিত, বেণু প্রভৃতি, মালদহ ; চৈতন্যচরণ কারক, বর্দ্ধমান ; জিতেন্দ্র, রবীন্দ্র দে, কাছাড় ; লাটু, পান্না, মন্টু প্রভৃতি রাইমাটাং ; ভারতী, পুরবী, দেবব্রত প্রভৃতি, জামসেদপুর ; অশোক ও অলোক (১৭২৯৪) গৌরমোহন কুণ্ডু, হাওড়া ; তুলসীদাস ব্যানার্জ্জী, মানভূম ; সুচরিতা রায়, কলিকাতা ; মুরলী ধর ; ভারতী, বংশী ও মেঘসুন্দর, পাটনা ; সুব্রত, শান্তা, শীলা প্রভৃতি, হাজারীবাগ ; অনুরাধা (১৬৯০২), কলিকাতা ।

চিত্র-প্রতিযোগিতার ফল

মেয়েদের আলপনা আর ছেলেদের প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকবার প্রতিযোগিতায় আমরা যে সব ছবি পেয়েছি তার মধ্যে অনেকগুলিই বেশ ভালো। মেয়েদের প্রতিযোগিতায় কুমারী সন্ধ্যা মাইতি (মেদিনীপুর) আর ছেলেদের প্রতিযোগিতায় নবকুমার ও প্রদীপকুমার সান্ন্যাল (দারভাঙ্গা) পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি ছবি বেশ ভালো হয়েছে, তাই তাদেরও উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে পুরস্কার দেওয়া হলো। মেয়েদের মধ্যে কৃষ্ণা সাউ (জয়হিন্দ বিদ্যালয়), মৈত্রেয়ী ধর (কলিকাতা), ইলারাণী সাহা (তালপুকুর), চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), বন্দনা চাটার্জি (গোবরডাঙ্গা) আর ছেলেদের মধ্যে অরবিন্দ বসু (টালিগঞ্জ) ও আবু কায়ছার (টাংগাইল) পুরস্কার পাবে। এদের প্রত্যেককে আশুতোষ লাইব্রেরী প্রকাশিত দু'টাকা মূল্যের বই দেওয়া হবে। বই নিজেদের বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে। অবিলম্বে এরা সবাই শিশুসাথী কার্য্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

বিজ্ঞপ্তি

কার্ত্তিক মাসের শিশুসাথী আগামী মহালয়ার আগেই বার করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কোন একটি দেশী কোম্পানী খুব সুন্দর জলছবি বার করেছেন। তারা তোমাদের বারোখানা জলছবি বিনামূল্যে দেবেন। ডাক-খরচের জন্য দু' আনার ডাকটিকেট পাঠালেই এই জলছবি পাবে। শিশুসাথীর ঠিকানায় চিঠি লিখবে। খামের ওপরে অতি অবশ্যই 'জল ছবির জন্য' লিখে দেবে।

সম্পাদক—**শ্রীহরিশরণ ধর**
৫নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।